NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PGBG

PAPER-7B

MODULES - 1-3

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ ঃ নভেম্বর, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : বাংলা

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পাঠক্রম : PGBG - 7(B)

পর্যায় - 1 □ একক : 1-13

আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্য : পরিপ্রেক্ষা ও প্রধান লেখকবৃন্দ

রচনা
ড. রামকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা
অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত

পর্যায় - 2 □ একক : 1-3

আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্য : উপন্যাস

রচনা
ড. পাপিয়া জয়সোয়াল

সম্পাদনা
অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত

পর্যায় - 3

আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্য : ছোটগল্প

রচনা
ড. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

সম্পাদনা
অধ্যাপক পবিত্র সরকার

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGBG 7(B)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায়

1

একক 1	□ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য : একটি প্রস্তাবনা	9-12
একক 2	□ অসমীয়	13-19
একক 3	□ উর্দু	20-29
একক 4	□ ওড়িয়া	30-35
একক 5	□ কন্নড়	36-42
একক 6	□ গুজরাতি	43-47
একক 7	□ তামিল	48-52
একক 8	□ পঞ্জাবি	53-58
একক 9	□ ভারতীয় ইংরেজি	59-65
একক 10	□ মরাঠি	66-74
একক 11	□ মালয়ালম	75-82
একক 12	□ হিন্দি	83-91
একক 13	□ ভারতীয় অন্যান্য ভাষার কথাসাহিত্য	92-96

পর্যায়

2

একক 1	☐ মইলা আঁচল : ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'	99-118
একক 2	☐ এক চাদর মইলি সি (ময়লা চাদর) : রাজিন্দর সিং বেদী	119-134
একক 3	☐ সংস্কার : ইউ. আর. অনন্তমূর্তি	135-156

পর্যায়

3

পূর্বকথা		159
লেখকদের সম্পর্কে কিছু কথা		159-162
গল্প-গুচ্ছ :		
টোবা টেক সিং (উর্দু)	সাদত হাসান মান্টো	163-172
কনে দেখা (পাঞ্জাবী)	অমৃতা প্রীতম	173-178
কাফন (হিন্দী)	প্রেমচন্দ	179-189
দিনের বেলার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে (তামিল)	জয়কান্তন	190-204
মরীচিকা (তেলুগু)	আচন্ট শারদা দেবী	205-215
দেয়াল (মালয়ালম)	ভি. এম. বশীর	216-244
মাছ ও মানুষ (অসমীয়া)	মহিম বরা	245-257
টড়পা (ওড়িয়া)	গোপীনাথ মোহান্তি	258-276
সমাজ-সংস্কারক (মারাঠী)	অরবিন্দ গোখলে	277-286
বদমাশ (গুজরাতী)	ঝবেরচান্দ মেঘানী	287-300
অনুশীলনী		301-304

পর্যায় - 1

আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্য : পরিপ্রেক্ষা ও প্রধান লেখকবৃন্দ

একক ১ ❑ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য : একটি প্রস্তাবনা

গঠন

১.১ পূর্বভাষ
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ ভারতীয় ভাষা পরিবার
  ১.৩.১ ভাষা-বৈচিত্র্য
  ১.৩.২ ভাষা-নৈকট্য
১.৪ ভারতীয় কথাসাহিত্যের আদিপর্ব
১.৫ অনুশীলনী
১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ পূর্বভাষ

এই এককটির মাধ্যমে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আপনার একটি প্রারম্ভিক পরিচয় ঘটবে। এই এককটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে :

- স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সংবিধান রচয়িতা ভারতীয় ভাষা বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেন।
- ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য কিভাবে সাহিত্যে অকাদেমির স্বীকৃতি পায়।
- ভারতীয় ভাষা-পরিবারগুলি কী কী এবং কিভাবে তা নতুন নতুন আধুনিক ভাষার জন্ম দেয়।
- ভারতীয় সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় লেখা হলেও কোথায় তার ঐক্য।
- ভারতীয় প্রধান ভাষাগুলিতে কোন কোন সাহিত্যিকদের হাতে কথাসাহিত্য শিল্পরূপটি প্রতিষ্ঠা পেল।
- কোন কোন বই আপনাকে বর্তমান বিষয়টি জানতে আরো বেশি সাহায্য করবে।

১.২ প্রস্তাবনা

স্বাধীনতার পর, ভারতীয় সংবিধান তৈরির পর্বে, একটি জরুরি কাজ ছিল দেশের প্রধান ভাষাগুলিকে চিহ্নিত করা। কাজটি কঠিন কারণ ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষী এক দেশ। সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর সংবিধান রচয়িতারা চোদ্দোটি ভাষাকে মূলভাষা চিহ্নিত করেন। এগুলি হল : অসমিয়া, উর্দু, ওড়িয়া, কন্নড়, কাশ্মীরি, গুজরাতি, তামিল, তেলুগু, পঞ্জাবি, বাংলা, মরাঠি, মালয়ালম, সংস্কৃত এবং হিন্দি।

অন্যদিকে সাহিত্য অকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৫৪ সালে। তাঁরা সংবিধান রচয়িতাদের বিধান অতিক্রম করে ঐ সালেই, অকাদেমির তৎকালীন সভাপতি জওহরলাল নেহরুর উপস্থিতিতে, ভারতীয় ইংরেজিকে স্বীকৃতি দিলেন। পরে পরে আরো কিছু ভাষা যুক্ত হল অকাদেমির তালিকায় : ১৯৫৭-তে সিন্ধি, ১৯৬৫-তে মৈথিলি, ১৯৬৯-তে ডোগরি, ১৯৭১-এ মণিপুরী ও রাজস্থানি, ১৯৭৫-এ কোঙ্কানি ও নেপালি এবং ২০০৪-এ বোড়ো ও সাঁওতালি। সব মিলে চব্বিশটি ভাষার সাহিত্য।

১.৩ ভারতীয় ভাষা পরিবার

কিন্তু তাতেও যে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সম্পূর্ণ অবয়বটি ধরা গেল তা নয়। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেমন আবেগ এবং নির্মিতিতে বহুমুখী, ভারতীয় ভাষা ও সহিত্যও তাই। আর্যরা ভারতবর্ষে আসার আগেই এদেশে নিষাদ (অস্ট্রিক), দ্রাবিড় এবং ভোট-চীনীয় পরিবারের ভাষাগুলি প্রচলিত ছিল। আর্যরা নিয়ে এলেন আর্যভাষা। পরবর্তী সময়ে এই চার ভাষা পরিবার কতদূর ডালপালা ছড়াল তার বিবরণ রয়েছে সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (চতুর্দশ সংস্করণ ১৯৮৩)। ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য ('আর্য' শব্দের উৎস 'অর্য', যার অর্থ 'বিদেশীয়') পালি-প্রকৃত পর্বের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি স্বদেশী ভাষা তৈরি করল। অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া, কন্নড়, কাশ্মিরি, গুজরাতি, পঞ্জাবি, মরাঠি এবং হিন্দি ভাষার নাড়ির যোগ সংস্কৃতের সঙ্গে। অন্যদিকে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং ভোট-চীনী ভাষাও ব্যবহৃত হয় নিত্যদিনের ভাব বিনিময়ে এবং অনিত্য কথন-সাহিত্যে। অস্ট্রিক পরিবারের অস্ট্রো-এসিয়াটিক শাখার মোন্-খমের উপভাষা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দিনযাপন এবং দিন উদ্‌যাপনের মাধ্যম। আবার কোল উপশাখার প্রচলন রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বোত্তর অঞ্চলে। উত্তর-পূর্বে ভারতের খাসী ভাষাও এর অন্তর্গত। অন্যদিকে দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের বিস্তৃতি দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম, টুলু থেকে ওড়িশার ছোটনাগপুর এবং মধ্যপ্রদেশের অঞ্চল বিশেষে গোঁড়-খোঁড়-ওরাওঁদের মধ্যে। মালদহ জেলার রাজমহল অঞ্চলের মালতো বা মালপাহাড়ীর আদি উৎস কন্নড় বলে সুকুমার সেনের অনুমান। আর ভোট-চীনীয় পরিবারের বোট-বর্মী তিব্বতী, বোড়ো, কাচি, নাগা ভাষার উল্লেখযোগ্য প্রচলন রয়েছে হিমালয়ের পূর্ব অংশের পাদদেশে।

১.৩.১ ভাষা-বৈচিত্র্য

ভাষার এই বহুমুখিনতা নিয়ে ভারতবর্ষ। ভাষার কোনো এককে এই বহুস্বরতাকে বোঝা সম্ভব নয়। দেবভাষার দৈবিকতায় সর্বভারতীয় তার সন্ধান চলেছিল কিন্তু সাফল্য আসেনি। রাজভাষার অর্থ ও অস্ত্রের কৌলিন্যেও ধরা যায়নি। ইংরেজি দিয়ে ভারত বন্ধনের চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ কিন্তু কাজ হয়নি। যে দেশের মাটির নানা বর্ণ, পাহাড়ের নানান উচ্চতা, বনের ভিন্ন ঘনত্ব, নদীর অজস্র স্বর সেখানে মানুষের ভাষা ও সাহিত্যকে 'সর্বভারতীয়' এবং 'আঞ্চলিক' অভিধায় ভেঙে ফেলা যায় না। যে দেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে অজস্র বিন্যাস সেখানে সাহিত্য এক স্বরে বলতে পারে না।

১.৩.২ ভাষা-নৈকট্য

অন্যদিকে, এক না হলেও কোথাও যেন একটা মিল রয়েছে এই বৈচিত্র্যের ভেতর। তাই পৃথক ভাষাভাষী মানুষ একই পুঁথিতে তাঁদের নিজ নিজ ভাষার উৎস খোঁজেন। একই কবির একাধিক জন্মস্থান আবিষ্কৃত হয়। ভারতীয় নানা ভাষার লোকগল্পে জীবজন্তু এবং মানুষজন প্রায় একইভাবে ঠকায় কিংবা ঠকে। এক রাজ্যের কাহিনী অন্য রাজ্যের ভাষার সুন্দর ফুটে ওঠে। একই লেখক একাধিক ভাষায় সৃষ্টিশীল লেখা লিখে চলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের অনুবাদ পড়ে অনেক পাঠকই বুঝতে পারেন না এটি লেখা হয়েছিল অন্য একটি ভারতীয় ভাষায়। মালয়ালম ঔপন্যাসিক ভৈকম মুহম্মদ বশীরের 'নানার হাতি' উপন্যাসটি বাংলা অনুবাদে

পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুভূতি হল : 'পড়তে পড়তে মনে হয়েছে আমাদের গ্রামের মুসলমান খাঁ সাহেবদের বাড়ির বিবরণ পড়েছি। মনে হয়েছে ভেঙেপড়া রায় জমিদারদের বাড়ির বিবরণ পড়েছি। অর্থাৎ যা ঘটেছে, যা ঘটছে ভারতের পূর্ব প্রান্তে, তাই ঘটছে পশ্চিমঘাটের দক্ষিণ প্রান্তে।'

১.৪ ভারতীয় কথাসাহিত্যের আদিপর্ব

ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় কথাসাহিত্যের যে বিকাশ ঘটেছে তা সর্বক্ষেত্রে এক সময়ে ঘটেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে উপন্যাস শিল্পরূপটি প্রতিষ্ঠা পেল বাংলা, গুজরাতি এবং উর্দুতে। বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৩৮-মৃত্যু ১৮৯৪), গুজরাতিতে নন্দশঙ্কর মেহতা (১৮৩৫-১৯০৫) এবং উর্দুতে নাজির আহমেদ (১৮৩১-১৯১২) ঐসব ভাষার প্রথম উপন্যাসটির জন্ম দিলেন। সাতের দশকে তামিল, তেলুগু এবং হিন্দি ভাষার উপন্যাস লিখলেন যথাক্রমে ময়ূরাম বেদনায়াকাম পিল্লাই (১৮২৬-৮৯), কন্দুকুরি ভিরিসলিঙ্গম পন্তালু (১৮৪৮-১৯১৯) এবং বালকৃষ্ণ ভট্ট (১৮৪৪-১৯১৪), মালয়ালম এবং সিন্ধি ভাষার উপন্যাসের প্রথম পর্ব শুরু হয় যথাক্রমে আপ্পু নেদুনগাদি (১৮৬৩-১৯৩৩) এবং মির্জা কালিচ বেগের (১৮৫৩-১৯২৯) কলমে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে অসমিয়া, ওড়িয়া, কন্নড়, পঞ্জাবি এবং মরাঠি ভাষার প্রথম উপন্যাস লিখলেন যথাক্রমে পদ্মনাথ গোহাঁই বরুয়া (১৮৭১-১৯৪৬), ফকিরমোহন সেনাপতি (১৮৪৭-১৯১৮), গুল্‌বাডি ভেঙ্কট রাও (১৮৪৪-১৯১৩), ভাই বীর সিং (১৮৭২-১৯৫৭) এবং হরিনারায়ণ আপ্তে (১৮৬৪-১৯১৯)। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাজস্থানি ভাষায় প্রথম উপন্যাস লিখলেন শিবচরণ ভারতীয়া (১৮৫৩-১৯১৪)। বিংশ শতাব্দীর পরবর্তী দশকে লেখা হল কোঙ্কানি, কাশ্মিরী, ডোগরি, মণিপুরী, মৈথিলী এবং সংস্কৃত ভাষার প্রথম উপন্যাস।

স্থানাভাবে বর্তমান আলোচনাটি সীমাবদ্ধ রাখা হল তেরটি ভাষার মধ্যে। ভাষাগুলি হল অসমিয়া, উর্দু, ওড়িয়া, কন্নড়, গুজরাতি, তামিল, তেলুগু, পঞ্জাবি, ভারতীয় ইংরেজি, মরাঠি, মালয়ালম, সিন্ধি এবং হিন্দি। আবার এই ভাষাগুলির কথাসাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ও এখানে মিলবে না। ঐ ভাষাগুলির কয়েকজন প্রধান কথাসাহিত্যিককে নিয়ে এই আলোচনা। আর কথাসাহিত্য যেহেতু উপন্যাস ও ছোটগল্প শিল্পরূপ দুটি নিয়ে তাই দুটি বিষয়েরই আলোচনা রয়েছে বইটিতে। বাংলা ভাষার কথাসাহিত্য এখানে আলোচিত হয়নি যেহেতু বাঙালি পাঠকদের বিষয়টি বিশেষভাবে জানা।

পরবর্তী এককগুলি পাঠের আগে স্মরণ রাখা ভাল যে আধুনিক ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্র বিকাশের ফলে ভারতীয় কথাসাহিত্য শিল্পরূপটি প্রতিষ্ঠা পেল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হল নগর-সভ্যতা, গড়ে উঠল নতুন বণিক সমাজ এবং পাশ্চাত্যের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে উঠল। ঔপনিবেশিক শাসকের নানা শাসন-শোষণের পাশাপাশি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটল, যার অন্যতম জরুরি শিল্পমাধ্যমে হল কথাসাহিত্য।

১.৫ অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক এবং কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।

(ক) সংবিধান রচনার পর্বে সংবিধান রচয়িতারা তেরোটি ভারতীয় ভাষাকে প্রধান ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

(খ) সাহিত্য অকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে।

(গ) সাহিত্য অকাদেমির প্রথম সভাপতি ছিলেন জওহরলাল নেহরু।

(ঘ) আর্যরা ভারবর্ষে আসার আগে তিনটে ভাষা পরিবারের ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত হত।

(ঙ) 'আর্য' শব্দের অর্থ 'স্বদেশীয়'।

(চ) কাশ্মিরি ভোট-চীনীয় পরিবারের ভাষা।

(ছ) উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসী ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবারের অন্তর্গত।

(জ) টুলু ভাষা দ্রাবিড় ভাষা-পরিবারের অংশ।

(ঝ) মালপাহাড়ী ভাষার আদি উৎস কন্নড়।

(ঞ) বোড়ো ভাষা ভোট-চীনীয় পরিবারের অন্তর্গত।

২। টীকা লিখুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

(ক) ভারতীয় ইন্দো-ইরানীয় ভাষা।

(খ) ভারতীয় নিষাদ ভাষাগোষ্ঠী।

(গ) ভারতীয় সাহিত্যে ঐক্য।

(ঘ) ভারতীয় কথাসাহিত্যে বিকাশের প্রথম তিন দশক।

৩। ১২৫-১৫০ শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

ভারতীয় কথাসাহিত্যের আদিপূর্ব।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

(১) কৃপালনি, কৃষ্ণ : লিটরেচর অব মডার্ন ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লি, ১৯৮২।

(২) জর্জ, কে এম (সম্পাদিত) : মডার্ন ইন্ডিয়ান লিটরেচর, প্রথম খণ্ড, নতুন দিল্লি, ১৯৯২।

(৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন : আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৫৫।

একক ২ ❑ অসমিয়া

গঠন

২.১ নাম
২.২ আধুনিক যুগ
২.৩ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য
২.৪ সৈয়দ আব্দুল মালিক
২.৫ ইন্দিরা গোস্বামী
২.৬ অন্যান্য কথাসাহিত্যিকবৃন্দব্দ
২.৭ অনুশীলনী
২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ নাম

বর্তমান অসম রাজ্যটি প্রাচীনকালে 'প্রাগ্‌জোতিষ' নামে পরিচিত ছিল। 'কামরূপ' শব্দটিরও ব্যবহার মেলে প্রাচীন সাহিত্যে। 'অসম' শব্দটি সম্ভবত প্রচলিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন শান্‌ বা অহোমরা ব্রম্ভপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করে। শান্‌রা যুদ্ধে অপরাজেয় বা অসম বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল বলে শোনা যায়। আবার এই মতও রয়েছে যে 'অহোম' শব্দটির উৎস বোডো 'হ-কোম' ধ্বনি থেকে যার অর্থ নিচু বা সমান্তরাল দেশ।

২.২ আধুনিক যুগ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে অসম জুড়ে চলছিল ধর্মীয় সংঘাত এবং সামাজিক নানা টানাপোড়েন। ১৮১৬ সালে অসম চলে যায় বর্মীদের হাতে। তারা ১৮১৯ পর্যন্ত অসম শাসন করে। দ্বিতীয় পর্বে তারা অসমের রাজদণ্ড হাতে নেয় ১৮২৪-এ। ১৮২৬ সালে ইয়াণ্ডাবু চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসে অসম। ১৮২৮ এবং ১৮৩০ সালে দু-বার ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করা হয়। ১৮৩২ সালে অসম রাজপরিবারের পুরন্দর সিংহের হাতে উত্তর অসমের রাজ্যভার অর্পণ করে ব্রিটিশরাজ। কিন্তু দক্ষিণ অসম নিজেদেরই হাতে রাখে। ১৮৩৮ সালে ব্রিটিশ সরকার উত্তর অসমেরও ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেয়। ১৮৩৯ সালে অসম টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৬-এ অসমের সঙ্গে কলকাতার স্টিমার চলাচলের স্থায়ী ব্যবস্থা শুরু হয়। একই সালে শিবসাগর থেকে প্রথম অসমিয়া পত্রিকা 'অরুণোদয়' প্রকাশিত হয় খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের উৎসাহে। অসমিয়া ভাষা ও সাহিত্যের এই নতুন পর্বে যে সব অসমিয়া লেখকদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (জন্ম ১৮২৯), হেমচন্দ্র বরুয়া (জন্ম ১৮৩৫) এবং গুণাভিরাম বরুয়া (জন্ম ১৮৩৭)।

তবে অসমিয়া সাহিত্যে নবজাগরণের সূত্রপাত ১৮৮৮ সালে কলকাতায় অসমিয়া ভাষা উন্নতি সভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই কাজে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন চার কলেজ ছাত্র—চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা

(জন্ম ১৮৬৭), লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (জন্ম ১৮৬৮), পদ্মনাথ গোহাঁই বরুয়া (জন্ম ১৮৭১) এবং হেমচন্দ্র গোস্বামী (জন্ম ১৮৭২)। ১৮৮৯ সালে এই চার তরুণ প্রকাশ করলেন 'জোনাকি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা যা কবিতা ও নাটকের অগ্রগতির পাশাপাশি অসমিয়া কথাসাহিত্যের সূত্রপাত ঘটায়। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয় পদ্মনাথ গোহাঁই বরুয়ার আখ্যান 'ভানুমতী' এবং ১৮৯১-এ বেজবরুয়ার উপন্যাস 'পদ্মকুমারী'। লক্ষ্মীনাথের উপন্যাসটি ঐতিহাসিক হলেও উপস্থাপনা রোমান্টিক রীতিতে। নায়ক সূর্যকুমারকে ঘিরে দুই নয়িকা পদুমকুমারী এবং ফুলের কাহিনী এটি। এছাড়াও লক্ষ্মীনাথ লোককাহিনীর তিনটি সংকলন প্রকাশ করেন—'সাধুকথার কুকি' (১৯১০), 'বুড়িয়াইর সাধু' (১৯১২) এবং 'ককাদেওতা আরু নটিলোরা' (১৯১২)। লক্ষ্মীনাথের উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলনগুলির মধ্যে রয়েছে 'সুরভি' (১৯১২) এবং 'জনবিরি' (১৯১৩)। এই কথাসাহিত্যিকের কাহিনী-গদ্য যে কতখানি চিত্রময় ছিল তার পরিচয় পেতে 'ভদরী' গল্পের সামান্য অংশ উল্লেখ করা যায় : 'কাছেই একটা কলাপাতার ওপর বঁটিটা মরা ময়ূরের মত কাত হয়ে পড়ে আছে আর থেঁতলানো-মাথা কইমাছগুলো যেন ছাইমাখা সন্ন্যাসীর মত ভাঙ খেয়ে নেশার ঘোরে মাথা ফাটিয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে।' (অনুবাদ বীণা মিশ্র)। লক্ষ্মীনাথের সমসাময়িক অন্যান্য কথাসাহিত্যিকরা হলেন রজনীকান্ত বরদলৈ, দৈবচন্দ্র তালুকদার, দণ্ডীনাথ কলিতা প্রমুখ।

স্বাধীনতা-উত্তর অসমিয়া কথাসাহিত্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯২৪), সৈয়দ আব্দুল মালিক (জন্ম ১৯১৯), ইন্দিরা গোস্বামী (জন্ম ১৯৪৪)। এছাড়াও নবকান্ত বরুয়া (জন্ম ১৯২৬), যোগেশ দাস (জন্ম ১৯২৭), বীণা বরুয়া (জন্ম ১৯০৮), হোমেন বরগোহাঁই (জন্ম ১৯৩১), ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া (জন্ম ১৯৩২) এবং সৌরভকুমার চলিহা (জন্ম ১৯২৭) অসমিয়া কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

২.৩ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৪ সালে অসমের শিবসাগর জেলায় এক দরিদ্র পরিবারে। ইস্কুলে যাওয়ার সময়ে অনেকদিনই খালি পেটেই তাঁকে যেতে হত। পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকতা এবং আরও পরে বার্মা সীমান্তে যখন বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন তখনও একজোড়া জামা-কাপড় আর পুরনো একটা মিলিটারি কোট পরে দিন যাপন করতেন। এমন একটা সময় গেছে যখন তাঁর স্ত্রীকে একটা শাড়িতে বেশ কিছুদিন চালাতে হয়েছে। কিন্তু বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য এ অবস্থাতেও তাঁর সৃষ্টি থেকে সরে আসেননি। তিনি লিখেছেন কুড়িটি উপন্যাস, ষাটটির মতো ছোটগল্প, একশর বেশি কবিতা, দশটি নাটক, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পাঁচটি অনুবাদ এবং প্রবন্ধ। একসময় গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন এবং পরে সেখান থেকে অবসর নিয়ে প্রধান সম্পাদক হিসেবে 'প্রকাশ' পত্রিকায় যুক্ত হন। ছয়ের দশকে 'রামধেনু' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সাহিত্য অকাদেমির সহ-সভাপতি এবং পরবর্তী সময়ে সভাপতিও হয়েছিলেন।

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের প্রথম উপন্যাস 'রাজপথে রিঙ্গিয়াই' (রাজপথের ডাক, ১৯৫৫)। উপন্যাসটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু তৃতীয় উপন্যাস 'ইয়ারুইঙ্গম' (১৯৬০) ভারতীয় কথাসাহিত্যে এক অনন্য সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বর্মা সীমান্তে শিক্ষকতার সময় তিনি যে সব মানুষজনের কাছাকাছি আসেন তাঁদের নিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনী। 'ইয়ারুইঙ্গম' শব্দটির অর্থ 'প্রজাসাধারণের শাসন'। কাহিনীর পটভূমি মণিপুর এবং

নাগাল্যান্ড সীমান্তের একটি নাগা-অধ্যুষিত গ্রাম, কাহিনীর সময়সীমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু। উপন্যাসের নায়ক দুজন—বিশাঙ ও ভিডেশেলী। বিশাঙ মনে করে ভারতবর্ষের মূলস্রোতের সঙ্গে নাগাদের থাকা উচিত এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নাগাল্যান্ডের স্বাধীনতা বলে মেনে নেওয়া জরুরি। অন্যদিকে ভিডেশেলী সশস্ত্র নাগাবিপ্লব এবং নাগাদের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। দু-জনের এ বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব খুবই নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক।

> বিশাঙ প্রশ্ন করে, 'তোমার স্বাধীনতার তাৎপর্য কি, বলো তো।'
>
> ভিডেশেলী এবার হাসতে লাগল। হঠাৎ তার কপালের শিরা ফুলে উঠল। সে বলতে থাকল, 'আমার এমন একটা স্বাধীন রাজ্যের পরিকল্পনা যেখানে বাস করে মানুষ অনুভব করতে পারে, নাগা হয়ে জন্মানোর সার্থকতা কোথায়।'
>
> 'আমি নাগা হয়ে থাকতে চাই না, ভিডেশেলী, আমি মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখি।'
>
> 'আমি তোমার আদর্শের কথা শুনেছি। কিন্তু তুমি এইভাবে মানুষ তৈরি করতে পারবে না, গাছের বৃদ্ধির জন্য যেমন সাধারণ মাটি প্রয়োজন, মানুষের ক্ষেত্রেও সেই রকম প্রয়োজন।'
>
> 'সেই সারবান মাটি হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী, এ নিথর-নিশ্চল প্রলম্বিত পাহাড় ক'টা মানুষের গৃহ নয়,' গভীর প্রত্যয়বোধ নিয়ে (বিশাঙ) বলল।
>
> (অনুবাদ সুকুমার বিশ্বাস)

উপন্যাসের পরবর্তী অংশে বিশাঙ বিয়ে করে তার প্রেমিকা খুটিংলাকে। দুই পরিবারের সংঘাতের কারণে যে বিয়ে সম্ভব হয়নি খুটিংলার বাবার মৃত্যুর পর সে বিয়ে হয়। ওদের প্রথম সন্তানের নাম রাখে ইয়ারুইঙ্গম। গণতন্ত্রে বিশ্বাস এবং ভারতবর্ষের মূলস্রোতে যুক্ত হওয়া নাগামুক্তির উপায়—এই উপন্যাসের সমাপ্তি।

অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এই উপন্যাসটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, 'এই মহৎ সৃষ্টিটির পেছনে রয়েছে নাগাদের প্রতি বীরেন্দ্রকুমারের সহানুভূতি এবং তাদের পরিস্থিতি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি।' উপন্যাসটি ১৯৬১ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে।

বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'মৃত্যুঞ্জয়' (১৯৭০)। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পর্বে আঠারো বছরের তরুণ বীরেন্দ্রকুমার দেখেছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবীদের কাজকর্ম। তার আঠাশ বছর পর সেই স্মৃতি তাঁকে এ উপন্যাসটি লেখায় উদ্বুদ্ধ করে। আঠারোটি পুরুষ এবং সাতটি নারী চরিত্র নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে রয়েছে দৈপারার চৈতন্যপন্থী মঠের অধ্যক্ষ তথা বিপ্লবীদের নেতা মহদানন্দ গোসাঁই, আফিংসেবী বৃদ্ধ আহিনা কোঁয়র, ডিম্বি, কলী, টিকৌ, ইনসপেক্টর শইকীয়া, ধনপুর এবং সুভদ্রা। গোসাঁই, ধনপুর, রূপনারায়ণরা পরিকল্পনা করে মিলিটারিদের নিয়ে যে ট্রেনটি আসছে সেটি তারা উড়িয়ে দেবে। দেয়ও। একটার পর একটা কামরা ওঠে আর পড়ে গভীর খালের মধ্যে, কিছুটা রেললাইনের পাশে। একই সঙ্গে গোসাঁই এবং ধনপুর মারা যায়। ঘটনার শেষ জনগণের মধ্যে অন্য এক রূপান্তরে। অনেকে পুলিশের চাকরি ছাড়ে, শয়ে শয়ে লোক জেলে যাবার জন্য মানসিকভাবে তৈরি থাকে। উপন্যাসে বিল, ঝর্ণা, গাছ, পাখি, সমাধির পাথর এক জাদুকরী পটভূমি রচনা করেছে। বৈষ্ণবীয় আচার, গীত, কার্বি সমাজের পার্বণ, লোকবিশ্বাস ও সংস্কার উপন্যাসটিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসটির জন্য বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য ১৯৭৯ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত হন।

২.৪ সৈয়দ আব্দুল মালিক

অসমিয়া কথাসাহিত্যে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন সৈয়দ আব্দুল মালিক। জন্ম ১৯১৯ সালে অসমের নাহারানি গ্রামে। ইস্কুল ও কলেজ শিক্ষকতা ছাড়াও আকাশবাণী সহ অন্যান্য সরকারী দপ্তরে চাকরি

করেছেন। রাজ্যসভার সদস্যপদসহ সাহিত্য অকাদেমি, ললিতকলা অকাদেমি, সংগীত নাটক অকাদেমি, অসম সাহিত্য সভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা সমিতির সদস্য ছিলেন।

মালিকের প্রথম গল্প 'অথ কোন?' প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। তারপর থেকে তাঁর কলম গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি নানা শিল্পরূপকে সমৃদ্ধ করেছে। মালিকের মতো বহুমুখী এবং সৃষ্টিবহুল সাহিত্যিক বিশ শতকের অসমিয়া সাহিত্যে আর কেউই ছিলেন না। তাঁর গল্পের সংখ্যা দু-হাজারের কাছাকাছি, উপন্যাস তেতাল্লিশটি, নাটক আটটি, কবিতা সংগ্রহ দুটি এবং অনুবাদ ও প্রবন্ধ সংগ্রহ বেশ কয়েকটি।

তাঁর গল্পের লেখার শুরু প্রেম-কাহিনী দিয়ে কিন্তু ধীরে ধীরে তার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক নানা স্তর এবং আর্থ-সামাজিক নানা বিন্যাস জায়গা করে নেয়। 'শেষ উপকূলার ফেলুয়া পার' (প্রত্যন্ত ভূমির শেষে শ্যাওলা তীরভূমি), 'প্রাণ হেরোয়ার পাচত' (প্রাণ হারাবার পর), 'জোয়ার আরু উপকূল' (জোয়ার এবং উপকূল) এবং 'মরহা পাপড়ি' (শুকনো পাপড়ি) ইত্যাদি গল্পে নারীমন বিশ্লেষণের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস লক্ষ করা যায়। অসমিয়া কথাসাহিত্যিক এবং সাহিত্যের ইতিহাসকার বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া মালিকের গল্পে নারীপ্রেম বিষয়ে একসময় মন্তব্য করেছিলেন, 'লেখকের বোধহয় ইচ্ছে ছিল প্রেমের প্রচলিত সংজ্ঞাকেই পরিবর্তন করে তিনি প্রমাণ করবেন যে সতীত্ব বা ব্যক্তিগত শুচিতার প্রশ্নগুলি চিরন্তন নয়, অপরিবর্তনীয়ও নয়, বরং সমাজ-কাল-ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত।' মালিকের উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলনগুলির মধ্যে রয়েছে 'ছয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর', 'অস্থায়ী অন্তর', 'বীভৎস বেদনা' ইত্যাদি।

মালিকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল 'রথর চকরি ঘুরে' (রথচক্র ঘোরে), 'ছবিঘর', 'সূর্যমুখীর স্বপ্ন', 'অসীমত ইয়ার হেরোল সীমা' (এর সীমারেখা হারিয়ে গেছে অসীমে) এবং 'অঘরী আত্মার কাহিনী'। শেষ উপন্যাসটির জন্য মালিক সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কারে সম্মানিত হন।

'রথচক্র ঘোরে' উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক। 'ছবিঘর' উপন্যাসটিতে লেখক একই সঙ্গে মানুষের মন ও সামজিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। 'সূর্যমুখীর স্বপ্ন' মালিকের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস যা বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষার অনূদিত হয়েছে। এই কাহিনীর শুরু রোমান্টিকতায়—তরুণ গুলাস বিয়ে করতে চায় পনেরো বছরের কিশোরী তারাকে। কিন্তু তারার মা কাপাহি মেয়ের কাছ থেকে গুলাসকে টেনে আনে তার কাছে। শেষ পর্যন্ত গুলাসকে বিয়ে করতে হয় কাপাহিকেই। কাঞ্চন বরুয়া ছদ্মনামে মালিক 'এর সীমারেখা হারিয়ে গেছে অসীমে' উপন্যাসটিতে উত্তর-পূর্ব অসমের একহাজার তিনশ বছর আগের জীবনকে ধরতে চেয়েছেন। ডিহং নদীর তীরের যে উদ্দাম জনজীবনের কথা এই উপন্যাসটিতে তিনি লেখেন তার ভেতর শৈলীগত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। মালিকের 'অঘরী আত্মার কাহিনী' (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯) স্বাধীনতা-উত্তর অসমীয়া সমাজজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীরূপ। উপন্যাসটির প্রকাশকাল থেকে বোঝা যায় তখন দেশজুড়ে চলছে এক টালমাটাল অবস্থা। জনমানসে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি চরম অনাস্থা প্রকাশ পাচ্ছে। মালিক লিখলেন মন্মথ চৌধুরী নামের এক প্রাক্তন মন্ত্রীর সংসারের চরম বিশৃঙ্খলার বৃত্তান্ত যা সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের প্রতীকও বলা যায়। নীতিবর্জিত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত মন্মথ চৌধুরী এক দরিদ্র ও বিধবা নারীকে ভোগ করে এবং সেই বিধবাটির মেয়ে অপরাজিতার জীবনেও বিপর্যয় ডেকে আনে। এক আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মী নিরঞ্জন বিয়ে করে অপরাজিতাকে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে কাহিনী কোনো সুখ কিংবা স্বপ্ন নীড়ে পৌঁছে দেয় না। নানা চরিত্রের অতীত ইতিহাস, ঘটনা-দুর্ঘটনা, অপরাজিতার দৈহিক সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নানা মানস-দৈহিক উপাদান উপাখ্যানটিকে টেনে নিয়ে যায় এক চরম সামাজিক শৃঙ্খলাহীনতার কেন্দ্রে।

মালিকের কথাসাহিত্যে যৌন বাস্তবতা আছে, আর্থ-সামাজিক সংকট আছে কিন্তু তারই পাশাপাশি এক নতুন সমাজের স্বপ্নও জড়িয়ে থাকে কাহিনী বিবর্তনের নানা স্তরে। বাস্তবতা এবং কল্পনার এক উল্লেখযোগ্য

বিনিময় তাঁর কথাসাহিত্যে। আর তাঁর গদ্য যেমন টানটান তেমনই তেমনই ইন্দ্রিয়-সচেতন। 'সূর্যমুখীর স্বপ্ন' উপন্যাসের পঁয়ত্রিশ নম্বর পরিচ্ছেদের প্রথম কয়েকটি বাক্য এই রকম :

রাত তখন ঘন।

অন্ধকার এবং আতঙ্কের রাত।

আকাশ যেন নিজেকে ভারমুক্ত করেছে। দমকা হাওয়া কর্কশ ধ্বনি তোলে। যখন বিদ্যুতের চোখ-ধাঁধানো আলো মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে, পৃথিবী কেঁপে ওঠে বজ্রের হুংকারে।

একি কোনো মহাপ্লাবন?

(অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

বিষয় এবং নির্মাণের এক উল্লেখযোগ্য পরিপূরকতা সৈয়দ আব্দুল মালিকের উপন্যাসগুলিকে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে।

২.৫ ইন্দিরা গোস্বামী

বর্তমান অসমিয়া কথাসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম ইন্দিরা গোস্বামী (মামণি রায়সম গোস্বামী)। জন্ম ১৯৪৪ সালে, অসমে। জন্মের পরে জ্যোতিষী বলেছিলেন মেয়েটির গ্রহের অবস্থান এতই খারাপ যে মা যেন দু-টুকরো করে ব্রহ্মপুত্রের জলে ফেলে দেন। মা চোখের জল ফেলেছিলেন কিন্তু মেয়েকে কোলছাড়া করেননি। ইন্দিরার শৈশব কাটে শিলঙে যেহেতু বাবা সেই সময় ওখানে শিক্ষাদপ্তরের এক উচ্চ পদে কাজ করতেন। ১৯৬৫ সালে মামণি স্বনির্বাচনে বিয়ে করেন মাধবন রায়সম আয়েঙ্গারকে। দু-বছরের মধ্যে এক গাড়ি দুর্ঘনায় আয়েঙ্গার মারা যান। ইন্দিরার সামনে তখন ঘোর অন্ধকার। তবু ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। ১৯৬৮ সালে গোয়ালপাড়া সৈনিক স্কুলে শিক্ষিকার চাকুরি নেন। পরে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন প্রভাষিকা হিসেবে।

ইন্দিরার প্রথম গল্প সংকলন 'চিনাকি মরম' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে এবং প্রথম উপন্যাস 'চিনবার স্রোত' ১৯৭২-এ। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'মমরে ধরা তরোয়াল' (মরচে ধরা তরোয়াল, ১৯৮০) এবং 'উনে খোওয়া হাওদা' (উইয়ে খাওয়া হাওদা, ১৯৮৮)।

প্রথম উপন্যাস 'চিনাবর স্রোত' বইটির বিষয় চিনার নদীর ওপর নির্মীয়মাণ সেতুর শ্রমিকদের জীবন। দলিত এবং শোষিত মানুষদের কথা রয়েছে তাঁর 'মরচে ধরা তলোয়ার' বইটিতেও। রায়বেরিলি জেলার সাই নদীতে একুয়েডাক্ট বাঁধার সময় ইন্দিরা কিছুদিন ওয়ার্ক সাইটে ছিলেন। সেই সময় শ্রমিকদের একটি ধর্মঘট হয়। শ্রমিক নেতাদের একতা, দূরদৃষ্টি ও ত্যাগের অভাবে ঐ ধর্মঘটের কী পরিণতি ঘটেছিল তারই ছবি এই উপন্যাসে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তরোয়ালে মরচে ছিল না। উপন্যাস শেষ হয় এইভাবে :

সেই বহুচর্চিত নেতাটি আবার ফিরে এসেছেন। ফিরোজ শাহ্ কলোনীতে এই শাস্ত্রীজী একটা দালানও কিনেছেন।

অক্টোবর মাস। রাত দুপুর। হঠাৎ শাস্ত্রীজী তাঁর দরজায় ঠক্-ঠক্ আওয়াজ শুনতে পেলেন। এ-অঞ্চলে চুরি ডাকাতি হয় না। শাস্ত্রীজী উঠে দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন, অন্ধকারে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কে?'

'আমি যশোবন্ত।'

'কি চাই?'

'আমার কয়েকটি প্রশ্ন ছিল, জবাব চাই।'—তার কণ্ঠস্বর অকম্পিত।

কালো দীর্ঘকায় মানুষটি দৃঢ় পায়ে শাস্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেল। গভীর রাতের সেই অন্ধকারে তার হাতে তরোয়াল ঝলসে উঠল। তরোয়ালটি মরচে ধরা নয়।

(অনুবাদ সঞ্জিত চক্রবর্তী)।

শাস্ত্রীজী এক স্থানীয় নেতা এবং যশোবন্ত হরিজন শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য।

'উইয়ে খাওয়া হাওদা' উপন্যাসটির কাহিনী অসমের কামরূপ জেলার একটি বৈষ্ণব সত্রকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে একটি গোস্বামী পরিবার। তাদের অনুগামী, সত্রের জমির রায়ত থেকে শুরু করে গোস্বামীদের হাতিশাল এবং আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের কাজকর্ম এমন বহু মানুষ এবং বিষয়ে এসেছে এই কাহিনীতে। উপন্যাসের সময়সীমাও বেশ বিস্তৃত—১৮২০ থেকে ১৯৪৭-৪৮। সত্রগুলির জমি অসম রাজারা দিয়েছিল অধিকার বা সত্র-প্রধানদের। জেংকিংসের সময়ে জমির আইনে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে তাদের সুখী এবং ভোগী জীবনে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে কিন্তু তারা তাদের অধিকার ছাড়তে চায় না। এই পরিবারে নারীদের জীবন ছিল অন্য এক সামন্ততান্ত্রিক ফাঁসে বাঁধা। আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন তাদের ধর্মান্তর উদ্যোগে খুব একটা সফল হয়নি সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের শেকড় অনেক গভীরে ছিল বলে। অন্যদিকে এদের কেউ কেউ উৎসাহিত হল অসমের তন্ত্রসাধনার প্রাচীন পুঁথিতে। সে প্রয়োজনেই গ্রামীণ মিশনারি মার্ক গোস্বামীদের পরিবারে যায় এবং এক তরুণী বিধবা কন্যার প্রেমে পড়ে। এক রাতে মার্কের কুটিরে মেয়েটিকে দেখে তার চরিত্র শুদ্ধির নামে অত্যাচার শুরু হয়। মেয়েটির অগ্নি পরীক্ষার জন্য মানুষজন কুটিরটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়, মেয়েটি জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুকেই বেছে নেয়।

গোস্বামীদের ভোগবাদী জীবন, তাদের অনুগামীদের অন্ধ আনুগত্য, মানুষজনের অফিমের ঘোরে বুঁদ হয়ে থাকা, বিশ শতকের চারের দশকে কমিউনিস্টদের আন্দোলন ইত্যাদি স্থান পেয়েছে এই উপন্যাসে। এর ভেতর হাতির পিঠে বসার আসনটি উইয়ে খেয়ে চলে—সত্রের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাও ক্ষয়ে যেতে থাকে। আবার এর ভেতরে দূরতম গ্রামের বৃদ্ধা মহারানীর নামে আশীর্বাদ করে একে অন্যকে, কারণ দেশ যে স্বাধীন হয়েছে তা তাদের জানা নেই।

ছোটগল্পকার হিসেবেও ইন্দিরা গোস্বামী স্বনামধন্যা। তাঁর গল্পের সংখ্যা তিনশোর বেশি।

২.৬ অন্যান্য কথাসাহিত্যিকবৃন্দ

অসমিয়া সাহিত্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত কথাকারদের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হলেন নবকান্ত বরুয়া, যোগেশ দাস, বীণা বরুয়া, হোমেন বরগোহাঁই, ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া, সৌরভকুমার চলিহা, নগেন শইকিয়া প্রমুখ। নবকান্ত বরুয়ার 'ককাদেউতার হাড়' (ঠাকুরদাদার হাড়) উপন্যাসে অভিজাতবংশীয় ভোগ্যই এবং হঠাৎ-নবাব বাখরা বোরা পরিবারের সংঘাতের কাহিনীর মধ্য দিয়ে নওগাঁ জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি জরুরি পর্ব ধরা রয়েছে। যোগেশ দাসের 'দাবর আরু নাই' (মেঘ কেটে গেছে) উপন্যাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক জীবনের বিপর্যয়ের মূল্যবান ছবি রয়েছে। বীণা বরুয়ার 'সেউজি পাতর কাহিনী' (সবুজ পাতার কাহিনী) উপন্যাসে চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ মেলে। হোমেন বরগোহাঁই 'প্রেম আরু মৃত্যুর কারণে' (প্রেম ও মৃত্যুর জন্য) গল্প-সংকলনে ধ্রুপদী শৈলীতে অবচেতনের মনের অন্দরে প্রবেশ করেছেন। ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার 'শৃঙ্খলা' গল্প-সংকলনে মানুষের বিভিন্ন ক্ষুধার পরিচয় মেলে। সৌরভকুমার চলিহার 'গোলাম' নামের ছোট্ট গল্প-সংকলনটি পড়লে মনে হয় তিনি যেন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর আবেগ ও অনুভূতির সন্ধান করছেন। নগেন শইকিয়ার 'আঁধারৎ নিজর মুখ' গল্প-সংকলনে রয়েছে, ব্যক্তি ও সামাজিক মানুষের ভেতরের নানা টানাপোড়েনের কথা।

২.৭ অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক এবং কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।

(ক) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অহোমরা অসমে প্রবেশ করে।

(খ) ১৮৪৭ সালে অসমের সঙ্গে কলকাতার স্টিমার চলাচলের স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) 'জোনাকি' সাহিত্য পত্রিকাটির উদ্বোধন ঘটে কলকাতায়।

(ঘ) 'ইয়ারুইঙ্গম' শব্দের অর্থ রাজার শাসন।

(ঙ) 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে বিশাঙ ও ভিডেশেলী চরিত্র দুটি অসমীয়।

(চ) 'রথচক্র ঘোরে' উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক।

(ছ) সৈয়দ আব্দুল মালিকের ছদ্মনাম বীণা বরুয়া।

(জ) ইন্দিরা গোস্বামীর প্রথম উপন্যাস 'চিনারের স্রোত'।

(ঝ) 'সত্র' শব্দের অর্থ বৈষ্ণব মঠ।

(ঞ) সৌরভকুমার চলিহার একটি উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলন 'শৃঙ্খল'।

২। টীকা লিখুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

(ক) অসমে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম ১৩ বছর।

(খ) ঔপন্যাসিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া।

(গ) 'ইয়ারুইঙ্গম'।

(ঘ) সৈয়দ আব্দুল মালিকের সৃষ্টির বহুমুখিতা।

৩। ১২০ থেকে ১৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

(ক) অসমিয়া কথাসাহিত্যে শ্রমিকদের জীবন।

(খ) অসমিয়া কথাসাহিত্যে অ-অসমীয়া চরিত্র।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

(১) বরুয়া, বিরিঞ্চিকুমার : আ হিস্ট্রি অব আসামিজ লিটরেচর।

(২) সাহিত্য অকাদেমি অ্যাওয়ার্ডস, ১৯৫৪-৭৮।

একক ৩ ❑ উর্দু

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ উর্দু উপন্যাসের আদিপর্ব
৩.৩ আধুনিক উর্দু উপন্যাস
৩.৪ প্রেমচন্দ
৩.৫ কৃষন চন্দর
৩.৬ সাদাত হাসান মান্টো
৩.৭ রাজেন্দ্র সিং বেদী
৩.৮ ইসমত চুগতাই
৩.৯ অনুশীলনী
৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ প্রস্তাবনা

'উর্দু' শব্দটি বাবরের সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে কিন্তু তখন এর অর্থ ছিল সৈন্য শিবির বা ছাউনি। শব্দটি তুর্কী, লিপি ফার্সি, ভাষা অর্থে 'উর্দু' শব্দটির ব্যবহার প্রথম মেলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আতা হুসেন 'তাহসিনএ'-এর একটি লেখায়। তিনি অবশ্য বলেছিলেন 'উর্দু-ই মোহল্লা'। পরে রাজকীয় 'মোহল্লা' শব্দটি বাদ পড়ে মীর আম্মানের ব্যবহারে।

৩.২ উর্দু উপন্যাসের আদিপর্ব

আধুনিক উর্দু সাহিত্যের জন্ম ১৮৫৭ সালে, সিপাহি বিদ্রোহের পর্বে। মুসলমানরা ইংরেজ শাসনকে কোনোদিনই মেনে নিতে পারেনি এবং সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতা তাদের আরো হতাশ করে। তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ইংরেজদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং ইংরেজি ভাষা-চর্চা থেকে। আবার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) -এর মতো কয়েকজনের উৎসাহে মুসলমানদের একটি অংশ পশ্চিমি সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় নিজেদের যুক্ত করে। যদিও সৈয়দ সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে ব্রিটিশের পক্ষে ছিলেন কিন্তু উর্দু গদ্যের বিকাশে তাঁর অবদান রয়েছে। উর্দু কথাসাহিত্যের সূচনাপর্বে যাঁদের নাম স্মরণীয় তাঁরা হলেন নাজির আহমদ (১৮৩১-১৯১২), পণ্ডিত রতননাথ সারসার (১৮৪৬-১৯০২), আবদুল হালিম সবুর (১৮৬২-১৯৬২), মুনসী সাজ্জাদ হোসেন (১৮৫৬-১৯১৫) এবং মির্জা হাদি রুসওয়া (১৮৫৮-১৯৩১)। নাজির আহমেদ শিক্ষা দপ্তরে চাকরি করতেন এবং উর্ধ্বতন ইংরেজ আধিকারিকদের উৎসাহে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ নেন। তাঁর হাতে উর্দু সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'তৌবত-উন-নসূ' (১৮৭৭) রচিত হল। ইংরেজি সাহিত্যের ড্যানিয়েল ডিফোর কাহিনীর আদলে এ উপন্যাসে নাজির আহমদ দিল্লির এক মুসলমান পরিবারের উত্থান-পতনের কথা লেখেন। রতননাথ সারসারের জন্ম লখনউ-এর এক কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ পরিবারে। উনবিংশ শতাব্দীর বিবরণকার রতননাথ তাঁর চার খণ্ডের 'ফিসানা-ই-আজাদ' (আমাদের

কাহিনী) বইটিতে আজাদের প্রেম থেকে তুর্কি সেনা হিসেবে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিবরণ রয়েছে। বইটিতে মূল গল্পের তুলনায় পার্শ্ব-কাহিনীর ভার বেশি কিন্তু ১৮৮০ সালে প্রকাশিত এই বইটির গুরুত্ব হাস্যরসে, সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে, আকর্ষণীয় সংলাপ এবং গতিশীল কিন্তু পরিশীলিত গদ্যে। এ পর্বের তৃতীয় ঔপন্যাসিক আবদুল হালিম সরুর ন-বছর বয়সে লখনউ থেকে কলকাতায় চলে আসেন। কুড়ি বছর বয়সে লখনউতে ফিরে যান। পরে ইংল্যান্ডেও যান। ফিরে কখনো হায়দারাবাদ, কখনো আবার লখনউতে থাকতেন। তাঁর বইয়ের সংখ্যা একশ দুই, যার অধিকাংশই উপন্যাস। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল 'ফিরদৌস-ই-বরিন', 'আয়না-ই-হারাম' এবং 'জাওয়াল-ই-বাগদাদ'। তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয় মুসলমানদের সাহস, বদান্যতা এবং ধর্মানুগত্য। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসটি উর্দুতে অনুবাদ করেন। মুনসী সাজ্জাদ হোসেন শিক্ষকতা দিয়ে জীবন শুরু করলেও পরে সম্পাদনার কাজে যোগ দেন। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তাঁর 'হাজি বাঘলোল' 'কয় পলত' ইত্যাদি উপন্যাস খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। দুই প্রজন্মের মধ্যে সংঘাত, ভেঙেপড়া সংস্কৃতি রক্ষার জন্য কিছু মানুষের হাস্যকর প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয় আসে তাঁর উপন্যাসে। মির্জা হাদি রুসওয়ার বিখ্যাত উপন্যাস 'উমরাও জান আদা' (১৮৮৯) মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীর এক রাজ-গণিকার জীবনী। এর মধ্যে নারীটি যেমন নিজের জীবনের টানাপোড়নকে অনুভব করে তেমনই সামাজিক অসঙ্গতিকেও চিনে নেয়। উপন্যাসটি ইংরেজি, জার্মান, রাশিয়ান, চেক ইত্যাদি নানা বিদেশী ভাষায় তর্জমা করা হয়েছে।

৩.৩ আধুনিক উর্দু উপন্যাস

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় কথাসাহিত্যে এক নতুন পর্ব শুরু হয়, যার প্রতিফলন উর্দু সাহিত্যেও। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পরবর্তী এই পর্বে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পরিধি ছোট হয় এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবদের সীমাবদ্ধতার প্রশ্নটি সামনে আসে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সাহিত্যের ভেতর এক নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। ১৯৩৬ সালে লখনউয়ে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হল। এই আন্দোলনে যুক্ত হলেন প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬), কৃষন চন্দরের (১৯১৪-১৯৭৭) মতো প্রথম শ্রেণীর কথাসাহিত্যিকরা। উর্দু আখ্যান-সাহিত্যের গতিপথ পরিবর্তিত হল। পরবর্তী সময়ে উর্দু সাহিত্যে এলেন সাদাত হাসান মান্টো (১৯১২-১৯৫৫), রাজেন্দ্র সিং বেদী (১৯১০-১৯৮৪), ইসমৎ চুগতাই (১৯১৫-১৯৯১) প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকেরা।

৩.৪ প্রেমচন্দ

প্রেমচন্দের প্রকৃত নাম ধনপৎ রায়, জন্ম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বারাণসীর কাছে লমহি গ্রামে। বাল্য ও কৈশোর কেটেছে ভয়াবহ দারিদ্র্যে। উপন্যাস লিখতে শুরু করেন ১৯০১ সাল থেকে। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে। শিক্ষা দপ্তরে সহকারী পরিদর্শকের কাজ করেছেন, এক সময় শিক্ষকতাও।

প্রেমচন্দের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'হরখুরমা-অ-হমসয়াব' (সেবাসদন)। এই কাহিনীতে হিন্দু সমাজের পণপথা এবং বৈধব্য জীবনের অসহায় পরিণতির প্রেক্ষিতে গণিকাবৃত্তির সমস্যাকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। প্রেমচন্দের 'প্রেমাশ্রম' উপন্যাসে রয়েছে দরিদ্র কৃষকদের ওপর জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী। জমিদারদের সশস্ত্র অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'সত্যাগ্রহ' যে নিরর্থক সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন লেখক। তবে সমালোচক

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মতে ১৯১৯-২০ সালের ভারতীয় কৃষক সমাজের যে নগ্ন চিত্র এই উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন তা অন্যত্র দুর্লভ। প্রেমচন্দ ১৯২০-২১ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখেন হিন্দি উপন্যাস 'রঙ্গভূমি'। এ বইটি উর্দুতে প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রেমচন্দ ১৯২১ সালে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ঐ পর্বে তিনি লেখেন যে 'ব্যবসা হত্যা ছাড়া কিছু নয়। মানুষকে পশুর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিক ব্যবসার মূলনীতি। ব্যক্তিগত ভাবে দু-একজন ধনী ভালো হতে পারে কিন্তু শ্রেণী হিসেবে তারা শোষক'। ১৯৩০ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় তিনি লেখেন 'কর্মভূমি' উপন্যাসটি।

কিন্তু এর পর তাঁর জীবনে একটি মোড় আসে—তিনি গান্ধীবাদ থেকে মার্কসীয় আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এই পর্বে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকৃত গ্রন্থটি হল 'গোদান'। কাহিনীটি গড়ে উঠেছে অওধ-সীমান্তবর্তী দুটি গ্রামে এবং নিকটবর্তী লখনউ শহরের জমিদার, কৃষক, কারিন্দা, মহাজন ইত্যাদি সামাজিক-অর্থনৈতিক নানা বর্গের মানুষদের নিয়ে। ঔপনিবেশিক এবং আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষে কৃষকদের ভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে জনমজুরে রূপান্তরিত হওয়ার এক অনুপুঙ্খ বিবরণ মেলে উপন্যাসটিতে। উপন্যাস শেষ হয় এক সময়ের কৃষক এবং পরবর্তী সময়ের জনমজুর হোরির মৃত্যুতে। মৃত্যু-পর্বে গ্রামের মানুষজন হোরির স্ত্রী ধনিয়াকে বলে গো-দান করিয়ে দিতে। ধনিয়া বুঝে গেছে এই ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম অর্থহীন। কিন্তু জনমতের চাপ সে অস্বীকার করতে পারে না।

> যন্ত্রের মতন ওঠে, আজ যে সুতো বিক্রি করেছিল তার বিশ আনা পয়সা নিয়ে এল আর স্বামীর ঠাণ্ডা হাতে রেখে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দাতাদীনকে বলল—মহারাজ, ঘরে না আছে গরু, না বাছুর, না টাকা। এই কটা পয়সা আছে, এই এঁর গো-দান। আর আছড়ে পড়ল।
>
> (অনুবাদ রণজিৎ সিংহ)

বিশিষ্ট সমালোচক প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত তাঁর লেখা প্রেমচাঁদের জীবনী গ্রন্থটিতে প্রেমচন্দের কথাসাহিত্যের চৌদ্দটি বিশেষ বিষয়কে চিহ্নিত করেছেনে। এগুলি তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে এসেছে। বিষয়গুলি হল : (ক) অলঙ্কারের প্রতি মোহের কারণে জীবনে নানা সমস্যা, (খ) কৃষক-জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা, (গ) সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস, (ঘ) যৌতুক এবং বিবাহ ব্যবস্থা, (ঙ) হিন্দু বিধবাদের যন্ত্রণা, (চ) বিমাতা, (ছ) সামাজিক এবং জাতীয় আন্দোলন, (জ) প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস, (ঝ) আধিভৌতিক ঘটনা, (ঞ) দেশপ্রেম, (ট) খেলা, (ঠ) ভাণ ও চালাকি, (ড) সামাজিক ন্যায়ের অভাব এবং (ঢ) সামাজিক বাস্তবতার কারণে মানুষের মন ও চরিত্রের পরিবর্তন। এর পাশাপাশি প্রেমচন্দের লেখার উপস্থাপনার দিকটি ছিল ঋজু, মেদহীন এবং বাড়তি আবেগ বর্জিত।

৩.৫ কৃষন চন্দর

কৃষন চন্দরের জন্ম ১৯১৪ সালে বর্তমান পাকিস্তানের গুজরানওয়ালা জেলার উজিরাবাদে। পড়াশোনা কাশ্মীর ও লাহোরে। তিনি যখন ছাত্র তখনই সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রমিক সংঘের সভাতেও যোগ দিতেন। একবার ঝাড়ুদার সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। ভগৎ সিংহের দলেও যোগ দেন এবং দু-মাস লাহোর দুর্গে বন্দী থাকেন। পরবর্তী সময়ে প্রগতিশীল লেখক সংঘের একাধিক সভায় অংশ নিয়েছেন। চাকরি করেছেন আকাশবাণীর লহোর, দিল্লি এবং লখনউ কেন্দ্রে। পরে বাঁধা চাকরি ভাল না লাগায় পুনেতে চলে যান চলচ্চিত্রের

কাজে। নাটক, শিশুসাহিত্য, রিপোর্টাজ ইত্যাদি ছাড়াও বাইশ খণ্ডে সংকলিত তাঁর গল্প এবং চল্লিশটির বেশি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

কৃষন চন্দরের একটি প্রখ্যাত উপন্যাস হল 'শিকস্ত' (পরাজয়) যার কাহিনীগত সময়সীমা হচ্ছে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭। অনেকগুলি চরিত্র নিয়ে এই উপন্যাস কিন্তু মূল চরিত্র তিনটি—শ্যাম, ছায়া এবং চন্দরা। শ্যাম মধ্যবিত্ত শিক্ষিত এক যুবক। সে একই সঙ্গে আবেগপ্রবণ এবং চেতনায় বিদ্রোহী। সে স্বপ্ন দেখে সমাজটাকে বদলে দেবে কিন্তু বাস্তবে সে ঠিকাদার ও রেওয়াজদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে না। ভালবাসায় ব্যর্থ হওয়ার পর তার প্রেমিকা বিন্তী আত্মহত্যা করে। উপন্যাসের শেষে বিন্তীর চিতার সামনে নিজের পরাজয়কেই যেন স্বীকার করে নেয় সে। অন্যদিকে ছায়া একগুঁয়ে এবং জেদী। ভালবাসার জন্য ধর্ম-আয়াস-সন্তানের স্নেহ সবই ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু সমাজের সঙ্গে অসম যুদ্ধে ব্রাহ্মণ কন্যা তার মুসলমান প্রেমিকের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারে না। আর এক চরিত্র চন্দরা ভালবেসেছিল রাজপুত যুবক মোহন সিংকে। কিন্তু ধর্মের প্রাচীর, জাতপাতের দেয়াল এবং তহশীলদারের পেশীবলের চাপে চন্দরা মানসিক ভারসাম্য হারায়।

কৃষন চন্দর এ-ছাড়াও লিখেছেন 'গদ্দার' নামের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস যেখানে ১৯৪৭-এর দাঙ্গার কথা আছে। এই কাহিনীতে এক হিন্দু যুবক ও এক মুসলমান যুবতী এবং এক হিন্দু মেয়ে ও এক মুসলমান ছেলের প্রেমের মর্মস্পর্শী বিবরণ মেলে। দাঙ্গার প্রেক্ষিতে রচিত এই উপন্যাসে প্রেম ও মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সবকিছুর ওপরে। এক সময় কৃষন চন্দর এই বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে 'অন্নদাতা' নামে একটি ছোট উপন্যাস লেখেন যেখানে মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে।

> কৃষন চন্দরের গল্প-উপন্যাসের বিশিষ্টতার কথা বলতে গিয়ে কথাসাহিত্যিক জীলানি বানু মন্তব্য করেছিলেন:
> তাঁর কাছে এক বিশুদ্ধ কল্পনা আছে, আর আছে সেই বাগ্‌ভঙ্গীও যা অন্যকে নিজের সঙ্গে মিলিত করে নেবার ঈর্ষণীয় সামর্থ্য রাখে। এসব সত্ত্বেও যা কৃষন চন্দরকে পারিভাষিক অর্থে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহিত্যিকদের থেকে পৃথক করে তা হল এঁর বাস্তববাদী স্বরূপ। বাস্তব সমস্যা আর প্রাণবান মানুষের গভীর সমীক্ষণ, এবং সেই সব সম্পর্কের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যা সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ এবং পারস্পরিক গৃধ্নুতাকে বাড়িয়ে দেয়। পুঁজিবাদী শক্তি ও তার শাসনের মাঝখানে কৃষন চন্দর মানুষকে অসহায় অবস্থায় পান। আর এই অসহায়তা বিভিন্ন দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু বনে যায়। এইভাবে কৃষন চন্দরে রোমান্টিকতা ও বাস্তববাদিতা পরস্পর মিলেমিশে বিভিন্ন ধরণের চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়।
>
> (অনুবাদ জ্যোতিভূষণ চাকী)

৩.৬ সাদাত হাসান মান্টো

মান্টো পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল কাশ্মীরে। সাদাত হাসানের জন্ম ১৯১২ সালে লুধিয়ানার সমব্রলাতে। জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে অমৃতসর, দিল্লি, বোম্বাই শহরে এবং মৃত্যুর আট বছর আগে চলে যান লাহোর। সাদাত হোসেনের বাবা ছিলেন বিচারক এবং বৈমাত্রেয় ভাই থেকে সহোদর বোন পর্যন্ত সবাই ছিলেন দেশে-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ কিন্তু সাদাত বেছে নিয়েছিলেন বেহিসেবি বোহেমিয়ান এক জীবন। সিগারেট, গাঁজা, চরস, মদ, জুয়া, নিষিদ্ধ পল্লীতে যাওয়া—এসবই ছিল তাঁর জীবনযাপনের অংশ।

যেমন জীবনে তেমনই লেখাতে তিনি সমকালীন অন্য লেখকদের থেকে ভাবনায় ও ভাষায় বেশ ভিন্ন।

শ-খানেক নাটক এবং প্রায় একই সংখ্যক প্রবন্ধের পাশাপাশি তিনি লিখেছিলেন একটি উপন্যাস 'বাগহেয়ার আনওয়ান কে' (নামবিহীন, ১৯৪০) এবং ষোলটি গল্প-সংকলন। তাঁর গল্পে সূচনা, মধ্যভাগ এবং পরিসমাপ্তি আছে, গল্পগুলি তরতর করে পড়া যায় কিন্তু গদ্য তরল নয়। পরিমিতির দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।

তাঁর জীবনের প্রথম গল্পগুলিতেই রাজনীতি এসে যায়। ব্রিটিশ সৈনিকের গুলিতে আহত এক যুবকের কথা লিখেছিলেন 'শারারে' গল্পে। পরের রাজনৈতিক গল্পগুলি হল 'নয়া কানুন' '১৯১৯ কি রাত', 'স্বরাজ কি লিয়ে' ইত্যাদি। রোমান্টিক প্রেম নিয়েও সাদাত হাসানের অনেকগুলি গল্প রয়েছে—যেমন 'দো কোয়া মে', 'ইসকিয়া কহানি', 'যাও হানিফ, যাও', 'সওদা বেচনেওয়ালি' কিন্তু সাদাত যেহেতু প্রখর বাস্তববাদী তাই তাঁর প্রেমের গল্পগুলি তেমন দানা বাঁধেনি। সাদাত বেশ অনেকগুলি গল্প লিখেছিলেন যৌনকর্মীদের নিয়ে। এর মধ্যে রয়েছে 'কালি শালোয়ার' (কালো শালোয়ার), 'দশ রুপায়ে' (দশটাকা), 'বর্মি লড়কি' (বর্মার মেয়ে), 'সরোজ' ইত্যাদি। এইসব গল্পে জীবনের রূঢ় বাস্তবকে স্পর্শ করেছেন সাদাত। নীতির পরিবর্তে যৌনকর্মীদের মানবিকতার দিকটি ধরতে চেয়েছেন গল্পকার। 'কালো শালোয়ার' গল্পে সুলতানার কামনা মহরমের দিন সে একটি কালো শালোয়ার পরবে। তার বাসস্থান একটি রেল ইয়ার্ডের সামনে। সাদাত একটি তুলনা টানেন ঐ রেল ইয়ার্ড এবং সুলতানার জীবনের মধ্যে—এ দুয়েরই কোনো ভূমিকা নেই জীবনের মূল স্রোতে। গল্পের একটি অংশ এই রকম :

> যখনই সে কোনো কামরা দেখে যা আপন গতিতে গড়িয়ে চলছে পেছনে ইঞ্জিনের ধাক্কায়, তার নিজের কথা মনে হয়। ঐ রেল কামরাটির মতো তাকেও পেছন থেকে কেউ ঠেলে দিয়েছে এবং তারপর তাকে ছেড়ে চলে গেছে। অন্য কোনো রেলপথ তদারককারী রেল-লাইনের পথ পরিবর্তন করেছে এবং সে গড়িয়ে চলেছে। সে জানে না কোথায়। একটা সময় আসবে যখন তার জীবন গতিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। কোনো এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে এক অচেনা অজানা জায়গায়।
>
> (অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

কিন্তু সুলতানার কালো শালোয়ারের স্বপ্ন মেটাতে খোদা আসে না, এমন কি খোদা বক্স নামের যে নিত্যদিনের খদ্দের সেও না। শেষে শংকর নামের এক দালাল সুলতানার কানের সাধারণ দুল জোড়াকে অন্য এক যৌনকর্মীর কাছে পাকা সোনার দুল বলে বিক্রি করে দেয়। সে টাকায় সুলতানার ইচ্ছাপূরণ ঘটে।

সাদাতের গল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল দেহ। অশ্লীলতার অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত হতে হয়েছে একাধিকবার। আসলে যৌবনের প্রতি তাঁর অসীম আনুগত্য। তাঁর কাহিনীর যে দেহ-বিবরণ তা কিন্তু সংকীর্ণ নয়। যেমন 'বু' (গন্ধ) গল্পে নামহীন এক তরুণ এবং তরুণীর যে মিলন তার ভেতর কেন্দ্রীয় বিষয়টি হল একটি সুমধুর গন্ধ। আকাশের বৃষ্টি যেমন মাটির এক মাদকীয় গন্ধ তৈরী করে তেমনই অনাগরিক মেয়েটির শরীর জুড়ে যে গন্ধ তা রণধীরের কাছে স্বর্গীয়।

দাঙ্গা নিয়েও সাদাতের বেশ কিছু মূল্যবান গল্প আছে—'খোল দে' (খুলে দে), 'ঠাণ্ডা গোস্ত' (ঠাণ্ডা মাংস) ইত্যাদি। 'খোল দে' গল্পের মূলচরিত্র সহায় আপন আবেগে চলে এবং যৌনকর্মীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেকটা বাবার মতো। একবার দাঙ্গার সময় একজন মুসলমান তাকে খুন করে। মৃত্যুর আগে সহায় মুমতাজ নামের একজনকে সমস্ত গয়নাপত্র দিয়ে বলে সুলতানা যেন নিরাপদ জায়গায় চলে যায়। সুলতানা পাকিস্তানে চলে যেতে মনস্থ করে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সুলতানা যখন হাত নাড়ে, মুমতাজের মনে হয় সুলতানা যেন সহায়ের আত্মাকে বিদায় জানাচ্ছে। 'ঠাণ্ডা গোস্ত' গল্পের ঈশ্বর সিং অন্ধকার জগতের মানুষ। দাঙ্গার সময় সে অনেকের হাতে তরবারী তুলে দিয়েছিল। একটি আক্রান্ত মেয়েকে কাঁধে তুলে সে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে চলেছিল। হঠাৎই তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে সে ধর্ষণ করে। পরে বোঝে মেয়েটি তার কাঁধেই মারা গিয়েছিল। একজন মৃতনারীকে ধর্ষণ করার আত্মবেদনায় সে যৌনক্ষমতা হারায়। অন্যদিকে আর এক নারী কলওয়ান্ত কাউর, যার

সঙ্গে ঈশ্বর সিং-এর একটা সম্পর্ক ছিল, সে ভাবে অন্য কোনো নারীর টানে ঈশ্বর তার প্রতি উৎসাহ হারিয়েছে। কাল্পনিক প্রতিহিংসায় সে ঈশ্বর সিংকে হত্যা করে। 'খোল দে' এবং 'ঠাণ্ডা গোস্ত' গল্প দুটির জন্য আদালত সতর্ক করে দিয়েছিল। শুধু দাঙ্গা নয়, দেশবিভাগ নিয়েও দুটি মর্মস্পর্শী গল্প লিখেছেন মান্টো—'টোবা টেকসিং' এবং 'আখ্‌রি স্যালুট'।

নতুন বিষয়, বিষয়ের আধুনিক উপস্থাপনা, জীবনকে নির্মমভাবে দেখার দৃষ্টি ইত্যাদি মিলে সাদাতের গল্প জীবনের এক নতুন পাঠ। আর কাহিনী গদ্যের বিষয়ে একথা প্রতিষ্ঠা পেয়েই গেছে যে প্রেমচন্দের গদ্যকেও বাঁধুনিতে অতিক্রম করে গেছেন সাদাত।

৩.৭ রাজেন্দ্র সিং বেদী

রাজেন্দ্র সিং বেদীর জন্ম বর্তমান পাকিস্তানের শিয়ালকোট জেলার ঢালে-কি গ্রামে। ছাত্রজীবনে উর্দু, ইংরেজি এবং পঞ্জাবিতে গল্প-কবিতা লিখতেন। জীবিকার শুরু ডাকবিভাগের করণিক হিসাবে লাহোরে (১৯৩৩-৪৩)। পরে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার দপ্তরে (১৯৪৩) এবং তার কিছুদিন পরে লাহোর বেতারে কর্মী-শিল্পী হিসেবে যোগ দেন (১৯৪৩-৪৬)। তারপর একটি প্রকাশন সংস্থায় কিছুদিন কাজ করে ১৯৪৭ সালে দিল্লিতে চলে আসেন পাকাপাকি ভাবে। একসময় জম্মু বেতারে পরিচালকের দায়িত্ব নেন। ১৯৪৯ সালে সেখান থেকে থেকে দিল্লি আসেন এবং এক সময় বোম্বেতে চলে যান ফিল্মের জগতে।

পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য জীবনে নাটক, চলচ্চিত্রের সংলাপ ইত্যাদি বাদ দিলে সত্তরটি গল্প এবং একটি উপন্যাস 'এক চাদর মৈলি সি' (ময়লা চাদর) লিখেছিলেন। কিন্তু এতেই উর্দু তথা ভারতীয় কথাসাহিত্যে তাঁর আসন চিরস্থায়ী হয়ে যায়। প্রেমচন্দের সমাজমনস্কতা, কৃষন চন্দরের রোমান্টিকতা কিংবা সাদাতের যৌনকেন্দ্রিকতার বিপরীতে তিনি নরনারীর বর্তমানকে বুঝতে চাইতেন পুরাণ ও ইতিহাসের ভেতর দিয়ে। একই সঙ্গে তাঁর কাহিনী-গদ্যের ভেতর প্রতীক, উপমা ইত্যাদির প্রয়োগ ঘটিয়ে ভেতরে অন্য এক অনন্যতা গড়ে তুললেন। তাঁর 'গ্রহণ' গল্পের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, 'কোনো কিছু যখন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি সেটিকে তার বাহ্যিক বাস্তবতায় লিখে ফেলি না। আমার ভেতর কল্পনা আর বাস্তবতার মিশ্রণে ঐ বিষয়টি যে নতুন আকার পায় সেইটিই আমি লিখি।'

'রহমান কে জুতে' (রহমানের জুতো) গল্পে একটি সংস্কারকে তুলে ধরেন লেখক—জুতোর ওপর জুতো ওঠা মানে যাত্রার লক্ষণ। রহমানের জুতোর ওপর জুতো চেপেছিল, সে যায় তার মেয়ের কাছে অন্য এক শহরে। কিন্তু যাত্রা হতে পারে দু-রকমের—এক স্থান থেকে অন্যস্থানে কিংবা ইহলোক থেকে পরলোকে। রহমান তার যাত্রাপথে মারা যায়।

'আঘওয়া' (প্রলোভন) গল্প রায়সাহেবের বাড়ি তৈরী হয়। আলি জু নামের একজন কাশ্মীরি যুবক মাটি খুঁড়ে জলের পাইপ বসায়। অন্য একজন শ্রমিকের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, 'মাটি শক্ত আর পাথুরে। বেশ খাটুনি আছে।' গল্পের শেষে আলি যেদিন মাটি ও পাথর ভেঙে পাইপ বসাতে সমর্থ হয়, সে রাতেই রায়সাহেবের মেয়ে কাঁশোর সঙ্গে সে পালিয়ে যায়।

'আপনে দুখ মুঝে দে দো' (নিজের দুঃখ আমাকে দিয়ো দাও) গল্পের কেন্দ্রে আছে ইন্দু, যা সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক। তার সঙ্গে বিয়ে হয় মদনের, যা কামদেবের নাম। গল্পে ইন্দুকে একবার রতি হিসেবেও উল্লেখ করেন লেখক, যে রতি সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস। মদন সৃষ্টির সহায়ক ব্যক্তিমাত্র, নিছক উপাদান। অন্যদিকে ইন্দু

একই সঙ্গে কন্যা, স্ত্রী ও মা। কাহিনীতে ইন্দুর গর্ভাধান ঘটে। মদন ভয় পায় ইন্দুর জীবন যেন না বিপন্ন হয়। সাহস দেয় মৃত্যুর মুখ থেকেও সে ইন্দুকে ছিনিয়ে আনবে। কিন্তু সে দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয় না, সে দায়িত্ব পালনের এক্তিয়ার তার নেই। আত্ম-বিস্মৃতি এবং আত্মোৎসর্গ কেবল নারীই করতে পারে। জীবন বিপন্ন করে রক্তের ভেতর দিয়ে হাঁটার মধ্য দিয়ে সে নতুন প্রাণের সৃষ্টি করে। ইন্দু সন্তানের জন্ম দেয়। সে এখন মা, সারা পৃথিবীর মা। সে যশোদা যে দেবকীর পুত্র কৃষ্ণকে লালন করেছিল, যে নন্দলালকে বড় করে তুলেছিল।

'এক চাদর মৈলি সি' উপন্যাসটি শুরু হয় এভাবে :

> আজ বিকেলে সূর্যের রেশটি টুকটুকে লাল ছিল—আজকে আকাশের দুর্গে কোনো নিরপরাধের বলি হয়েছিল এবং তার রক্তের ফোঁটা নিচে বকায়ন গাছের ওপরে পড়ে তার তলায় তলোকের উঠোনে ঝরছিল। জীর্ণ কাঁচা দেওয়ালের পাশে যেখানে বাড়ির লোক ময়লা ফেলে, ডাব্বু মুখ তুলে কাঁদছিল সেখানে।
>
> (অনুবাদ শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য)

প্রথম অনুচ্ছেদেই 'লাল' 'রক্ত' ইত্যাদি শব্দে কাহিনীর রংটি স্থির করে দেন রাজেন্দ্র। তারপর সংঘাত এবং রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে গল্প এগোয়। মনে হয় যেন এক তান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

কোটালা গ্রামের দেবী মন্দিরে এসেছে একটি মেয়ে, মেয়েটি যেন নিজেই দেবী—একদিকে সে পার্বতী-উমা-গৌরী, অন্যদিকে কালী-দুর্গা-ভবানী। তলোক এবং তার সঙ্গীরা মেয়েটিকে ভোগ করে। অন্যদিকে মেয়েটির ভাইয়ের হাতে তলোক খুন হয় এবং অন্যদের জেল হয়। কাহিনীর শেষ দিকে ওই মেয়েটির ভাই তলোক-রানুর বড় মেয়েকে বিয়ে করে, তাকে বিক্রী হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

রাজেন্দ্রর লেখার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন কাজ করে কিন্তু তাঁর কাহিনী তত্ত্বের বিস্তার নয়, জীবনের উপলব্ধি। বইটির বাংলা অনুবাদক শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য লিখেছিলেন যে অশিক্ষিত-অমার্জিত মানুষজনদের নিয়ে এই উপন্যাসে গালাগালির এতই ছড়াছড়ি যে বাংলা ভাষায় প্রতিশব্দ খুঁজতে গিয়ে তাঁকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছিল বাংলা ভাষায় গালাগালির শব্দ ভাণ্ডার খুবই সীমিত।

৩.৮ ইসমত চুগতাই

ইসমতের জন্ম ১৯১১ সালে উত্তর প্রদেশের বদায়ুন অঞ্চলে। মা-বাবার নবম সন্তান ইসমতের তেমন কদর ছিল না। বাবা ছিলেন বিচারক ফলে বাড়ির অবস্থা ভালই ছিল কিন্তু একে নবম সন্তান তায় মেয়ে ফলে কাজের মেয়েদের হাতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইসমতও ছোটবেলা থেকে নিজের মতো বেড়ে উঠেছিলেন পাশাপাশি বাড়িঘরের নিম্নবিত্ত এবং গরীব মানুষজনের বাচ্চাদের সঙ্গে। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন মা-বাবা কিন্তু ইসমত সে বিয়ে ভেস্তে দেন। একসময় আলিগড়ে পড়তে চান হস্টেলে থেকে। মা-বাবার তাতে চরম আপত্তি। ইসমত জানিয়ে দেন তাঁকে যেতে না দিলে তিনি পালিয়ে যাবেন এবং খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবেন। বিপদ বুঝে মা-বাবা সম্মতি দেন। আলিগড় পর্ব থেকেই তাঁর গল্প লেখার শুরু। আলিগড় থেকে একসময় লখনউ যান স্নাতক হতে। ঐ খ্রিস্টান মিশনারী কলেজের আধুনিক পরিবেশে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ নেন। পরে রাশিয়ান ও ফরাসী সাহিত্যও পড়েন। যুক্ত হন প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে। একসময়ে প্রগতি আন্দোলনের নিয়মশৃঙ্খলার বাড়াবাড়িতে দূরত্বও তৈরী হয়। পরবর্তী সময়ে স্নাতক হন লখনউ-এর একটি কলেজ থেকে। একসময় রাজস্থানের একটি ইস্কুলে প্রধান শিক্ষিকার পদ নিয়ে যান। কিছুদিনের মধ্যে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আসেন কারণ ওখানকার নবাব পুত্রবধূ করবেনই। একসময় যোধপুর ইস্কুলে যোগ দেন। সেখান থেকে বোম্বেতে, ইস্কুলের পরিদর্শক পদে। পুরানো বন্ধু শহিদের সঙ্গে দেখা হয়। চুগতাই যুক্ত হন চলচ্চিত্র

দুনিয়ার সঙ্গে। বিয়ে করেন শহিদকে। একসময় ইস্কুল পরিদর্শকের চাকরি ছেড়ে দেন। দুটি মেয়ে হয়। কিন্তু শহিদের সঙ্গে পারিবারিক জীবন বিশেষ সুখের হয়নি। একে নানা বিষয়ে মতান্তর, সঙ্গে শহিদের অত্যধিক মদ্যপান দুজনের ভেতর দূরত্ব গড়ে দেয়। ১৯৬৭ সালে কম বয়সেই মারা যান।

ইসমতের প্রতিবাদী চেতনা তাঁর এগারটি বড় ও ছোটমাপের উপন্যাস এবং ন-টি গল্প সংগ্রহ, একটি নাটক এবং অন্যান্য লেখার মধ্যে সম্প্রসারিত। তাঁর 'জিদ্দি' (একগুঁয়ে ১৯৪১) নামের ছোট উপন্যাসটি পুরম এবং আশা নামের এক যুবক-যুবতীর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। এর মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' উপন্যাসের প্রভাব লক্ষ করেছেন কোনো কোনো সমালোচক। পরবর্তী 'তেড়হি লকির' (বাঁকা রেখা, ১৯৪৩) ও 'মাসুমা' (সরল বালিকা ১৯৬১), 'সৌদাই' (দিশাহারা, ১৯৬৪) কাহিনীগুলি যেন তাঁর 'দিল-কি-দুনিয়া' (হৃদয়ের জগৎ ১৯৬৬) উপন্যাসটির প্রস্তুতি। এই কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছে একটি মেয়ে—কুদসিয়া। পনের বছর বয়সে তার বিয়ে হয় এবং স্বামী শ্বশুরের অর্থে বিলেত পড়তে যায়। বছর দুয়েক স্বামীর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলতে থাকে। তারপর স্বামী বিয়ে করে এক মেমকে। দেশে ফিরে সে তার সঙ্গে সংসার পাতে। কুদসিয়ার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। পঁচিশ বছরেই তার চুলে পাক ধরে। অন্যদিকে সাবির নামের এক যুবক ঘনিষ্ঠ হয় কুদসিয়ার কিন্তু মা ও পরিবারের মানুষজনের তাতে ঘোর আপত্তি। শেষে পরিবারের ছন্নছাড়া কাকা মাচুর সাহায্যে কুদসিয়া একদিন সাবিরের সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়। তাদের একটি মেয়েও হয়। পরবর্তী সময়ে সেই মেয়েটি মা ও বাবার জীবনের ঘটনা শোনায় উপন্যাসের কাহিনীকারকে।

ইসমতের অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল 'জংলি কবুতর' (জংলি পায়রা, ১৯৭০), 'আজিব আদমি' (অদ্ভুত লোক, ১৯৭০) ইত্যাদি। তবে ইসমতের প্রসিদ্ধি মূলত ছোটগল্পের জন্য। একশ'র ওপর ছোটগল্প লিখেছিলেন তিনি। তাঁর নারী চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লাঞ্ছিত কিন্তু প্রতিবাদী। ভারতীয় মুসলমান নারীদের বিবর্তনের একটা চেহারা ধরা পড়ে তাঁর লেখায়। 'চৌথি কি ঝোরা' (বিয়ের সাজ) গল্পে বিধবা আম্মা তার দুই মেয়ে কুবরা এবং হামিদাকে কষ্টে বড় করে তোলে। সে কুবরার জন্য বিয়ের পোশাক বানায়, তাতে সুতোর কাজ করে কিন্তু বর জোটে না। হঠাৎ খবর আসে আম্মার ভাইয়ের ছেলে আসছে। সে পুলিশে চাকরি করে। আম্মা যা কিছু সঞ্চয় ছিল সব বেচে ভাইয়ের ছেলের ভাল খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ছেলেটির কুবরার চেয়ে হামিদাতে চোখ বেশী। একসময় তার প্রতি ভালবাসাও চলে যায় কারণ অন্যত্র তার বিয়ের ঠিক হয়েছে। টিবি এবং কয়েকদিনের এই মানসিক টানাপোড়েনে অসুস্থ হয়ে পড়ে কুবরা। একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। তারই বিয়ের সাজ দিয়ে তার মৃতদেহ ঢাকা হয়। ইসমত একাধিকবার অশ্লীলতার অভিযোগে সমালোচিত হয়েছেন এবং তাঁকে কোর্টেও যেতে হয়েছে। এমনই একটি গল্প 'ঘরওয়ালি'। লাজো নামের মেয়েটির মাতৃ-পিতৃ পরিচয় অজানা। সে নিজে কোনো নৈতিকতার ধার ধারে না। যেখানে কাজ করে কিছুদিনের মধ্যে সেখানের মালিকের সঙ্গে রাত কাটায়। মির্জা নামের এক মালিক তাকে ভালোবেসে ফেলে এবং প্রায় জোর করেই লাজোকে রাজি করায় তাকে বিয়ে করতে। তারপরই সে লাজোর চরিত্র ও পোশাকে পরিবর্তন এনে তাকে সভ্য করতে চায়। লাজো মেনে নেয়। ওদিকে মির্জা অন্য পুরুষদের মতো যৌনকর্মীদের পাড়ায় যাতায়াত শুরু করে। লাজো আবার তার পুরানো অভ্যেসে ফেরে। মির্জা ভাবতে পারে না তার স্ত্রী ওভাবে চলবে। সে মারধোর করে এবং একসময় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। লাজো আবার মুক্ত। একসময় আবার লাজোর অফিসে সে চাকরি নেয়। রাতে লাজো আবার তার প্রেমিকা হয়ে ওঠে। 'লিহাফ' (কাঁথা) গল্পে নবাব বিয়ে করে বেগমজান নামের এক সুন্দরী মহিলাকে। কিন্তু নবাব হচ্ছে সমকামী, ফলে একাকীত্বে ভোগে জান। তার বাইরে যাওয়ার পথও বন্ধ কারণ নবাবী বাড়িতে সে রীতি নেই। একসময় বেগম জান তার এক দাসীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে এবং সমকামিতার মাধ্যমে যৌন সুখ ভোগ করে। এই গল্পটির বিষয় আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল কিন্তু ইসমতের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

বিংশ শতাব্দীর উর্দু কথাসাহিত্য যেমন আধুনিক তেমনই প্রতিবাদী। প্রাচীন 'দাস্তান' থেকে যে কথন সাহিত্যের শুরু তা পরবর্তী সময়ে অন্য খাতে বয়ে গেছে। অন্যান্য ভারতীয় বা বিদেশী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে এক আশ্চর্য বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমান সময়ে ভারতীয় উর্দু কথাসাহিত্যকে যাঁরা পুষ্ট করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন কুরয়েতুলিন হায়দার (জন্ম ১৯২৭), জামিরুদ্দিন আহমেদ (জন্ম ১৯২৮) প্রমুখ।

৩.৯ অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক এবং কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।

(ক) আধুনিক উর্দু সাহিত্যর জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

(খ) উর্দু সাহিত্যের লেখকেরা সকলেই ধর্মে মুসলমান।

(গ) 'উমরাও জান আদা' উপন্যাসটির লেখক মির্জা হাদি।

(ঘ) প্রেমচন্দের উপন্যাসে একটি অন্যতম বিষয় হল সামাজিক ন্যায়ের অভাব।

(ঙ) অবিভক্ত গ্রাম-বাংলার মেহনতি মানুষের যন্ত্রণা-বেদনা নিয়ে লেখা কৃষন চন্দরের উপন্যাসটির নাম 'গদ্দার'।

(চ) সাদাত হাসান মান্টোর গল্প-উপন্যাসে একটি প্রধান বিষয় যৌনতা।

(ছ) রাজেন্দ্র সিং বেদীর গল্পে পুরাণ ও ইতিহাস একটি উপাদান।

(জ) ইসমত চুগতাইয়ের জন্মস্থান বদায়ুনের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জীবনের একটি পর্ব জড়িত।

(ঝ) ইসমত চুগতাইয়ের 'জংলি কবুতর' উপন্যাসটির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাসের বিষয়গত মিল রয়েছে।

(ঞ) 'দাস্তান' উর্দু কথাসাহিত্যের একটি প্রাচীন আঙ্গিক।

২।. পাঁচ বাক্যের চারটি টীকা লিখুন।

(ক) উর্দু ভাষা।

(খ) উর্দু উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক।

(গ) উর্দু কথাসাহিত্যে লখনউ।

(ঘ) 'লিহাফ' (কাঁথা)।

৩। দশটি বাক্যে উত্তর দিন।

(ক) উর্দু উপন্যাসের আদিপর্ব।

(খ) 'গোদান'।

(গ) কৃষন চন্দরের গল্প-উপন্যাসের বিশিষ্টতা।

(ঘ) সাদাত হাসান মান্টোর গল্পে দাঙ্গা।

৪। পঁচিশটি বাক্যে উত্তর দিন।

(ক) ইসমত চুগতাইয়ের জীবন ও সৃষ্টিতে প্রতিবাদী চেতনা।

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

(১) জাইদি, আলি জাওয়াদ : আ হিস্ট্রি অব উর্দু লিটরেচর, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৩।
(২) বেদী, রাজেন্দ্র সিং : ময়লা চাদর (অনুবাদ শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য), সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১।
(৩) বেদী, রাজেন্দ্র সিং : সিলেক্টেড শর্ট স্টোরিজ, (ইংরেজি অনুবাদ জয় রতন), সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮৯।
(৪) চন্দর, কৃষন : নির্বাচিত গল্প (বাংলা অনুবাদ ননী শূর), সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৯।
(৫) প্রেমচন্দ : গোদান (বাংলা অনুবাদ রণজিৎ সিংহ), সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৮।

একক ৪ ❑ ওড়িয়া

গঠন

৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ ফকিরমোহন সেনাপতি
৪.৩ গোপীনাথ মহান্তি
৪.৪ মনোজ দাস
৪.৫ অনুশীলনী
৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ প্রস্তাবনা

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বে ওড়িয়া সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। ১৮০৩ সালে ব্রিটিশরাজ ওড়িশা দখল করে এবং তারপর একের পর এক বিদ্রোহ দমন চলে। ছয়ের দশক নাগাদ তারা তাদের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে। কিন্তু ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ এ-কথা প্রমাণ করে দেয় যে ব্রিটিশরাজ অনেক বিষয়েই অযোগ্য ছিল।

কিন্তু সমাজ-শিক্ষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্য এক চেতনার জন্ম হল। খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমের চিন্তাচেতনার সঙ্গে শিক্ষিতশ্রেণীর পরিচয় ঘটে। সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। তৎকালীন বঙ্গদেশের ব্রাহ্মসমাজের মুক্তচিন্তার ধাক্কা লাগে সামন্ততান্ত্রিক ভাবনাচিন্তার গায়ে। এ-সমস্ত কিছু মিলে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে সবকিছুর মধ্যে, ঔপনিবেশিক শাসনের দোষ-গুণ সহ।

আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের এই পর্বে যাঁরা মুখ্য ভূমিকা নিলেন তাঁরা হলেন ফকিরমোহন সেনাপতি (১৮৪৭-১৯১৮), রাধানাথ রায় (১৮৪৮-১৯০৮) এবং মধুসূদন রাও (১৮৫৩-১৯১২)। তাঁদের মধ্যে ফকিরমোহন তৈরী করলেন নতুন যুগের সাহিত্য আর রাধানাথ লিখলেন নতুন সময়ের কবিতা। মধ্যযুগের ধর্মানুরাগ এবং প্রেমের ঐতিহ্যের ভেতর আধুনিক আর্থ-সামাজিক প্রশ্নাবলী উঠতে লাগল।

৪.২ ফকিরমোহন সেনাপতি

ফকিরমোহন শৈশবেই মা-বাবাকে হারিয়ে দিদিমার কাছে মানুষ হন। ছোটবেলায় ভুগতেন নানা অসুখে। বালেশ্বরের দুই ফকিরের ওষুধে সেরে ওঠেন বলে 'ব্রজমোহন' নাম পরিবর্তন করে 'ফকিরমোহন' রাখা হয়। মহরমের সময় বছরে সাতদিন ফকিরের বেশ পরে বালেশ্বরের বাড়িতে-বাড়িতে ভিক্ষে করতেন। সংগৃহীত পয়সা এবং জিনিসপত্র বিক্রি করে ফকিরদের দান করা হত। কিন্তু শুধু শারীরিক নয়, অর্থনৈতিক জোরও ছিল না। কাকা চাননি যে ভাইপোর জন্য খরচপত্র হোক। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বাড়ির কাজকর্ম করে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু কাকা তাও পছন্দ করলেন না। দশের কাছাকাছি বয়সে ফকিরমোহনকে কাজ করতে যেতে হল নুন কোম্পানির অফিসে অন্নের সন্ধানে। পনের বছর বয়সে সে কাজও গেল। তখন ফকিরমোহন সেখানে বারাবতীর মিশন ইস্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু মাসিক পঁচিশ পয়সা বেতন দেবার সাধ্য না থাকায় একসময় সাধ অপূর্ণ

রেখে ইস্কুল ছাড়তে হয়। কিন্তু ততদিনে ছাত্র হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়েছে। ফলে কিছুদিন পরে ঐ ইস্কুলের শিক্ষকতার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যদিও তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো সার্টিফিকেট ছিল না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে শিক্ষক হিসেবে ফকিরমোহন এতোটাই কৃতিত্ব দেখান যে তাঁর মাসিক মাইনে আড়াই থেকে বাড়িয়ে চার টাকা করা হয়। এমনকি যেসব বিষয় তিনি ছাত্রজীবনে পড়েননি সেগুলিও এমনভাবে শিখে নেন যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদ খালি হলে মিশন কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঐ পদ দেন। তখন মাইনে স্থির হয় দশ টাকা। জেলা কালেকটর জন বিমসের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে ফকিরমোহনের যেমন জ্ঞানের বিস্তার ঘটে তেমনই সামজিক মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁর ইস্কুলে শিক্ষার পর্বটি ছিল মোটে দেড় বছরের তাঁর লেখা অঙ্ক, ভূগোল, ভারতীয় ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বইগুলি নানা ইস্কুলে পঠিত হতে থাকে। কিন্তু শিক্ষার বই লিখে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, দেওয়ান পদে চাকুরি, পত্রিকা প্রকাশন, রামায়ণ-মহাভারত ও উপনিষদের অনুবাদ, কবিতা লেখা প্রভৃতি কাজকর্মের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে ১৮৮৯ সালে লিখলেন প্রথম উপন্যাস 'ছ-মাণ আঠ গুণ্ঠ' (উনিশ বিঘা দুই কাঠা)। তারপর ১৯০১ সালে প্রকাশিত হল 'লছমা', ১৯১৩-তে 'মামু' (মামা) এবং ১৯১৫-তে 'প্রায়শ্চিত' (প্রায়শ্চিত্ত)। ১৮৯৮-১৯১৬ সময়পর্বে লিখলেন বেশ কটি গল্পও।

'ছ-মাণ আঠ গুণ্ঠ' উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র রামচন্দ্র মঙ্গরাজ ছিল মাতৃপিতৃহীন এক দরিদ্র বালক। দোরে দোরে ভিক্ষে করে তার দিন কাটতো। কিন্তু তার ভেতরে এক তীব্র জেদ এবং ধূর্ততা ছিল। সে গ্রামের সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি হয়ে উঠতে চায়। ছোট ব্যবসা এবং তেজারতি থেকে সে ধীরে ধীরে অর্থবান হয়ে ওঠে। মেদিনীপুরবাসী এক জমিদারের খাজনা আদায়ের দায়িত্ব নিয়ে এক সময় নিজেই জমিদার হয়ে যায়। তখন অর্থ ও সম্পদের নেশা আরো বাড়ে। সঙ্গে যুক্ত হয় এক নারীও—চম্পা। তার পরিকল্পনায় রামচন্দ্রের স্ত্রী বাড়ির কর্তৃত্ব হারায় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছেয় ভাগ্যকে সঁপে দিয়ে এইসব ক্রিয়াকাণ্ড থেকে মন তুলে নেয়। ওদিকে সারিয়া ও ভাগিয়া নামের নিঃসন্তান এক তাঁতি দম্পতিকে চম্পা বোঝায় যে তারা যদি তাদের উনিশ বিঘে দু-কাঠা জমি রামচন্দ্রের কাছে বন্ধক রেখে গ্রামে একটি দেবী-মন্দির বানায় তাহলে তাদের সন্তান হবে। তারা সে জমি বন্ধক রাখে কিন্তু আর ফেরত পায় না। তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হাতছাড়া হবার পর চরম দারিদ্র্য এবং অপমানের শিকার হয় তারা। সারিয়ার মৃত্যুর জন্য আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয় রামচন্দ্র এবং তার জেল হয়। একই জেলে বন্দী ভাগিয়া দাঁতের কামড়ে রামচন্দ্রের নাক কেটে ফেলে। জেল থেকে ফিরে রামচন্দ্র তার অন্যায়ের জন্য অনুশোচনায় ভোগে এবং এক সময় নরকের দৃশ্যগুলি ভাসতে থাকে তার চোখের সামনে। রামচন্দ্র মারা যায়। ওদিকে চম্পা নতুন সম্পর্ক পাতে গোবিন্দ নামের এক নাপিতের সঙ্গে। রামচন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তি চুরি করে এক সময় পালিয়ে যায় দু-জনে এবং কটকে আত্মগোপন করে। কিন্তু সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদের কারণে গোবিন্দ ক্ষুর দিয়ে চম্পাকে হত্যা করে এবং টাকা ও অলঙ্কার নিয়ে নৌকায় চেপে পালাতে যায়। কিন্তু গোবিন্দের রক্ত মাখা জামাকাপড় দেখে মাঝির সন্দেহ হয়। ধরা পড়ার ভয়ে গোবিন্দ জলে ঝাঁপায় যাতে সাঁতার কেটে পালাতে পারে। কিন্তু সে যায় কুমিরের পেটে। উপন্যাসটি ভারতীয় কথাসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কাহিনীর ঘন বুনোট, চরিত্রচিত্রণ, হাস্যরসের ব্যবহার ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দের হাতে চম্পার খুনের ঘটনার যে বিবরণ ঔপন্যাসিক দেন তা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই নিখুঁত।

> যেমনভাবে হায়না ঝাঁপিয়ে পড়ে শূকরীর ওপর তেমনই সে (গোবিন্দ) লাফিয়ে পড়ল চম্পার ওপর। সেই মুহূর্তে পলতের আগুন পৌঁছে গেছে কিনারে এবং শেষ স্ফুরণের মধ্য দিয়ে হঠাৎই নিভে যায়। সবই এখন অদৃশ্য। ঘরের কেন্দ্রে এত তীব্র গোঙানি এবং হাত-পা ছোঁড়ার শব্দ। একসময় সবই নিশ্চুপ, শব্দ শুনে আগেই দ্রুত পালিয়েছে শৃগাল। যেভাবে গাছ থেকে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে সেভাবে ডানার আনাড়ি ঝাপটায় উড়ে গেছে বাদুড়। একটা ঝোড়ো হাওয়ায় দোকান-বাড়ির গায়ের

গাছগুলো কেঁপে ওঠে। মনে হয় এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের অতলে সমস্ত বিপর্যয় নেমে এসেছে একসঙ্গে, একটি বিশেষ মুহূর্তে।

(অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

ফকিরমোহনের 'লছমা' উপন্যাসের সময়পর্বটি হল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক। ওড়িশার জনজীবনে এই পর্বটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ১৭৫১ সালে মুসলমান সম্রাটের হাত থেকে রাজ্যভার মরাঠি হাতে চলে যায় এবং ১৮০৩ সালে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। উপন্যাসটির শুরু একদল তীর্থযাত্রীর জগন্নাথ মন্দির যাওয়ার বিবরণে। পথে মরাঠি অশ্বারোহীরা তাদের আক্রমণ করে এবং লুটপাট করে নেয়। ভয়ে ও আতঙ্কে তীর্থযাত্রীরা যেদিকে পারে পালায়। এদের মধ্যে একজন ছিল লছমা, সুন্দরী এক তরুণী। সে আশ্রয় পায় সামন্তরায় রায়বানিয়ার রাজপরিবারে। পরে মরাঠাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষে রাজার মৃত্যু হয় এবং রাণী আত্মহত্যা করে। কিন্তু মৃত্যুর আগে রাণী লছমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেয়। ওদিকে আলিবর্দির সঙ্গে বর্গী নেতা ভাস্কর পণ্ডিতের সন্ধির প্রস্তাব চলে। আলিবর্দির এক সৈনিক বাদল সিংহের কারণে আলিবর্দি মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় এবং তাকে দেহরক্ষী হিসেবে নিযুক্ত করে। আলিবর্দির সঙ্গে ভাস্কর পণ্ডিতের এক আলোচনা পর্বে বাদলের পরিকল্পনায় ভাস্কর পণ্ডিত খুন হয়। আলিবর্দি বাদলকে বাংলার বনবিষ্ণুপুর পরগণার রাজা করে দেয়। এক সময় গয়ার ফল্গু নদীর তীরে বাদল এবং লছমার দেখা হয়। সেখানে থেকে বিবাহ, তারপর মরাঠাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ের বিবরণ। রাজা ও রাণী হিসেবে তারা আ-মৃত্যু প্রজাদের খুবই প্রিয় ছিল।

ফকিরমোহনের 'মামু'তে দেখানো হয়েছে পুরানো জমিদারদের পরিবর্তে শহরবাসী মানুষজন ভূমির অধিকারে এসেছে কিন্তু মানুষজনের দুঃখ-দুর্দশা কমেনি। 'প্রায়শ্চিত্ত' উপন্যাসের সময়কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশ। এখানে এসেছে শিক্ষিত এক নতুন শ্রেণীর কথা যাদের নতুন ভাবনা আছে কিন্তু স্বার্থপরতা মুক্ত নয়। এই উপন্যাসগুলিতেও ফকিরমোহনের ভাবনা ও ভাষার নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে।

৪.৩ গোপীনাথ মহান্তি

গোপীনাথের জন্ম ১৯১৪ সালে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৮ সালে ওড়িশার প্রশাসনিক কৃত্যকে যোগ দেন। প্রথম উপন্যাস 'মন গহিরর চাষ' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। একই দশকে প্রকাশিত হল তাঁর অন্য চারটি উপন্যাস 'দাদিবুঢ়া' (১৯৪৪), 'পরজা' (১৯৪৫), 'অমৃতর সন্তান' (১৯৪৭) এবং 'হরিজন' (১৯৪৮)। 'অমৃতর সন্তান' উপন্যাসটির জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান ১৯৫৫ সালে। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় 'মাটি মটাল' (মাটির কাব্য)। এই বইটির জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত হন ১৯৭৪ সালে। গোপীনাথের প্রথম গল্প-সংগ্রহ 'ঘাসর ফুল, পোড়া কপাল' প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে।

'দাদিবুঢ়া' একটি পুরনো খেজুর গাছ, আদিপুরুষের প্রতীক। আদিবাসী জীবনের আনন্দ-বিষাদের নীরব দর্শক। তার কাছেই আছে এক বল্মীকস্তূপ, যার নাম হুঁকাবুঢ়া। সে আদিবাসী সমাজের সরল বিশ্বাসের প্রতীক। উপন্যাসের পটভূমি ওড়িশার কোরাপুটের পাহাড়ি এলাকা। মানুষজনের মধ্যে রয়েছে পরজা ও ডোম সম্প্রদায়। ধর্মের দিক থেকে কেউ লোক দেবদেবীতে বিশ্বাসী, কেউবা খ্রিস্টান ধর্মে। সে নিয়ে মতান্তরও আছে যেমন পুরনো ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিশ্বাসের রকমফের রয়েছে। সেই গ্রামে মড়ক এল। বার আনা গরু আর চৌদ্দ আনা মুরগি মারা গেল। দেখা দিল বাঘের উপদ্রব যা কখনো এতখানি দেখা যায়নি। তেতাল্লিশজনকে বাঘে খেল।

একসময় মানুষজন বহুকালের এই পুরনো গ্রাম ছেড়ে নতুন বসতি গড়ল দুই পর্বতের মাঝে এই উপত্যকায়। পড়ে রইল দাদিবুঢ়া আর হুঁকাবুঢ়া।

'পরজা' উপন্যাসটি আকারে বেশ বড়, প্রায় পাঁচশ পাতার মতো। দুর্বলের ওপর সবলের আধিপত্যের কাহিনী এটি কিন্তু তার চেয়ে জরুরি হল আধুনিক বস্তুবাদী কাজকর্ম কেমন করে মানুষের প্রাচীন বিশ্বাসের জায়গাগুলিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। গোপীনাথের এই উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হয় আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেই তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে উন্নয়নের কোনো অর্থ হয় না এবং তা স্থানীয় মানুষের উপকারেও আসে না।

'অমৃতর সন্তান' (অমৃতের সন্তান) একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস যার পটভূমি দক্ষিণ-পশ্চিম ওড়িশার পার্বত্য অঞ্চলের রুদ্রসুন্দর প্রকৃতি। চরিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে মিণিঅপায়ু, বন্দীকার ও মিটিং গাঁয়ের কন্ধ নরনারী। উপন্যাসটির বিষয়ে হরেকৃষ্ণ মহতাব মন্তব্য করেছিলেন, 'সমাজের বিভিন্ন স্তরে সভ্যতার অসমান বিকাশের ফলে যারা অন্য অন্য স্বদেশবাসী ভাইদের কাছ থেকে বহু শতাব্দী ধরে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে আছে, সেই সব লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনী লেখক তাঁর শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।'

'মাটি মটাল' (মাটির কাব্য) উপন্যাসে রবি শহরে চাকরি করতে গিয়েও মাটি ও মানুষের টানে গ্রামে ফিরে আসে। সে গ্রামের মানুষকে দেখতে চায় সুখ ও সমৃদ্ধিতে। এতেই সংঘাত ঘটে শোষক বাবার সাথে। এক সময় গ্রাম ছেড়ে চলে যায় রবি। স্ত্রী ছবিও সঙ্গে যায়। আর তাদের বুকের ভেতর তারা বয়ে নিয়ে যায় গ্রাম উন্নয়নের স্বপ্ন। ইতিহাস, উপকথা, রাজনৈতিক ঘটনাবলী প্রভৃতি নানা উপাদানে সমৃদ্ধ প্রায় হাজার পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি।

গোপীনাথ মহান্তির কাহিনী-গদ্য বিষয়ে অনেক সমালোচক বলেন তাহল ভাষার কাব্যগুণ এবং চিত্রময়তা। উদাহরণ হিসাবে 'দাদিবুঢ়া' উপন্যাসের একটি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে গ্রামবাসীর গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পরিত্যক্ত গ্রামের একটি বিবরণ রয়েছে :

> ওরা ঝড়ের মতন চলে গেল। এখানে এখন সব নিস্তব্ধ। আর ঘরের চালা থেকে ধোঁয়া উঠবে না। পথে গোবর ও জঞ্জাল জমা হবে না। ঘরের দরজার সামনে শিশুরা ধুলো ছড়াবে না। সন্ধ্যায় বনের রাস্তা ধরে লোকেরা ও দল বেঁধে গরু বাছুররা ফিরে আসবে না। জ্যোৎস্না রাতে জমজমাটি নাচ হবে না। ঝগড়া বিবাদ আনন্দ নেই। চিরদিনের জন্যে সব স্তব্ধ শান্ত হয়ে গেল।
>
> (অনুবাদ রত্না সাহা)

গোপীনাথ মহান্তির উপন্যাসের সংখ্যা চব্বিশ এবং গল্প-সকংলন দশটি। এছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য শিল্পরূপেও তাঁর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে।

৪.৪ মনোজ দাস

মনোজ দাসের জন্ম ১৯৩৪ সালে মেদিনীপুর জেলার অদূরে ওড়িশার শাঁখারী গ্রামে। আট বছর বয়সেই অভিজ্ঞতার ঝুলিতে সঞ্চিত হয়েছিল ১৯৪২-এর বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় এবং মন্বন্তর। মার্কসবাদে দীক্ষিত হন বালেশ্বর জেলা ইস্কুলে পড়ার সময়ে। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হল কবিতা সংগ্রহ 'শতাব্দীর আর্তনাদ'। তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। ১৯৫০-এ প্রকাশ করলেন 'দিগন্ত' নামে একটি সাহিত্যপত্রও। প্রথম গল্প-সংকলন 'সমুদ্রের ক্ষুধা' প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। ঐ দশকেই প্রকাশিত হয় আর দুটি গল্প-সংকলন 'জীবনর স্বাদ' এবং 'বিষকন্যার কাহিনী'। ১৯৫৯ সালে কলেজ শিক্ষক হিসেবে কটকের একটি কলেজে যোগ দেন। ছয়ের দশকে জীবনে এক বিপর্যয় নেমে

আসে—একমাত্র সন্তান মারা যায়। সেই অসীম শূন্যতার মধ্যে অরবিন্দের দর্শনে জীবজনের নতুন অর্থ খুঁজে পান। ১৯৬৩ সালে পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম গল্প-সংকলন 'এ সং ফর সানডে অ্যান্ড আদার স্টোরিস' (রবিবারের গান এবং অন্যান্য গল্প)। তার পর থেকে ওড়িয়া এবং ইংরেজি দুটি ভাষাতেই লেখেন। ১৯৭২ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান 'কথা ও কাহিনী' বইটির জন্য। তার আগে এবং পরে একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে।

'মনোজ দাসের কথা ও কাহিনী' বইটিতে রয়েছে মোট সাতান্নটি গল্প। নানা বিষয়ের ওপর লেখা এই সংকলনের গল্পগুলির কয়েকটির শিরোনাম এই রকম : 'বিলেই' (বেড়াল), 'কুঅ'(কূপ), 'উপগ্রহ', 'বাঘ', 'বন্যা', 'মোহমবতী', 'মনুষ্য-মর্কট সংবাদ' ইত্যাদি। সংকলনের প্রথমে গল্প 'অপহৃত টোপির রহস্য' গল্পে এক রাজনৈতিক নেতার টুপিটি একটি বানর খেলার জিনিস ভেবে নিয়ে পালায়। সেটি দেখে ফেলে একটি শিশু। তারপর নেতা থেকে কর্মীদের ছোটাছুটিতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ভেতরের শূন্যতা ফুটে ওঠে। 'বিহঙ্গ' (পাখি) গল্পের নায়ক কুমার তরুণ রায় এক অভিজাত পরিবারের মানুষ। তার অবসর সময়ের আনন্দ হল পাখি শিকার। একদিন সে অনুভব করে তার এ আনন্দের মধ্যে নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে আছে। পাখির মতো সেও মুক্ত হতে চায় নানা বন্ধন থেকে। সে তার বাঘটিকেও মুক্ত করে গভীর বনের মধ্যে নিয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয় থানা এবং ব্লক উন্নয়ন দপ্তরের মানুষজন কুমার তরুণ রায়কে একটি মুক্ত বাঘের থাবার সামনে দেখে ভাবে প্রাণীটি তরুণ রায়কে মারতে চাইছে। গুলি ছুটে আসে। বাঘটি মারা যায়। তরুণ রায়ও আর উঠে দাঁড়ায় না। গল্পটি যেন মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনারই ছবি। 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে এক মনোবিজ্ঞানী সুদীর্ঘ সময় এক গবেষণাগারে কাজ করে একসময় নিজের শহরে ফিরে আসে মানুষজনের সেবা করতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বুঝতে পারে তার ভাবনাচিন্তার সঙ্গে ঐ অঞ্চলের মানুষজনের ভাব-ভাবনার মিল ঘটেছে না। সে এক সময় ফিরে যায় তার গবেষণাগারে, মনে হয় সে নিজেই যেন মানসিক রোগী।

মনোজ দাসের গল্পে সবসময় এক ধরনের নতুনত্ব থাকে। জীবনকে ভেতর ও বাইরে, দুদিক থেকেই দেখার প্রচেষ্টা সেখানে। শব্দ ও বাক্যের সংক্ষিপ্ততা তাঁর শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর গল্পের আর একটি বিষয় হল দৃশ্যময়তা। 'পাখি' গল্পে কুমার তরুণ রায় পাখি শিকারী থেকে প্রেমিকে রূপান্তরিত হয়, মাত্র কয়েক বাক্যে সে পরিবর্তন ছবির ফুটিয়ে তোলেন মনোজ দাস :

> পাখিগুলোর বড় তাড়া। তাদের গতির সঙ্গে তাল মেলানো যায় না। রায় থামল এবং চোখ ঘোরালো আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে—এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে। সে কখনো জানতো না তার চোখ দুটো এতো বড় যে আকাশের অতখানি আঁকড়ে ধরতে পারে, বোধ হয় আকাশের মতই তারা বিস্তৃত। যে পাখিগুলো এইমাত্র উড়ে গেল—আড়াআড়ি ভাবে তার চোখের সামনে দিয়ে—তারা মুছে দিয়েছে বহু বছর ধরে সঞ্চিত চোখের ধূলিকণা; চোখজোড়া এখন পবিত্র এবং নতুন।
>
> (অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

বিশটিরও বেশি গল্পগ্রন্থের লেখক মনোজ দাস একটি উপন্যাসও লেখেন 'সাইক্লোনস' নামে, ইংরেজি ভাষায়।

ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যান্য বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিকেরা হলেন কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, রামচরণ মিত্র, কিশোরীচরণ দাস, সুরেন্দ্র মহান্তি, মহাপাত্র নীলমণি সাহু, অখিলমোহন পট্টনায়ক, কৃষ্ণপ্রসাদ মিশ্র, শান্তনুকুমার আচার্য, চন্দ্রশেখর রথ, প্রতিভা রায় প্রমুখ।

৪.৫ অনুশীলনী

১। **নিচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক ও কোনটি ভুল নির্ধারণ করুণ।**

(ক) ওড়িশাতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা পায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে।
(খ) ফকিরমোহনের শৈশবের নাম ছিল ব্রজমোহন।
(গ) 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' উপন্যাসের প্রধান নারীচরিত্রটির নাম চম্পা।
(ঘ) 'দাদিবুঢ়া' উপন্যাসটির পটভূমি ওড়িশার কটক অঞ্চল।
(ঙ) 'অমৃতর সন্তান' উপন্যাসটি কন্ধদের জীবন নিয়ে।
(চ) গোপীনাথ মহান্তির উপন্যাসের সংখ্যা চব্বিশ।
(ছ) 'মাটির কাব্য' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র হল রবি ও ছবি।
(জ) মনোজ দাসের প্রথম গল্প-সংকলনের নাম 'জীবনর স্বাদ'।
(ঝ) মনোজ দাস ওড়িয়া এবং বাংলাভাষাতে সাহিত্যচর্চা করেন।
(ঞ) কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী একজন কথাসাহিত্যিক।

২। **পঁচিশ থেকে তিরিশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।**

(ক) আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের তিন পথিকৃৎ।
(খ) 'লছমা'।
(গ) 'পরজা'।
(ঘ) মনোজ দাসের গল্পের শৈলী।

৩। **পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।**

(ক) ফকিরমোহনের শৈশব।
(খ) 'দাদিবুঢ়া'।
(গ) মনোজ দাসের গল্পের কাহিনী বৈচিত্র্য।

৪। **দেড়শ শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।**
গোপীনাথ মহান্তির উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ।

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

(১) সাহিত্য অকাদেমি অ্যাওয়ার্ডস ১৯৫৪-৭৮।
(২) জর্জ, কে. এম (সম্পাদিত) : মডার্ন ইন্ডিয়ান লিটরেচর (দু-খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমি।

একক ৫ ❑ কন্নড়

গঠন

৫.১ প্রস্তাবনা
৫.২ মাস্তি ভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার (ছদ্মনাম শ্রীনিবাস)
৫.৩ কে. শিবরাম কারন্ত
৫.৪ ইউ. আর. অনন্তমূর্তি
৫.৫ এস. এল. ভৈরাপ্পা
৫.৬ অনুশীলনী
৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ প্রস্তাবনা

'কন্নড়' ভাষাটি দু হাজার বছরের পুরনো বলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। কন্নড়ভাষী রাজ্য হল কর্ণাটক। 'কর্ণাটক' শব্দটির উৎস নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত রয়েছে। অনেকে বলেন কালোমণির দেশ 'করনড়ু' অথবা ফুল ও চন্দনকাঠের দেশ 'কম্মিটুনাড়ু' থেকে সংস্কৃত রূপ কর্ণাটক। সাহিত্যের ইতিহাসকার আর. এস. মুগালির মত হল কর্ণাটকের মূলে আছে উচ্চ অথবা বৃহৎ দেশবোধক শব্দ 'করুনাড়ু', যা কালক্রমে করনাড়ুর থেকে কন্নাড়ু শব্দের উদ্ভব। কন্নড় শব্দটি দেশ ও ভাষা দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক কন্নড় সাহিত্যের সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। আধুনিক কন্নড় ভাষার লিপি তৈরী হয় ইংরেজ ধর্মযাজকদের হাতে। মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের মাধ্যমেই। ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে তারা কন্নড় ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ প্রকাশ করে। এক ইংরেজ রাজকর্মচারীর সাহায্যে উত্তর কর্ণাটকের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কন্নড় ভাষা চালু হয় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে। কবিতা ও নাটকে নতুন পর্ব শুরু হয়। গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়টি ছিল অনুবাদ কর্মের। এস. জি. নরসিংহাচার 'আলাউদ্দীনের প্রদীপ', 'ঈসপ'স ফেবলস', 'গ্যালিভার'স ট্রাভেলস' ইত্যাদি অনুবাদ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বি. বেঙ্কটাগর অনুবাদ করেন বঙ্কিমের উপন্যাস। মরাঠি উপন্যাসের অনুবাদ করেন গালগনাথ। ঐ শতাব্দীর শেষ পর্বে কন্নড় ভাষার প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'ইন্দিরাবাই' প্রকাশ করেন গুলবাডি বেঙ্কট রাও। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু দশকে প্রকাশিত হয় বোনার বাবুরাও-এর 'বাগদেবী' (১৯০৫), গুলবাডী অন্নাজিরাও-এর 'রোহিনী' (১৯০৭), কেরুর-এর 'ইন্দিরা' (১৯০৮) এবং 'যদু মহারাজ' (১৯১৬)। কন্নড় ছোটগল্পের সূত্রপাত ১৯০০ সালে পঞ্জের হাতে। ঐ পর্বের অন্য দুজন বিশিষ্ট লেখক হলেন এম. এন. কামাত এবং কেরুর। কিন্তু প্রথম সার্থক গল্পের স্বাদ মিলল মাস্তি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের 'রঙ্গনা মাদুভে' (রঙ্গনার বিয়ে, ১৯১১) গল্প-সংকলনটির মধ্যে দিয়ে। ১৯২০ এবং ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হল তাঁর আরও দুটি গল্প-সংকলন 'কেলাভু সন্ন কাথেগালু' (কয়েকটি গল্প) এবং 'সন্না কাথেগালু' (ছোটগল্প)। বিষয় ও নির্মিতিতে এক আশ্চর্য বিস্তার দেখা গেল মাস্তির গল্পে।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মতো কর্ণাটকের মানুষজনও সামিল হন। আকাশে-বাতাসে আত্মত্যাগের আহ্বান। পাশাপাশি চলতে থাকে নানা সামাজিক সংস্কার আন্দোলন। তিনের দশকে প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। তারপর স্বাধীনতা লাভ—নতুন স্বপ্ন

ও স্বপ্নভাঙার পর্ব, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতা। বিংশ শতাব্দীর দুয়ের দশক থেকে শতাব্দীর অন্যান্য দশকগুলিতে কে. শিবরাম কারন্ত, অ না কৃ, তরাসু, আনন্দকন্দ, কুবেম্পু, গোকাক, কত্তিমণি, নিরঞ্জন, মিরজি, ইনামদার, পুরাণিক, ত্রিবেণী, এম. কে. ইন্দিরা, শান্তিনাথ দেশাই, ইউ. আর. অনন্তমূর্তি, এস. এল. ভৈরাপ্পা প্রমুখ কথাসাহিত্যিকরা বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে পারি চারজন কথাসাহিত্যিকের মধ্যে। এঁরা হলেন মাস্তি (১৮৯১-১৯৮৬), কারন্ত (১৯০২-৯৭), অনন্তমূর্তি (১৯৩২) এবং ভৈরাপ্পা (১৯৩৪)।

৫.২ মাস্তি ভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার (ছদ্মনাম শ্রীনিবাস)

ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার, সমালোচক শ্রীনিবাসের জন্ম ১৮৯১ সালে মহীশূরের মাস্তি গ্রামে। মহীশূর সিভিল সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন বহুদিন। ১৯৪৩-এ অবসর নেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯১০-এ। পরবর্তী সময়ে মোট পনেরটি গল্প-সংকলন এবং দুটি নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। 'সন্ন কাথেগালু' গল্প সংগ্রহটির জন্য ১৯৬৮ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। ১৯৮৩ সালে জ্ঞানপীঠ পুস্কারে সম্মানিত হন 'চিকভির রাজেন্দ্র' উপন্যাসটির জন্য। ১৯৭৩ সালে সাহিত্য অকাদেমির ফেলো নির্বাচিত হন। 'জীবন' নামের একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন একুশ বছর ধরে। নব্বইটির বেশি গ্রন্থ লেখেন যার মধ্যে রয়েছে 'নবরাত্রি' নামের একটি কাব্য-কাহিনী এবং 'ভাব' নামে আত্মজীবনী।

মাস্তির গল্পের বিশেষত্ব নিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক জি. এস. আমুর 'নির্বাচিত কন্নড় গল্প' সংকলনটির ভূমিকায় লেখেন, 'শ্রীনিবাসের পরে যাঁরা কন্নড় ছোটগল্প লিখতে আসেন তাঁদের কেউই তাঁর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। শ্রীনিবাসের গল্প মানবিক অনুভূতিতে পূর্ণ এবং তাঁর চরিত্রগুলির বিস্তারও উল্লেখযোগ্য—পুরাণ থেকে এই সময়ের অতি সাধারণ মানুষ।' তিনি নারী-পুরুষের সম্পর্কের অজস্র টানাপোড়েনকে তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। দুঃখ ও যন্ত্রণাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। লক্ষ করেছেন মানুষের আত্মত্যাগ। আবেগ এবং অনুভূতির খেলা দেখেছেন। মানুষের জয় এবং পরাজয়ের পর্বও তাঁর চোখ এড়ায়নি। 'ভেঙ্কটিগের স্ত্রী' গল্পে তিনি তুলে ধরেন ভেঙ্কটিগের মনোজগৎ যেখানে কোনো দ্বেষ কিংবা প্রতিশোধের স্পৃহা নেই, ভালোবাসা আর ক্ষমাই তার জীবনের মূল মন্ত্র। সে তার স্ত্রীর শুভ কামনা করে চলে যদিও মেয়েটি তার সঙ্গে তঞ্চকতা করে এবং দূরে সরিয়ে দেয়। ভেঙ্কটেশ একজন নিরক্ষর শ্রমজীবী কিন্তু তার চিন্তার মধ্যে এক আশ্চর্য আধুনিকতা, 'যে মেয়েটি একদিন আমার ছিল সে আমার টান হারিয়ে পালিয়ে গেছে। আমার কি করার ছিল—বকতুম? মারতুম? জোর করতুম? বলতুম আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিলুম? কী করতুম? আমার পক্ষে যা করা স্বাভাবিক তাই করেছি। যে মেয়েটি আমাকে বিয়ে করেছিল সে আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। আমি অখুশী কিন্তু রাগ করিনি।' শ্রীনিবাসের অনেক গল্পেই জীবনকে এতোখানিই নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখার পরিচয় মেলে। তাঁর গল্পের ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনেকখানি। ইজিপ্ট, রোম, মেক্সিকো, ইংল্যান্ড, মস্কো আসে, চরিত্র হিসেবে এসে যায় শেক্সপিয়র, টলস্টয় প্রমুখেরা। শ্রীকৃষ্ণ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রও আসেন। তাঁর যে তিনটি গল্পের কথা বারেবারেই পাঠক-আলোচকদের মুখে শোনা যায় তা হল 'টলস্টয় মহর্যিয় ভূর্জ বৃক্ষগালু' (মহর্ষি টলস্টয়ের ভূর্জবৃক্ষ), 'বিচিত্র প্রেম' এবং 'ইরুভেগল লোক' (পিঁপড়ের পৃথিবী)।

'চিকভির রাজেন্দ্র' একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস যা বিষয়বস্তু কুর্জ ভূখণ্ডের রাজা বীররাজেন্দ্রর ১৮৩৫ সালে ক্ষমতা হারোনো এবং ব্রিটিশের ক্ষমতা দখল। বীরেন্দ্র তার চৌদ্দ বছরের শাসনকালে ব্যক্তিগত ইচ্ছায়

চলতে থাকে এবং প্রজাদের সুখ দুঃখ তাকে কোনোভাবেই ভাবায় না। তার নিষ্ঠুরতাও প্রকাশ পেতে থাকে ধীরে ধীরে ধীরে। একসময় তার সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে সে এক নিকট আত্মীয়কে খুন করে। প্রতিবেশী এক ব্রিটিশ ভূখণ্ডের একটি নারীকে হরণ করে। রাজেন্দ্রর বোন ব্রিটিশ রাজত্বে আশ্রয় ভিক্ষা করলে রাজেন্দ্র বোনের শিশুপুত্রটিকে খুন করে। ফলে ব্রিটিশ শাসকরা কুর্জ ভূখণ্ড দখলে আনার সুযোগ পেয়ে যায়। স্থানীয় ভূস্বামীরাও ইংরেজদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। কর্নেল ফ্রেজার প্রস্তাব দেন বীররাজেন্দ্রর শিশুকন্যা সিংহাসনে বসুক এবং রানী তার অভিভাবিকা হিসেবে কাজ করুক। কিন্তু রানী ইচ্ছে প্রকাশ করেন শিশু-কন্যাসহ রাজার সঙ্গে সে নির্বাসনে যাবে। ফ্রেজার রাজত্বভার নেয় এবং রাজা, রানী ও শিশু কন্যা ভেলোর থেকে একসময় বারাণসীতে চলে যায়। সেখানে রানীর মৃত্যু হয়। রাজা তার কন্যাকে নিয়ে এক সময় ইংল্যান্ডে চলে যায়। শ্রীনিবাস এ উপন্যাসটিতে দেখান যে রাজক্ষমতার অপব্যবহার কেমন করে রানী, কন্যা এবং প্রজাদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। তারা এ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী নয় কিন্তু এ দায়ভার তাদের বহন করতে হয়। তাদের ওপর বিদেশী শাসনও নেমে আসে।

শ্রীনিবাসের কথাসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দুটি উপাদান হল প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মিলন ঘটানো এবং লোকসাহিত্যের কথনরীতিকে আত্মীকরণ।

৫.৩ কে শিবরাম কারন্ত

শিবরাম কারন্তের জন্ম দক্ষিণ কর্ণাটকের কোটা অঞ্চলে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ত্যাগ করে কারন্ত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন সামাজিক রূপান্তরের প্রচেষ্টায়। সারাদিন হেঁটে গিয়ে এমন জায়গায় পৌঁছেছেন যেখানে বক্তা দুজন আর শ্রোতা একজন কিন্তু হতাশ হননি। হরিজনদের মূলস্রোতের অংশ করে তোলা, তাঁতে কাপড় বোনা, মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের এমন অনেক কিছুই তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এর মধ্যে দিয়ে যেমন কষ্ট করার শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করেছেন তেমনই সংগ্রহ করেছেন তাঁর লেখার উপাদান। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ, নাটক চৌদ্দটি, ভ্রমণবৃত্তান্ত ছটি, আত্মজীবনী দুটি, বিশ্বকোষ ও অভিধান পাঁচটি, সমালোচনামূলক গ্রন্থ পাঁচটি, নানা প্রবন্ধের সংকলন একটি, ইংরেজি গ্রন্থ পাঁচটি। এর বাইরেও রয়েছে তাঁর ছোটদের লেখা এবং গল্পগুচ্ছ।

কারন্তের তিনটি ধ্রুপদী উপন্যাস হল 'মরলি মন্নিগে' (মাটির টানে, ১৯৪১), 'বেট্টদ জীব' (পাহাড়ের মানুষ, ১৯৪৩) এবং 'কুড়িয়র কুস' (কুড়িয়র বাচ্চা, ১৯৫১)। 'মাটির টানে' তিন প্রজন্মের বৃত্তান্ত যার সময়সীমা ১৮৫০ থেকে ১৯৪০। এর ভেতর সমাজ বিবর্তনের তিনটি জরুরি পর্ব চিহ্নিত হয়ে আছে। কাহিনীর পটভূমি দক্ষিণ কর্ণাটকের একটি সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল। রাম ঐতালের বিয়ে হয় পার্বতীর সঙ্গে। পরিবারে আর ছিল এক বিধবা বোন সরস্বতী। কিন্তু বিয়ের অনেকদিন পরেও কোনো সন্তান না হওয়ায় সত্যভামা নামে আর একটি নারীকে বিয়ে করে রাম ঐতাল। সে নিয়ে দুই স্ত্রীর মধ্যে প্রাথমিক তিক্ততা থাকলেও পরে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরিবারটি পূজো-আর্চা আর সামান্য জমি চাষবাসের মধ্য দিয়ে সুখে-দুঃখে জীবন অতিবাহিত করছিল। কিন্তু প্রকৃতির ওপর নির্ভররশীল যে কৃষিকাজ সেখানে অনেক রকম অনিশ্চয়তা। তাই রাম ঐতাল তার প্রথম সন্তান লচ্চাকে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠায় যাতে সে চাকরিজীবী হতে পারে। এটিই প্রথম প্রজন্মের কাহিনী বৃত্তান্ত। দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি লচ্চা বাবা-মা এবং সামাজিক বাধা-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 'আধুনিকতার' সন্ধান খোঁজে

বেহিসেবী জীবনযাপনে। লচ্চা মনে করে তার বাবা কৃপণ এবং ছেলের চেয়ে মেয়ে সুব্বির প্রতি বাবা-মায়ের টান বেশি। ছেলেকে পথে আনতে বাবা-মা নাগবেণী নামের একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়। কিন্তু তাকেও প্রবঞ্চনা করে লচ্চা। তিনটি সন্তানের জন্ম দেয় কিন্তু বাবার টাকায় জুয়া খেলে, যৌনকর্মীদের সঙ্গে রাত্রিবাস করে। যেটুকু সম্পত্তি ছিল বাবা তা নাগবেণীর নামে লিখে দেয় যাতে লচ্চা সেটুকুও না অপচয় করে ফেলে। একসময় রাম ঐতাল ও পার্বতী মারা যায়। নাগবেণীর দুটি সন্তানও পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। বেঁচে থাকে একমাত্র সন্তান রাম। নাগবেণীকে ঠকিয়ে তার নামে লিখে দেওয়া সম্পত্তিও বেচে দেয় লচ্চা। তৃতীয় প্রজন্মের রামকে দিয়ে শুরু কাহিনীর শেষ অংশ। রাম শিক্ষিত হয়ে পরিবারকে নতুন করে গড়ার স্বপ্ন দেখে। স্নাতক হয়। স্বাধীনতার আগের পর্বে অনেক যুবকের মতো সেও চাকরি খুঁজে বেড়ায়। ছোটখাট কাজ করে। একসময় যুক্ত হয় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ অন্দোলনে। শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নেয় দাদুর মতো সেও চাষবাসে মন দেবে। তার জন্য দাদুর কিছু অর্থ মাটির তলায় চাপা ছিল । মা আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

খুবই সূক্ষ্ম এই কাহিনীর বিন্যাস। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের নানা অনুপুঙ্খ ধরা আছে উপন্যাসটিতে। রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের ভাল-মন্দের নানা কথা। প্রকৃতির নানা রূপ ফুটে উঠেছে।

'বেট্টদ জীব' উপন্যাসে নায়ক গোপালায় সকলের উপদেশ অগ্রাহ্য করে পাহাড়ের কাছাকাছি এক গভীর অরণ্যে চলে যায় বসবাস করতে এবং সেখানে গাছ কেটে জীবনযাপনের মতো কৃষিযোগ্য জমি গড়ে তোলে। অবিরাম বর্ষণ, হিংস্র প্রাণী আর ম্যালেরিয়ার জীবাণুতে পরিপূর্ণ অঞ্চলটিতে একসময় একটি নারকেল বাগান আর কৃষিযোগ্য কিছুটা জমি বানিয়ে নেয়। তার দুই সন্তানের মধ্যে মেয়েটি শৈশবে মারা যায় এবং ছেলেটি বড় হয়ে অন্য কোনো জীবন ও জীবিকার সন্ধানে দূরে চলে যায়। শূন্যতা পূরণ করতে ঐ দম্পতি একটি অনাথকে বড় করে তোলে এবং বিয়ে দেয়। কাছাকাছি একটি জায়গায় তাদের বাসস্থানও গড়ে তোলে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন লড়াই এবং সেই প্রকৃতিতেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার এক উল্লেখযোগ্য বৃত্তান্ত এই উপন্যাসটি।

'কুড়িয়র বাচ্চা' উপন্যাসটিতে রয়েছে মলেকুড়িয়র নামে পরিচিত উপজাতীয় মানুষজনের ধর্মীয় ও সামাজিক আচারসহ তাদের জীবনযাপনের বেশ কিছু জরুরি কথা।

৫.৪ ইউ. আর. অনন্তমূর্তি

অনন্তমূর্তির জন্ম কর্ণাটকের মালানাড অঞ্চলের একটি ছোট গ্রামে। শহরের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ যখন উচ্চশিক্ষার জন্য মহীশূরে এলেন। পরবর্তী সময়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক থেকে উপাচার্য পর্যন্ত হয়েছেন। তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে, তেইশ বছর বয়সে। তারপর আরো চারটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত উপন্যাস তিনটি : 'সংস্কার'. উপন্যাসটি প্রকাশের পরেপরেই আলোড়ন তুলেছিল কন্নড় পাঠক মহলে। এক অর্থে এটি একটি ধর্মীয় উপন্যাস কারণ এর পটভূমি দক্ষিণ ভারতের একটি ব্রাহ্মণ মহল্লা এবং তারাই এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র। উপন্যাসটি শুরু হয় ব্রাহ্মণ-সন্তান নারাণাপ্পার মৃত্যু দিয়ে। নারাণাপ্পা কোনোদিন ব্রাহ্মণদের সংস্কার মানেনি—বেঁচে থাকতে মদ খেয়েছে, এক শূদ্র মহিলার সঙ্গে আনন্দে মেতেছে। তাই তার মৃতদেহ সৎকারে রাজি হয় না কেউ। তারা আসে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ প্রাণেশাচার্যের কাছে। ঐসব ব্রাহ্মণদের কতাবার্তার মধ্যে ধরা পড়ে কেউ কেউ নারাণাপ্পার তথাকথিত দোষগুলি নিজেরাও করে চলেছে কিন্তু সবই গোপনে। কারো মধ্যে আবার অর্থনৈতিক নানা স্বার্থও কাজ করেছে। প্রাণেশাচার্য কৃচ্ছ্রসাধন করে। সে পুঁথি থেকে বুঝতে চায় এই সৎকার করা উচিত হবে কি না। কিন্তু কোনো হদিশ পায় না। ওদিকে মৃতদেহে পচন শুরু হয়।

শকুন নেমে আসে আকাশ থেকে। মৃতদেহ সংকার না হওয়ায় ব্রাহ্মণরা খেতেও পারে না। খিদেয় কষ্ট পায়। রাতে প্রাণেশাচার্য যায় মারুতি মন্দিরে কোনো দৈববাণীর আশায়। কিন্তু নির্দেশ মেলে না। আর অপেক্ষা করতেও পারলেন না কারণ পঁচিশ বছর ধরে অসুস্থ রুগ্ন স্ত্রীকে ওষুধ দিতে হবে। ফেরার পথে হঠাৎই দেখা হল চন্দ্রীর সঙ্গে, যার সাথে নারাণাপ্পা দশ বছর জীবনযাপন করেছে। চন্দ্রী চেয়েছিল প্রাণেশাচার্যকে তার কৃতজ্ঞতা জানতে কারণ আচার্য সন্ধান করে চলেছেন মৃতদেহ সংকারের কোনো উপায়। কিন্তু আচার্যের পা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে যুবক প্রাণেশাচার্য এবং যুবতী চণ্ডীর ভেতর অন্য এক দৈহিক টান গড়ে ওঠে। ধর্মের সমস্ত তত্ত্ব মাথায় নিয়েও সেই টান অস্বীকার করতে পারল না প্রাণেশাচার্য। চণ্ডী এই ভেবে খুশী হল যে তার সন্তান হবে যা এতদিন কামনা করেও সে পায়নি। আরো আনন্দিত হল এই ভেবে যে তার সন্তানের শরীরে এক মহাপুরুষের রক্ত বইবে। প্রাণেশাচার্য চলে যাওয়ার পর চণ্ডী গেল মুসলমান পাড়ার দিকে। মেদো আমেদ বারী একসময় ষাঁড় কিনবে বলে টাকা ধার করেছিল নারাণাপ্পার কাছে। তাকে বিশেষ কিছু বলতে হল না চণ্ডীকে। বারী অন্ধকারে গরুর গাড়িতে কাঠ তুলে দাহ করে এল নারাণাপ্পাকে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মৃতদেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। চণ্ডী বনের পথ ধরে চলল বাসরাস্তার দিকে। সকালের বাসে চলে যাবে কুন্দপুরে। ওদিকে প্রাণেশাচার্যের রুগ্ন স্ত্রী মারা যায়। সে শ্মশান থেকে আর ফিরল না। পূর্ব দিকে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে দেখা নানা সাধারণ মানুষের সঙ্গে। পুট্টা নামের এক যুবক, পদ্মবতী নামে এক সম্ভ্রান্ত যৌনকর্মী থেকে এক মেলায়। সর্বত্র নিজের পরিচয় গোপন রাখে প্রাণেশাচার্য। কিন্তু একসময় জীবনের মুখোমুখি হতে চায়। নিজের গ্রামে ফিরে চলে, জানাতে চায় সব কথা। নিজের অনুভূতির সঙ্গে গোপন খেলা খেলবে না। কিন্তু তার এই পরিবর্তন কেমন ভাবে নেবে সম্প্রদায় সমাজ? গরুর গাড়িতে চড়ে গ্রামের পথে চলে। 'পথ আরো চার-পাঁচ ঘন্টার। তারপর কী? প্রাণেশাচার্য অপেক্ষা করে—উৎকণ্ঠিত, উৎসুক।'

উপন্যাসটি নিয়ে নানা বিতর্ক আছে কিন্তু সামান্য একশ তিরিশ-পঁয়ত্রিশ পাতার একটি উপন্যাসে ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যের বিরোধিতা, ধর্মীয় রীতিনীতির অর্থ ও অর্থহীনতা, কাম ও মোক্ষ—এমন কতকিছুকেই ঔপন্যাসিক কি করে এমন ধ্রুপদী রীতিতে গাঁথলেন তা পাঠক ও লেখকদের কাছে বিস্ময়ের। উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপান্তরের পর্বে চিত্র জগতেও বেশ আলোড়ন উঠেছিল।

অনন্তমূর্তির উপন্যাস ও ছোটগল্পে এ-রকমই দুই বিপরীত সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে বিরোধও ঘটে। সে বিরোধ একটি বিশ্বাস যে অপরটির জায়গা দখল করে নেয় এমন নয়। বরং সংঘাতের মধ্য দিয়ে দুটি বিশ্বাসের ভেতরেই পরিবর্তন আসে। যেমন 'সংস্কার' উপন্যাসটিতে নারাণাপ্পার উগ্র প্রতিবাদী সত্তার পরেও দেখা যায় সে চণ্ডী কিংবা পদ্মাবতীর মনের সমস্ত জায়গা পূরণ করতে পারে না। মনে হয় যেন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যে সত্য প্রকাশ পায় সেটিই যেন নতুন ও আধুনিক।

অনন্তমূর্তির উল্লেখযোগ্য গল্পের মধ্যে রয়েছে 'প্রকৃতি', 'কার্তিক', 'ঘটশ্রাদ্ধ' ইত্যাদি। গল্পগুলিতে লেখকের শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি ছাপ ফেলেছে। 'ঘটশ্রাদ্ধ' গল্পটি চলচ্চিত্রে হিসেবে বেশ সফল হয়েছিল। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে তাঁর গল্প-উপন্যাসে একটা তত্ত্বভাবনা সব সময়েই ঢুকে পড়ে। অন্যদিকে কিছু সমালোচক এই মতও ব্যক্ত করছেন যে চিন্তা ও চেতনা তাঁর সৃষ্টিকে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে। তাঁর কথাসহিত্য পাঠ করে শুধু আনন্দ মেলে না, সমাজ পরিবর্তনের একটা দায়িত্বও যেন পাঠকের ওপর এসে পড়ে।

৫.৫ এস. এল. ভৈরাপ্পা

ভৈরাপ্পা জন্ম কর্ণাটকের শান্তিশিবর গ্রামে। এগারো বছর বয়সে মা-বাবা দুজনকেই হারান। তারপর নানা কাজকর্ম করে পড়াশোনা চালাতে থাকেন। দর্শন শাস্ত্রে অনার্স ও এম. এ. তে. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পরে নন্দনতত্ত্বের ওপর গবেষণা করে বরোদার এম. এস. বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। দীর্ঘকাল দর্শনের অধ্যাপনা করেছেন।

ভৈরাপ্পার প্রথম উপন্যাস 'ধর্মশ্রী' প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে কিন্তু ১৯৬৫ সালে 'বংশবৃক্ষ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি কন্নড় কথাসাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। উপন্যাসটি প্রকাশের পর তা যেমন পাঠক-প্রিয় হয়েছিল তেমনই বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। উপন্যাসটি ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীনিবাস সৈত্রীকে কেন্দ্র করে। তাঁর বালবিধবা পুত্রবধূ দ্বিতীয়বার বিয়ের প্রস্তাব রাখলে দুই প্রজন্মের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়।

'গৃহভঙ্গ' (১৯৭০) কন্নড় সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অধিকাংশ চরিত্র নিরক্ষর এবং তাদের ভাষা অমার্জিত। নানাজাম্মার বিয়ে হয় এমনই একজনের সঙ্গে যার আচার-আচরণ অমানবিক। শাশুড়িও তেমনই—দুর্মুখ, গোঁয়ার এবং কলহপ্রবণ। গোটা উপন্যাস জুড়ে নানজাম্মা লড়াই করে চলে মূর্খতা, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, অবিচারের বিরুদ্ধে সন্তানদের সুস্থভাবে বড় করে তুলতে।

'দাতু' (১৯৩৭) উপন্যাসে ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে সত্যভামা শ্রীনিবাস নামের এক শূদ্র যুবককে বিয়ে করতে চায়। তারপর এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মানুষজনের মধ্যে অজস্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। গান্ধীমতবাদী বেত্তাইয়া মনে করে জাতের প্রাচীর অতিক্রম করতে হবে অহিংস পথে। তার ছেলে মোহনদাস মনে করে একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান মিলবে। সত্যভামার বাবা ভেঙ্কটর মানাইয়া যদিও এক শূদ্র নারীর শরীর ভোগ করে কিন্তু তার মেয়ে একজন শূদ্রকে বিয়ে করবে ভাবতেই পারে না। শ্রীনিবাসের বাবা মেলগিরি, যে একজন মন্ত্রীও, এ বিয়েতে মত দিতে পারে না কারণ তাতে আত্মীয়স্বজনরা ক্ষুণ্ণ হবে এবং ভোটেও অসুবিধে দেখা দিতে পারে। শ্রীনিবাসের দাদুরও আপত্তি কারণ তাদের শরীরে রাজরক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এবং ঐ সাধারণ ব্রাহ্মণকন্যা সংসারে এলে রক্তের কৌলিন্য নষ্ট হবে। শ্রীনিবাসের মাও রাজি হয় না কারণ গৃহদেবতা চটে যাবে এবং দেবতার পূজারী সত্যভামার বাবা ভেঙ্কটরামানাইয়া অখুশি হবে। এর মধ্যে সত্যভামার বাবা মানসিক ভারসাম্য হারায় এবং তার সারা জীবনের পূজিত দেবতাকে ত্যাগ করে। সে নিজেকে বশিষ্ঠ ভাবতে শুরু করে এবং শূদ্র মহিলা মাতঙ্গীকে অরুন্ধতী বলে কল্পনা করে। এরকম নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে উপন্যাস এগোতে থাকে। সত্যভামা, শ্রীনিবাস, মোহনদাস এবং আরো অনেকেই জাতের গণ্ডী পেরোতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। শেষ পর্যন্ত সত্যভামা শূদ্রত্ব গ্রহণ করে শ্রীনিবাসের সঙ্গে মিলিত হয়। সকলের বহুমুখী চেষ্টার পরেও জাতিভেদের প্রাচীরকে জাত-নিরপেক্ষভাবে অতিক্রম করা যায় না।

'পর্ব' (১৯৭৭) উপন্যাসটির বীজ কিভাবে ঔপন্যাসিকের মনে প্রোথিত হল সে প্রসঙ্গে লেখক জানান যে ১৯৬৬ সালে চিক্‌মগালুরের ড. নারায়ণাপ্পার সঙ্গে মহাভারতের বাস্তব আবেদন প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে তাঁর কল্পনায় আখ্যানটি এক অস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। পরে 'অশ্বযুজ' কার্তিকে হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলে ভ্রমণের সময় বহুপতিপ্রথা (দ্রৌপদী প্রথা) প্রচলিত একটি ছোট গ্রামে কিছুদিন বসবাস করেন। তারপর মহাভারতের ঘটনাগুলি যেসব অঞ্চলে সংগঠিত হয়েছিল বলে প্রচলিত আছে সেইসব অঞ্চলে যান। পাশাপাশি চলতে থাকে নানা পাঠ। শেষে ১৯৭৫-এর ১২ অক্টোবর থেকে ১৯৭৬-এর ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছর দুমাসের মধ্যে এই

বৃহৎ উপন্যাসটি (মুদ্রিত চেহারায় সাড়ে পাঁচশ পৃষ্ঠা) লেখেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েনের এক গভীর ও ব্যাপ্ত আখ্যান এটি। যৌনতা এখানে অন্যতম একটি উপাদান। একটি উপ-মহাদেশের এক সুদীর্ঘ সময়ের সংঘাত, সংঘর্ষ ও বিচ্ছিন্নতার ছবি উপন্যাস জুড়ে। কাহিনী শেষ হয় তীব্র হতাশায়।

> কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর প্রবল বর্ষার মধ্যে দলে দলে স্ত্রীলোক সভাগৃহে প্রবেশ করে। ধর্মরাজ প্রশ্ন করেন ওরা কারা। এক বৃদ্ধা জবাব দেয়, 'তোমাদের যুদ্ধে সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য গ্রাম থেকে জোর করে নিয়ে আসা মেয়ে এরা। যুদ্ধকালেই এরা গর্ভবতী হয়েছে। এদের স্বামীরা এখন এদের ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না। এদের এখন কী হবে? এদের জন্য কোন পথ খোলা আছে?' ধর্মরাজ নির্বাক চেয়ে রইলেন।

লেখক হিসেবে ভৈরাপ্পার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল পরিবেশ সৃষ্টিতে নৈপুণ্য, জীবন্ত চরিত্র নির্মাণ, নানা চোখ দিয়ে কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে দেখা ইত্যাদি।

অন্যান্য কথাকারদের মধ্যে যাঁরা বর্তমান সময়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন পি. লঙ্কেশ (১৯৩৫), কে. পি. পূর্ণচন্দ্র তেজস্বী (১৯৩৮), বীণা শান্তেশ্বর (১৯৪৫), দেবানুর মহাদেব (১৯৪৯), বোলওয়ার মহম্মদ কুনহি (১৯৫১), কুম. বীরভদ্রপ্পা (১৯৫২) প্রমুখ।

৫.৬ অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি ভুল ও কোনটি ঠিক নির্ধারণ করুন।

(ক) কন্নড় ছোটগল্পের পথিকৃৎ হলেন পঞ্জ।

(খ) শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের জন্মভূমির নাম মাস্তি।

(গ) 'মরালি মন্নিগে' উপন্যাসটি অসহযোগ আন্দোলনের পর্বে লেখা।

(ঘ) অনন্তমূর্তির 'সংস্কার' উপন্যাসটির শেষে প্রাণেশাচার্য এক গভীর আত্মবিশ্বাসে তার গ্রামে ফেরে।

(ঙ) ভৈরাপ্পার প্রথম উপন্যাস 'বংশবৃক্ষ'।

২। পাঁচটি বাক্যের মধ্যে টীকা লিখুন।
'কন্নড়' শব্দের উৎস।

৩। দশটি বাক্যের মধ্যে উত্তর দিন।
কন্নড় কথাসাহিত্যের আদিপর্ব।

৪। পঁচিশটি বাক্যের মধ্যে লিখুন।
কন্নড় উপন্যাসে জাত-বর্ণ সমস্যা।

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

(১) মুগালি, আর. এস. : কন্নড় সাহিত্যের ইতিহাস (অনুবাদ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য), সাহিত্য অকাদেমি।

একক ৬ □ গুজরাতি

গঠন

৬.১ প্রস্তাবনা
৬.২ গুলাবদাস ব্রোকার
৬.৩ পান্নালাল নানালাল প্যাটেল
৬.৪ রঘুবীর চৌধুরী
৬.৫ অনুশীলনী
৬.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ প্রস্তাবনা

সংস্কৃত থেকে শৌরসেনী প্রাকৃত এবং গৌরজার অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে ১২০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে গুজরাতি ভাষা নিজস্ব চরিত্র পায়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে 'গুজরাত' নামে অঞ্চলটি চিহ্নিত হওয়ার পরেই ভাষাটি গুজরাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

আধুনিক গুজরাতি সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার বেশ একটা যোগ আছে। এই যোগটি প্রথমে তৈরি হয় বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) শহরের মাধ্যমে। ১৮২০ সালে সুরাটে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিস্টান মিশনারীদের উৎসাহে। বোম্বাইয়ের বছর দুয়েক পরে সুরাটে একটি ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে বোম্বাই এডুকেশন সোসাইটি যেখানে টাকা দিয়ে 'নেটিভদের' ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা ছিল। ১৮২০ সালে শিক্ষার জন্য গুজরাতি বইয়ের প্রয়োজন হয়। তখনই রণছোড়দাস গিরধরদাসের (১৮০৩-৭৩) সাহায্যে সেই কাজের সূত্রপাত। ধীরে ধীরে পশ্চিমের সঙ্গে গুজরাতি সমাজের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়। কিছুটা তারই প্রভাবে বরোদা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮২ সালে এবং ভাওনগর শ্যামলদাস কলেজ ১৮৮৫ সালে।

প্রথম গুজরাতি উপন্যাসটি অবশ্য লেখা হয়ে গেছে তার আগেই, ১৮৬৬ সালে। নন্দশঙ্কর মেহতা (১৮৩৫-১৯০৫) 'করংঘেলো' উপন্যাসটি লিখলেন গুজরাতের শেষ হিন্দু রাজা কর্ণ বাঘেলার জীবন অবলম্বন করে। স্যর ওয়াল্টার স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসের রীতিতে লেখা এই কাহিনী। পরের বছর মহীপত্রম নীলকান্ত (১৮১৯-৯১) লিখলেন একটি সামাজিক উপন্যাস 'সাসুবহুনি লড়াই'। তিনি দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসও লেখেন। আরো বেশ কয়েকজন উপন্যাস লেখায় হাত দিলেন। মারাঠি ও বাংলা থেকে উপন্যাস অনুবাদেও উৎসাহ দেখা গেল। তবে গোবর্ধনরাম মাধবরাম ত্রিপাঠীর (১৮৫৫-১৯০৭) চার খণ্ডে লেখা 'সরস্বতীচন্দ্র' (১৮৮৭-১৯০১) গুজরাতি কথাসাহিত্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল। এক ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনীর মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় পঞ্চাশ বছরের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনের এটি একটি প্রামাণ্য দলিল। এর পরবর্তী পর্যায়ে এলেন কানাইলাল মানেকলাল মুন্সী (১৮৮৭-১৯৭১)। তাঁর প্রতিষ্ঠা মূলত ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্য যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'গুজরাতনো নাথ' (১৯১৭), 'রাজাধিরাজ' (১৯২২) এবং 'জয় সোমনাথ' (১৯৪৪)।

ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক সভ্যতারও চাপ পড়েছিল গুজরাতি জীবনে। ধর্মান্তর থেকে শুরু করে সাহেবদের অন্ধ অনুকরণের প্রতিযোগিতা দেখা গিয়েছিল সমাজের নানা স্তরে। এরই এক পর্বে এলেন

মহাত্মা গান্ধী। ১৯২৫ থেকে ১৯৫১ পর্বটিকে গুজরাতি সাহিত্যে গান্ধীপর্ব বলা হয়। শুধু বিষয় নয়, পরিবর্তন এল কথনরীতিতেও। মাটি ও মানুষের কথা এল। সাহিত্যে গুরুত্ব পেল গ্রামজীবন, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠল। এই পর্বের একজন অন্যতম কথাকার রমণলাল দেশাই। তাঁর 'জয়ন্ত' (১৯২৫), 'কোকিলা' (১৯২৮), 'দিব্যচক্ষু' (১৯৩২), 'গ্রামলক্ষ্মী' (চার খণ্ড, ১৯৩৩-৩৭) ইত্যাদি উপন্যাসে স্বাধীনতা সংগ্রাম, অস্পৃশ্যতা, নারীদের উন্নতি, গ্রাম-গঠন, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় জায়গা করে নিল। পরবর্তী পর্বে তিনি মার্কসবাদী দর্শনে আকৃষ্ট হন এবং 'ছায়ানট' (১৯৪১), 'ঝঞ্ঝাবাত' (১৯৪৮-৪৯), 'প্রলয়' (১৯৫০) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লেখেন। এই পর্বের আর একজন উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক হলেন জাভের চাঁদ মেঘানী (১৮৯৬-১৯৪৭)। তিনি তাঁর ন-টি উপন্যাসে গুজরাতের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্টের এক মর্মস্পর্শী বিবরণ দেন।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাঁচ-ছ দশকের যে তিনজন কথাসাহিত্যিকের ওপর আমরা পরবর্তী আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে পারি তাঁরা হলেন গুলাবদাস ব্রোকার (১৯০৯), পান্নালাল নানালাল প্যাটেল (১৯১২-৮৮) এবং রঘুবীর চৌধুরী (১৯৩৮)।

৬.২ গুলাবদাস ব্রোকার

গুলাবদাসের জন্ম গুজরাতের পোরবন্দর অঞ্চলে। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা যদিও পরে বোম্বাই থেকে ইস্কুলজীবনের শেষ পরীক্ষা দেন। ১৯৩০ সালে সুখ্যাত এলফিনস্টোন কলেজে ভর্তি হন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে ১৯৩২-৩৩ সময়পর্বে ষোল মাস জেলে কাটান। জেলে থাকার সময়েই তাঁর প্রথম গল্প লেখা যদিও প্রকাশিত হয় বেশ কিছুকাল পরে। জেল থেকে বেরিয়ে ব্রোকার পারিবারিক পেশা শেয়ার বাজারের দালালির কাজে যুক্ত হন। পাশাপাশি লেখা চলতে থাকে। একদিন সাহস সঞ্চয় করে ঐ সময়ের এক প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক রামনারায়ণ পাঠকের কাছে একটি গল্প পড়াতে নিয়ে যান। রামনারায়ণ শুধু গল্পটি পছন্দই করেননি, তাঁর নিজের মাসিক পত্রিকা 'প্রস্থান'-এ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তারপর আর পেছন ফিরে তাকাননি গুলাবদাস। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বারোটি গল্প সংগ্রহ, দু-খণ্ডে 'সত্য গল্প', দুটি পূর্ণাঙ্গ ও দুটি একাঙ্ক নাটক, একটি কবিতা পুস্তক, সাহিত্য-সমালোচনামূলক তিনটি গ্রন্থ, দুটি স্মৃতিকথা, একটি ভ্রমণকাহিনী এবং তিনটি অনুবাদ গ্রন্থ।

গুলাবদাসের উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলনগুলির মধ্যে রয়েছে 'লতা আনে বিজি ভাতো' (লতা ও অন্যান্য গল্প, ১৯৩৮), 'বসুন্ধরা আনে বিজি ভাতো (পৃথিবী ও অন্যান্য গল্প, ১৯৪০), 'সূর্য' (১৯৫০) ইত্যাদি। গুলাবদাস একজন দক্ষ গল্পকথক। তাঁর গল্পগুলির প্রেক্ষিত হল শহরের মধ্য-উচ্চবিত্ত জীবন যা তিনি গভীরভাবে জানতেন। বাইরের থেকে মানুষের মনের অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ তাঁর গল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাস্তবতা এবং আদর্শের এক জবুরি রসায়নও মেলে তাঁর গল্পে। গুলাবদাসের গল্প বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট লেখক ও সমালোচক কে. এম. মুন্সি লিখেছিলেন, 'গুলাবদাসের কাছে কোনো পরিস্থিতিই সাধারণ নয় এবং কোনো চরিত্রই তাঁর সৃষ্টির কাছে অসম্পূর্ণ নয়। তাঁর ক্ষমতা ছিল সবকিছুকেই অর্থবান করে তোলার।' তাঁর বিবরণের দৃশ্যময়তাও উল্লেখযোগ্য। 'ঝরিয়া' গল্পের প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ গল্পকার হিসেবে তাঁর বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট লক্ষ্য করতে পারি :

> নীল শাড়িটি যেন আকাশে উড়ছে। মনে হচ্ছিল সূর্য এবং চাঁদ শাড়িটির দুটি প্রান্তকে চলনে সাহায্য করছে। তার মাঝে কারো মুখের গোলাপী দীপ্তি যেন ঐ কাপড়ের টুকরোতে ঢাকা হয়েছে।
>
> অজিত হাসল। নিজের মনে মনে বলল, 'আমি কি কবি না অন্য কিছু হয়ে যাচ্ছি?' সে সকালের কাগজের ওপর মন বসাতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। তার চোখ আবার পথভ্রষ্ট হল এবং সে মুখ তুলল। আকাশে উড়ন্ত নীল শাড়ি তার দিকে

এগিয়ে এল। শাড়িটি ঢেকে রেখেছিল একটি সুন্দর গোলাপী মুখ।

অজিতের হাত থেকে কাগজটি পড়ে গেল। সে চোখ দুটো খানিক খোলা-বন্ধ করল। ঘসলোও। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল তার দৃষ্টিভ্রম ঘটছে কিনা। ইতিমধ্যে গোলাপী মুখ সামনে এসে হাজির। বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। বলব?'

(অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

ঐ নীল ও গোলাপী রং অজিতকে আনন্দ ও বিপর্যয়ের এক অভিজ্ঞতায় পৌঁছে দেয় গল্পের শেষে। ঐ শাড়িও সেখানে এক জরুরি ভূমিকা পালন করে।

৬.৩ পান্নালাল নানালাল প্যাটেল

পান্নালাল নানালালের জন্ম গুজরাত ও রাজস্থানের সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে। ইস্কুল শিক্ষার সুযোগ হয়েছিল সামান্যই। জীবিকার রদবদল ঘটেছে বারেবারে—কখনো জলের পাইপের মিস্ত্রি, কখনো বিদ্যুৎ দপ্তরের তেলকর্মী, কখনো আবার বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক। এর ভেতরেই লেখাপত্র এবং একসময় সাহিত্যের জন্য সাহিত্য অকাদেমি, জ্ঞানপীঠ ইত্যাদি পুরস্কার লাভ।

তাঁর প্রখ্যাত উপন্যাস 'মালেলা জীবা' (দুটি আত্মার মিলন) প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। উপন্যাসটিতে রয়েছে উত্তর-পশ্চিম গুজরাতের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ ছবি। কাহিনীর কেন্দ্রে আছে জীবী নামের এক ক্ষৌরকার মেয়ের সঙ্গে কাণজী নামের এক কৃতি পরিবারের যুবকের প্রেমের কথা। কিন্তু দুই ভিন্ন জাতের বিয়ে সমাজ অনুমোদন করে না। সমাজকে অস্বীকার করার মনোবলও কাণজীর নেই। শেষে বন্ধু হীরার সঙ্গে পরামর্শ করে সে নিজের গ্রামের এক ক্ষৌরকারের সঙ্গে জীবীর বিয়ের ব্যবস্থা করে যাতে নিত্যদিন তার প্রেমিকাকে দেখতে পায়। কিন্তু বিয়ের পর সামাজিক পরিবেশের কারণে জীবীর সঙ্গে কাণজী তেমন সম্পর্ক রাখতে পারে না কিন্তু জীবীর স্বামী সন্দেহ করে যে তার স্ত্রীর সঙ্গে কাণজীর কোনো একটা সম্পর্ক আছে। সেই সন্দেহ থেকে সে জীবীর ওপর অত্যাচার চালায়। অত্যাচারের খবর কাণজীরও কানে যায় কিন্তু সে অসহায়। এই পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে সে গ্রাম থেকে দূরে চলে যায়। জীবীর দুঃখ তাতে আরো বাড়ে। সে খাবারে বিষ মেশায় আত্মহত্যা করার জন্য। কিন্তু তার স্বামী ভুল করে সেটি খেয়ে ফেলে। গ্রামের মানুষজনের ধারণা হয় জীবী সচেতনভাবে তার স্বামীকে মেরে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত জীবী উন্মাদ হয়ে যায়। কাহিনীর শেষে কাণজী ফিরে আসে এবং তার ভুল সংশোধনের জন্য জীবীকে নিয়ে শহরে চলে যায়।

কাহিনীর বয়ান যেমন ঘন, চরিত্র নির্মাণ তেমনই জীবন্ত। কাহিনী বিবরণও ছবির মতো। উপন্যাসটির প্রথম অনুচ্ছেদটি হল :

> কাভারিয়া পাহাড়ের তরাইয়ে জন্মাষ্টমীর মেলা বসিয়াছিল। দেবতা স্নানের জন্য নূতন জলে ভরা বৃষ্টি দুপুরে থামিয়া গিয়াছে। চলন্ত পাহাড়ের মতো মেঘ পুব দিকে চলিয়াছে। সূর্য পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করিতেছে।
>
> (অনুবাদ প্রিয়রঞ্জন সেন)

'মানবীনি ভাবায়' (১৯৪৭) উপন্যাসের বিষয় কালু ও রানুর প্রেম। কিন্তু সে প্রেম জড়িয়ে আছে মাটি ও শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিনের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে। এক ঊষর মৃত্তিকার বুকে ফসল ফলানোর জন্য মানুষের নিরন্তর প্রচেষ্টা উপন্যাসে ফিরে আসে বারে বারে। দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, অনাহারী মানুষজন করুণার দান গ্রহণ

করতে হাত পাতে। এক নিদারুণ জীবনযাপনের কাহিনী এটি যার তুলনা গুজরাতি সাহিত্যে নেই বললেই চলে। তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'ন্যাশনাল সেভিংস', 'লাখ চোরাশি', 'রং ভাতো' ইত্যাদি।

৬.৪ রঘুবীর চৌধুরী

রঘুবীর চৌধুরী গুজরাতের মেহসানা জেলার বাপুপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দি ও সংস্কৃত সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পূর্বরাগ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪-এ। উপন্যাসটি অনেকটাই আত্মজীবনী মূলক। তাঁর 'অমৃতা' উপন্যাসটি দু-বছর পর প্রকাশিত হয়। ত্রিকোণ প্রেমের এই কাহিনীতে দুই পুরুষ বন্ধুর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে অমৃতাকে। আবার ঐ দুই বন্ধু একে অপরের স্বার্থে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়। উপন্যাসে অস্তিবাদী দর্শনের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

রঘুবীর চৌধুরীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হল তিন খণ্ডের 'উপর্বাস কথাত্রয়ী'। ঔপন্যাসিকের স্বভূমি এবং ব্যক্তিজীবনের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে উপন্যাসটিতে। তিন খণ্ডের কাহিনীর প্রথম পর্ব ১৯৪৮-৫২ (উপর্বাস), ১৯৫২-৬০ (সহবাস) এবং ১৯৬০-৭২ (অন্তর্বাস)। সোমপুরা গ্রামের কৃষিজীবী পিঠু ভগৎকে কেন্দ্র করে এই আখ্যান। পাশাপাশি ছোট ছোট গ্রাম তিম্বা, বদরী, ধেকালিয়া এবং গোকালিয়নকেও কাহিনীকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। লাভজীর আমেদাবাদে থাকার সূত্রে নাগরিক জীবনের জীবনযাত্রাও ধরা পড়েছে। শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভেতর থেকে উঠে এসেছে প্রায় তেরশ পৃষ্ঠার এই ত্রয়ী উপন্যাসে। 'অন্তর্বাস' হচ্ছে বাইরে থেকে মানুষের অন্তর্মুখী যাত্রা। 'সহবাস' হচ্ছে পারস্পরিক সহাবস্থান কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে ভেতরের জীবন (অন্তর্বাস)। কাহিনী গদ্যে সামাজিক ও আঞ্চলিক শব্দের এক উল্লেখযোগ্য ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নারী-পুরুষের সম্পর্কও এই উপন্যাসের একটি জরুরি বিষয়।

রঘুনাথ চৌধুরীর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে আছে ঐতিহাসিক কাহিনী 'রুদ্রমহল' (১৯৭৮), মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস 'শ্রাবণ রাতে' (১৯৭৮) প্রভৃতি। তাঁর গল্প-সংকলনের মধ্যে রয়েছে 'আকস্মিক স্পর্শ' (১৯৬৮), 'বাহার কৈ ছে' (১৯৭৩) ইত্যাদি।

গুজরাতি কথাসাহিত্যে বর্তমান সময়ে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন সুরেশ জোশী, মধু রায়, চন্দ্রকান্ত বক্সী, হারীন্দর দাভে প্রমুখ।

৬.৫ অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলির মধ্যে ঠিক ও ভুল নির্ধারণ করুন।

(ক) আধুনিক গুজরাতি সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার যোগ আছে।

(খ) প্রথম গুজরাতি উপন্যাস লেখা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে।

(গ) গুজরাতি ভাষার অন্যতম কথাকার হলেন মহাত্মা গান্ধী।

(ঘ) কাণজী চরিত্রটি রয়েছে রঘুবীর চৌধুরীর 'অন্তর্বাস' উপন্যাসে।

(ঙ) পান্নালাল নানালাল প্যাটেলের 'মানবীনি ভাবায়' উপন্যাসটি প্রিয়রঞ্জন সেন বাংলায় অনুবাদ করেন।

২। পাঁচটি বাক্যে টীকা লিখুন।
মহাত্মা গান্ধী ও গুজরাতি সাহিত্য।
৩। দশটি বাক্যের মধ্যে আলোচনা করুন।
'মালেলা জীবা'।
৪। পঁচিশ থেকে তিরিশটি বাক্যের মধ্যে লিখুন।
গুজরাতি ছোটগল্প।

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

(১) প্যাটেল, পান্নালাল নানালাল : মালেলা জীবা (বাংলা ভাষান্তর প্রিয়রঞ্জন সেন, সাহিত্য অকাদেমি)।
(২) এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইন্ডিয়ান লিটরেচর (খণ্ড ১-৬), সাহিত্য অকাদেমি।

একক ৭ ❑ তামিল

গঠন

৭.১ প্রস্তাবনা
৭.২ ইন্দিরা পার্থসারথি
৭.৩ অশোকমিত্রণ
৭.৪ জয়কান্তন
৭.৫ অনুশীলনী
৭.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ প্রস্তাবনা

তামিল ভাষাভাষীরা তামিলনাড়ু এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য ছাড়াও ছড়িয়ে রয়েছেন শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়। এর মধ্যে ভারতবর্ষ বাদ দিলে শ্রীলঙ্কার তামিলভাষীরা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে পশ্চিমী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তামিলের সংযোগ গড়ে ওঠে। আধুনিক তামিল ছোটগল্পের সূত্রপাত ১৮৫৪ সালে জোসেফ বেসচির 'পরমার্থ গুরু কথাই' (গুরু পরমার্থের গল্প) সংকলনটির মধ্য দিয়ে। বইটিতে লোককথা থেকে শুরু করে অন্যান্য কাহিনিও রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য ছোটগল্পকাররা হলেন চন্দ্রবর্ণম পিল্লাই (কথা চিন্তামণি, ১৮৭৫), বীরস্বামী চেত্তিয়ার (বিনোদ রসমঞ্জরী, ১৮৭৭) এবং সেলভা কেশব রায় ('অভিনব কথইকল')। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু-দশকে সভাপতি মুদালিয়ার, রামানুজালু নইড়ু, নমশিব মুদলিয়ার, ভি. ভাগবন্থ রাও, জে. এস. বৈদ্যনাথ আয়ার, সুব্রমণিয় ভারতী প্রমুখেরা বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন।

তামিল ভাষায় প্রথম উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে, ময়ূরাম বেদনায়াকাম পিল্লাই (১৮২৬-৮৯) লিখিত 'প্রদপ মুদলিয়র চরিথিরম'। লেখক পিল্লাই বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতাকে বিবৃত করার মধ্য দিয়ে তিনি তামিলদের পাল-পার্বণে পূর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছবি তুলে ধরেন। কোথাও কোথাও নিচু স্বরে বিদ্রূপও করেন। তামিল ভাষায় দ্বিতীয় উপন্যাসটি লেখেন শ্রীলঙ্কাবাসী সিথিলাববাই মরিকর বা মহম্মদ কাসিসম মারিকর। মুসলিম জীবনের পরিচয় মেলে উপন্যাসটিতে যেখানে মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষের কথাও রয়েছে। ঐ পর্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল থিরুচীরপূরম এস. ভি. গুরুস্বামী শর্মার লেখা 'প্রেমকলাবত্যম'। ১৮৮৮ সালে লেখা, ১৮৯৩-তে প্রকাশিত এই উপন্যাসে লেখক তাঁর গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারগুলির সমস্যা, বিমাতার আচরণ, গ্রামবাসীদের লোকগীতি ইত্যাদি বিষয় আঞ্চলিক ভাষায় তুলে ধরেন। ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম ঐতিহাসিক রোমান্স, শ্রীলঙ্কার লেখক সরবন মুথু পিল্লাইয়ের 'মোহনাংকি'। রোমান্স থেকে বাস্তবতার পথে পা দেন রাজম আয়ার ('কমলামবল চরিথিরম'), এ. মাধবায় ('পদ্মাবতী চরিথিরম') ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীতে যাঁরা তামিল কথাসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভি. ভি. এস. আয়ার (১৮৮১-১৯২৫), কলকী (১৮৯৯-১৯৫৪), এম. এস. কল্যাণসুন্দরম 'মুনসী' (১৯০১-৮৯), কু. পা. রাজাগোপালন (১৯০২-৪৪), পুদুমাই পিথন (১৯০৬-৪৮), কা. না. সুব্রমনিয়ম (১৯১২-৮৮), আর. সংমুগসুন্দরম (১৯১৮-

৭৭), টি. এম. সি. রঘুনাথম (১৯২৩), কু. আজহাগিরিস্বামী (১৯২৩-৭০), ইন্দিরা পার্থসারথি (১৯৩০), সুন্দর রামস্বামী (১৯৩১), ডি. জয়াকান্তন (১৯৩৪), নীলা পদ্মনাভন (১৯৩৮), অশোকমিত্রণ (১৯৩৯) প্রমুখ। এই আলোচনা এই সময়ের তিনজন বিশিষ্ট কথাকারকে নিয়ে—ইন্দিরা পার্থসারথি, অশোকমিত্রণ এবং জয়াকান্তন।

৭.২ ইন্দিরা পার্থসারথি

রঙ্গনাথন (ছদ্মনাম 'ইন্দিরা') পার্থসারথির জন্ম কুম্বাকোনমের একটি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পরিবারে। ঐ এলাকাতেই ইস্কুল ও কলেজ শিক্ষা। স্নাতকোত্তর পাঠ আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পি-এইচ. ডি. করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করেছেন দিল্লি, পোল্যান্ড, কানাডা এবং হল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। প্রথম গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে এবং প্রথম উপন্যাস ১৯৬৮-তে। ১৯৭৭ সালে 'কুরুথিপ্পুনাল' (রক্তবন্যা) উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত গল্প-সংকলন এবং উপন্যাসের সংখ্যা কুড়িটিরও বেশি। তা ছাড়াও নাটক এবং জীবনীপুস্তকও লিখেছেন।

'কুরুথিপ্পুনাল' উপন্যাসটির সময়কাল বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশক। বিষয় 'তামিলনাড়ুর ধান ভাণ্ডার' বলে খ্যাত তাঞ্জাউর জেলার কীলা ওয়েনমনি গ্রামের কৃষক এবং খেতমজুরদের সঙ্গে জোতদারদের সংঘর্ষ। তার ভেতর জাতপাতেরও নানা চোরা স্রোত। উপন্যাসের যেভাবে লেখা তা এই রকম :

> গ্রামের তিন-চতুর্থাংশ জমি চারটি পরিবারের হাতে। সবাই জানে জমির উচ্চসীমা নির্ধারণ আইন শুধু নাম-কে-ওয়াস্তে। আর্থিক দিক থেকে মজুরদের এবং গ্রামের অন্য লোকেদের মধ্যে তফাৎ নেই। কিন্তু গ্রামের অন্য লোকেরা মজুরদের চেয়ে উঁচু জাতের বলে মনে মনে গর্ব পোষণ করে। ওদের এই দুর্বলতাকে নায়ডুর মতো পয়সাওয়ালারা নিজেদের কাজে লাগায়। ওদের দুর্ভাগ্য ওরা পয়সাওয়ালাদের এ কৌশলটা বোঝে না।
>
> (অনুবাদ সুব্রমণিয়ন কৃষ্ণমূর্তি)

তবু লড়াই হয়। সেখানে শিক্ষক রামায়া, ডাক্তার কনকসবাই, উকিল সুন্দরবদনম, এক সময়ের দুই দিল্লিবাসী তামিল বন্ধু শিব ও গোপাল প্রমুখের প্রগতিশীল ভূমিকা আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে প্রান্তিক মানুষের সম্পর্কের মধ্যেও নানা টানাপোড়েন।

> মনুষ্য সমাজের মানসিক দৌর্বল্য এই যে কোনো আন্দোলন থেকে কিছু সুবিধে পেয়ে গেলে সেই আন্দোলনকেই স্থায়ী করে সে সুবিধের আরামে বিভোর হয়ে থাকতে চায়। ...শহরে বিচ্ছিন্নভাবে যে আন্দোলনগুলি ঘটে থাকে ওগুলিকে বিপ্লব মনে করা ভুল। সাময়িকভাবে মজুরি বাড়াবার উপায়ই বিপ্লব, এই ভুল ধারণা শহুরে মজুরদের মধ্যে প্রচার করে স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতারা বিপ্লবের বিকৃতি ঘটিয়েছে।

অন্যদিকে জোতদার-রাজনৈতিক নেতা-পুলিশের ভেতর সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয় এবং তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে খেতমজুর, প্রান্তিক চাষী এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষজনের ওপর। বিয়াল্লিশজন হরিজন খেতমজুরকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। ১৯৬৯ সালের সেই ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিতও হয়েছিল। এই নিয়েই ইন্দিরা পার্থসারথির বর্তমান উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। উপন্যাসের শেষে মৃত্যুর হাহাকার। কিন্তু এরই মধ্যে মধ্যবিত্ত যুবক গোপাল যে শহুরে জীবনের সমস্ত প্রাপ্তিকে তুচ্ছ করে গ্রামে চলে এসেছিল ছ-বছরের কিছু আগে সে হরিজনপল্লীর আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে শোষিত মানুষের বৃহত্তর লড়াইয়ের অঙ্গীকার গ্রহণ করে।

ইন্দিরা পার্থসারথির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'তন্দির ভূমি' (প্রতারক ভূমি), 'সুদন্দির ভূমি' (মুক্ত ভূমি), 'যীশুবীন থোজারগল' (যীশুর সঙ্গীরা), 'থিরাইগালুক্কু অপ্পাল' (অবগুণ্ঠনের ভেতর থেকে) ইত্যাদি। এইসব লেখার মধ্যে সামাজিক অবক্ষয়, প্রবঞ্চনা, নারীর আত্মচেতনা ইত্যাদি নানা বিষয় উঠে এসেছে। নিজের লেখা নিয়ে একসময় ইন্দিরা পার্থসারথি মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রচলিত ব্যবস্থা সংস্কার কিংবা নতুন

ব্যবস্থা গড়ে তোলা বিষয়ে আমার কোনো প্রচেষ্টা নেই—আমি শুধু সমালোচনা করতে চাই। পুরনো বাস্তবতাকে সরিয়ে আমি তেমনই গোঁড়া, দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং সমাধান নির্ভর কোনো মত প্রতিষ্ঠা করতে চাই না। আমার প্রচেষ্টা নঞর্থক— সব প্রশ্ন, কোনো উত্তর নেই। অধিবিদ্যা হচ্ছে কুয়াশাচ্ছন্ন বিভ্রম, সত্য হচ্ছে যা ফলদায়ক, মূল্যায়নধর্মী সিদ্ধান্ত হচ্ছে খারাপ পদন্বয়, স্বাধীনতা হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক অনিশ্চয়তা।' শুধু কথাসাহিত্যিক হিসেবে নয়, নাট্যকার হিসেবেও ইন্দিরা পার্থসারথি বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর লেখার মধ্যে সবসময় এক দায়িত্বশীল সামাজিক মানুষ চোখে পড়ে।

৭.৩ অশোকমিত্রণ

জে. ত্যাগরাজন, যিনি অশোকমিত্রণ নামে পাঠকমহলে পরিচিত, সেকেন্দ্রাবাদের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বেড়ে ওঠেন হায়দারাবাদের নিজামের রাজত্বকালে। শৈশব ও কৈশোরে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার দেখেছেন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে, অন্যদিকে হায়দারাবাদকে ভারতভুক্তির পর্বে লাঠি-বন্দুকের সামনে সাধারণ মানুষের আতঙ্কেরও সাক্ষী থেকেছেন। ১৯৫২ নাগাদ মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) চলে যান এবং তারপর বছর চৌদ্দ যুক্ত থাকেন জেমিনি ফিল্ম স্টুডিওর সঙ্গে। ১৯৬৬ সাল থেকে পূর্ণ সময়ের লেখক। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস দশটিরও বেশী, প্রকাশিত গল্প-সংকলনও তাই। ছোট উপন্যাসেরও দুটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। এর পাশাপাশি খান চারেক সমালোচনা গ্রন্থ। দেশ-বিদেশের নানা পুরস্কার এবং ফেলোশিপে সম্মানিত হয়েছেন।

অশোকমিত্রণের লেখার মধ্যে নাটকীয়তার জায়গা নেই বললেই চলে। খুবই নিচু স্বরে মানুষের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশার কথা বলা আছে সেখানে। সামাজিক জীবনেরও অনুপুঙ্খ ছবি ধরা থাকে। অশোকমিত্রণের পঁচিশটি গল্পের একটি সংকলনের ভূমিকায় বিশিষ্ট সমালোচক এ.ভি. ধানুশকোডি লিখেছিলেন, 'অশোকমিত্রণের লেখায় রয়েছে জীবনের সত্যিকারের এক প্রতিচ্ছবি। সৎ এবং গভীর সেই পাঠে মানুষের ইচ্ছে, ভয়, রাগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাফল্য, ব্যর্থতা, আনন্দ, দুঃখ ধরা থাকে। তাঁর চরিত্রগুলি যা করে বা তাদের জীবনে যা ঘটে সেটি গুরুত্বপূর্ণ—কিন্তু তারা যা, বাস্তবে তারা যেমন, সেটিই জীবনকে ঠিক প্রেক্ষিতে চিনিয়ে দেয়।

অশোকমিত্রণের সুখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'কর-ইন্ত নিঝলকল' (দ্রবীভূত ছায়া), 'তন্নির' (জল) , 'পতি নেত্তাভাতু অতচক্কোদু' (অষ্টাদশ সমান্তরাল) ইত্যাদি। 'করইন্ত নিঝলকল' উপন্যাসটি একটি চলচ্চিত্র নিয়ে যা সকলের প্রচেষ্টার পরেও শেষ হতে পারে না। এর মধ্যে ফুটে ওঠে মানুষের জীবনের গভীর, তুচ্ছ, হাস্যকর এবং কখনো বেদনাদায়ক নানা অনুভূতি। 'তন্নির' উপন্যাসে ফুটে ওঠে মাদ্রাজ শহরের খরাকালীন এক পরিস্থিতি। অনাটকীয় এক বিবরণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেন মানুষজনের দৈনন্দিনের কাহিনী। জলের জন্য কলসী ও বালতি হাতে সারিবদ্ধ দাঁড়ানো, জলের এক উৎস থেকে অন্য উৎসে যাওয়া, ভোর রাতে তাড়াতাড়ি টিউবওয়েলের কাছে জলের প্রয়োজনে ছোটা, মান-সম্মানের কথা ভুলে একপাত্র জলের জন্য আবেদন—এমন নানা কিছুর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা এবং তারই পাশাপাশি সহমর্মিতাও প্রকাশ পায়। 'পতি নেত্তাভাতু অতচক্কোদু' উপন্যাসে হায়দারাবাদকে ভারতভুক্তির পর্বে জনজীবনের আতঙ্কের ছবি মেলে। হিন্দু, মুসলমান এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে যে শহর তা দ্রুত বদলে যায়। চন্দ্রু নামের এক যুবকের চোখ দিয়ে ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রুকে দাঙ্গাবাজ ভেবে একটি মেয়ে তার শরীর এগিয়ে দেয় যাতে পরিবারের বাকি মানুষজন রক্ষা পায়।

উপন্যাস ছাড়াও অশোকমিত্রগণের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে জীবনের নিত্যদিনের সুখদুঃখের কথা। পড়তে পড়তে বোঝা যায় অশোকমিত্রণ জীবনকে

কতখানি সূক্ষ্মতায় ধরতে চান। যেমন 'সুন্দর' গল্পটি শুরু হয় এইভাবে :

> যা হয় হোক, আমরা ভাবলাম, একটা গাইগরু অবশ্যই কিনব। অনেক মোষ পোষা হল, সহ্যের সীমা শেষ হল। একটি গরু এলে আমাদের ভাগ্য ফিরবে এবং বাড়ির পেছনটা ঝলমলে হয়ে উঠবে।
>
> মোষগুলো যে আমরা আদর করে এনেছি এমন নয়। কোনো এক রহস্যজনক কারণে একটা আমাদের ঘরে চলে এসেছিল। ভেবেছিলাম সামান্য কদিনের জন্যে থাকবে। কিন্তু থেকেই গেল। যখন দুধ দেওয়া বন্ধ করল তখন আমরা অন্য একটা দুধের মোষ কিনলাম। তারপর দুটোই যখন দুধ দেওয়া বন্ধ করল, তৃতীয়টা কেনা হল।
>
> (অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

অশোকমিত্রণ এভাবেই আলগা চালে জীবনের কাহিনী শুনিয়ে যান। কেমন স্বতঃস্ফূর্ততায় জীবন এগিয়ে চলে তারই ইঙ্গিত যেন গল্পটিতে।

তাঁর অন্যান্য প্রসিদ্ধ গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'গান্ধি', 'দুই নারী', 'শরীর ও আত্মা', 'এক পেয়ালা কফি', 'বাবা ও ছেলে', 'অভিশাপ' ইত্যাদি।

৭.৪ জয়কান্তন

কুদ্দালোরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জয়কান্তনের জন্ম। বারো বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েন এবং ঘুরতে ঘুরতে একসময় কমিউনিস্ট পার্টির মাদ্রাজ দপ্তরে এসে হাজির হন। তারপর ওটিই তাঁর বাড়ি এবং ইস্কুল। পার্টি তাঁকে কম্পোজের কাজ শেখায়, ধীরে ধীরে লেখাতেও হাত পাকে। এর পাশাপাশি দেওয়ালে পোস্টার মারা, মাঠে-ময়দানে সমাবেশের আয়োজন ইত্যাদি কাজেও যুক্ত হন। ইস্কুলে পড়াশোনার সুযোগ না ঘটলেও মোহন কুমারমঙ্গলম, জীবনান্দম, বি. সি. লিঙ্গাম প্রমুখের সংস্পর্শে ভারতীয় ইতিহাস এবং নানা দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন। ঐ সময়েই লেখালেখির শুরু। ১৯৫৪ সালে নিজের গল্পসংগ্রহের অক্ষর-বিন্যাস করেছিলেন নিজেই। তারপর কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তর ছেড়ে চলচ্চিত্রের জগতে প্রবেশ করেন। পাশাপাশি চলতে থাকে লেখালেখি। লেখক জীবনের প্রথম পঁয়ত্রিশ বছরে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা চল্লিশের কাছাকাছি, গল্পের সংখ্যা প্রায় দুশো, পনেরোটির মতো প্রবন্ধসংগ্রহ এবং বেশ কিছু অনুবাদ গ্রন্থ। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান ১৯৭২ সালে, সোভিয়েত দেশ নেহরু সম্মান ১৯৭৮-এ।

জয়কান্তনের একাধিক গল্প-উপন্যাসের বিষয় হল সামাজিক বর্ণাশ্রম প্রথা, যা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ভেতর প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পরিবর্তনের ছাপও লক্ষ করা যায়। 'ওরু পকলনেরপ প্যাসেঞ্জার ভান্দি' (যাত্রী ট্রেনে একদিন) গল্পে এক ব্রাহ্মণ মহিলা মৃত্যুর সময় তার সন্তানকে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বৃদ্ধের হাতে অর্পণ করে বড়ো করে তোলার জন্য এবং বৃদ্ধকে অনুরোধ করে মহিলার সকল পারলৌকিক কর্ম করার জন্য। নারী-পুরুষ সম্পর্ক জয়কান্তনের কথাসাহিত্যের আর একটি প্রিয় বিষয়। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত 'কিছু মুহূর্তে কিছু মানুষ' উপন্যাসটিতে এই বিষয়টিই বেশ বড় প্রেক্ষিতে ধরা পড়ে। পরে এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব 'গঙ্গা কোথায় যাচ্ছে?'। আগের সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকে গঙ্গা এক সুস্থ পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করে তার সঙ্গে যে তার জীবনকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। 'সুন্দর কাণ্ডম' উপন্যাসে এসেছে নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের প্রসঙ্গ। নারীর আত্মমর্যাদার প্রশ্নও জয়কান্তনের গল্পে বারেবারে আসে। 'পিণক্কু' (প্রতিক্ষেপ) গল্পে এক বৃদ্ধা তার স্বামীর সঙ্গে যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন করে। কৈলাসম পিল্লাই তার স্ত্রী ধর্মমবলকে শোনায় বদলীর চাকরিতে অনেক মেয়েই তার জীবনে এসেছে। ধর্মমবল চমকে ওঠে কারণ সে তো তার স্বামী ছাড়া কারো কথা ভাবেনি, কারো সঙ্গে রাত কাটায়নি। বোঝে তাকে ঠকিয়েছে তার স্বামী। কৈলাসম বুঝতে পারে না সুদূর অতীতের ঐ ঘটনায় এখন রাগ বা শোকের কি আছে! কিন্তু ধর্মমবল ক্ষমা করতে

পারে না স্বামীকে। তাই মৃত্যুর সময় সে যে দুধ ধর্মমবলের মুখে দেয় তা দাঁত ও ঠোঁটের প্রতিরোধে গাল বেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে।

তামিল আখ্যান সাহিত্যে এছাড়াও যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে আছেন কু. পা. রাজাগোপালন (১৯০২-৪৪) যাঁর ছোটগল্পে নারীদের মনোজগতের উল্লেখযোগ্য পরিচয় মেলে। পুদুমই পিথনের (১৯০৬-৪৮) গল্পে রয়েছে দৈনন্দিনের রূঢ় বাস্তবতা। শানমুগসুন্দরমের (১৯১৮-৭৭) বাইশটি উপন্যাস এবং একটি ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখায় রয়েছে কোয়েম্বাটোর জেলার মানুষজনের দিনযাপনের সুখ-দুঃখের কথা। তাঁর একটি সুপরিচিত উপন্যাস হল 'নাগম্মাল'। কল্কী (১৮৯৯-১৯৫৪) ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। কা. না. সুব্রমণিয়ম (১৯১২-৮৮)-এর গল্প-উপন্যাস নিচু স্বরে লেখা যেখানে দর্শনের একটি বিশেষ মাত্রা রয়েছে। এ-ছাড়াও যাঁদের কথা উল্লেখ করা জরুরি তাঁরা হলেন টি. এম. সি. রঘুনাথন (১৯২৩), কু. অলগিরি স্বামী (১৯২৩-৭০), নীলা পদ্মনাভন (১৯৩৮), সুন্দর রামস্বামী (১৯৩১), রাজম কৃষ্ণন (১৯২৫) প্রমুখ।

৭.৫ অনুশীলনী

১। **নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।**

(ক) আধুনিক তামিল ছোটগল্পের সূচনাপর্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর চারের দশক।

(খ) তামিল ভাষার প্রথম উপন্যাসটির লেখক ময়ূরাম বেদনায়াকাম পিল্লাই।

(গ) 'কুরুথিপ্পুনাল' উপন্যাসটির লেখক সুন্দর রামস্বামী।

(ঘ) অশোকমিত্রণের কথাসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নাটকীয়তা।

(ঙ) জয়কান্তনের উপন্যাসে নারীর সমস্যা একটি জরুরী বিষয়।

২। **পাঁচটি বাক্যে আলোচনা করুন।**

(ক) 'প্রেমকলাবত্যম'।

(খ) জয়কান্তনের উপন্যাসের প্রধান-প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৩। **দশটি বাক্যে আলোচনা করুন।**

'রক্তবন্যা'।

৪। **কুড়ি থেকে পঁচিশটি বাক্যের মধ্যে আলোচনা করুন।**

তামিল উপন্যাসে সামাজিক জীবন।

একক ৮ ❑ পঞ্জাবি

গঠন

৮.১ প্রস্তাবনা
৮.২ নানক সিং
৮.৩ সুরিন্দর সিং নরুলা
৮.৪ কর্তার সিং দুগ্গল
৮.৫ অমৃতা প্রীতম
৮.৬ গুরদিয়াল সিং
৮.৭ অজীত কৌর
৮.৮ অনুশীলনী
৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ প্রস্তাবনা

পঞ্জাবি সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলা হয় গুরু নানক দেব (১৪৬৯-১৫৩৯) থেকে গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৬৬-১৭০৮) পর্বটিকে। মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্য এই পর্বে সংকলিত হয়। এই ধারা মুঘল শাসনের শেষ পর্যায় (১৭০৮-৯৯) এবং রণজিৎ সিংহের (১৮০০-৪৯) মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও তার বিস্তার ও গভীরতা বেশ কমে আসে। ১৮৫০ সালে ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হয়। তখন ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্য এক সংকট। হিন্দুরা দেবনাগরী লিপিতে হিন্দিতে উৎসাহী হলেন, মুসলমানরা ফার্সী লিপিতে উর্দুতে আর তৃতীয় একটি শ্রেণী তৈরী হল যাঁরা ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চায় উৎসাহী হলেন। বাংলা কথাসাহিত্যিক এবং অনুবাদক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য' বইটিতে হয়ত তাই বিলাপ করেছিলেন :

> কবি ইকবাল, ড. মুলক্‌রাজ আনন্দ, কৃষন চন্দর, রাজেন্দর সিং বেদী, উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক, হাফিজ জলন্ধরী, ফৈয়জ আহ্‌মদ ফৈয়জ, সাদাত হোসেন মান্টো, এ এস বোখারী, ধরম প্রকাশ প্রমুখ কবি-কথাশিল্পীরা যদি মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হতেন, কে জানে, আধুনিক পঞ্জাবি সাহিত্যের চেহারাই হয়ত পালটে যেত।

আধুনিক পঞ্জাবি সাহিত্যের সূত্রপাত ভাই বীর সিং (১৮৭২-১৯৫৭), চরণ সিং শহীদ (১৮৮১-১৯৩৫) , লালা কিরপা সগর প্রমুখের হাতে। ভাই বীর সিং-এর হাতেই প্রথম পঞ্জাবি উপন্যাসের সূত্রপাত। ১৮৯৮ সালে লেখা 'সুন্দরী' উপন্যাসে বীর সিং শিখ জাতির অতীতের উজ্জ্বল দিনগুলির কথা স্মরণ করে। একই অতীতের কথা লেখা হল ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত 'বিজয় সিং' এবং ১৯০০-এ 'সাতওয়ান্ত কাউর'-এ। চরণ সিং শহীদ লিখলেন 'দলের কাউর' এবং 'রণজিৎ কাউর', অনেকটা ভাই বীর সিংয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে। ভাই মোহন সিং বেদ অবশ্য পারিবারিক ও সামাজিক জীবনচিত্রে বেশি উৎসাহিত হলেন। ১৯১২ সালে 'সুশীল নূনহ' (শিক্ষিতা বধূ) এবং ১৯১৮-তে 'সিয়ানী মাতা' (বুদ্ধিমতী মা), ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হল নতুন একটি উপন্যাস যার বাংলা অনুবাদে অর্থ হল 'সুখী পরিবার'।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। ১৯৩৬ সালে লখনউতে প্রগতি লেখক সংঘের অধিবেশনের মধ্য দিয়ে লেখকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি অগ্রাধিকার

পায়। তারপর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, আই. এন. এ-র গঠন, দেশ তথা পঞ্জাব বিভাজন ইত্যাদি পর্ব চলতে থাকে। পঞ্জাব বিভাজনের কারণে ছিন্নমূল হল লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই পর্বে পঞ্জাবি গল্প-উপন্যাসে যাঁরা সময়ের সুখ-দুঃখের কথা লিখে রাখলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন নানক সিং (১৮৯৭-১৯৭১), সুরিন্দর সিং নরুলা (১৯১৭), যশবন্ত সিং কঁবল (১৯১৯), কর্তার সিং দুগ্গল (১৯১৯), অমৃতা প্রীতম (১৯২৩) প্রমুখ। অজীত কৌর (১৯৩৩), গুরদিয়াল সিং (১৯৩৩), মোহন ভাণ্ডারী (১৯৩৭) প্রমুখের কলমে আবার ধরা পড়েছে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের গ্রামজীবনে প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ, নারীর অধিকার অর্জনের লড়াই, শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার বোধ, হরিজনদের আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার অঙ্গীকার ইত্যাদি বিষয়।

৮.২ নানক সিং

পণপ্রথা, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় মিথ্যাচার ইত্যাদি সমস্যা নানক সিং-এর প্রথম পর্বের উপন্যাসে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেন ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'চিট্টালহু' (সাদা রক্ত) উপন্যাসটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'পবিত্তর পাপী' (পবিত্র পাপী, ১৯৪১)। এই উপন্যাসটি অনেকখানি শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'-এর মতো যেখানে নায়ক কেদার ধীরে ধীরে নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। পান্নালাল নামে এক ঘড়ি-ব্যবসায়ীর দোকানের কর্মচারী ছিল কেদার। এক কাকতালীয় ঘটনায় পান্নালাল ব্যবসায় ব্যর্থ হয় এবং কাউকে না জানিয়ে দূর দেশে চলে যায়। সেখান থেকে চিঠি দিয়ে কেদারনাথকে অনুরোধ করে তার স্ত্রী এবং চার সন্তানের সংসারটি দেখার জন্য। পান্নালালের মেয়ে বীণার সঙ্গে কেদারের সম্পর্ক ভাই-বোনের মতো কিন্তু এই কিশোরীর প্রতি ধীরে ধীরে কেদার অন্য এক টান অনুভব করে। কিন্তু সে-কথা বলতে পারে না বীণাকে। একদিন বীণার মায়ের অনুপস্থিতিতে সে বীণার কাছে যায় এবং উত্তাল মনের কথা বলে। কিন্তু এ-রকম পরিস্থিতির জন্য মানসিক প্রস্তুতি ছিল না বীণার। এমনকি ধর্মীয় বাধাও সে অনুভব করে। সে বলে, 'তুমি এ কি কথা বলছ দাদা-ভাই? ভাই আর বোনের মধ্যে কেমন করে সম্ভব?' কেদার বোঝায় তারা রক্তের সম্পর্কে ভাই-বোন নয়। কিন্তু কোথাও যেন একটা সামাজিক দূরত্ব অনুভব করে বীণা। এই দুটি চরিত্রের যে মানসিক টানাপোড়েন তা সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। 'পবিত্র পাপী'-র পরবর্তী নানক সিং-এর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'খুন দে সোহিলে' (রক্তের গান, ১৯৪৭), 'আগ্ন দী খেড়' (আগুনের খেলা, ১৯৪৮), মঞ্ঝধার (ঘূর্ণি, ১৯৪৯) এবং 'চিত্রকার' (১৯৫০)। এই চারটি উপন্যাসের বিষয় দেশভাগ এবং জাতিদাঙ্গা।

৮.৩ সুরিন্দর সিং নরুলা

নরুলার প্রথম উপন্যাস 'পিত্ত-পুত্তর' (পিতা-পুত্র) প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। প্রথম উপন্যাসেই চমকে দিয়েছিলেন পাঠকদের কারণ বাস্তবতার যে ছবি নরুলা আঁকলেন তার কোনো ঐতিহ্য পঞ্জাবি সাহিত্যে আগে ছিল না। কাহিনীটি বলেছে এক কিশোর উত্তমপুরুষে। ঘটনার প্রেক্ষিত অমৃতসর। ১৮৯৫ থেকে ১৯১৮ সময়পর্বের মধ্যে এই শহরের সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক ঘটনার ছবি রয়েছে উপন্যাসটিতে। কাহিনী-কথক হীরা শৈশবে মা-বাবাকে হারিয়ে মামার বাড়িতে দাদু-দিদিমার কাছে মানুষ হয়। কিন্তু এই বেড়ে ওঠার ভেতর আদর-ভালবাসা কমই ছিল। বিশেষ করে ভেষজ ওষুধ বিক্রেতা দাদু গুরদিৎ সিং একটু বেশিই কর্কশ ছিল। কিন্তু তাতে যে হীরা ভেঙে পড়েছিল তেমন নয়। বরং ধীরে ধীরে মানুষজনের আচার-আচরণের মধ্যে নানা অসঙ্গতি সে খুঁটিয়ে দেখত এবং এক ধরনের মজা অনুভব করত। কিন্তু শিখ, মুসলমান ও খ্রিস্টান অধ্যুষিত শহরটিতে সম্পর্কের

টানাপোড়েন ছিল, আবার বিনিময়ও ঘটত নিজেদের মতো করে। নরুলার কলমে চণ্ডীগড় বাজারের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা যেমন অনুপুঙ্খ তেমনই জীবন্ত :

> আমার দাদু ছিলেন শহরের নামী ডাক্তারদের মধ্যে একজন। তখনকার দিনে তাঁর এক বিশেষ মর্যাদা ছিল শহরে। এর কারণ বোধ হয় এই যে শহরে সামান্য কয়েকজনই বৈদ্য, হাকিম আর ডাক্তার ছিল। শহরের প্রধান হাসপাতালটি ততদিনে হয়ে গেছে এবং তার পরিচালক-ডাক্তার শহরের চার্চের ধর্মযাজক। হাসপাতালে যারাই ওষুধ নিতে আসত ডাক্তারবাবু তাদের খ্রীস্টীয় ধর্মতত্ত্ব শেখাত। ফলে বাজারের মানুষজনের ওষুধের দরকার হলে আমার দাদুর কাছে আসত। শহরের প্রধান হাসপাতালটি কাছে হলেও মসজিদের মৌলবী নির্দেশ দিয়েছিল ধর্ম বিশ্বাসী মানুষজন যেন খ্রিস্টান ডাক্তারের কাছে না যায়। এর কারণ বোধ হয় এই যে মৌলবী আব্দুল গনি শেখের চিকিৎসা করত। সাধারণত তার ওষুধপত্রের সঙ্গে ঝাড়ফুঁকের একটা যোগ থাকত। আর আমার দাদুর খদ্দেররা ছিল মুসলমান পরিবারের কিশোর-কিশোরী।
>
> (অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

এই সামান্য উদ্ধৃতি থেকেও বোঝা যায় ঔপন্যাসিক হিসেবে নরুলা কতখানি আধুনিক ছিলেন বিশ শতকের চারের দশকেই। 'পিতা-পুত্র' ছাড়াও নরুলার আরো বারোটি উপন্যাস, ছটি গল্প-সংকলন, আটটি সাহিত্য সমালোচনার বই এবং তিনটি কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। তাঁর 'রঙমহল' এবং 'জাগ্রত' উপন্যাস দুটিও পাঠক-সমালোচকদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রথমটিতে মার্কসীয় এবং য়ুরোপীয় চেতনার সংমিশ্রণ ঘটে। আর দ্বিতীয়টিতে শোষিত শ্রমিক জীবনের এক মর্মস্পর্শী জীবনচিত্র ধরা পড়ে।

৮.৪ কর্তার সিং দুগ্গল

দুগ্গলের প্রথম পর্বের লেখায় যৌনতা এবং নগ্নতার প্রাধান্য ছিল। ঐ সময় প্রকাশিত হয়েছিল 'ভোরে' (১৯৪১), 'পিপল গাছের পাতা' (১৯৪২) এবং 'মেয়েটি তার গল্প বলে চলে' (১৯৪৩) গল্প-সংকলন। তারপরেই শুরু হল দাঙ্গা, ধর্ষণ, মৃত্যু এবং ছিন্নমূল মানুষের হাহাকার পর্ব। ১৯৪৭-এ প্রকাশিত তাঁর গল্প-সংকলন 'পশু', ১৯৪৮-এ 'আগুন-খাদক' এবং ১৯৫০-এ 'নতুন ঘর'। ১৯৫২ থেকে তাঁর লেখায় অন্য এক নির্মাণ সচেতনতা প্রকাশ পেতে থাকে। 'ফুল তোলা বারণ' (১৯৫২), 'অবিশ্বাস্য' (১৯৫৭), 'আলোর ছটা' (১৯৬৩) ইত্যাদি সংকলনে এই নতুন পর্বটির ছাপ রয়েছে। সাতের দশকে প্রকাশিত হয় 'মাজাহ্ মরেনি', 'সোনার বাংলা' ইত্যাদি সংকলন। তাঁর সুপরিচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'নখ এবং মাংস' (১৯৫৭), 'বিক্রির জন্য একটি হৃদয়' (১৯৫৭) ইত্যাদি। দুগ্গলের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নারী চরিত্রের অন্তরঙ্গ-বিবরণ। তাঁর গল্প-উপন্যাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল পঞ্জাবের জল ও মাটির বিবরণ। ভাষার দিক দিয়েও তিনি মানুষের দৈনন্দিনের বাচনে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আঞ্চলিক পথচারী ভাষাকে তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। সব মিলে পঞ্জাবি কথাসাহিত্যে দুগ্গল এক অবিস্মরণীয় স্রষ্টা। দুগ্গলের জীবন এবং সৃষ্টির গভীরতা যে কতখানি তা ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'অভিসার' গল্প থেকেও বোঝা যায়। মেয়ে মিন্নীর বিয়ের তোড়জোর চলছে, মা মালিনের মনে পড়ে তার যৌবনের কথা। সে স্মৃতিতে সুখ নেই, সবটাই হতাশা :

> এই তো সেদিন ওর নিজের হাতে মেহেন্দী আঁকা হয়েছিল। কিন্তু মিন্নীর বাবা একবারও ওর হাত দুটি উঠিয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ায়নি, চোখে চুমু খায়নি। রোজ ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষটি কাজ থেকে ফিরে রুটি খেত আর শুয়ে পড়ত। মালিন পাশে শুয়ে ছটফট করত, জানালা দিয়ে আকাশের তারা গুণতে গুণতে অনেক কষ্টে ঘুমুত। তার একটু পরেই জেগে উঠে ভদ্রলোক ওকে জাগিয়ে পুত্রপ্রাপ্তির লালসায় কসরৎ করত। ঘুমকাতুরে মালিনের কাছে ভদ্রলোকের প্রেম ছিল কসরতেরই নামান্তর। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একটা করে কন্যাসন্তান আসত। অনাকাঙ্ক্ষিত লিকপিকে সব কন্যারা যেমন করে আসত তেমনই মাকে কাঁদিয়ে অপুষ্টি বা অন্য কোনো কারণে কেউ দু-মিনিট কেউ দু-দিন পরে মরে যেত। কেবল মিন্নীই ব্যতিক্রম।
>
> (অনুবাদ শ্যামল ভট্টাচার্য)

সেই মিন্নীর বিয়ে সামনের সপ্তাহে। মিন্নী হাতে মেহেন্দী আঁকে, চুড়ি পরে। দেখে মালিন। পরের দিন সকালে হঠাৎ গাঁয়ের মানুষজন এসে মিন্নীর রাতের কীর্তি শুনিয়ে যায়। ক্ষেতে পুরুষ মানুষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। মেয়ে ছুটে চলে কুয়োর দিকে, পাড়া-পড়শিরা ছুটে যায় বাঁচাতে। মালিন কাঠের তক্তার মতো উঠোনে অসাড় পড়ে থাকে। মা ও মেয়ের চেহারায় ভীষণ মিল, মানুষজন তাই চিনতে ভুল করেছে।

৮.৫ অমৃতা প্রীতম

শৈশবে অমৃতা প্রীতমের ধর্মানুরাগী বাবা চেয়েছিলেন মেয়ে ধর্মপ্রাণা কবি হয়ে উঠুক। প্রথম দিকে সে পথেই চলেছিলেন তিনি কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে জীবন এবং সৃষ্টির মধ্যে এক দোটানা অনুভব করলেন। চারপাশে যা দেখছেন তার সঙ্গে ধর্মীয় দার্শনিকতার কোনো মিল নেই। যে আকৃতিমগ্নতা দিয়ে শুরু করেছিলেন কাব্যসাধনা তাও যেন এক ধরনের নিষ্ক্রমণ। ১৯৩৫-এ 'ঠাণ্ডা রশ্মি' দিয়ে যে কাব্যসাধনার শুরু, ১৯৪৪-এ 'মানুষের যন্ত্রণা'-য় তার স্বরভঙ্গী বদলাতে থাকে। ১৯৪৬-এ প্রকাশিত 'পথের নুড়ি'-তে তিনি কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি। সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বিশেষভাবে নারীদের নানা সংকট তাঁর কবিতার বিষয় ও নির্মিতি বদলে দিতে থাকে। একই সঙ্গে কবিতার পাশাপাশি চারের দশকের মাঝামাঝি উপন্যাসে চলে আসছেন। যেন কবিতার মধ্য দিয়ে যা বলতে চাইছেন তার সবটুকু ধরা যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে শতক শেষে তাঁর উপন্যাস এবং গল্প-সংকলনের সংখ্যা যথাক্রমে একত্রিশ এবং ছত্রিশ।

তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস 'জয়শ্রী' (১৯৪৬) এবং 'ড. দেব' (১৯৪৯) বই দুটিতে অমৃতা প্রীতম তুলে ধরেছিলেন ভারতীয় নারীদের দিনযাপনের গ্লানি। তাঁর ছয়ের দশকের শেষে লেখা 'জিলাবতন' উপন্যাসে এল এক তরুণের কাহিনী যে তার চারপাশে তাকিয়ে দেখে সে বড় নিঃসঙ্গ। সাতের দশকের শেষ দিকে লেখা 'উনিনযা দিন' উপন্যাসে মৃত্যুচেতনা বাসা বাঁধে উপন্যাসের ভেতর। কিন্তু এরই পাশাপাশি বিশ্বাস ও প্রেম জেগে থাকে। এ-দুয়ের ভেতর টানাপোড়েন চলে।

ছোটগল্পকার হিসেবেও অমৃতা প্রীতমের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় এবং বিদেশি বহু ভাষাতে অনূদিত হয়েছে তাঁর গল্প যেখানে মানুষের দৈনন্দিনের নানা সুখ-দুঃখের কথা গাঁথা থাকে। 'দুই নারী' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন অমৃতা সেই ১৯৪৩ সালে কিন্তু এখনও নানা গল্প সংগ্রহে জায়গা করে নেয়। গল্পটি এক ধনী শাহের দুই নারীকে নিয়ে—একজন তার স্ত্রী শাহনী আর অন্যজন তার রক্ষিতা নীলা যাকে লোকে শাহের কঞ্জরী বলে। শাহনী কিংবা নীলা কেউ কাউকে চেনে না কিন্তু শাহের ছেলের বিয়ে উপলক্ষে তাদের দেখা হয় শাহের বাড়ির মহফিলে। গানের শেষে দুই নারীর পারস্পরিক হিংসা ও ক্ষোভ প্রকাশ পায় যদিও এই পরিস্থিতির জন্য তাদের দুজনের কেউই দায়ী নয়। গল্পের শেষ অংশটি এই রকম :

> সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মহফিল প্রায় শেষের দিকে। শাহনী আগে বলেছিল ও গানের পরে নীলা ও সমস্ত বস্ত্রে ও সেহরে গানেওয়ালীদর রীতি অনুযায়ী কেবল বাতাসা দেবে। কিন্তু এখন কামরায় চা ও অনেক রকম মিষ্টি চলে আসে। তারপর শাহনী মুঠি থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবি ছাপা একশো টাকার নোট বের করে ছেলের মাথার উপর ঘুরিয়ে নীলার হাতে ধরিয়ে দেয়। ও বলে—থাক্ থাক্ শাহনী, এমনিতে তো তোমারই খাই। বলে ও খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। ওর হাসিও ওর রূপের মতন ঝিলমিলিয়ে ওঠে। শাহনীর মুখ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। এই ভরা সভায় শাহের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ জুড়ে কঞ্জরী কি ওকে অপমান করতে চায়? ওর ভীষণ রাগ হয়। কান ঝা ঝা করে। তবু নিজেকে সামলায়। আজ কোনমতেই হারলে চলবে না। ও বেশ জোরে হেসে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নীলার হাতে নোটটা গুঁজে দিয়ে বলে, শাহের থেকে তো রোজই নিস্, কিন্তু আমার হাত থেকে আর কবে পাবি? চল্ আজ নিয়ে নে।
>
> তখন শাহের কঞ্জরী, একশো টাকার নোট হাতে নিয়ে, শাহনীর ঐ কথায় কেমন ঝিমিয়ে পড়ে!
>
> (অনুবাদ শ্যামল ভট্টাচার্য)

পুরুষ শাসিত ও শোষিত সমাজে এভাবেই তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে স্বলিঙ্গেই ফিরে আসে। সমাজ বদলায় না, নারীর কপালের লিখনও না।

৮.৬ গুরদিয়াল সিং

গুরদিয়াল সিং তাঁর জীবিকা শুরু করেন প্রাথমিক ইস্কুলের শিক্ষক হিসেবে, ১৯৫৪ সালে। পরে মাধ্যমিক ইস্কুল এবং কলেজের অধ্যাপক হন। লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ১৯৬২ সালে 'সাগ্নি ফুল' নামে একটি গল্প-সংকলনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু লেখক হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা পান প্রথম উপন্যাস 'মরহী দা দীবা' (সমাধিতে মাটির প্রদীপ, ১৯৬৫) প্রকাশের মাধ্যমে। এটি মালোয়া অঞ্চলের গ্রামজীবনের এক নিখুঁত চিত্র। উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে আঞ্চলিক ভাষার উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসটি একটি চাষি পরিবার এবং তাদেরই এক খেতমজুর পরিবার নিয়ে। ধরম সিং-এর বাবা থোলা নামের এক ভূমিহীন তথাকথিত নিম্নগোত্রীয় মানুষকে নিজের আদি গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছিল পাগড়ি বদল করে। থোলাকে দিয়েছিল চাষের চার বিঘে জমি, চাষের কাজের মাইনে বাদে। তাদের সম্পর্ক এতই নিবিড় ছিল যে একসঙ্গে উৎসবে অংশ নিত। মৃত্যুর সময় সিংজী ছেলেকে বলেছিল থোলার সঙ্গে যেন কোনো রকম খারাপ ব্যবহার না করে। বাবার কথা রেখেছিল ধরম সিং। থোলার চার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল এবং থোলার ছেলে জগশিরের দায়িত্ব নিয়েছিল। জগশিরের ইচ্ছেয় থোলার সমাধিতে মন্দিরও বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবারে ধরম সিং-এর গুরুত্ব কমতে থাকে। তার ছেলে ভান্তা সংসারের ভার নেয়। জগশিরের গুরুত্ব তার কাছে একজন জনমজুরের চেয়ে বেশি কিছু নয়। সে থোলার সমাধিমন্দিরটি ভেঙে দেয়। তার দাদুর দেওয়া জমিও কেড়ে নেয়। জগশিরের জীবনে নেমে আসে দুঃখ। সে প্রেমেও ব্যর্থ হয়। বিয়াল্লিশ বছরে জগশিরের জীবনে মৃত্যু নেমে আসে।

গুরদিয়াল সিংয়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'আনহোয়ে' (১৯৬৬), 'কুয়েলা' (১৯৬৮), 'আধ চানানি রাত' (১৯৭২)। সাহিত্য অকাদেমি, সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার, ভাই বীর সিং পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ইত্যাদি সম্মানে গুরদিয়াল সিংকে সম্মানিত করা হয়েছে।

৮.৭ অজীত কৌর

অজীত কৌরের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে নটি ছোটগল্প সংকলন, ছটি উপন্যাস, একটি আত্মজীবনী, একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং দেশি-বিদেশি বেশ কিছু গ্রন্থের অনুবাদ। জীবনের অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ব্যক্তি ও লেখক হিসেবে তাঁর চলা, যার কিছু পরিচয় অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত আত্মজীবনী 'খানাবাদোশ' বইটিতে মেলে। কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছেন বলেই বোধহয় লেখার মধ্যে তরল আবেগের স্থান নেই।

লেখা শুরু করেছিলেন একজন নারীবাদী লেখক হিসেবে। নারী-পুরুষ সম্পর্কের দৈহিক দিকগুলিকে গল্প-উপন্যাসে বেশ স্পষ্টভাবেই এনেছেন বহু সময়। এর পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক নানা বিষয় জায়গা করে নিতে থাকে তাঁর গল্পে। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত 'ওকে মেরো না' গল্পে একটি অনুচ্ছেদেই সময় ও সমাজকে অনেকখানি আধারিত করেন :

> ওরা বলে আমার ভাইকে আতঙ্কবাদীরা মেরেছে। জানি না ওর সঙ্গে কার কী শত্রুতা ছিল। অবশ্য হত্যা তো যে কেউ করতে পারে। সে জন্য সন্ত্রাসবাদী হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কাউকে মেরে ফেলা কত সহজ। বছরের পর বছর কত কষ্ট করে মা-বাবা তাদের ছেলেকে বড় করে তোলে, আর একটিমাত্র গুলি। বাস! মস্ত ফোলানো বেলুনে একটি সুঁই ফোটালে যেমন হয়। যতক্ষণ মানুষ হাঁটতে চলতে থাকে ততক্ষণই সে মানুষ। একটা ফুটো করে দিলেই সমস্ত রক্ত বেরিয়ে যায়।

বাকি থাকে লাশ। মাটি। তাকে পুড়িয়ে দিলেও কিছু থাকে না, কবর দিলেও প্রায় একই ব্যাপার।

(অনুবাদ শ্যামল ভট্টাচার্য)

নারীর সমস্যা, তাঁর গল্পে, সম্পর্কের অসম দিকগুলি স্পষ্ট করে তোলে। স্বামী কিংবা প্রেমিক কারো কাছ থেকেই নারী তার প্রাপ্য মর্যাদা পায় না। নারী বাড়ি পায় কিন্তু তার ঘর মেলে না। 'ইক মোকান ইক ঘর' (একটি বাড়ি একটি ঘর) গল্পে অজীত কৌর তুলে ধরেন গোমতীর জীবনের অর্থহীনতা। তার স্বামীর অবসর নেই তার জন্য আলাদা কিছুটা সময় নির্দিষ্ট রাখার। গোমতীর স্বপ্ন তাই ভেঙে যেতে থাকে :

> বিয়ের আগে অবসর ও ঘুমে গোমতী বিয়ে নিয়ে জাল বুনতো অবসর ও ঘুমে—সংসার মানে গোলাপের গন্ধ, ঘাসের ঘ্রাণ, বহুবিচিত্র রঙ আর স্বচ্ছ প্রবহমান জলস্রোতের কাছে পাহাড়ের দুই বাহুতে ঘুমিয়ে থাকা এক নিঃশ্চুপ উপত্যকা....কিন্তু স্বামীর হাত কিংবা সংসার থেকে এ-রকম কিছুই পায়নি সে।
>
> (অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

তাহলে কি পুরুষ ভালবাসতে জানে না? অজীত কৌর লেখেন পুরুষ তার সমগোত্রীয়কে ভালবাসতে চায় না। সে এমন কাউকে চায় যে তার অধীনে থাকবে, তার মতামতকে অন্ধভাবে সমর্থন করবে। এভাবে পুরুষ তার আত্মাভিমানকে তুষ্ট করে। কখনো আবার একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিজের অহংকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সংখ্যাটি সেখানে হয়ে ওঠে ক্ষমতার অন্য এক বিজ্ঞাপন।

এটিই পঞ্জাবি কথাসাহিত্যের রূপরেখা। নতুন প্রজন্মের লেখকেরাও আসছেন, যেমন তেজিন্দার গুজরাল, কাশ্মীর সিং পন্নু, বিন্দর বাসরা, তলবিন্দর সিং, মনমোহন কৌর। তাঁদের লেখা নিয়ে এখনই কোনো চূড়ান্ত মূল্যায়নে যাওয়া কঠিন। পঞ্জাবি সাহিত্যের ইতিহাসকার কে. এস. দুগ্গল নতুন প্রজন্মের লেখকদের বিষয়ে লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেন তাঁদের মধ্যে রাগ এবং হতাশা প্রকাশ পাচ্ছে কিন্তু কোথায় যে তাঁরা তাঁদের চরিত্রদের পৌঁছে দেবেন সে বিষয়ে বোধহয় নিশ্চিন্ত নন। এর পেছনে হয়ত ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক সংকট প্রকাশ পায় যেখানে বহু স্বপ্নের গায়েই রাহুর গ্রাস।

৮.৮ অনুশীলনী

১। **নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক এবং কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।**

(ক) ভাই বীর সিং-এর হাতে পঞ্জাবি উপন্যাসের সূত্রপাত।

(খ) ভাই মোহন সিং পারিবারিক জীবনের ছবি এঁকেছেন তাঁর উপন্যাসে।

(গ) নানক সিং-এর 'পবিত্র পাপী' উপন্যাসটির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মিল রয়েছে।

(ঘ) সুরিন্দর সিং নরুলার 'পিতা-পুত্র' উপন্যাসটির প্রেক্ষিত লাহোর শহর।

(ঙ) 'ইক মোকান ইক ঘর' গল্পটির লেখক অজীত কৌর।

২। **পাঁচটি বাক্যে আলোচনা করুন।**

(ক) আধুনিক পঞ্জাবি সাহিত্যের আদিপর্বের লেখক।

(খ) পঞ্জাবি সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৩। **দশটি বাক্যে উত্তর দিন।**

গল্পকার অমৃতা প্রীতম।

৪। **কুড়ি থেকে পঁচিশটি বাক্যের মধ্যে বিশ্লেষণ করুন।**

পঞ্জাবি কথাসাহিত্যে নারী চরিত্র।

একক ৯ ❏ ভারতীয় ইংরেজি

গঠন

৯.১ প্রস্তাবনা
৯.২ মূলক রাজ আনন্দ
৯.৩ আর. কে. নারায়ণ
৯.৪ রাজা রাও
৯.৫ অনুশীলনী

৯.১ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের সূত্রপাত। এই সাহিত্যকে কখনো 'ইন্ডো-অ্যাংলিয়ান লিটরেচর' কখনো 'ইন্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশ' কখনো আবার 'ইন্ডো-ইংলিশ লিটরেচর' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেসব লেখক জন্মসূত্রে বা পারিবারিক পরম্পরায় বা নাগরিকত্বে ভারতীয় তাঁদের লেখাকে এই ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের অংশ বলে ধরা হয়। তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রমও রয়েছে, যেমন আনন্দ. কে. কুমারস্বামী। শ্রীলঙ্কার তামিল বাবা এবং ইংরেজ মায়ের সন্তান কুমারস্বামী। ভারতবর্ষে থাকেননি এবং ভারতবর্ষের নাগরিকও ছিলেন না কিন্তু তাঁর লেখালেখি এতখানিই ভারতবর্ষ কেন্দ্রিক যে তাঁকে ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের লেখক হিসেবেই ভাবা হয়।

ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের গদ্য অংশের সূত্রপাত ক্যাভেলি ভেঙ্কট বরিয়া (১৭৭৬-১৮০৩) এবং রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) হাতে। তেলুগু কবি বরিয়ার লেখা 'এ্যাকাউন্ট অব দ্য জৈনস' প্রবন্ধটি ১৮০৯ সালে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়ের প্রথম ইংরেজি প্রবন্ধ 'আ ডিফেন্স অব হিন্দু থিইজম' প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে। ভারতীয় ইংরেজি কবিতার সূত্রপাত হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)-এর হাতে। ভারতীয়-পর্তুগীজ বাবা এবং ইংরেজ মায়ের সন্তান ডিরোজিওর প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'পোয়েমস' প্রকাশিত হয় ১৮২৭ সালে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ 'দ্য ফকির অব জুংহীরা : আ মেটরিক্যাল টেল এ্যান্ড আদার পোয়েমস' ১৮২৯ সালে। তার পরের বছর কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-৭৩) প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দ্য শাইর অর মিনস্ট্রেল এ্যান্ড আদার পোয়েমস'। এটিই সম্পূর্ণ ভারতীয় একজন কবির ইংরেজিতে কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ। তারপর রাজনারায়ণ দত্ত (১৮২৪-৮৯), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) প্রমুখ। ভারতীয় ইংরেজিতে আখ্যান সাহিত্যের সূত্রপাত কৈলাসচন্দ্র দত্তের হাতে। ১৮৩৫ সালে 'দ্য ক্যালকাটা লিটরেরি গেজেট'-এ প্রকাশিত হয় কৈলাসচন্দ্রের 'আ জর্নাল অব ফরটি-এইট আওয়ার্স অব দ্য ইয়ার নাইনটিন ফরটি ফাইভ'। এই কাল্পনিক আখ্যানে লেখক কল্পনা করেন একশ বছর পরে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানের কথা। শশিচন্দ্র দত্ত ১৮৪৫ সালে প্রকাশ করেন 'রিপাবলিক অব ওড়িশা : এ্যানালস্ ফ্রম দ্য পেজেস অব দ্য টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি'। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) 'রাজমোহন'স ওয়াইফ' উপন্যাসটি 'দ্য ইন্ডিয়ান ফিল্ড' সাপ্তাহিকে ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত কবি তরু দত্তও ইংরেজিতে 'বিআংকা, অর দ্য ইয়ং স্প্যানিশ মেডেন' (১৮৭৮) উপন্যাসটি লেখেন। তিনিই প্রথম এশীয় মহিলা যিনি কোনও ইউরোপীয় ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। ফরাসিতেও তিনি একটি উপন্যাস লেখেন 'লে জুর্নাল দ্য মাদমোয়াজেল দ্যার্ভের্স' নামে। ঐ সময়ের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রামকৃষ্ণ

পন্ত, তারাচাঁদ মুখার্জী, লালবিহারী দে, আনন্দপ্রসাদ দত্ত, মির্জা মুরাদ আলি বেগ, লেফটেনান্ট সুরেশ বিশ্বাস, শরৎকুমার ঘোষ, এ. মাধবিয়া, টি. রামকৃষ্ণ পিল্লাই, সির্দার যোগেন্দ্র সিং, এস. টি রাম প্রমুখ। বিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যে ছোটগল্প শাখায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন কর্নেলিয়া সোরাবজী।

১৯২০ সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দাবী ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। তার ছাপ পড়ে ইংরেজি ভাষার ভারতীয় সাহিত্যে। কে. এস. ভেঙ্কটরমনী (১৮৯১-১৯৫১) 'মুরুগী, দ্য টিলর' (১৯২৭) এবং 'কন্দন দ্য পেট্রিয়ট : আ নভেল অব নিউ ইন্ডিয়া ইন দ্য মেকিং' (১৯৩২) উপন্যাসে আন্দোলনের ছাপ পড়ে। তিনের দশকে মূলক রাজ আনন্দ (১৯০৫-২০০৪), সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৯৯-১৯৬৫), রাজা রাওয়ের (জন্ম ১৯০৮) কলমে ভারতীয় ইংরেজি উপন্যাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে তাঁদের উল্লেখযোগ্য উত্তরসূরীরা হলেন ভবানী ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৮৮), মনোহর মালগাঁওকার (জন্ম ১৯১৩), খুশবন্ত সিং (জন্ম ১৯১৮), চমন নাহাল (জন্ম ১৯২৭), নয়নতারা সাগল (জন্ম ১৯২৭), রাসকিন বন্ড (জন্ম ১৯৩৪), মনোজ দাস (জন্ম ১৯৩৪), অনিতা দেশাই (জন্ম ১৯৩৭), অমিতাভ ঘোষ (জন্ম ১৯৫৬), অরুন্ধতী রায় (জন্ম ১৯৬১) প্রমুখ।

৯.২ মূলক রাজ আনন্দ

মূলক রাজের জন্ম ১৯০৫ সালে বর্তমান পাকিস্তানের পেশোয়ারে। তাঁর শৈশব ও কৈশোরের কথা মূলকরাজ লিখেছেন 'এ্যাপোলজি ফর হিরোইজম' (১৯৪৬) নামের আত্মজীবনীতে। বড় হয়েছেন ঐ সময়ের অনেক ছেলের মতোই ভারতীয় ঐতিহ্যের তুলনায় পশ্চিমী সংস্কৃতির মাহাত্ম্যের কথা শুনতে শুনতে। কিন্তু পঞ্জাবি জীবন তাঁর বুকের ভিতরে কোথাও জায়গা করে নিয়েছিল, সঙ্গে দেশের প্রতি ভালবাসাও। গান্ধীজির আন্দোলনে অংশ নেন কলেজে পড়ার সময় এবং কিছুদিন কারাবাস করেন। ১৯২৪ সালে ইংল্যান্ডে যান দর্শনশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতে। সেখানে ভারতীয় শিল্প বিষয়ে পড়াশোনায় উৎসাহী হয়ে পড়েন। বামপন্থী চিন্তাভাবনাতেও অনুপ্রাণিত হন এবং স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে অংশ নেন। ১৯৪৬ সালে দেশে ফিরে 'মার্গ' পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। উপন্যাস লেখা অবশ্য শুরু হয়েছে তার আগেই। ১৯৩৫ সালে 'আনটাচেব্‌ল' (অস্পৃশ্য) , ১৯৩৬-এ 'কুলি' এবং ১৯৩৭-এ 'টু লিভস অ্যান্ড আ বাড' (দুটি পাতা একটি কুঁড়ি) তাঁকে ইংরেজি ভাষার ভারতীয় সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্বে প্রকাশিত হয় তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস—'দ্য ভিলেজ' (গ্রাম), 'অ্যাক্রস দ্য ব্ল্যাক ওয়াটার (কালাপানির ওদিকে) এবং 'দ্য সোর্ড অ্যান্ড দ্য সিকল' (তরবারী এবং কাস্তে)। তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'দ্য বিগ হার্ট' (বড় মন, ১৯.৫), 'সেভেন সামার্স' (সাত গ্রীষ্ম, ১৯৫১), 'দ্য প্রাইভেট লাইফ অব অ্যান্ড ইন্ডিয়ান প্রিন্স' (একজন ভারতীয় রাজপুত্রের ব্যক্তিগত জীবন, ১৯৫৩), 'দ্য ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য কাউ' (বৃদ্ধ এবং তার গরু, ১৯৬০), 'মর্নিং ফেস' (সকালের মুখ, ১৯৭০) ইত্যাদি।

'অস্পৃশ্য' উপন্যাসটির বিষয় যুবক ঝাড়ুদার বাখার জীবনের একটি দিন। কাহিনীর প্রথম অনুচ্ছেদেই রয়েছে ঝাড়ুদার পল্লীর একটি বিস্তৃত পরিচিতি :

> জাতিচ্যুতদের বসতি বলতে দু-সারি মাটির ঘর, শহর ও সেনা ছাউনির ছায়ায়, যদিও তাদের সীমার বাইরে এবং দূরত্ব রেখেই। জাতিচ্যুতদের কলোনির বাসিন্দা হল কাগজ কুড়ুনি, চামার, ধোপা, নাপিত, জল-ভারি, ঘাস কাটার লোক এবং হিন্দু সমাজের অন্যান্য সমাজ বহির্ভূত ব্যক্তি। সরু রাস্তার গা দিয়ে একটা ছোট খাল বয়ে চলে। একসময় সেই জল ছিল স্ফটিক স্বচ্ছ। এখন কাছাকাছি গণশৌচাগারের ময়লা ও নোংরাতে খালটি ভর্তি, জায়গাটা দুর্গন্ধও—মৃত পশুর ছালচামড়া

শোকায় খালের ধারে, স্তূপ করে রাখা থাকে গাধা, ভেড়া, ঘোড়া, গরু এবং মোষের গোবর ঘুঁটে তৈরী করার জন্য।...
(অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

এখানেই বাখার বাস। সে নিত্যদিনের মতো মানুষের মলমূত্র পরিষ্কার করে। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় তার জানা নেই। একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক তাকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়। বাখা গান্ধীজির কথাও শোনে। একথাও তার কানে যায় যে একমাত্র যন্ত্র দিয়ে মলমূত্র অপসারণের ব্যবস্থা করলেই এ-সমস্যার যথাযথ সমাধান সম্ভব। সবই শোনে বাখা কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। এই উপন্যাসটি ভারতীয় উপন্যাসের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ভারতীয় সমাজবাস্তবতার একটি নিখুঁত ছবি রয়েছে উপন্যাসটিতে। লেখার ভঙ্গীটিও মর্মস্পর্শী। এই উপন্যাসটি ঘিরে বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ই. এম. ফর্স্টারের বক্তব্য মনে করা যেতে পারে :

> 'অস্পৃশ্য' উপন্যাসটি একজন ভারতীয়ই কেবল লিখতে পারেন, এবং সেই ভারতীয় যিনি বাইরে থেকে দেখছেন। কোনো ইউরোপীয়, যতই সহানুভূতিশীল হন না কেন, বাখার মতো চরিত্র সৃষ্টি করতে পারতেন না কারণ ওর সমস্যাগুলো বিষয়ে জ্ঞানের অভাব। কোনো অস্পৃশ্যও এই উপন্যাস লিখতে পারতেন না কারণ তাঁর ভেতর ক্ষোভ এবং আত্ম-অনুকম্পা কাজ করবে। শ্রী আনন্দ একটি আদর্শ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি জাতে ক্ষত্রিয়, তাঁর ভেতরেও দূষণ-চিন্তা ঢুকে থাকতে পারত কিন্তু ছোট থেকে ভারতীয় সেনানিবাসের গায়ে ঝাড়ুদারদের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলো করেছেন, তাদের ভালবেসে বড় হয়েছেন এবং তাদের জীবনের দুঃখ-বেদনাকে বুঝেছেন যা তাঁকে ভোগ করতে হয়নি।
> ('অস্পৃশ্য' গ্রন্থের মুখবন্ধ, ১৯৩৫, অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

মূলক রাজ আনন্দের অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'কুলি' (১৯৩৬) এবং 'টু লীভস অ্যান্ড আ বাড' (দুটি পাতা একটি কুঁড়ি, ১৯৩৭)। 'কুলি' উপন্যাসের প্রধান-চরিত্র মুনু কাংরা পাহাড়ি অঞ্চলের এক অনাথ কিশোর। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে সে এক জীবিকা থেকে অন্য জীবিকায় গড়িয়ে যায়—গৃহভৃত্য, কুলি, কারখানার মজুর, রিক্সাচালক। বোম্বাই থেকে সিমলা পর্যন্ত তার পথচলার ভেতর সে বাঁচার পরিবর্তে মৃত্যুরই রসদ পায়। অতিরিক্ত মদ্যপান তার জীবনকে আরো ছোট করে দেয়। মুনুদের জীবন এ-রকমই বঞ্চনার বৃত্তান্ত যার পিছনে পুঁজিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত কাজ করে চলে। আর 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' উপন্যাসে আমরা পড়ি গঙ্গু নামের এক পঞ্জাবি কৃষকের কথা যে অসমে চা বাগানের শ্রমিক হয়ে আসে। সেখানকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবনযাপন নরক বাসেরই নামান্তর। এক বৃটিশ অফিসার তার মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। প্রতিরোধ করতে গিয়ে অফিসারের গুলিতে গঙ্গুর মৃত্যু হয়। এই উপন্যাসটিও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিতে উজ্জ্বল। অবশ্য 'কুলি' এবং 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' উপন্যাস দুটি সম্পর্কে কোন কোন সমালোচকের অভিমত এই যে বাইরের ঘটনার প্রতি অতিরিক্ত সচেতনার ফলে চরিত্রগুলির ভেতরের টানাপোড়েন অকথিত থেকে গেছে।

৯.৩ আর. কে. নারায়ণ

রাশিপুরম কৃষ্ণস্বামী নারায়ণের জন্ম ১৯০৬ সালে। তামিল পরিবারে জন্ম হলেও বিদ্যালয়-শিক্ষকের এই সন্তান বড় হয়েছেন মহীশূরের কোলাহলহীন শান্ত নগর-পরিবেশে। পড়াশোনা পর্ব শেষ করে সামান্য কিছুদিন শিক্ষকতা এবং সাংবাদিকতা করেছিলেন নারায়ণ, তারপর পূর্ণ সময়ের লেখক হয়ে ওঠেন। প্রথম উপন্যাস 'স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। উপন্যাসটিতে স্বামীনাথন বা স্বামীর শৈশব-কৈশোরের টুকরো টুকরো ঘটনা আয়রনির আকর্ষণীয় ব্যবহারে তুলে ধরেন নারায়ণ। ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হল 'দ্য ব্যাচেলর অব আর্টস'। মূল

চরিত্র চাঁদরাম বুঝে উঠতে পারে না বইতে পড়া পশ্চিমী প্রেম এবং ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনের প্রাচীন ব্যবস্থার ভেতর সে কোনটা বেছে নেবে। হতাশায় কিছুকালের জন্য সাধুও হয়ে যায়। শেষে সংসারে ফেরে এবং এই সিদ্ধান্তে আসে যে ভারতীয় বিবাহ ব্যবস্থা ঠিক চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার নয়। এরপর নারায়ণের যে সমস্ত উপন্যাস চার ও পাঁচের দশকে প্রকাশিত হল তার মধ্যে রয়েছে 'দ্য ডার্ক রুম' (অন্ধকার ঘর, ১৯৩৮), 'দ্য ইংলিশ টিচার' (ইংরেজির শিক্ষক, ১৯৪৬), 'দ্য ফাইনানসিয়াল এক্সপার্ট' (অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ, ১৯৫২), এবং 'দ্য গাইড' (পথপ্রদর্শক, ১৯৫৮)। এই শেষের উপন্যাসটি নারায়ণকে ভারতীয় সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিল।

'পথপ্রদর্শক' উপন্যাসের মূল চরিত্র রাজু বড় হয়েছে স্টেশন চত্বরে যেখানে তার বাবার একটি ফল-খাবারের দোকান ছিল। বাবার ব্যবসা ভাল চলছে দেখে রাজু ইস্কুলের পাট চুকিয়ে দোকানে বিক্রির কাজে যুক্ত হয়। বাবার মৃত্যুর পর রাজু নিজেই দোকানটি দেখতে থাকে এবং ভ্রমণার্থীদের নানা তথ্য সরবরাহ করতে থাকে। আর এই দ্বিতীয় কাজে সে এতই সফল হয় যে দোকান বন্ধ করে গাইডের কাজই পুরো সময় করতে থাকে। সে পরিচিত হয়ে ওঠে 'রেলওয়ে রাজু' নামে। একদিন মার্কো নামের এক গবেষক তাঁর স্ত্রী রোসিকে নিয়ে বেড়াতে আসেন। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর তেমন মনের মিল নেই কারণ মার্কো তাঁর গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অন্যদিকে রোসির রক্তে নাচের নেশা। রোসির সঙ্গে রাজুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং মার্কো তাদের জীবন থেকে সরে যায়। রাজু পূর্ণ উদ্যমে নেমে পড়ে রোসিকে নৃত্যশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। করেও কিন্তু সফল নৃত্যশিল্পীর ব্যস্তজীবনে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে রোসি। মার্কো আবার পুরনো সংসারে ফিরিয়ে আনতে চায় রোসিকে কিন্তু রাজুর বাধায় সম্ভব হয় না। কাগজপত্রে নানা কারচুপি করে সে এই কাজটি করে কিন্তু ধরাও, পড়ে যায়। দুবছরের জন্য জেলে যেতে হয় তাকে। জেল থেকে বেরিয়ে সে দেখে মানুষজন তাকে সাধু ভাবছে। ভাবনাটা তার নিজেরও মনে ধরে। সে সাধুর বেশ ধারণ করে। কিন্তু খরার সময় মানুষজন যখন বৃষ্টি নামানোর আবেদন জানায় তখন 'মহাত্মা' রাজু বৃষ্টির জন্য উপবাস শুরু করে। তার শরীর অবসন্ন হতে থাকে, এক সময় সে জ্ঞান হারায়। সত্যিকারের এই কষ্টের ভেতর দিয়ে বৃষ্টি নামল কিনা বোঝা যায় না কিন্তু উপন্যাসের শেষে এক মিথ্যে সাধুর সত্যিকারের কষ্টের এক মর্মস্পর্শী বিবরণ রয়েছে।

অনেক সমালোচকই মনে করেন 'পথপ্রদর্শক'-ই নারায়ণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সূক্ষ্ম আইরনির সঙ্গে নৈতিক কল্পনার এমন অপূর্ব মিশ্রণ তাঁর অন্য কোনো লেখাতে চোখে পড়ে না। বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক এম. কে. নায়েকের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'রেলের গাইড থেকে অর্ধেক সচেষ্ট এবং অর্ধেক ইচ্ছা নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় রাজুর গুরু হয়ে ওঠার কাহিনী আইরনির মধ্য দিয়ে বেশ নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক কিন্তু এই আইরনি সুখ-দুঃখের সাধারণ মিশ্রণ নয়। মানুষের পরিকল্পনা এবং কাজের বিষয়ে বেশ কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন জেগে ওঠে। আমাদের ভাবায় বাইরের চেহারা এবং বাস্তবতা, মানুষ এবং মুখোশ, পরিণতি এবং পদ্ধতির ভেতর দূরত্ব বিষয়ে।' কাহিনী-বিবরণ বর্তমান থেকে অতীতে গেছে আবার অতীত থেকে ফিরে এসেছে বর্তমানে। উপন্যাসটি আকারে বিশেষ বড় না হলেও এর মধ্যে এক ধরনের মহাকাব্যিক চরিত্র আছে—বিশেষ করে জীবনকে একটি গভীর স্তরে স্পর্শ করার প্রচেষ্টার মধ্যে।

নারায়ণের 'ওয়েটিং ফর মহাত্মা' (মহাত্মার জন্য প্রতীক্ষা) উপন্যাসটির প্রেক্ষিত ১৯৪২-এর ভারতবর্ষ। কাহিনীর নায়ক শ্রীরাম একজন স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী। কিন্তু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতমাতার চেয়ে ভারতী নামের একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীর প্রতি বেশি উৎসাহী হয়ে পড়ে। বিয়েতে কাহিনীর পরিণতি। মালগুদিতে গান্ধীর কারাবরণের পর বিশৃঙ্খল অবস্থার এক মজার বিবরণ হয়েছে উপন্যাসটিতে। পরের উপন্যাস 'দ্য ভেন্ডর অব সুইটস' (মিষ্টি বিক্রেতা) উপন্যাসেও গান্ধীর প্রসঙ্গ এসেছে। মিষ্টি-বিক্রেতা জগন গান্ধীবাদী কিন্তু

তার ছেলে মালি পশ্চিমী সংস্কৃতির ভক্ত। সে আমেরিকা থেকে বাড়ি ফেরে একজন আধা-আমেরিকান আধা-কোরিয়ান মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যে তার বিবাহিত স্ত্রী নয়। ছেলের কাজকর্মে বাবা হতাশ হয়ে স্বর্গবাসের প্রতীক্ষা করে। দুই প্রজন্ম এবং দুই সংস্কৃতির টানাপোড়েনকে কাহিনীতে তুলে ধরেন নারায়ণ।

নারায়ণের মালগুদি নামের এক কাল্পনিক ভূখণ্ড বেশ কটি উপন্যাসে এক অপূর্ব প্রেক্ষিত গড়ে তুলেছে। ঐ অঞ্চলের মানুষের ছোট ছোট ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুখ-দুঃখকে খুবই তির্যকভাবে তুলে ধরেছেন নারায়ণ। সাধারণ আটপৌরে মানুষের চেয়ে ছকের খানিক বাইরের মানুষের প্রতি নারায়ণের আকর্ষণ বেশি। তারাই নারায়ণের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সামাজিক অঙ্কে এইসব মানুষের দাম তেমন কিছু নেই কিন্তু তারা এমন কিছু কাজ করে যে জীবনের প্রচলিত সংজ্ঞাগুলিতে পাঠক আর আগের মতো আস্থা রাখতে পারে না।

৯.৪ রাজা রাও

কর্নাটকের হাসান অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে রাজা রাওয়ের জন্ম। পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যারণ্য স্বামী যিনি অদ্বৈতবাদ তত্ত্বের একজন অন্যতম পণ্ডিত ছিলেন। শৈশবে এ-রকমই এক দার্শনিক পরিবেশে রাজা রাও বড় হয়ে ওঠেন এবং তাঁর জীবনযাপন ও লেখার মধ্যেও তার প্রভাব পড়ে। ১৯২৯ সালে ১৯ বছর বয়সে রাজা রাও ফরাসী দেশে চলে যান পশ্চিমী মরমিয়াবাদের ওপর গবেষণার কাজে। তারপর থেকেই বিদেশবাসী যদিও ফরাসী দেশ থেকে পরে আমেরিকায় চলে যান।

রাজা রাওয়ের প্রথম উপন্যাস 'কন্থপুর' প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। মালাবার উপকূলের এই ছোট্ট গ্রামটিতে মানুষজনের জীবনে সবচেয়ে জরুরি বিষয় ছিল বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে ধান রোওয়া। সেই গ্রামে ১৯৩০ সালে গান্ধীজির স্বাধীনতা আন্দোলনের হাওয়া লাগল। মানুষজন প্রথম দিকে কিছুটা উদাসীনই ছিল কিন্তু তরুণ গান্ধীবাদী মূর্তির উৎসাহে হরিকথার মধ্য দিয়ে গান্ধীর কথা মানুষজনকে শোনানো হল। তাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের যতটা প্রভাব মানুষের মধ্যে পড়ল প্রায় ততখানিই বিরোধিতা গড়ে উঠল গ্রামের রক্ষণশীল মানুষজনের তরফে। অন্যদিকে লোকবিশ্বাসে গান্ধী হয়ে উঠলেন আর এক হিন্দু অবতার। এভাবেই চিরাচরিত বিশ্বাস এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে ভারতবর্ষের একটি ছোট জনপদে।

যে শৈলীতে রাজা রাও এই কাহিনীটি গড়ে তুলেছেন তা বেশ আকর্ষণীয়। একজন বৃদ্ধা ঠাকুমা ঘটনাটি শোনাচ্ছেন হরিকথার রীতিতে। সেখানে বিবরণ, বিশ্লেষণ, লোককথা, ধর্ম মিলে মিশে যাচ্ছে। রাজা রাওয়ের মাতৃভাষা কন্নড়ের শব্দ ও পদ ঢুকে পড়েছে। কাহিনী-গদ্যের এই রীতি বিষয়ে বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বইটির ভূমিকায় লিখেছিলেন :

> ভারতীয় জীবনের লয় আমাদের ইংরেজি লেখার মধ্যে সঞ্চার করা জরুরি যেভাবে আমেরিকান এবং আইরিশ জীবন তাদের সাহিত্যরীতিকে গড়ে তুলেছে। আমরা, ভারতবর্ষে, দ্রুত ভাবি, দ্রুত কথা বলি, যখন হাঁটি তখনও তাড়াতাড়ি হাঁটি। ভারতবর্ষের সূর্যতে এমন কিছু আছে যা আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে চলে। আমাদের পথও অন্তহীন। মহাভারতে ২,১৪,৭৭৮টি পদ আছে, রামায়ণে ৪৮,০০০। পুরাণে অসংখ্য। আমাদের বিরামচিহ্ন নেই, বিভ্রান্তিকর 'এখানে-সেখানে' বা 'ওপরে' আমাদের বিরক্ত করে না—আমরা একটাই চলমান গল্প বলে যাই। একটার পর একটা উপাখ্যান আসে। ভাবনা ফুরোলে শ্বাস পড়ে, তারপর আর এক গল্প। এটাই ছিল আমাদের গল্প বলা। আজও আমাদের কথনের পরিচিত রীতি এটাই। আমাদের বর্তমান গল্পে আমি সেটিই অনুসরণ করতে চেয়েছি।

রাজা রাওয়ের উপন্যাস 'দ্য সার্পেন্ট অ্যান্ড দ্য রোপ' (সর্প ও রজ্জু) প্রকাশিত হল প্রায় তেইশ বছর পরে, ১৯৬০ সালে। বইটি ১৯৬৩ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। বইটিতে লেখকের আত্মজীবনীর

প্রক্ষেপ রয়েছে বলে অনেক পাঠক-আলোচক মনে করেন। বইটির কেন্দ্রীয় চরিত্র রামস্বামী ফরাসী দেশে ইতিহাসের গবেষণা কাজে যান। সেখানে ইতিহাসের এক শিক্ষিকা মাদলিনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সেখান থেকে প্রেম ও বিয়ে। কিন্তু পরে দুজনেরই মনে হয় পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতির যে দূরত্ব তা যেন তাঁদের ভেতরও ক্রিয়াশীল। এরপর রামস্বামীর আলাপ ঘটে কেম্ব্রিজে গবেষণারত সাবিত্রীর সঙ্গে। সে আধুনিকা কিন্তু মনের গভীরে একান্তভাবে ভারতীয়। মাদলিন সরে যান রামস্বামীর জীবন থেকে, পরে পৃথিবী থেকেও। রামস্বামী একসময় অনুভব করেন সাবিত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শরীরবৃত্তে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমনই হওয়া দরকার যা তাঁদের ঈশ্বরের সঙ্গে মেলাতে পারে। উপন্যাস যেখানে শেষ হয় সেখানে রামস্বামী প্রতীক্ষা করেন গুরুর কাছে যাওয়ার জন্য যে গুরু তাঁকে অহংবোধ থেকে মুক্ত করে পরম সত্যের কাছে পৌঁছে দেবেন।

'সর্প ও রজ্জু' উপন্যাসটির মধ্যে এক গভীর দর্শন আছে। শঙ্করাচার্যের দর্শনের সূত্র থেকে লেখক বলতে চেয়েছেন যে অনেক সময়েই যেমন দড়িকে সাপ বলে মনে হয় তেমনই ক্ষুদ্র অহংকে স্বতন্ত্র আত্মা বলে ভ্রম হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের একটি সামান্য অংশ। গুরুর মাধ্যমে জীব মিলিত হয় শিবের সঙ্গে। কাহিনীর শেষের দিকে নায়কের সেই আর্তি এই রকম :

> এখন আমার মনে হয় আমি জানি, কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরে আমায় যে যেতে হবে, যেতেই হবে। এখন আমার কাশী নেই, গঙ্গা নেই, যমুনা নেই; ত্রিবাঙ্কুরই আমার দেশ, ত্রিবাঙ্কুরই আমার নাম। প্রভু আমায় গ্রহণ কর, অনুগ্রহ করে আমায় বলে দাও যেখানে আমার থাকা উচিত সেখানে যেন থাকি। গেয়র্গেসিকে আমি বলি কি করে, কি করে বলব আমি? সে কি বুঝবে? মাদলিন কি তার চক্র আর বজ্র নিয়ে এই সাদাসিধা, এই চিরপ্রদীপ্ত পরমসত্যকে বুঝবে? পরমসত্য বাস্তবিকই সেই তিনি, গুরু। না না, তিনি সংজ্ঞার বাইরে। তিনি আছেন, তুমিই নেই।
>
> (অনুবাদ রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

রাজা রাওয়ের পরবর্তী উপন্যাস 'দ্য ক্যাট অ্যান্ড শেক্সপিয়র' (বিড়াল এবং শেক্সপিয়র) বইটির একটি প্রাথমিক রূপ ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হলেও মূল বইটি প্রকাশ পায় ১৯৬৫ সালে। লেখক এটিকে 'প্রার্থনার গ্রন্থ' বলে উল্লেখ করেন। বইটির প্রধান তিনটি চরিত্র হল রামকৃষ্ণ পাই এবং গোবিন্দন নায়ার নামে দুই ব্যক্তি এবং একটি বিড়াল। রামকৃষ্ণ এবং গোবিন্দনের জীবিকায় মিল রয়েছে, দুজনেই করণিক কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বেশ দূরত্ব। রামকৃষ্ণের স্বপ্ন একটা বড় বাড়ি বানানো আর গোবিন্দনের প্রচেষ্টা পরমাত্মায় বিলীন হওয়া যাকে সে 'মা বিড়াল' বলে উল্লেখ করে। এই ভাবনার পেছনে কাজ করে একাদশ শতাব্দীর দার্শনিক রামানুজাচার্যের পরিবর্তিত অদ্বৈতবাদ যার মূল ভাবনা ছিল এই যে বিদ্যা বা জ্ঞান নয়, আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে। রামানুজের মৃত্যুর পর এই ভাবনা মর্কট-ন্যায় এবং মার্জার-ন্যায় নামের দুই ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। সেখান থেকেই রাজা রাওয়ের বর্তমান কাহিনীর বিড়াল আসে। আর শেক্সপিয়র চলে আসেন গোবিন্দনের 'টু বি অর নট টু বি' ভাবনায়, হ্যামলেট নাটকের ইঁদুর-ফাঁদ ইত্যাদি নানা অনুষঙ্গে।

রাজা রাওয়ের আরো অন্য একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'কমরেড কিরিল্লভ', যা ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। ছোট আকারের জন্য এটিকে অনেকে বড় গল্পও বলে থাকেন। কমরেড কিরিল্লভের প্রকৃত নাম পদ্মনাভ আয়ার যিনি একজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী। বর্তমান নামটি ব্যবহৃত হয়েছে দস্তয়েভস্কির 'ভূতগ্রস্ত' বই থেকে। কিরিল্লভ নিজেকে নামহীন কিন্তু যুক্তিবাদী বলে উল্লেখ করে এবং কমিউনিজমকে বলে তার জন্মভূমি। বর্তমান কাহিনীর প্রেক্ষিত তিরিশ ও চল্লিশের দশক। শেষ পর্যন্ত মস্কো যাত্রা করে সে পিকিংয়ে গিয়ে পৌঁছয়। মজার কিন্তু খুবই জীবন্ত কিরিল্লভের চরিত্রটি।

রাজা রাওয়ের 'দ্য চেসমাস্টার অ্যান্ড হিজ মুভস' (দাবাড়ু এবং তার চাল) উপন্যাসটি লেখা বাণভট্টের

'কাদম্বরী'তে ব্যবহৃত 'কথা' রীতিতে। ভারত, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের প্রেক্ষিতে লেখা এই বইটিতে মানবাত্মার গভীর সন্ধান রয়েছে।

ছোটগল্পকার হিসেবেও রাজা রাওয়ের বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় গল্পগুচ্ছ 'পোলিসমেন অ্যান্ড দ্য রোজ' (পুলিস এবং গোলাপ) সমালোচক ও পাঠকদের একটি প্রিয় সংকলন।

ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যে এখন নতুন লেখকেরা এসেছেন। এঁদের বইয়ের প্রচার বেশ ভাল। কিছুটা বিশ্বায়ন এবং কিছুটা ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার ব্যবস্থার বিস্তারের কারণে দেশ-বিদেশের পাঠকদের মধ্যে ইংরেজি ভাষার ভারতীয় সাহিত্য পড়ার উৎসাহ বেড়েছে। ভি. এস. নইপাল, যাঁর পূর্বপুরুষ ভারত থেকে ত্রিনিদাদে গিয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে, নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইংরেজিতে সাহিত্যকর্ম রচনার জন্য। যদিও নইপাল ব্রিটিশ নাগরিক তবু এটিকে ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম স্বীকৃতি বলে অনেকে মনে করেন। অমিতাভ ঘোষ, ঝুম্পা লাহিড়ি এবং অরুন্ধতী রায়ের সাফল্য নতুন প্রজন্মের লেখকদের আরো বেশি উৎসাহিত করেছে এবং করছে।

৯.৫ অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক এবং কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।

(ক) ভারতীয় ইংরেজিতে প্রথম সৃষ্টিশীল সাহিত্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮২৭ সালে।

(খ) ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় কথাসাহিত্যের জনক হলেন রাজনারায়ণ দত্ত।

(গ) খুশবন্ত সিং 'মার্গ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।

(ঘ) ই. এম. ফর্স্টারের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া'।

(ঙ) রাজা রাওয়ের মাতৃভাষা তামিল।

২। পাঁচটি বাক্যে আলোচনা করুন।

(ক) ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যে ভারতীয়তা।

(খ) মহাত্মা গান্ধী ও ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য।

৩। দশটি বাক্যে আলোচনা করুন।

'আনটাচেবল' (অস্পৃশ্য)।

৪। কুড়ি থেকে পঁচিশটি বাক্যে আলোচনা করুন।

ভারতীয় ইংরেজি কথাসাহিত্যের শৈলী।

একক ১০ ❐ মরাঠি

গঠন

১০.১ প্রস্তাবনা
১০.২ হরিনারায়ণ আপ্তে
১০.৩ ভি. এস. খাণ্ডেকর
১০.৪ শ্রীপদ নারায়ণ পেন্ডসে
১০.৫ ভালচন্দ্র নেমাড়ে
১০.৬ অনুশীলনী
১০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ প্রস্তাবনা

১৮১৮ সালে মরাঠা শাসনের অবসান ঘটে, ইংরেজরাজ পর্বের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী সাত-আট দশক ধরে নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে রাজ্যপরিচালনা এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে। একটি নব্য শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে ওঠে যাঁরা নানা সংস্কারে উদ্যোগী হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন গোপালহরি দেশমুখ (১৮২৩-৯২), মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪৮-১৯০১), গোপাল গণেশ আগরকর (১৮৫৬-৯৫), দীপ্তি শাস্ত্রী চিপলুংকার (১৮৫০-৮২), মহাত্মা জ্যোতি রাও ফুলে (১৮২৭-৮৯) প্রমুখ। ইতিমধ্যে ইংরেজি বইপত্রের অনুবাদ প্রকাশ শুরু হয়েছে ইংরেজদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণযন্ত্রে।

এসবের ছোঁয়া লাগে সাহিত্যেও। আধুনিক কবিতার সূত্রপাত ঘটে কেশবসুতের (১৮৬৬-১৯০৫) রচনায়। পালগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারি' সংকলনটির মাধ্যমে পশ্চিমী রোমান্টিকতার সংমিশ্রণ ঘটান তিনি ভারতীয় অদ্বৈতবাদী দর্শনের সঙ্গে। নাটকের ক্ষেত্রে নতুন অনুভূতি ও প্রকরণের প্রথম পরিচয় মেলে বলওয়ান্ত পাণ্ডুরং কিরলোসকারের (১৮৪৩-৮৫) লেখা 'সৌভদ্রা' (অর্জুন-সুভদ্রার প্রেমকাহিনী অবলম্বনে) বইটিতে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে (মরাঠিতে উপন্যাস শিল্পরূপটি কাদম্বরী নামে চিহ্নিত) নতুন সাহিত্যের অগ্রদূত হলেন বাবা পদমজী (১৮৩১-১৯০৬)। তাঁর 'যমুনা-পর্যটন' (১৮৫৭) বইটিকে প্রথম মরাঠি উপন্যাস বলে ধরা হয়। উপন্যাসের নায়ক বিনায়ক ও নায়িকা যমুনা। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই স্বামী-স্ত্রী একবার ভ্রমণে বেরিয়ে লক্ষ করেন হিন্দু বিধবারা, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়েরা, কিভাবে শোষিত হচ্ছে। কেউ ভিক্ষা করছে, কেউ আবার শরীর বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রয়োজনে। এই দৃশ্য দেখে তারা খুব আঘাত পায়। ফিরে আসার পর এক দুর্ঘটনায় পড়ে বিনায়ক। অবস্থার অবনতি ঘটে এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। বিনায়ক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং বিনায়কের মৃত্যুর পর যমুনাও একই ধর্মে দীক্ষিত হয়। বিনায়কের ইচ্ছে মতো নতুন করে বিবাহও করে যমুনা। এখানে উল্লেখ করা যায় যে লেখক পদমজীও ১৮৫৪ সালে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে পদমজীর সমসাময়িক ব্যক্তিরা হলেন শ্রীলক্ষ্মণশাস্ত্রী হল্‌বে, রা. বি. গুঞ্জীকর, এন. এস. রিমবাদ প্রমুখ। লক্ষ্মণশাস্ত্রীর 'মুক্তা-মালা' (১৮৬১), গুঞ্জীকরের 'মোচন-গড়' (১৮৬৭) এবং রিসবাদের 'মঞ্জুঘোষ' (১৮৬৭) পাঠকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে সত্যিকারের আধুনিক মরাঠি উপন্যাস ও গল্পের সূত্রপাত যাঁর হাতে তিনি হলেন হরিভাউ বা হরিনারায়ণ আপ্তে (১৮৬৪-১৯১৯)। পরবর্তী সময়ে যাঁরা মরাঠি কথাসাহিত্যে

উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নাথ মাধব (১৮৮২-১৯২৮), ভি. এম. জোশী (১৮৮২-১৯৪৩), এস. ভি. কেটকর (১৮৮৪-১৯৩৭), নারায়ণ সীতারাম ফাড়কে (১৮৯৪-১৯৭৮), ভি. এস. খাণ্ডেকর (১৮৯৮-১৯৭৬), পি. ওয়াই. দেশপাণ্ডে (১৮৯৯-১৯৮৬), জি. টি. মাদখোলকর (১৮৯৯-১৯৭৬), ভি. ভি. হড়প (১৯০০-৬০), বিশ্রাম বেদেকর (জন্ম ১৯০৬), এস. এন. পেণ্ডসে (জন্ম ১৯১৩), গঙ্গাধর গ্যাডগিল (জন্ম ১৯২৩), ভালচন্দ্র নেমাড়ে (জন্ম ১৯৩৮) প্রমুখ। আমরা হরিনারায়ণ আপ্তে, ভি. এস. খাণ্ডেকর, এস. এন. পেণ্ডসে এবং ভালচন্দ্র নেমাড়ের লেখা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করতে পারি।

১০.২ হরিনারায়ণ আপ্তে

হরিনারায়ণের জন্ম ১৮৬৪ সালের ৮ মার্চ। পড়াশোনা মুম্বাই এবং পুণাতে। ১৮৮০-৮২ পর্বে পুণাতে পড়ার সময়ে তিনি বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুংকার, গোপাল গণেশ আগরকর, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ চিন্তাবিদ শিক্ষকদের সংস্পর্শে আসেন। এখানেই তিনি ভারতীয় সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ নেন। অনেকগুলি দেশি-বিদেশি ভাষাও শেখেন যার মধ্যে বাংলা অন্যতম। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর বেশিদূর এগোয়নি। এর কারণ প্রথাগত শিক্ষা বিষয়ে তাঁর অনীহা এবং পারিবারিক অর্থনৈতিক টানাপোড়েন। সংসার জীবনেও তাঁকে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগার বছরের মেয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ, একমাত্র কন্যার মৃত্যু—এরকম বহু কিছুরই মুখোমুখি হয়েছেন। সম্পাদনা করেছেন একাধিক পত্রপত্রিকা। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এগারোটি সামাজিক উপন্যাস, এগারটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, চারটি গল্প-সংগ্রহ, একাধিক মূল ও অনুবাদ নাটক এবং বক্তৃতা ও চিঠিপত্র।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মধ্লী স্থিতি' (মধ্যবর্তী অবস্থান) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে। লেখার সূত্রপাত জি. ডবলিউ. রেনল্ডস্-এর 'দ্য মিসট্রিস অব ওল্ড লন্ডন' বইটি মরাঠি ভাষায় নব-রূপায়ণের সূত্রে। কাজটি করতে গিয়ে তাঁর মনে হয় পুনর্নির্মাণের চেয়ে নিজের মতো করে নতুন উপন্যাস লেখাই ভাল। টুকরো টুকরো আট-নটি কাহিনী জুড়ে এই উপন্যাস যাকে 'আজকালচ্যা গোষ্ঠী' বা আজকালকার কাহিনী বলে উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসটি বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক আর. বি. জোশীর মন্তব্য হল : 'ঐ সময়ে লেখা অন্যান্য লেখা থেকে এটি এতই ভিন্ন ছিল যে এটিকে নতুন রীতির উপন্যাস বলে মনে হল। শৈলী হল সরাসরি, সরল এবং মানুষের মুখের ভাষা। এই ভাষাতে পাঠকেরা নিত্যদিন কথা বলে। গদ্যের মধ্যে সাহিত্যের প্রচলিত উচ্ছ্বাস বা অলঙ্করণ নেই। স্থান এবং চরিত্রের বিবরণ এতই যত্ন করে তৈরী করা এবং সেই বর্ণনা এতই বিস্তারিত যে পাঠকের চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে ওঠে।' ('হরিনারায়ণ আপ্তে' : ইংরেজি ভাষায় লেখা জীবনী, পৃষ্ঠা ২৮, সাহিত্য অকাদেমি)। কাহিনীটির প্রেক্ষিত পুণা শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশের ছবি। ছটি পরিবার এবং প্রায় পঞ্চাশটি চরিত্র রয়েছে প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠার এই বইটিতে। কাহিনীতে গোবিন্দরাও নামের এক খলচরিত্র তার দুই সঙ্গিনী কাকুবাই ও থামাবাইকে সঙ্গে নিয়ে মানুষজনকে ঠকিয়ে বেড়ায়। সে জানতে পারে যে বিনায়করাও নামে এক যুবক বাবার মৃত্যুর পর বেশ কিছু টাকা হাতে পেয়েছে। স্ত্রী সরস্বতী এবং মাকে নিয়ে সংসার করছে। গোবিন্দ রাও তাকে এক নৈশক্লাবের সদস্য করে দেয় যেখানে মদ্যপান ও গল্পগুজব হয়। মাঝে মাঝে বাইজিরা এসে গানও গেয়ে যায়। গোবিন্দরাওয়ের ইচ্ছায় নিজের বাড়িটিকে সাজিয়ে তোলে বিনায়ক এবং সেখানে মদ্যপান ও গানেরও ব্যবস্থা করে। একসময় মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। স্ত্রীকেও অত্যাচার করে। গোবিন্দ একদিকে স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে বিনায়কের মধ্যে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে, অন্যদিকে সরস্বতীকে স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকে। সরস্বতী ফাঁদে পা দেয় না কিন্তু গোবিন্দের

ষড়যন্ত্রে সরস্বতীকে এক মিথ্যা চুরির অভিযোগে ঘর থেকে বার করে দেয় বিনায়ক। ওদিকে গোবিন্দ বিনায়কের বাকি সম্পত্তি হাতিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করে। কিন্তু অন্য একজন মানুষ যে গোবিন্দের অপকর্মের খবর জানত সে পুলিশের সাহায্যে তাদের আটকায়। বিচারে জেল হয় তাদের। এদিকে বিনায়ক তার ভুল বুঝতে পেরে মা ও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে। গোবিন্দের চুরি করা অর্থও ফিরে পায়।

হরিনারায়ণের দ্বিতীয় একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'পণ লক্ষাৎ কোণ্ খেতো' (কিন্তু কে তোয়াক্কা করে?)। ১৮৯৩ সালে বই আকারে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি ১৮৯০ সালে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্র 'করমনুক'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এটি মূলত দুটি পরিবার নিয়ে এবং কাহিনীকথক হল যমুনা নামের একটি মেয়ে। সে তার আট-ন বছরের একটি ঘটনা দিয়ে তার পরিবারের কথা শুরু করে। পরিবারে তার মা-বাবা ছাড়াও সামান্য বড় এক দাদা এবং এক ছোট বোন ছিল। দাদু-ঠাকুমা কিছু দূরে গ্রামের বাড়িতে ছিল। বাবা ছিল কালেকটর অফিসের প্রধান করণিক। পরিবারের সকলে তাকে খুব ভয় পেত এবং পারলে ধারে কাছে আসত না। কাহিনীর প্রথম দিকে ছোটদের একটি পুতুলখেলার দৃশ্য রয়েছে। অফিস ফেরত বাবা তাদের খেলতে দেখে এমনই চিৎকার করে যে পুতুলের বিয়ে ছেড়ে আতঙ্কে পালিয়ে যায় তারা। পুতুলের মতো নারীদের জীবনেও আনন্দ বড় সাময়িক ও ঠুনকো। যমুনার বিয়ে হয় দাদার বন্ধু, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রঘুনাথের সঙ্গে। বাবাকে রঘুনাথ হারিয়েছে শৈশবে। মামা-কাকাদের বৃহৎ যৌথ পরিবারে সে থাকে। সেই পরিবারে দিদিমা, মাসিমা, শাশুড়ি এমন অনেকের বসবাস। শাশুড়ি এবং স্বামী ছাড়া সকলেই যমুনাকে নানাভাবে লাঞ্ছনা করে। ওদিকে যমুনার মা চতুর্থ বার প্রসবের সময় মেয়ের বিয়ের এক মাসের মাথায় মারা যায়। বাবা আবার বিয়ে করে এবং বাপের বাড়িতে যমুনার আসা নিয়ে সৎমা বিরক্তই হয়। ভাইয়ের বিয়ে হয়। যমুনা ভাবে তার কাছে সে বন্ধুত্ব পাবে কিন্তু সে আশাও মেটে না। ওদিকে ডিগ্রি পরীক্ষার পাশ করে রঘুনাথ মা ও যমুনাকে নিয়ে মুম্বই যায় আইন পড়তে, তার অন্য দুই বন্ধুও স্ত্রীদের নিয়ে আইন পড়তে গিয়েছিল। ফলে এই পর্বটি যমুনার জীবনে মুক্তির মতো, কিন্তু হঠাৎই চব্বিশঘণ্টার জ্বরে রঘুনাথ মারা যায়। যমুনাকে ফিরতে হয় পুণেতে। তাকে মাথা কামাতে বাধ্য করা হয়—তার মৃত স্বামী, ভাই এবং তার নিজের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে। এটা তার কাছে এক আতঙ্ক। ধীরে ধীরে মানসিক চাপে তার শরীর ভাঙে। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সে তার জীবন-কথা লিখে যায়। এক সময় সে পৃথিবী থেকে চলে যায়। 'কিন্তু কে তোয়াক্কা করে?' কাহিনীটি প'ড়লে বোঝা যায় আমাদের সমাজ নারীদের প্রতি কতখানি হৃদয়হীন। পরিবারের বেশ কিছু নারী চরিত্রও তাদের আচরণে খুবই নির্মম। হরিনারায়ণ তাঁর উপস্থাপনা শক্তির বিশিষ্ট ক্ষমতায় চরিত্রগুলিকে গড়ে তুলেছেন। নারীদের ভাষার যে নিজস্ব গড়ন এবং প্রেক্ষিতের ভিন্নতায় সে ভাষার ভেতরের যে ভাঙা-গড়া তা সুন্দর ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। সামাজিক টানাপোড়েনও ধরা পড়েছে—বিশেষ করে সামন্ততান্ত্রিকতা এবং আধুনিকতার মধ্যে সংঘাত।

১৮৯২-৯৫ পর্বে প্রকাশিত 'যশোবন্তরাও খারে' উপন্যাসটি হরিনারায়ণ আপ্তের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠার এই বইটিতে যশোবন্ত নামের একটি কিশোরের বারো থেকে বিশ বছর পর্যন্ত জীবনের পর্যায়টি ধরা হয়েছে। পড়াশোনার জন্য ছেলেটি একজন রাও বাহাদুরের সাহায্য নেয়, যিনি নিজেকে সমাজ-সংস্কারক বলে মনে করেন। একই সঙ্গে তিনি ইংরেজ শাসনের ঘোর সমর্থক। কিন্তু তিনি এবং তাঁর পরিবারের নারী-পুরুষেরা নিজেদের মানমর্যাদা নিয়ে এতই সচেতন এবং দাম্ভিক যে যশোবন্ত সেখানে টিকতে পারে না। সে যে শুধু ঐ পরিবার বিষয়ে হতাশ হয় তা নয়, সমাজ-সংস্কার ব্যাপারটি তার কাছে অনীহার বিষয় হয়ে ওঠে। অন্য দিকে লাঞ্ছনা ও অপমানে সে কেমন ভেঙে পড়ে, তার পরিবারের মধ্যেও একলা হয়ে যায়—ভাবে কেউ তাকে ভালবাসে না, মা-ও না। ঠিক এমনই এক বিপদের সময় হঠাৎই শ্রীধরপন্থ নামে এক বিদ্বান ও জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে তার আলাপ হয়। শ্রীধরপন্থ সহানুভূতি ও ভালবাসা দিয়ে যশোবন্তরাওয়ের মন জয় করে। কলেজ

শিক্ষা সমাপ্ত হয়। সেও রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার আদর্শ ইটালিয়ান দেশপ্রেমী মাজিনি। যশোবন্তরাও খারে, অন্যদিকে, তৎকালীন সমাজসংস্কারকদের ভূমিকা নিয়েও বেশ সরব। এই উপন্যাসটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনের একটি পর্বে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজ শাসন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতার কারণে। সেই টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় নবজাগরণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় শিক্ষিতশ্রেণীর একটি অংশের ভেতর। যশোবন্তরাও খারের চরিত্র নির্মাণটিও অনেক পাঠকের কাছে বিস্ময়কর— বিশেষ করে বাইরের ঘাত-প্রতিঘাত একটি কিশোরের মনকে যেমনভাবে আন্দোলিত করছে এবং কিশোরটি যৌবনের পথে কিভাবে এগিয়ে চলেছে বিশ্বাসের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে।

হরিনারায়ণের আর একটি জরুরি উপন্যাস হল 'মী' (আমি), যা ১৮৯৩-৯৫ পর্বে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আত্মজীবনীর ভঙ্গীতে লেখা উপন্যাসটি। যে আত্মজীবনী শোনাচ্ছে সে হচ্ছে ভাও। কলা এবং আইনে স্নাতক হয়ে সে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার সিধান্ত নেয়। বক্তৃতা দেয়, নিজের চিন্তা কাগজে ছেপে প্রচার করে এবং একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে নারী ও পুরুষদের সেবাকার্যে উদ্বুধ করে। ভাও হয়ে ওঠে ভাবানন্দ এবং মানুষের সেবা হয়ে ওঠে তার জীবনের একমাত্র কর্ম। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত শ্রমের কারণে শরীর ভেঙে যায় এবং মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নেয়। তারই শিষ্য রামানন্দ কাহিনীটি সম্পূর্ণ করে। সেখানে রামানন্দ জানান একসময় ভাবানন্দ ছিলেন নেতা কিন্তু এখন ধর্মগুরু। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক অনন্ত কাণেকর লিখেছেন যে হরিনারায়ণের উপন্যাসে নায়ক চিত্রিত হন পথ-প্রদর্শক রূপে, যিনি মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলেন এবং সৎ ভাবনারাশির সঞ্চার করেন। (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অনূদিত 'মী' উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ 'আমি'-র প্রস্তাবনা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৭২/৭৪)। এই উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এখানে ঔপন্যাসিক সমাজসংস্কারের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন কিন্তু তা 'যশোবন্ত রাও খারে' উপন্যাসের রাও বাহাদুর বা তার পরিবারের রীতিতে নয়। এখানে সমাজসংস্কার দেশ ও মানুষকে জড়িয়ে। তাই ভাবানন্দের কাছে পরমার্থ হল দেশের হিতসাধন এবং মোক্ষ হল দেশকে দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। আর আশ্রমবাসীদের কাছে তার পরামর্শ হল— জ্ঞানের প্রচার করো, দরিদ্রের কাছে গিয়ে তাদের আশা-আকাঙক্ষা জেনে নাও।

হরিনারায়ণের অবদান বিষয়ে সমালোচক অনন্ত কাণেকরের মন্তব্য হল, 'কল্পনাশ্রয়ী অদ্ভুত বাতাবরণ থেকে বাস্তবানুগ বাতাবরণ পর্যন্ত হরিভাউ-এর সাহিত্যকৃতির চিত্রপট বিস্তৃত। জীবনকে সম্পূর্ণতায় দেখবার প্রয়াস এবং তাকে সুনিয়োজিত কথা দ্বারা অনবদ্যভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতার গুণে মরাঠি সাহিত্যে হরিভাউ-এর বিশিষ্ট স্থান ও এই তাঁর বিশিষ্ট অবদান।' ('মী' উপন্যাসের প্রস্তাবনা, অনুবাদ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র)।

১০.৩ ভি. এস. খাণ্ডেকর

পুরো নাম বিষ্ণু সখারাম খাণ্ডেকর, জন্ম ১৮৯৮ সালের ১৯ জানুয়ারি সাঙ্গলিতে। ওখানেই বাবা মুন্সেফ হিসেবে কাজ করতেন ফলে ইস্কুলশিক্ষা পর্বটি সাঙ্গলিতেই কাটে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অষ্টম স্থান পান ১৯১৩ সালে। পরে ডিগ্রি স্তরে পড়তে পুণেয় যান। কিন্তু অর্থনৈতিক চাপের কারণে গৃহশিক্ষকতা করে পড়াশোনা চালাতেন। পরে কাকা তাঁকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় বিষ্ণু সখারাম, নইলে পৈতৃক নাম ছিল গণেশ আত্মারাম। কাকার কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য মিলবে এমন আশাতেই পালিত পুত্র হওয়া কিন্তু সে আশা মেটেনি। ফলে কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে সাওয়ান্তওয়াড়ি চলে যান এবং তিন বছর দারিদ্র্য আর ম্যালেরিয়ার ভোগেন। পরে কাছাকাছি একটি ইস্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নেন। শিক্ষক হিসেবে বেশ সুনামও অর্জন করেন। পাশাপাশি চলতে থাকে সাহিত্যের লেখালিখি, বিশেষ করে প্রবধ। তারপর বন্ধু মেঘাশ্যাম

শিরোদকরের অনুরোধে একটি সাপ্তাহিকের সাহিত্য বিভাগের দায়িত্ব নেন তিনি, অবশ্য শিক্ষকতার পাশাপাশি। তবে এর ফলে ১৯২৫ সাল থেকে তাঁর লেখালেখির সংখ্যা বেড়ে যায়। নানা পত্রপত্রিকায় ছোটগল্প প্রকাশিত হতে থাকে। একে একে নাটক, গল্পগ্রন্থ, উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তিনের দশকে চিত্রনাট্য লেখাও শুরু করেন। ঐ সময়েই ত্বকের অসুখের কারণে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন এবং কোলহাপুরে বসবাস করতে চলে যান। এখানেই নতুন নতুন লেখা তিনি লিখতে থাকেন। প্রকাশিত হতে থাকে নতুন নতুন বই। ১৯৭৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে তিনি পনেরটি উপন্যাস, ঊনত্রিশটি গল্প-সংকলন, একটি নাটক, আঠারটি চিত্রনাট্য, নটি আলোচনা গ্রন্থ ইত্যাদি দিয়ে প্রায় পঁচাত্তরটি বই প্রকাশ করেন। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান ১৯৬০ সালে, পদ্মভূষণ সম্মান ১৯৬৮-তে, সাহিত্যে অকাদেমি ফেলো হন ১৯৭০-এ এবং জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান ১৯৭৪ সালে।

খাণ্ডেকরের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি হল 'হৃদয়চি হক' (হৃদয়ের ডাক, ১৯৩০), 'কাঞ্চন মৃগ' (সোনার হরিণ, ১৯৩১), 'উল্কা' (১৯৩৪) এবং 'দোনধ্রুব' (দুই মেরু, ১৯৩৪)। চারটি উপন্যাসেই কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে এসেছে মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। কিন্তু সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের, জীবনযাপনের বিড়ম্বনার কথাও বলা হয়েছে। এসেছে নারী-জীবনের নানা দুঃখ হতাশার কথাও। সমাজে প্রগতিশীল এবং প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল মানুষজনের মধ্যের দ্বন্দ্বও রূপ পেয়েছে কোনো কোনো উপন্যাসে। এই দিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কাঞ্চন মৃগ' উপন্যাসটি। সুধাকর শহর থেকে গ্রামে যায় শিক্ষকতার জীবিকা নিয়ে। তার গ্রামে যাওয়ার অন্যতম কারণ হল সেখানকার জীবনযাত্রার উন্নতিসাধন। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে, যার নাম সুধা। মেয়েটি বিধবা ফলে রক্ষণশীল সমাজ তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়ে ওঠে। কিন্তু সে সবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা জেতে এবং সুধাকর তার গ্রাম সংস্কারের মূল লক্ষ্যে কাজ করে চলে। এটিই হওয়া উচিত শিক্ষিত মানুষজনের জীবনের উদ্দেশ্য কিন্তু তারা সীতার মতো সোনার হরিণের লোভে জীবনকে ভুল পথে চালনা করছে। নগরজীবনের তথাকথিত সুখে দিন কাটাচ্ছে। বইটির ভূমিকায় ঔপন্যাসিক বলেন যে ভারতমাতার পোশাক হচ্ছে শহর আর তার হাড়-মাংস হচ্ছে গ্রাম। প্রথমটিকে গুরুত্ব দেওয়া এবং দ্বিতীয়টিকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে সীতার সোনার হরিণ চাওয়া।

খাণ্ডেকরের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'যযাতি' প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। এক পৌরাণিক আখ্যানের মধ্য দিয়ে লেখক এখানে আধুনিক মানুষের সীমাহীন চাহিদার কথা বলেছেন। সেই চাওয়ার কোনো শেষ নেই। ব্যক্তিজীবন থেকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই এক দৃশ্য। শুধুই বস্তুবাদী প্রচেষ্টা। মহাভারতের যযাতির কামনাও ছিল অনিয়ন্ত্রিত। অশোকবনে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে মিলনের পর থেকে সে কামনার দাস হয়ে যায়, ইন্দ্রিয় অনুভূতি তাকে তাড়না করে বেড়ায়। বর্তমান কালের মানুষজনের একটি অংশের মধ্যেও এক সীমাহীন কামনা—অর্থ, যশ, ক্ষমতার জন্য। এর বিপরীত চরিত্র কচ। সে জানে আবেগকে কেমন করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কচ এবং অঙ্গিরস মুনি যযাতিকে সে সব কথা শুনিয়েও ছিল। তখন তার ভেতর কামনা এবং দর্শনের এক টানাপোড়েন শুরু হয়। খাণ্ডেকরের উপন্যাসে এর সুন্দর বিবরণ রয়েছে। উপন্যাসের তিরিশতম পরিচ্ছেদে যযাতির মৃত্যু আতঙ্কের একটি অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। যযাতি ছুটে এসেছে হস্তিনাপুরে বাবার মৃত্যু আসন্ন মৃত্যু সংবাদে। মৃত্যুশয্যায় বাবার স্মৃতিশক্তি হারানো, বেঁচে থাকার জন্য শারীরিক আর্তি ইত্যাদি যযাতির মধ্যে এক তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মৃত্যু চিন্তা থেকে মুক্ত হতে সে সুদূর গুহায় চলে যাবে ভাবে কিন্তু এও বোঝে সেখানেও মৃত্যুর ঠাণ্ডা হাত এগিয়ে যাবে। যযাতি এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেতে সুরা চায় কিন্তু মুকুলিকা বলে রানীমার নির্দেশে ঐ কুঠিতে সুরাপান নিষেধ কারণ সাধু-যোগীরা ওখানে এসে থাকেন। যে যযাতি পশু শিকারে মত্ত থাকে,

নারীর শরীর যার আনন্দের প্রধান উৎস সে হঠাৎই কাঁপতে থাকে। বলে, 'আমি আমার একাকিত্বে ভয় পাই। কারো সাহায্য চাই।' পাশে হেলতে হেলতে সে মুকুলিকার হাত ধরে ফেলে।

মরাঠি ছোটগল্পেও খাণ্ডেকরের অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রায় দুশটি ছোটগল্প লিখেছিলেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'ফুল ও পাথর', 'নারী ও পুরুষ', 'আজ ও কাল', 'স্বর্গ ও নরক', 'স্বপ্ন ও জীবন' ইত্যাদি। লক্ষ করলে দেখা যায় যে দুই বিপরীতের কথা বলতে চাইছেন গল্পকার। জীবনের এই দ্বৈততা নিয়ে খাণ্ডেকর লিখেছিলেন, 'জীবন একটি ধারাবাহিক সংঘাতের বৃত্তান্ত—সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, পবিত্রতার সঙ্গে অপবিত্রতার, স্থূলতার সঙ্গে সূক্ষ্মতার, তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবতার।' সততা, সহানুভূতি ইত্যাদি বিষয় এসেছে তাঁর 'পূজা', 'অপঘাত', 'পার্বতী' ইত্যাদি গল্পে। দেশি-বিদেশি বহু গল্পকারের গল্পের পাঠক ছিলেন খাণ্ডেকর, সেসব লেখা নিয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গল্প খুবই পছন্দ করতেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে আদর্শ ভারতীয় গল্প বলে উল্লেখ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পের কাব্যিক শৈলীও তাঁকে আকর্ষণ করত। তিনি মনে করতেন রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা', 'অতিথি', 'পোস্টমাস্টার' গল্পগুলি মোঁপাসার 'কণ্ঠহার' কিংবা ও হেনরির 'সাধুদের উপহার' (গিফ্‌ট অব দ্য মাজাই)-এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কারণ রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির অনুভূতির গভীরতা 'কণ্ঠহার' বা 'সাধুদের উপহার' গল্পে নেই।

অনেক সমালোচকই মনে করেন যে বিষ্ণু সখারাম খাণ্ডেকর শুধু একজন লেখকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক এবং একটি যুগের নান্দনিক ইতিহাসকার।

১০.৪ শ্রীপদ নারায়ণ পেণ্ডসে

শ্রীপদ নারায়ণের জন্ম ১৯১৩ সালে, মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন অঞ্চলে। ছবির মতো সাজানো এই উপকূলবর্তী অঞ্চলটি তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের পটভূমি। এখানে তাঁর শৈশবের এগারো বছর কেটেছিল। পরে বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হন। ১৯৪০ সালে তাঁর লেখাপত্রের সূত্রপাত। তারপর থেকে দশটিরও বেশি উপন্যাস লিখেছেন। এর মধ্যে রয়েছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ওপর 'এলগর', একজন শিক্ষকের জীবন নিয়ে 'হুদ্দ-পর', বয়ঃসন্ধির জীবন দিয়ে 'হত্য', কোঙ্কন এলাকার জীবনের টানাপোড়েন নিয়ে 'গরমবীচা বপু' এবং একটি নারীর জীবনের টানাপোড়েন নিয়ে 'রথচক্র'। এছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্প সংকলন, নাটক এবং আত্মজীবনী। 'রথচক্র' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান ১৯৬৩ সালে।

'গরমবীচা বপু' (গরমবীরের বপু) উপন্যাসটি শুরুতে এলাকাটির একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক :

> গরমবীর ছোট রাজ্যটি পাহাড়ের একটি ডানায় ছড়িয়ে আছে। এই পাহাড়ের আশ্রয়েই রয়েছে বুরন্দি, বিভাল-পঞ্চারি এবং দুর্গেশ্বর। বুরন্দিতে এটি সোজা সমুদ্রে ঢুকে পড়েছে কিন্তু সেখান থেকে ডানদিকে ফিরেছে; যেখানে থেমে গরমবীকে কাছে টেনেছে সেটি উপকূল থেকে সাতমাইল দূরে। এখানে সামান্য জায়গা ছেড়ে রেখেছে বনদে নদীর জন্য। তারপর পেছন ফিরে সমুদ্রের দিকে এগিয়েছে, সেই সখারপেডি পর্যন্ত। প্রথম অংশটিকে বলা হয় গরমবীরের পাহাড় আর দ্বিতীয়টি পীরের পাহাড়। আর দুই উচ্চ স্থলরেখা জুড়ে একটি বিস্তৃত ত্রিভুজ গড়ে তুলেছে যার পাদদেশে রয়েছে আরব সাগর আর শীর্ষে গরমবী।
>
> (অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

এই প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটি যেখানে জাতপাতের দ্বন্দ্ব, লোভ, ক্ষমতা ইত্যাদি কাজ করে চলে কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে। এর মধ্যেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিথব সামলের ছেলে বপু বেড়ে উঠতে থাকে এক দুরন্ত চরিত্র নিয়ে। প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি তার পছন্দ নয়। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও

গুরবদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। আর যার প্রেমে পড়ে সেই রাধা ছিল অন্যের স্ত্রী। সারা অঞ্চল উত্তাল হয়। এসব মিলে এই উপন্যাসে পরিবর্তিত সময়ের ছাপ পড়ে।

'রথচক্র' উপন্যাসটিও কোঙ্কন অঞ্চলের প্রেক্ষিতে লেখা। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি নারী যে স্ত্রী, পুত্রবধূ এবং মা হিসেবে ব্যর্থ হয়। আত্মহত্যা করতে গিয়ে অসফল হয়। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং দুর্ভাগ্যের শিকার সে। তার স্বামী তার সঙ্গে আট বছর বসবাস করে, তাকে ভালবাসে না কিন্তু চার সন্তানের জন্ম দেয় এবং একদিন তাকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়। যৌথ পারিবারিক জীবনে মেয়েটি হয় লাঞ্ছনার শিকার। তার স্বামীর ভাইয়েরা তার বড় ছেলেটিকে নিজেদের কাজে লাগায় অর্থনৈতিক লাভের লক্ষ্যে। এক লখনউবাসী দেওর অবশ্য সাহায্য করে এবং তার স্বামী ও অন্য ভাইদের আসল চরিত্র প্রকাশ করে দেয়। পরিবারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মেয়েটি সংসার ছেড়ে দ্বিতীয় ছেলেকে নিয়ে তালুক শহরে বসবাস শুরু করে। সেখানে কৃষ্ণবাঈ নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মেয়েটির স্বভাব চরিত্র ভাল নয়। মায়ের বকুনিতে ছেলেটি কৃষ্ণা বাঈয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে পড়াশোনায় মন দেয়। পরীক্ষায় জেলার প্রথম স্থান পায় এবং সাফল্যের কারণ হিসেবে বাবার ধর্মীয় জীবনের কথা উল্লেখ করে। ব্রাহ্মণ বিধবাটি বোঝে তার কোনো গুরুত্ব কারো কাছে নেই। তার লড়াই, ত্যাগ, কষ্ট সবই আত্মীয়-পরিজনের কাছে তুচ্ছ। মৃত্যুই তার কাছে মুক্তির পথ কিন্তু সে আত্মহত্যা করতেও ব্যর্থ হয়।

গোটা উপন্যাসটি জুড়ে যে তথ্য ও সত্য ছড়িয়ে আছে তা হল সমাজে-সংসারে নারীর মর্যাদা এবং অধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাদের কথার কোনো দাম নেই, তাদের কষ্টের কোনো হিসেব নেই। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদেই মেদহীন এক লেখক-বিবরণীতে ধরা পড়েছে সেই কথা :

> তার ছোট মেয়ে গর্ভে নড়াচড়া শুরু করেছে। ঠিক সে সময়েই তার স্বামী হঠাৎ অদৃশ্য হল। তারা বলল পুরুষটি পারিবারিক জীবনে হতাশ হয়েছিল কারণ তৃতীয় সন্তানের পর মেয়েটি আবার গর্ভবতী হয়। দায় চাপে শুধু মেয়েটির ওপর। সে মনে মনে ভাগ্যকে দোষারোপ করে। কেউ তার কথা শুনতে উৎসাহী ছিল না। সবাই পুরুষটির অদৃশ্য হওয়া নিয়ে দুঃখ করতে লাগল। মেয়েটিও দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল কারণ অন্যেরা তাকে ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু এসব বেশি দিন চাপা থাকে না। তারা ওর সমালোচনা করে। তার স্বামীর সংসার ছাড়া তাকে কোনোভাবে বিচলিত করেনি। সে সব খারাপ কথা হজম করে। সে জানে পরিবারের ভেতরের কথা প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে বিশেষ ভাবে না। তারপর সে সমস্ত ব্যাপারটা ভুলে যেতে চায়।
>
> (অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

এ-রকমই ঋজু মেয়েটি, এরকমই লক্ষ্যভেদী ঔপন্যাসিকের কলম।

পেণ্ডসে শুধু কাহিনী লেখেন না, সময় ও সমাজের বাস্তবতাকে গভীরতায় ধরতে চান। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নির্মাণের ক্ষেত্রে। চিন্তা-ভাবনায় আধুনিক এবং উপস্থাপনায় ব্যতিক্রমী এই লেখক মরাঠি কথাসাহিত্যের এক নতুন ধারার জন্ম দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

১০.৫ ভালচন্দ্র নেমাড়ে

ভালচন্দ্রের জন্ম ১৯৩৮ সালে, মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার সাংভি নামের একটি ছোট গ্রামে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি পুণাতে যান উচ্চশিক্ষার জন্য। বি. এ. ও এম. এ. (ভাষাতত্ত্ব) পাশ করেন। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কোসলা' (নীড়) যা মরাঠি কথাসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলে বিবেচিত হয়। ১৯৬৪ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনে যুক্ত হন এবং 'বাচ' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনায় হাত দেন (১৯৬৬)। ঐ বছরেই প্রকাশিত হয়

তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন 'মেলডি' (সুর)। ১৯৭১ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ও আফ্রিকা বিভাগে মরাঠি বিষয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৯৭২ সালে নিজের গ্রামে ফিরে 'বিধার' (পরিবার), 'জারিলা' (পাগড়ি) এবং 'জুল' (গরুর পিঠের রঙীন আচ্ছাদন) নামে একটি ত্রিপদী উপন্যাসে হাত দেন যা যথাক্রমে ১৯৭৫, ১৯৭৭ এবং ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, পুরস্কার পেয়েছেন বেশ কয়েকটি এবং প্রকাশিত হয়েছে একাধিক সমালোচনা ও অন্যান্য গ্রন্থ।

'নীড়'কে বলা হয় প্রতিষ্ঠান বিরোধী আধুনিক মরাঠি সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বিষয় ও নির্মাণ দুটি ক্ষেত্রেই এটি ব্যতিক্রমী। কাহিনীসূত্রটি এই রকম : পাণ্ডুরঙ্গ সাংভীকর নামের এক যুবক উচ্চশিক্ষার জন্য পুণাতে এসেছে। তার বাবা একজন সম্পন্ন চাষি। ছাত্রাবাসে থেকে পাণ্ডুরঙ্গ পড়াশোনা করে। সে কলেজের বিতর্কসভার সম্পাদক হয়, হস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছাত্রপ্রতিনিধি হয় এবং একটি নাটকও পরিচালনা করে। তার এক দরিদ্র বন্ধুকে সে হস্টেলের কাজেও যুক্ত করে, যে পরে টাকা সরায়। শুধু সে নয়, এক সময় পাণ্ডুরঙ্গ দেখে নিজেদের স্বার্থে অনেকেই তাকে ব্যবহার করে নিচ্ছে। ততদিনে আর ফিরে দাঁড়ানোর অবস্থা নেই—তার পরীক্ষার ফল খুবই খারাপ হয় এবং হাত-খরচের টাকাতেও টান পড়ে। বাবার রাগের আঁচও গায়ে লাগে। পাণ্ডুরঙ্গের বোধোদয় হয় যে জীবনে ভাল কাজের তেমন কোনো মূল্য নেই। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে সে অন্য যুবক। কিন্তু ছোটবোন মণির মৃত্যুতে হঠাৎই সে কেমন বদলে যায়। যেন কোনো কিছুরই অর্থ খুঁজে পায় না। পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে পারে না। গ্রামে ফেরে অস্তিত্ববাদী শূন্যতা নিয়ে। গ্রামের অন্যান্য যুবকদের সঙ্গে মেশে যাদেরও হাতে কোনো কাজ নেই। তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে হতে জীবনের একটা অর্থ যেন তার কাছে তৈরী হতে থাকে। উপন্যাসটি শেষ হয় এইভাবে :

> সব করব। এরা যা যা বলে সব। এতগুলো বছর তো কাটিয়েই ছিলাম এবং আরো বেশ কিছু বছর কাটাবার অহংকারও আছে। অন্য কারো বছর চুরি করব না। বাপের পয়সা অযথা নষ্টও করব না। বয়স চলে গেছে একথাটা ঠিক বলে না এরা। সামনে আরো কত বছর পড়েই তো আছে। বছরগুলি ঠিকঠাক আছে। যে যত দেরিতেই উঠুক না কেন। এবং যেমন খুশি বাঁচুক না কেন। যার যার বছর ঠিক পড়ে থাকে সামনে। সেগুলি যেমন রোজগার করা যায় না, তাই খরচ হয়ে গেছে কথাটাও তেমন ঠিক নয়। অথবা বছরগুলো একেবারে বৃথা গেল—এ কথা বলাও যেমন ভুল। ঠিকই আছে।
>
> (অনুবাদ বন্দনা আলাসে হাজরা)

'নীড়' উপন্যাসের বাংলা অনুবাদের শুরুতে বন্দনা আলাসে হাজরা লিখেছেন যে এই বইটি আসলে সংস্কৃতি নামের যে খাঁচা মানুষের অস্তিত্বকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—সংস্কৃতি নামের মহা জঞ্জালের সঙ্গে জড়ানো নিজের নাড়িটা কেটে একটু মুক্তভাবে জীবনের দিকে তাকিয়ে, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তে নিজের মনের কথা নিজের পছন্দমতো ভাষায় প্রকাশ করে এই মহাজীবনের রহস্য জানার চেষ্টা। বইটির শৈলীর বৈশিষ্ট্য হল পূর্ণচ্ছেদ, কমা ইত্যাদি চিহ্নের ব্যবহার বেশ কম, বাক্যগঠন অনেক সময়ে অসম্পূর্ণ এবং জায়গায় জায়গায় গদ্যকে পদ্য থেকে আলাদা করা যায় না।

নেমাড়ের উপন্যাস ত্রয়ী 'বিধার', 'জারিলা' এবং 'জুল'-এর মধ্যে পরিক্রমার একটি প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। এই পরিক্রমায় উঠে এসেছে আধুনিক মরাঠি সমাজ-সংস্কৃতির নানা পর্ব ও বিভিন্ন স্তর যার মধ্যে বর্ণ, ধর্ম, শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি নানা বিষয় রয়েছে। অন্যদিকে লেখার বিশেষ শৈলীর কারণে বাস্তববাদী উপন্যাসের পরিচিত গড়নের মধ্যেও অন্য এক ধরনের বিশিষ্টতা অর্জন করে নিয়েছে উপন্যাস তিনটি।

মরাঠি কথাসাহিত্য বিষয়ে আরো যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন চারজন নারী—কমলাবাঈ তিলক, বিভাবরী শিরুরকর, কৃষ্ণাবাঈ (জন্ম ১৯০১) এবং কুসুমবতী দেশপাণ্ডে (জন্ম ১৯০৪)। তাঁদের লেখায় পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের বিয়ে, চাকরি ইত্যাদি বিষয়ে নানা সমস্যার উল্লেখ

রয়েছে। মরাঠি ছোটগল্পে নবকথা আন্দোলনের পুরোধা গঙ্গাধর গ্যাডগিলের (জন্ম ১৯২৩) লেখায় চেনা মানুষের অচেনা অভিব্যক্তিগুলি সুন্দর ধরা পড়েছে। অবচেতন মনের উপস্থাপনায় তিনি একজন দক্ষ কথাকার। মরাঠি দলিত কথা-সাহিত্যের অন্যতম দুই রূপকার অন্যভাউ সাঠে (জন্ম ১৯২০) এবং শংকররাও খারাট (জন্ম ১৯২১) অন্য এক বাস্তবতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের লেখায়। আর্থ-সামাজিক শক্তি কিভাবে আমাদের সমাজেরই একটা অংশকে অসহ্য দুঃখকষ্টের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তার ছবি এঁদের লেখায়। তীব্র ক্ষোভ ও প্রকাশ পেয়েছে গল্পের ভেতর।

এসব মিলেই আধুনিক মরাঠি কথাসাহিত্যের একটি খণ্ড রূপ।

১০.৬ অনুশীলনী

১। **নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক ও কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করুন।**

(ক) মরাঠি ভাষায় উপন্যাসকে বলা হয় 'কাদম্বরী'।

(খ) হরিভাউ হচ্ছে হরিনারায়ণ আপ্তের প্রচলিত নাম।

(গ) 'মধ্লী স্থিতি' পদমজীর লেখা একটি উপন্যাস।

(ঘ) হরিনারায়ণের 'মী' (আমি) উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

(ঙ) যযাতি চরিত্রটির উল্লেখ রয়েছে পুরাণে।

(চ) শ্রীপদ নারায়ণ পেণ্ডসের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের টমাস হার্ডির মিল রয়েছে।

(ছ) ভালচন্দ্র নেমাড়ে একজন অপ্রাতিষ্ঠানিক লেখক।

(জ) গঙ্গাধর গ্যাডগিল বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকের একজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার।

২। **পঁচিশ থেকে তিরিশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।**

(ক) 'যমুনা পর্যটন'।

(খ) 'মী'-এর আমি।

(গ) 'নীড়' উপন্যাসের পাণ্ডুরঙ্গ সাংভীকর।

৩। **পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।**

(ক) গল্পকার বিষ্ণু সখারাম খাণ্ডেকর।

(খ) সামাজিক কুসংস্কার এবং হরিনারায়ণের উপন্যাস।

৪। **দেড়শ শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন।**

(ক) মরাঠি উপন্যাসে নারী-জীবন।

(খ) ইংরেজ শাসন এবং মরাঠি উপন্যাসের উন্মেষকাল।

১০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

দেশপাণ্ডে, কুসুমবতী এবং রাজাধ্যক্ষ, এম. ভি. : আ হিস্ট্রি অব মরাঠি লিটরেচর, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮৮।

একক ১১ ❑ মালয়ালম

গঠন

১১.১ প্রস্তাবনা
১১.২ পি. কেশবদেব
১১.৩ বৈকম মুহম্মদ বশীর
১১.৪ তাকাযি শিবশঙ্কর পিল্লাই
১১.৫ এম. টি. বাসুদেবন নায়ার
১১.৬ অনুশীলনী
১১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ প্রস্তাবনা

'মালয়ালম' শব্দটির উৎপত্তি দুটি শব্দের সমন্বয়ে—'মালা' (পাহাড়) এবং 'আলম' (জায়গা)। পাহাড়ের গায়ের যে জায়গা সেটিই মালয়ালম। আদি অর্থে শব্দটি স্থানবাচক কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভাষার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে থাকে। একসময় দেশের নামেই ভাষার নাম হয়ে যায়। ভাষাটি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর এবং তামিল ভাষার সঙ্গে বাক্যবিন্যাস এবং শব্দভাণ্ডারে বেশ মিল রয়েছে।

আধুনিক মালয়ালমের সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হল, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা শুরু হল এবং অনুবাদের কাজেও হাত দেওয়া হল। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা স্বাতী তিরুনালের উৎসাহে ইংরেজি ভাষা চর্চা এবং শিক্ষার গতি বৃদ্ধি পায়। প্রকাশিত হয় দ্বি-ভাষিক মালয়ালম-ইংরেজি, ইংরেজি-মালয়ালম অভিধানও। পরবর্তী সময়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিখ্যাত কবি এবং পণ্ডিত কেরালা বর্মা বালিয়া তাম্পুরান একটি বড় পরিবর্তন আনলেন, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের উদ্যোগে, বেশ কিছু জরুরি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করে। প্রকাশিত হল বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রও। ফলে সাহিত্যের ধারাও বদলাতে থাকে। ১৮৮৭-তে প্রথম মালয়ালম উপন্যাস অপ্পু নেড়ুঙ্গাডিব 'কুন্দলতা' প্রকাশিত হল। অনেকটা সংস্কৃত মহাকাব্যের রীতিতে লেখা এই উপন্যাসের মূল অনুপ্রেরণা ছিল স্যার ওয়ালটার স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি। কিন্তু প্রথম সফল মালয়ালম উপন্যাস হল ও. চন্দু মেননের (১৮৪৭-৯৯) 'ইন্দুলেখা' যা প্রকাশিত হয় ১৮৮৯-এ। চন্দু মেননের প্রথাগত শিক্ষার তেমন সুযোগ ঘটেনি। সরকারি দপ্তরে করণিকের পদ থেকে মুন্সেফ হন, পরে সাব-জজ। চাকরি থেকে অবসর নেবার আগেই মৃত্যু হয়। তাঁর ইংরেজি শিক্ষাও ঘটেছিল অনেকটাই নিজের মতো। একসময় লর্ড বেকনস্‌ফিল্ডের 'হেন্‌রিয়েটা টেম্পল' অনুবাদে হাত দেন। কিন্তু পরে মনে হয় অনুবাদের চেয়ে একটা নতুন উপন্যাস লিখে ফেলা ভাল আর সেই উপন্যাসই মালয়ালম সাহিত্যের প্রথম মৌলিক উপন্যাস হয়ে উঠল। উপন্যাসটির বিষয় হচ্ছে নায়ার পরিবারের মেয়ে ইন্দুলেখার প্রেম। সে আইন পাশ করা মাধবনকে বিয়ে করতে যায় যে কিছুদিন পরে একটি সরকারি চাকরি পাবে। কিন্তু দাদু রাজি নন কারণ নায়ার পরিবারে নিজের পছন্দে বিয়ের রীতি নেই আর বোনের নাতি মাধবন ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে কুকথা বলে। দাদু ঠিক করেন বিয়ে দেবেন নিরক্ষর কিন্তু ধনী মধ্যবয়স্ক সুরি নাম্বুতিরির সঙ্গে। ইন্দুলেখা রাজি হয় না। দাদু তখন পরিবারের অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সুরির বিয়ে দিয়ে রটিয়ে দেন যে ইন্দলেখা স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে সুরিকে। সে কথা শুনে মাধবন দুঃখে দেশান্তরী হয়। পরে দেখা মেলে বোম্বেতে। লোকজনের মুখে সে যখন

শোনে ইন্দুলেখা দাদুর মতকে অগ্রাহ্য করেছে শুধু তার জন্য, মাধবনের আনন্দের সীমা থাকে না। দুজনের মিলন হয় এবং দাদুও আশীর্বাদ করেন। কাহিনীটি এখন তেমন ব্যতিক্রমী মনে না হলেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর যাটের দশকে একজন নারীর প্রতিবাদ চেতনার প্রকাশ হিসেবে খুবই উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সমালোচকেরা উপন্যাসটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন চরিত্রায়ণ, বিবরণের বাস্তবতা, আকর্ষণীয় সংলাপ এবং প্রাণবন্ত কথ্য শৈলীর কারণেও। চন্দু মেনন পরে 'শারদা' নামে আর একটি উপন্যাসে হাত দেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি।

চন্দু মেননের পর মালয়ালম কথাসাহিত্যে যাঁর কথা অবশ্যই স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন সি. ভি. রামন পিল্লাই (১৮৫৮-১৯২২)। তিনি কেরালাতে মালয়ালম ভাষার স্কট নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক রোমান্স রীতির লেখক হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। তাঁর বিখ্যাত বইগুলি হল 'মার্তণ্ডবর্মা' (১৮৯১), 'ধর্মরাজা' (১৯১৩) এবং 'রামরাজা বাহাদুর' (১৯৮০-২০)। এছাড়া 'প্রেমামৃতম' নামে তিনি একটি সামাজিক উপন্যাসও লেখেন। 'মার্তণ্ড রাজা' উপন্যাসের মার্তণ্ড ছিলেন ধেনাড় নামে একটি ছোট রাজ্যের রাজা। পরে আশেপাশের রাজ্য জয় করতে করতে তিনি একসময় বিশাল ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য গড়ে তোলেন, কিন্তু তাঁর দুই মামাতো ভাই তাঁর বিরুধে চক্রান্ত করে। তারা তাম্পি ভাই নামে পরিচিত। রাজার একজন কাছের মানুষ হল অনন্ত পদ্মনাভন, যাকে তাম্পিদের লোকজন মারধোর করে মৃতপ্রায় অবস্থায় জঙ্গলে ফেলে রেখে চলে যায়। একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় পাঠান ও তার লোকজন অনন্তকে বাঁচায়। ওদিকে অনন্তের প্রেমিকা খবর পায় যে তার প্রেমিক বেঁচে নেই। খুবই দুঃখ পায়। অসুস্থও হয়ে পড়ে যখন শোনে যে তার বাবা-মা বড় তাম্পির সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করছে। ওদিকে অনন্ত প্রেমিকার অসুস্থতার খবর পেয়ে ছদ্মবেশে তার কাছে আসে এবং তাকে সারিয়ে তোলে। সে রাজা মার্তণ্ড বর্মাকে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচায় এবং তাঁর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। প্রেমিক-যুগল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই উপন্যাসটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য যার মধ্যে অন্যতম হল ত্রিবাঙ্কুরের অপূর্ব ঐতিহাসিক বর্ণনা এবং কাহিনীর চরিত্রগুলিকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে তুলে ধরা। পরবর্তী উপন্যাস 'ধর্মরাজা' মার্তণ্ড বর্মার উত্তরসূরী কার্তিকা তিরুনালকে নিয়ে যিনি ধর্মরাজা নামে পরিচিত ছিলেন। তৃতীয় উপন্যাস 'রামরাজা বাহাদুর'ও ত্রিবাঙ্কুরের ইতিহাস নিয়ে। শেষের দুটি উপন্যাস নির্মাণের নিবিড়তার জন্য খুবই পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির কথাও অনেক সমালোচক উল্লেখ করেছেন।

মালয়ালম উপন্যাসের যে আধুনিক পর্ব সেখানে যাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাঁদের মধ্যে আছেন কে. এম. পানিক্কর, পি. কেশবদেব, তাকাযি শিবশঙ্কর পিল্লাই, ভৈকম মুহম্মদ বশীর, এস. কে. পোট্টেকাট, এম. টি. বাসুদেবন নায়ার, কে সরস্বতী আম্মা, কমলা দাস, ও. ভি. বিজয়ন, এম. মুকুন্দন প্রমুখ। মালয়ালম কথাসাহিত্যের প্রাথমিক পাঠ হিসেবে আমরা এই আলোচনা কেশবদেব (জন্ম ১৯০২), বশীর (জন্ম ১৯১০), তাকাযি (জন্ম ১৯১২) এবং এম. টি.-র (জন্ম ১৯৩৪) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারি।

১১.২ পি. কেশবদেব

চারের দশকের কেরলে কেশবদেব এক বর্ণময় চরিত্র। শ্রমিক আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, রাজনৈতিক লিফলেট লেখা এবং বিতরণ, নাটক-গল্প-উপন্যাস সৃষ্টি ইত্যাদি মিলে বেশ আলোচিত চরিত্র। ঘোষিতভাবে জানিয়েও দিয়েছিলেন তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে দেখেন, শিল্পরসের জোগানদার হিসেবে নয়।

তাঁর 'ওডায়িল নিন্নু (পাঁক থেকে) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। কাহিনীর নায়ক পাপ্পুর ভেতরে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রতি এক গভীর ক্ষোভ। কিন্তু সমাজ-রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বদলায় না, ফলে পুরনো জীবিকা

রিক্সাটানার কাজই চালিয়ে যেতে হয়। একদিন তার রিক্সায় চাপা পড়ে একটি অনাথ বাচ্চা মেয়ে। তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সারিয়ে তোলে সে, বড়ও করে তোলে। নিজের সন্তানের মতো আদর ও স্নেহে লালনপালন করে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে। জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়েও দেয়। কিন্তু পাপ্পু নিজে ক্ষয়রোগের শিকার হয়। তার জীবনে গুটিয়ে যেতে থাকে। একসময় সে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়, তার মেয়ের বাড়ির পথে। চলতে চলতে সে এগিয়ে যায় অনন্ত পথে। এক গভীর বেদনায় কাহিনীটি শেষ হয়—পাপ্পুর প্রতি রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির নির্লিপ্ততায়।

কেশবদেবের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'উলক্কা' (হামানদিস্তা) এবং 'আর কবু ভেণ্ডি (কার জন্য?) এবং 'নটী'। 'হামানদিস্তা' উপন্যাসটির মূল সুর বিদ্রোহ ও বিপ্লবের। কিন্তু 'কার জন্য'? বইটিতে রয়েছে কমিউনিস্ট আদর্শ ও কাজকর্মের প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা। 'নটী' কাহিনীটি রঙ্গমঞ্চের মালিকদের নিয়ে যারা টাকার জন্য শিল্পকে পণ্য করে তোলে। গল্পকার হিসেবেও তিনি বেশ সফল। বাস্তববাদী এই লেখক ঐ সময়ের জেলে, ছোট দোকানদার ইত্যাদি সাধারণ মানুষজনের জীবন খুবই নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। উপস্থাপনার রীতিটি সরাসরি হওয়ার ফলে সহজেই পাঠকদের কাছে পৌঁছে যায়। উদাহরণ হিসেবে তাঁর 'গুষ্টি' (কুস্তি প্রতিযোগিতা) গল্পটি উল্লেখ করা যায়। পাশাপাশি দুটি ছোট দোকানের মালিক পাপ্পু পিল্লাই এবং কুঞ্জুমৈদিন। পাপ্পু ধোসা ও চা বানায় আর অন্যজন বিড়ি বাঁধে। একজন খদ্দের চা খেতে এসে শোনায় স্টেডিয়ামে কুস্তি হবে কদিন পরেই। কে জিতবে সে নিয়ে কথা হতে হতে দুই কুস্তিবীরের ধর্ম জড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে উত্তেজনা, হাতাহাতি এবং খুনোখুনি। একসময় শহর থেকে সে সংঘর্ষ গোটা রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য মানুষের প্রাণ যায়। বাড়িঘর পোড়ে, দোকানদানি ছাই হয়। আবার পেটের টানে মানুষজন পথে বেরোয়। পাপ্পু পিল্লাইয়ের দু ভাই খুন হয়েছে, পুড়ে গেছে দোকান। সে বাঁশ আর নারকেল পাতা নিয়ে নতুন দোকান গড়তে চলে। দেখা হয় কুঞ্জুমৈদিনের ছেলে মহম্মদের সঙ্গে। তার বাবা মারা গেছে দাঙ্গায়। মহম্মদ জানে না কি করে তিন ভাই আর মায়ের পেট চালাবে সে। দোকান গড়ার বাঁশ আর নারকেল পাতাও নেই তার। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে পিল্লাই। কাহিনীর শেষ দিকটি এই রকম :

'...কেউ কোথাও কুস্তি লড়ছিল আর তাতেই আমার দাদা আর তোমার বাবা পরস্পরকে খুন করে ফেলল। এটা পাগলামো না হলে আর কী?

''আরো খারাপ ব্যাপার হল সেই পাগলামো ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে!'

'হায়রে এ এক অদ্ভুত পাগলামো, মহম্মদ, মানুষ মারছে মানুষকে।'

'আমি শুনেছি, পিল্লাই, উত্তরেরও কোন জায়গায় মানুষ এমনই পাগলামিতে মেতেছে।

'হ্যাঁ, বাংলা ও বিহারে।'

পাপ্পু পিল্লাইয়ের ভাই এবং কুঞ্জুমৈদিনের ছেলে এভাবেই তাদের অগ্রজদের উন্মাদনা নিয়ে দুঃখ আর বিলাপ করে।

(অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

পরে তারা দুজনে জায়গাটা পরিষ্কার করে নতুন করে দুটি দোকান গড়ে তোলে। একটি চায়ের, অন্যটি পানের। দুটি দোকানের মাঝে ঝুলিয়ে দেয় পোস্টার—'পাগলদের প্রবেশ নিষেধ'।

১৯৪০ সালে লেখা এই গল্পটি আজও নানা আলোচনায় ফিরে ফিরে আসে উপস্থাপনা ও বিষয়ের গুণে।

১১.৩ বৈকম মুহম্মদ বশীর

বশীরের সুখ্যাতি তাঁর ছোটগল্পের জন্য কিন্তু 'বাল্যকালসখী' (বাল্যসখী), 'এন্টপ্পাপ্পাকেকারোন্নু আনেনডারুন্নু'

(নানার হাতি) এবং 'পাতুম্মায়্যুদু আদু' (পাতুম্মার ছাগল) তাঁকে ঔপন্যাসিক হিসেবেও বিখ্যাত করে তুলেছে। তিনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, যে কারণে কারাবাসও করেছেন কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে লেখক-স্তর কখনোই চড়া নয়। বরং আয়রনির এক চমৎকার ব্যবহার রয়েছে গদ্যে। কখনো আবার নিচু পর্দায় এমন কিছু ঘটনার বিবরণ দেন যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভেতরে দুর্বলতা ছবির মতো ফুটে ওঠে।

'বাল্যসখী' কাহিনীর প্রধান দুটি চরিত্র হল সুহরা এবং মজিদ। তারা ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে উঠেছে পাশাপাশি। যখন তারা বড় হল সমাজ তাদের আলাদা করে দিল। সুহরাকে বিয়ে দেওয়া হল এমন একজনের সঙ্গে যাকে সে একেবারেই পছন্দ করে না। মজিদ গ্রাম ছেড়ে চলে গেল জীবিকার সন্ধানে। সুহরার জীবন স্বাভাবিক কারণেই সুখের হল না। তাকে স্বামীর ঘর ছাড়তে হল। একসময় যক্ষ্মায় মারা গেল সে। ওদিকে দুর্ঘটনায় মজিদের একটা পা কাটা গেল। যে দুটি জীবন গড়ে তুলতে পারত এক সুন্দর পরিবার তা ধ্বংস হয়ে গেল। এটি একটি অনবদ্য প্রেমকাহিনী যার পরিণতি চূড়ান্ত বেদনায়। 'বাল্যসখী' বড় ছোটগল্প নাকি ছোট উপন্যাস সে নিয়ে মতান্তর রয়েছে। তবে যে বিষয়ে সমালোচক-পাঠক কারোরই সন্দেহ নেই তা হল কাহিনীটির 'উচ্চ আদর্শ, জীবন সম্বন্ধে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা, মানবচরিত্র সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম জ্ঞান।' বিশিষ্ট মালয়ালম সমালোচক এম. সি. পল ১৯৪৪ সালে বইটি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে চান্দু মেননের 'শারদা'-র পর এতখানি হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস মালয়ালম ভাষায় নেই বলেই তাঁর ধারণা।

'নানার হাতি' উপন্যাসের আম্মা (মা) চারপাশের মানুষজনদের বলে বেড়ায় যে সে খুব বড় বংশের মেয়ে আর তার বাবার বেশ কটা হাতি ছিল। আম্মা খালি পায়ে হাঁটে না, খড়ম পরে। এখন অবশ্য অতীত ঐশ্বর্যের কিছুই নেই, শুধুই স্মৃতি। আম্মা শুধু স্মৃতিতেই সুখী নয়, মেয়েকে শেখায় অতীত গৌরব নিয়ে অহঙ্কার করতে। অন্যদিকে দিনে দিনে নিদারুণ অভাব তাদের গ্রাস করছে। সেই সময় নিজার আমেদ নামে একটি যুবক মা আর বোনকে নিয়ে পাশের বাড়িতে ভাড়া আসে। তাদের অবস্থাও ভাল নয় কিন্তু যুবকটি তার ভেতরেই উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। চেতনার দিক থেকেও তারা এগিয়ে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে আম্মার পরিবারটিও বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে এগিয়ে চলার পথ খোঁজে। দুটি পরিবারের বিবাহ-বন্ধনের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি। এই বইটির নিলীনা আব্রাহাম কৃত বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় ১৯৬০ সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন :

> এক প্রাচীন মুসলমান পরিবারের একটি কুমারী কন্যা এক নায়িকা—তার নানার হাতি ছিল, হাতির দাঁতের খড়ম ছিল। ...পড়তে পড়তে মনে হয়েছে আমাদের গ্রামের মুসলমান খাঁ সাহেবদের বাড়ির বিবরণ পড়ছি। মনে হয়েছে ভেঙেপড়া রায় জমিদারদের বাড়ির বিবরণ পড়ছি। অর্থাৎ যা ঘটেছে ভারতের পূর্ব প্রান্তে, তাই ঘটছে পশ্চিম ঘাটের দক্ষিণ প্রান্তে। এবং দুই স্থানের সাহিত্যিক এক ভাবনায় অনুপ্রাণিত। গ্রন্থখানির মধ্যে যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা বর্তমানে বাস্তব সত্য এবং সমাজ সত্য। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙার সঙ্গে ঘর ভাঙছে। ঘরের সঙ্গে সমাজ ভাঙছে, প্রাচীন বিশ্বাস পাল্টাচ্ছে—নতুন যুগ আসছে—তার সঙ্গে প্রাচীন জগৎ নবীন জগতে পরিবর্তিত হয়ে দিবারাত্রির ছন্দে কক্ষপথে চলছে।

উপন্যাসটির শেষেও আম্মার মুখে হাতির গপ্পো কিন্তু মেয়ে কুঞ্জুপাতুম্মার মুখে এক বিচিত্র হাসি।

১৯৫১ সালে লেখা হল 'পাতুম্মার ছাগল'। বাস্তবজীবন থেকে উঠে এসেছে এই কাহিনী। ১৯৫৯ সালে বশীর নিজেই বইটির ভূমিকা লেখেন যে চরিত্রগুলি তখনও 'আল্লার দয়ায় বেঁচে আছে'। গল্পটি তাঁর বাড়ির গল্প, লেখার সময় কিছু কিছু ঘটনা বাদ দেন। উপন্যাসটি বিষয়ে লেখকের একটি মন্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য, 'এটা একটা মজার গল্প। কিন্তু লেখার সময় আমি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আমার সব ব্যথা ভুলে যাবার জন্য লেখার শরণ নিয়েছিলাম।' পাতুম্মা হচ্ছে কাহিনীকথকের বোন। তার ছাগলের কার্যকলাপের বিবরণ দিতে দিতে একটি মুসলমান পরিবারের ভেতর-বাইরের এক অন্তরঙ্গ ছবি তুলে ধরেছেন বশীর।

বশীরের উপন্যাসের সংখ্যা তের এবং দশখণ্ডে সংগৃহীত তাঁর গল্পের সংখ্যা পঁচাত্তর। তাঁর গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন অধ্যাপক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁরই অনূদিত 'বশীরের শ্রেষ্ঠ গল্প' বইটির ভূমিকায়। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা মোটেই একবার পড়ে ভুলে যাবার মতো ঘটনা নয়—বারে-বারে ফিরে-ফিরে পড়বার মতো; আর প্রতিবার নতুন করে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে নতুন নতুন অর্থ, তাৎপর্য।' এই সংকলনে যেসব গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে 'প্রেমপত্র', 'নীল আলো', 'সোনার আংটি', 'দেয়াল' ইত্যাদি। 'দেয়াল' গল্পটি অনেক পাঠকেরই পরিচিত আদুর গোপালকৃষ্ণণের চলচ্চিত্রায়ণের কারণে। কাহিনীতে এক পুরুষ আর এক মহিলা বন্দী পরস্পরকে না দেখেও প্রেমের বিনিময় ঘটিয়ে চলে।

বশীরের বেশ কয়েকটি বই নানা ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে—কয়েকটি বিদেশি ভাষাতেও।

১১.৪ তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই

শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের জন্ম কেরলের আলেপ্পি শহর থেকে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে তাকাষি নামের একটি ছোট গ্রামে ১৯১৪ সালের এপ্রিলে। বাবা ছিলেন সম্পন্ন জমিদার আর বাড়িতে নাচ, গান ও রামায়ণ-মহাভারত পাঠের ঐতিহ্য ছিল। গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক পড়াশোনা সেরে পরের পড়াশোনা আম্বালাপুযা মাধ্যমিক ইস্কুলে। ইস্কুলটি ছিল সমুদ্রের উপকূলে, জেলেপাড়ার মাঝখানে। এখানেই জেলেদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় যা পরবর্তী সময়ে তাঁকে 'চেম্মিন' (চিংড়ি) উপন্যাসটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। ইস্কুলের পড়া শেষ করে তাকাষি যান ত্রিবান্দ্রমে আইন পড়তে। সেখানেই তাঁর মনের জগৎ বিস্তৃতি পায়। কার্ল মার্কস ও ফ্রয়েডের পাশাপাশি ইংরেজি, ফরাসি এবং রাশিয়ান ভাষার বিশিষ্ট লেখকদের গল্প-উপন্যাসের পাঠক হয়ে ওঠেন। আইন পাশ করে তিনি ফিরে যান কৈশোরের গ্রাম আম্বালাপুযায় এবং আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পাশাপাশি চলতে থাকে লেখার কাজ। 'পতিত পঙ্কজম' এবং 'প্রতিফলন' নামের দুটি ছোট উপন্যাসে সমাজ-নৈতিকতার নিয়ম ভেঙে জীবনের কিছু অন্ধকার দিক তুলে ধরেন। বিশিষ্ট সমালোচক পি. কে. পরমেশ্বরণ নায়ারের অভিমত হল, বই দুটির মধ্যে মোপাসাঁর বাস্তববাদের প্রতিফলন রয়েছে। পরের তিনটি উপন্যাস হল 'তালায়োড়ু' (কঙ্কাল), 'তোটিযুডে মকন্' (মেথরের ছেলে) এবং 'তেণ্ডিবর্গম' (ভিক্ষুকের ছেলে)। প্রথমটির বিষয় ত্রিবাঙ্কুরের বায়ালার বিয়োগান্ত কমিউনিস্ট বিদ্রোহ। অন্য দুটিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রান্তবাসী দুই শ্রেণীর মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

কিন্তু তাকাষি একজন প্রথমশ্রেণীর ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন 'রন্টিতাঙ্গাষি' (দুকুনকে ধান) প্রকাশিত হবার পর। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসে রয়েছে জমিদার ও প্রজার মধ্যে চিরাগত সম্বন্ধ ভেঙে পড়ার একটি বিশেষ পর্যায়। কুট্টনাড়ের জলাভূমির অস্পৃশ্য পারায়া জাতির চাষিদের মজুরি আবহমান কাল থেকে দু কুনকে ধান। তাদের সঙ্গে তম্পুরান বা জোতদারদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তাদের মনে গর্ব থাকলেও আসলে তারা দিনমজুর। এই পরিবর্তনের পটভূমিকায় কাহিনীর নায়ক কোরনের জীবনে এক বিপর্যয় ঘটে। তার বউ চিরুতাকে ধর্ষণ করে জোতদার চাক্কো। কোরন কামুক চাক্কোকে হত্যা করে জেলে যায়। যাওয়ার সময় সে চিরুতাকে তার পূর্ব প্রেমিক চাত্তনের হাতে দিয়ে যায়। কিন্তু বিবাহিত চাত্তন মনে করে একজন পুরুষের একজনই স্ত্রী থাকতে পারে। তাই চিরুতাকে সে স্পর্শ করে না। কোরন জেল থেকে ফেরার পর চিরুতাকে নিয়ে নতুন করে সংসার বাঁধে। অন্যদিকে তখন ধ্বনি ওঠে, 'ইনকিলাব...জিন্দাবাদ! মজদুর সঙ্ঘ.....জিন্দাবাদ'। কাহিনী শেষ হয় একটি সোচ্চার দাবীতে—'খেত কার?....চাষ যে করে তার।' বইটি বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক সর্দার কে. এম্.

পানিকর মন্তব্য করেছিলেন, 'উপন্যাসটি শক্তিশালী, চরিত্রচিত্রণ বাস্তব, ঘটনাগুলির বিন্যাসে বিয়োগান্তিক পরিণাম। তাকাষি যে শ্রেণীর সমাজজীবন অঙ্কিত করেছেন তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তিনি বিশেষরূপে উপলব্ধি করেছেন। তাই সাধারণ লোকের মুখের ভাষাই তিনি তাঁর গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। তাদের জীবনের চিত্র অঙ্কণে তিনি তাঁর উদার বুদ্ধি ও সহৃদয় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।' (দু কুনকে ধান' গ্রন্থের ভূমিকা, বাংলা রূপান্তর মলিনা রায়, সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৫৯)।

১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হল 'চেম্মিন' (চিংড়ি)। পরের বছরেই বইটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। ভারতীয় এবং বিদেশি ভাষা মিলে বইটি প্রায় পঁচিশটি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি থেকে এমন একটা সময় গেছে যখন পাঁচজন মালয়ালমভাষী এক জায়গায় উপস্থিত হলে তাঁদের আলোচ্য বিষয় হত 'চেম্মিন'—এ তথ্য দিয়েছেন বিশিষ্ট সমালোচক নারায়ণ মেনন। বইটি কেরলের সমুদ্রকূলবর্তী জেলেদের জীবনযাপন, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার এবং দুঃখ-যন্ত্রণার প্রেক্ষিতে লেখা। কাহিনীর কেন্দ্রে আছে কারুতাম্মা যে প্রেমে পড়ে এক মুসলমান যুবকের যার নাম পারীকুট্টি। উপন্যাসের শুরু দু-জনের একটি সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে :

> 'বলি ও ছোট মিয়া, মাছ ধরতে আমার বাবার যে নৌকো আর জাল কিনতে হবে।'
> 'তা তোমার ভাগ্যে থাকলে নৌকো কেনা হবে।'
> এ ধরনের জবাব পেয়ে কারুতাম্মার মুখে হঠাৎ কোনো উত্তর জোগাল না। তাই এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ও বলে উঠল, 'কিন্তু টাকায় বোধহয় কিছু কম পড়বে। কিছু টাকা দাও না গো মিয়াসাহেব।'
> 'টাকা? আমার কাছে টাকা কোথায়?
> পারীকুট্টি হাত উল্টে দিল—অর্থাৎ নেই। ওর হাত ওল্টানোর ভঙ্গি দেখে কারুতাম্মা হেসে ফেলল।
> 'টাকাই যদি নেই তবে আবার মাছের কারবারী হয়েছ কিসের?'
> 'কারুতাম্মা তুমি আমাকে "ছোটমিয়া"...."মাছের কারবারী" এসব বলে ডাক কেন?'
> 'কি বলে ডাকব তাহলে?'
> 'কেন আমার কি নাম নেই? আমাকে পারীকুট্টি বলে ডাকবে।'
> কারুতাম্মা 'পারী'-টুকু বলেই হেসে ফেলল।
> (চিংড়ি, অনুবাদ বোম্মানা বিশ্বনাথম ও নিলীনা আব্রাহম, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৪)

এই প্রেম দুটি হৃদয়কে কাছাকাছি নিয়ে এলেও সামাজিক বাধা তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একসময় বুকের ব্যথা ভেতরে চেপে কারুতাম্মাকে বিয়ে করতে হয় স্বজাত ও স্বধর্মের এক তরুণ জেলে পালানিকে। কারুতাম্মা আপ্রাণ চেষ্টা করে অতীতকে দুর সরিয়ে রেখে নতুন সংসারে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে। মনের টানাপোড়েনের সেই বেদনাঘন পর্বের সহমর্মী একমাত্র তার মা। কিন্তু কারুতাম্মার নতুন সংসার সুখের হয়নি। একসময় নিয়তির মতো কোনো এক ডাকে ছুটে যায় পারীকুট্টির কাছে। দুজনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। ওদিকে ঢেউয়ের ওপর মাঝসমুদ্রে দোলে পালানি। তার বঁড়শিতে গেঁথেছে বিশাল এক হাঙর। হাঙরটি ধরা পড়ে কিন্তু পালানি তলিয়ে যায় অথৈ জলে। সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কারালাম্মা সেই পুরুষকে জলের তলায় টেনে নেন যার স্ত্রী অন্য পুরুষে আকৃষ্ট হয়। ওদিকে দুদিন পরে আলিঙ্গনে বদ্ধ একজন পুরুষ ও এক নারীর দেহ তীরে পৌঁছে দেয় সমুদ্রের ঢেউ—মৃতদেহ দুটি কারুতাম্মা আর পারীকুট্টির। বাস্তববাদের সঙ্গে রোমান্টিক ভাবের সংমিশ্রণে 'চিংড়ি' ভারতীয় কথাসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

তাকাষির মহাকাব্যিক উপন্যাস 'কয়ার' প্রকাশিত হয় সাতের দশকে। এটি যদিও নিজের গ্রামের প্রায় একশ পঞ্চাশ বছরের অতীত ও বর্তমান নিয়ে লেখা কিন্তু এর আবেদন সর্বজনীন। বাস্তবতা, কল্পনা, লোককথা, পুরাণ ইত্যাদি মিলে এর শৈলী এবং নির্মাণও খুবই উল্লেখযোগ্য। কাহিনীর কাব্যিক, ঝকঝকে এবং একই সঙ্গে বিপ্লবের ভীরু-তাত্ত্বিক চরিত্রটির মধ্যে যেন তাকাষির নিজের আদলটি ধরা পড়ে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলির

মধ্যে রয়েছে সামন্ততান্ত্রিক মোড়ল মুখা কুরুপ, লোভী এবং কুচক্রী শেযা আয়ার, ধর্মপ্রাণ বাসুদেবন্নু, পণ্ডিত পরমু আসান, যৌন-সংস্কারমুক্ত কল্যাণী আম্মা, তার পণ্ডিত ছেলে কেশব পিল্লাই প্রমুখ। মাতৃতান্ত্রিক থেকে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিবার ও সমাজের পরিবর্তিত পর্যায়টিও খুব আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেছেন তাকাযি। বইটির জন্য তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন।

তাকাযি সাঁইত্রিশটি উপন্যাস এবং প্রায় পাঁচশ গল্প লিখেছিলেন। এছাড়াও একাধিক ভ্রমণকাহিনী এবং স্মৃতিকথাও লিখেছেন।

১১.৫ এম. টি. বাসুদেবন নায়ার

এম. টি.-র জন্ম ১৯৩৪ সালে দক্ষিণ মালাবারের কুদাল্লুর অঞ্চলে। পালঘাট ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৫৩ সালে স্নাতক হন এবং বছর দুয়েক নানা কাজকর্ম করে ১৯৫৬ সালে 'মাথরুভূমি' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন 'রকথম পুরাণ্ড মন্থরীকাল'। তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেক বছরেই হয় একটি গল্প-সংকলন কিংবা উপন্যাস প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও ভ্রমণ, সাহিত্য সমালোচনা, কাহিনীচিত্র নির্মাণ ইত্যাদির সঙ্গেও তিনি যুক্ত। চলচ্চিত্র পরিচালনাও করেছেন।

'কালম' (সময়) বইটির জন্য এম. টি. ১৯৭০ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। বইয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি একজন যুবকের যার সঙ্গে কাহিনীকারের মিল রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। ক্ষয়িষ্ণু নায়ার পরিবারের এই যুবক শৈশব কাটিয়েছিল পারিবারিক পরিবেশে তার গণ্ডিতে। কিন্তু তার সাহিত্য প্রীতিকে কেউই উৎসাহ দেয়নি। ছেলেটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' এবং হুইটম্যানের 'লিভস অব গ্রাস' পড়ে নিজের একটি মনোজগৎ সৃষ্টিতে মগ্ন। এক সময় কলেজ থেকে বেরিয়ে যুবকটি জীবিকার সন্ধানে ফেরে। কিছুদিন একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে কিন্তু পরিচালকের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে সেখান থেকে চলে আসে। তারপর কফির বাগান, পেট্রল গুমটি, জুয়ার ঠেক ঘুরে অর্থবান শ্রীনিবাস মুথালালির সাম্রাজ্যে। তারপর সে জীবনে উন্নতি করে কিন্তু তার হৃদয় শুকিয়ে যেতে থাকে। এসবের মূলে কি শুধুই সামাজিক অবস্থা নাকি সে নিজেও? তার আত্মপ্রিয়তা কি তার আত্মার অবক্ষয়ের জন্য দায়ী? একসময়ের প্রেমিকা সুমিত্রা সেরকমই মনে করে। তাই মায়ের মৃত্যু কিংবা ভাইয়ের দৈন্য তাকে আলোড়িত করে না। কিন্তু অন্যদিকে যুবকটির যে আবেগের কিংবা আদর্শের দীনতা তা কিন্তু নিছক তার একার নয়—আধুনিক সময়ের অনেক যুবকের মধ্যেই এই সংকটের প্রতিফলন। সেটিই খুব দক্ষতার সঙ্গে এক মেদহীন গদ্যে তুলে ধরেছেন এম. টি.।

একজন গল্পকার হিসেবেও এম. টি. বেশ সফল। ছোট ছোট বাক্যে প্রায় ছবির মতো ফুটিয়ে তোলেন এক একটি ঘটনা। তবে ঘটনার চেয়ে পরিবেশ ও চরিত্র নির্মাণেই তিনি বেশি উৎসাহী। 'কুয়াশা' উপন্যাসের কুমায়ুন পাহাড়ের গায়ে শিক্ষিকা নিবাসের একটি বিবরণ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় :

> বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকছিল।
>
> বহু শব্দের আশ্চর্য সমস্বরতায় এক নীরবতা। মেয়েটি ভাবল সম্পূর্ণ নীরবতা বলে কিছু নেই। কিন্তু যা শুনছে সেটাই নীরবতা। সংগীতই নীরবতা। পুরনো কড়িকাঠ থেকে মাঝে মাঝে উইকাটা কাঠের গুঁড়ো ঝরে। হাল্কা কুরকুর শব্দ। দূরে গাছের ডাল ভাঙার শব্দ। ঝিঁঝির শব্দও দূর থেকে আসছে না। তার মনে পড়ে যাচ্ছিল বর্ষার সময় বৃষ্টিভেজা কেরলের সুপুরিগাছের কথা। কিন্তু কুমায়ুন পাহাড়ে রোদ ঝলমলে দিনেও ঝিঁঝি ডাকে দিন-দুপুরে।
>
> (অনুবাদ বর্তমান আলোচকের)

এম. টি. জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ছাড়াও সম্মানিত হয়েছেন চলচ্চিত্রের নানা আঞ্চলিক ও জাতীয় পুরস্কারে।

মালয়ালম সাহিত্যে আর যেসব কথাকারদের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এম. মুকুন্দন, ও. ভি. বিজয়ন, ওড়ুবিল কুঞ্জুকৃষ্ণ মেনন, সি. কুঞ্জিরাম মেনন, ললিতাম্বিকা, কে. সরস্বতী আম্মা, কমলা দাস প্রমুখ। কমলা দাসের সুখ্যাতি কবি হিসেবে হলেও তিনি তিনটি ছোট উপন্যাস এবং দুটি ছোটগল্প সংকলন মালয়ালম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল তিনি বেশ কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়েছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থের নাম 'সামার ইন ক্যালকাটা'।

১১.৬ অনুশীলনী

১। **নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক এবং কোন্‌টি ভুল নির্ধারণ করুন।**
(ক) মালয়ালম ভাষার প্রথম উপন্যাস 'কুন্দলতা'।
(খ) 'মার্তণ্ড রাজা' উপন্যাসের মার্তণ্ড ধেনাড় রাজ্যের রাজা ছিলেন।
(গ) অনন্ত পদ্মনাভন হল 'রামরাজা বাহাদুর' উপন্যাসের একটি চরিত্র।
(ঘ) 'ওড়ায়িল নিন্নু' (পাঁক থেকে) উপন্যাসটি কে. এম. পানিক্করের লেখা।
(ঙ) 'বাল্যসখী' উপন্যাসের সখীর নাম সুহরা।
(চ) বশীরের লেখা উপন্যাসের সংখ্যা দশ এবং গল্প-সংকলন তেরো।
(ছ) 'রন্টিতাঙ্গাষি' (দু কুনকে ধান) উপন্যাসের নায়কের নাম কোরন।
(জ) 'চেম্মিন' (চিংড়ি) বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন মলিনা রায়।
(ঝ) এম. টি. বাসুদেবন নায়ারের জন্মস্থান দক্ষিণ মালাবারে।
(ঞ) ইংরেজি ও মালয়ালম দুটি ভাষাতেই কমলা দাস কবিতা ও গল্প-উপন্যাস লেখেন।

২। **টীকা লিখুন (৫০টি শব্দের মধ্যে)।**
(ক) মালয়ালম সাহিত্যে আধুনিকতার আদিপর্ব।
(খ) চন্দু মেনন।
(গ) কেশব দেব।
(ঘ) 'চেম্মিন' (চিংড়ি)।

৩। **১২০ থেকে ১৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।**
(ক) মালয়ালম কথাসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক।
(খ) মালয়ালম কথাসাহিত্যে জেলেজীবন।

১১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। নায়ার, পি. কে. পরমেশ্বরন-মালয়ালম সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা অনুবাদ নিলীনা আব্রাহাম, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮৮।
২। সাহিত্য অকাদেমি অ্যাওয়ার্ডস, ১৯৫৫-৭৮

একক ১২ ☐ হিন্দি

গঠন

১২.১ প্রস্তাবনা

১২.২ প্রেমচন্দ

১২.৩ যশপাল

১২.৪ জৈনেন্দ্র কুমার

১২.৫ ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'

১২.৬ নির্মল বর্মা

১২.৭ অনুশীলনী

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১২.১ প্রস্তাবনা

ব্রজভাষা থেকে খড়ীবোলীর ভেতর দিয়ে আধুনিক হিন্দিভাষা ও সাহিত্যের সূত্রপাত। ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮), প্রার্থনা সমাজ (১৮৬৭) এবং আর্য সমাজের (১৮৭৫) ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন অনেক ভারতীয় সাহিত্যের মতো হিন্দির ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের সূচনা করছিল। ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা ভাবনাচিন্তার বিস্তার ঘটাচ্ছিল। হিন্দি কবিতায় পরিবর্তন ঘটছিল, আকার নিচ্ছিল হিন্দি গদ্য এবং অনুবাদের কাজ চলছিল। কাহিনী গদ্যে হাত দেন লালা শ্রীনিবাস দাস (১৮৫১-৮৭), কিশোরীলাল গোস্বামী (১৮৬৫-১৯৩২), বালকৃষ্ণ ভট্ট (১৮৪৪-১৯১৪) প্রমুখ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হল তার মধ্যে রয়েছে বালকৃষ্ণ ভট্টের 'রহস্য কথা' (১৮৭৯) এবং 'সান আজন এক সুজন' (১৮৯২), রাধাকৃষ্ণ দাসের 'নিঃসহায় হিন্দু' (১৮৯০), লজ্জারাম শর্মার 'ধূর্ত রসিকলাল' (১৮৯০), কিশোরীলাল গোস্বামীর 'ত্রিবেণী বা সৌভাগ্যত্রেণী' (১৮৯০) এবং দেবকীনন্দন খেত্রীর 'চন্দ্রকান্তা সন্ততী' (১৮৯৬)। এইসব উপন্যাসের অনেকগুলিতেই কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল রোমান্স ও রহস্য। প্রথম হিন্দি গল্পের লেখক হলেন কিশোরীলাল গোস্বামী। 'ইন্দুমতী' নামের গল্পটি 'সরস্বতী' পত্রিকায় ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়। শেক্সপিয়রের 'দ্য টেমপেস্ট'-এর ছায়া অবলম্বনে গল্পটি লেখা। ১৯০৯ সালে কাশী থেকে সাহিত্য পত্রিকা 'ইন্দু'র প্রকাশ শুরু হয় যা হিন্দি গল্পসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। জয়শঙ্কর প্রসাদ সহ বহু বিশিষ্ট লেখকের গল্প 'ইন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবে সত্যিকারের আধুনিক হিন্দি কথাসাহিত্য যাঁদের হাতে গড়ে উঠল তাঁরা হলেন মুন্সী প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬) এবং জৈনেন্দ্র কুমার (১৯০৫-৮৮)। পরবর্তীকালে নতুন কথাসাহিত্যকে যাঁরা আরো পুষ্ট করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যশপাল (১৯০৩-৭৬), সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎসায়ন 'অজ্ঞেয়' (১৯১১-৮৭), ফণীশ্বরনাথ 'রেণু' (১৯২১-৭৮), ভীষ্ম সাহনি (১৯১৫-২০০৪), মোহন রাকেশ (১৯২৫-৭২), নির্মল বর্মা (১৯২৯-২০০৫), রাজেন্দ্র যাদব (১৯২৯), কমলেশ্বর (১৯৩২), গিরিরাজ কিশোর (১৯৩৬) প্রমুখ। আলোচনার সূত্রপাত ঘটতে পারে প্রেমচন্দকে দিয়ে।

১২.২ প্রেমচন্দ

প্রেমচন্দের জন্ম ১৮৮০ সালে বারাণসীর কাছে লমহি গ্রামে। ছোটবেলাতেই বাবা-মাকে হারান। তারপর শুরু হয় বেঁচে থাকার কঠোর লড়াই। স্নাতক হন সবরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে চাকরি ছেড়ে দেন। সম্পাদনা করেছেন 'মাধুরী' এবং 'জাগরণ' পত্রিকা। প্রতিষ্ঠা করেন সরস্বতী প্রেস।

তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ধনপত রায়। সরকারের আইন এড়াতে লেখালিখির জন্য 'প্রেমচন্দ' নামটি গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম দিকের লেখালিখি উর্দুতে। পরে হিন্দিতে লেখাপত্র শুরু করেন। গান্ধীজির উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণাতে কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষজনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার কথাকার হয়ে ওঠেন। তিনি একাধিকবার দরিদ্র জনগণের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন ১৯২৩ সালে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেন, 'আমি ভবিষ্যতের সেই পার্টির সদস্য যে ছোটলোকদের স্বার্থে কাজ করবে।' তিনি প্রায় তিনশ ছোটগল্প, বারোটি উপন্যাস এবং বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উত্তর ভারতের জীবনের এক আশ্চর্য নান্দনিক দলিল তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলি। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'প্রেম' (১৯০৭), 'সেবাসদন' (১৯১৮), 'প্রেমাশ্রম' (১৯২২), 'রঙ্গভূমি' (১৯২৫), 'কায়কল্প' (১৯২৬), 'নির্মলা' (১৯২৭), 'গবন' (১৯৩১) এবং 'গোদান' (১৯৩৫)। গল্পের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ হল 'পৌষ কি রাত', 'নাশ', 'কফন' ইত্যাদি। এইসব লেখার মধ্যে দিয়ে জমিদার ও আমলাদের সমবেত উদ্যোগে কৃষকদের শোষণ, নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, পণপ্রথা, নারী নির্যাতন, বিধবা এবং যৌনকর্মীদের জীবনযাপন, সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি সমস্যা উঠে এসেছে। প্রেমচন্দের উপন্যাস 'গোদান' আলোচিত হয়েছে এই বইয়ের উর্দু বিভাগে। এখানে তাঁর 'কফন' (শবদেহের চাদর) গল্পটির সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে।

গল্পটি শুরু হয় এইভাবে—ঘিসু আর মাধব, বাবা ও ছেলে, কুঁড়েঘরের সামনে বসে আছে আর মাধবের বউ বুধিয়া প্রসব বেদনায় ভিতরে কাতরাচ্ছে। শীতের রাত, প্রকৃতি নিশ্চুপ, গ্রামটি অন্ধকারে ঢাকা। ঘিসু কিংবা মাধব কেউই ভিতরে ঢুকে বুধিয়াকে দেখতে যায় না কারণ আগুনে আলু পুড়ছে আর কেউ ভিতরে গেলে অন্যজন বেশি খেয়ে ফেলবে। বাবা ও ছেলে দুজনেই অদ্ভুত চরিত্রের। মুচি ঘরের এই দুই মানুষ খাটতে চায় না। যদি খাটতে যায়ও, একদিন কাজ করে তিনদিন আয়েশে দিন কাটায়। ঘিসুর বউ আগেই মারা গেছে। বুধিয়া সংসারে এসে খেটেখুটে সংসারটা দাঁড় করাতে চেয়েছিল কিন্তু তাতে বাপ-ছেলের কুঁড়েমি আরো বেড়ে যায়। বুধিয়ার শ্রমেই পেট চলে গেলে কে আর বেরোতে চায়! বুধিয়া বাঁচে না। পরের দিন সকালে বাপ-ছেলে ঘরে ঢুকে মৃত বুধিয়াকে দেখে। মৃতদেহ সৎকারের জন্য বাপ-ছেলে জমিদারের কাছে যায়। জমিদার শ্রমকাতর লোক দুটিকে অপছন্দই করত, তবু দু টাকা দেয় মৃতদেহ সৎকারের জন্য। বাপ-ছেলে গ্রামের অন্যান্য ঘরেও যায় এবং মোটামুটি পাঁচ টাকা দান হিসেবে পায়। বাপ-ছেলে তখন শবদেহ ঢাকার কাপড় কিনতে যায় শহরে। কত দামের কাপড় কিনবে সে নিয়ে আলোচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে কম দামের কাপড়ই ভাল কারণ কালো কাপড়টি অন্ধকারে তেমন দেখা যাবে না আর কাপড়টি পুড়িয়েও ফেলা হবে। কিন্তু সস্তা কাপড়ও শেষ পর্যন্ত কেনা হয় না। ঘুরতে ঘুরতে বাপ ছেলে এক শুঁড়িখানায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানে মদ্য পান সেরে দুজনে পেট পুরে পুরি-তরকারি খায়। বুধিয়াকে আশীর্বাদ করে তার জন্যই তাদের এক ভাল ভোজ হল। কামনা করে বুধিয়া সুখে স্বর্গবাস করুক। মাধব এক সময় কান্নাও জোড়ে। বাবা ঘিসু তাকে জীবনের নশ্বরতার দর্শন বোঝায়—'কাঁদিস কেনে বাপ? আনন্দ কর, মেয়েটা মোহের জাল থেকে বেরিয়ে গেল। কষ্টের বন্ধন থেকে মুক্ত হল। বড়ই

ভাগ্যবতী রে, কত তাড়াতাড়ি মায়ার জট থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।' দারিদ্র্য যে মানুষকে কতখানি অমানবিক করে তোলে তার এক নির্মম বিবরণ এই কাহিনীটি। ভারতীয় গল্পে দারিদ্র্যের এমন হৃদয়-বিদারক রূপ খুব কমই মিলেছে।

১২.৩ যশপাল

১। নিচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক এবং কোন্‌টি ভুল নির্ধারণ করুন।

যশপালের জন্ম পঞ্জাবের ফিরোজপুরে। লাহোরের ন্যাশনাল কলেজে পড়ার সময়েই ভগৎ সিং এবং চন্দ্রশেখর আজাদের সংস্পর্শে আসেন এবং সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। স্যান্ডার্স হত্যা এবং লাহোরের বোমা কারখানা পুলিশের নজরে আসার পরে আত্মগোপন করেন। ১৯২৯ সালে লর্ড আরউইনের ট্রেন যাত্রায় বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। পরে পুলিশের সঙ্গে অনেকবারই মুখোমুখি সংঘর্ষে অংশ নেন। ১৯৩২ সালে ধরা পড়ার পর সারা জীবনের জন্য কারাবাসের রায় ঘোষিত হয় কিন্তু ১৯৩৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পান। জেল থেকে বেরিয়ে 'বিপ্লব' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনায় হাত দেন। ধীরে ধীরে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর পত্রিকাটি এক সময়ে দৈনিকপত্র হয়ে ওঠে কিন্তু সরকারের বিরুধ্বে মত প্রকাশের কারণে দৈনিকটির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৪৭-এর মার্চে নতুন করে প্রকাশিত হলেও ১৯৪৯ সালে সরকারি রোষে পত্রিকাটির প্রকাশ নতুন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। যশপালের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ যার মধ্যে বারোটি উপন্যাস এবং ষোলোটি গল্প-সংকলন। প্রথম বই 'পিঞ্জরে কী উড়ান' প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। এটি একটি গল্প-সংকলন। এরপর ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয় আর একটি গল্প-সংকলন 'ভো দুনিয়া' এবং একটি উপন্যাস 'দাদা কমরেড'। তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেক বছরেই একটি উপন্যাস কিংবা গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। একই বছরে গল্প-সংকলন এবং উপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছে বার চারেক। তাঁর গল্প-উপন্যাসে রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় প্রবলভাবে উপস্থিত কিন্তু যে উপন্যাসগুলিতে রাজনীতি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে এসেছে তার মধ্যে রয়েছে 'দাদা কমরেড', 'দেশদ্রোহী', 'পার্টিকমরেড' 'মনুষ্য কী রূপ' ইত্যাদি। তবে যে দুটি বইয়ের জন্য তিনি ভারতীয় কথাসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন সে দুটি হল 'ঝুটাসাচ' (মিথ্যাসত্য, দু খণ্ডে প্রকাশিত ১৯৫৮ এবং ১৯৬০) এবং 'মেরি তেরি উসকি বাত' (আমার তোমার তার কথা, ১৯৭৫)।

'মিথ্যাসত্য' উপন্যাসটি মহাকাব্যিক। প্রায় পাঁচশ পাতার এই উপন্যাসে স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের পনেরো-ষোলো বছরের (১৯৪২-৫৭) ইতিহাস ধরা আছে। দু খণ্ডে রচিত এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের নাম 'জন্মভূমি ও দেশ' এবং দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'দেশের ভবিষ্যৎ'। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সূত্র থেকে নানা উপকরণ সংগ্রহ করে এই অসামান্য লেখাটি তিনি লেখেন যেখানে রাষ্ট্রের ইতিহাস ও উপন্যাস পরস্পরের সম্পূরক হয়ে উঠেছে। কাহিনীর উৎসর্গ-পত্রে যশপাল লিখেছিলেন 'সত্যকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে সেই মানুষজনের হাতে তুলে দিলাম যারা চিরকাল মিথ্যার দ্বারা বারেবারে প্রতারিত হয়েও সত্যের জন্য নিজেকে নিষ্ঠা এবং লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার সাহস হারায়নি'। হয়ত তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের রক্তপাত, মৃত্যু এবং পরবর্তী সময়ে দেশভাগ ও জাতিদাঙ্গার পরেও উপন্যাসটি মানুষের ওপর আস্থা হারায় না। ডাক্তার নাথের এই কথাগুলি দিয়ে তাই যেন উপন্যাস শেষ হয়, 'গিল, এবার তো তুমি বিশ্বাস করবে যে, জনসাধারণ একেবারে নিস্পৃহ নয়। তারা সব সময় বোঝা হয়েও থাকে না। দেশের ভবিষ্যৎ কখনও কখনও নেতা বা মন্ত্রীদের হাতের মুঠোয় ধরা থাকে না। তা থাকে দেশের জনসাধারণের হাতেই এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে'। (অনুবাদ কালীপদ দাস)

যশপালের আর একটি অসামান্য সৃষ্টি হল 'আমার তোমার তার কথা'। এই বইটির জন্য ১৯৭৩ সালে ঔপন্যাসিক সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। প্রায় সাতশ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসটি তুলে ধরেছেন তার সবলতা ও দুর্বলতা সমেত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনসাধারণের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনও। ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক চরিত্র মিলিয়ে বাস্তবতা ও কল্পনার এক স্মরণীয় মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন যশপাল। গান্ধীজি, মোতিলাল নেহরু, তিলক, লাজপত রায়ের পাশাপাশি এসে গেছে উষার মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষজন যারা নতুন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে। পঞ্জাবের প্রেক্ষিতে লেখা হলেও কাহিনীটি সমগ্র দেশকেই স্পর্শ করেছে, এমনকি বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বকেও।

যশপালের কয়েকটি গল্পের কথাও উল্লেখ করা জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে 'জ্ঞানদান', 'ভগবান কী পিতা দরশন', 'ধর্মযুধ্ব', 'উত্তরাধিকারী', 'ফুলোঁ কা কুর্তা' প্রভৃতি। এই কাহিনীগুলিতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের নানা স্তরকে স্পর্শ করা হয়েছে। এই সম্পর্কের অন্য এক মাত্রা মেলে যশপালের 'দিব্যা' উপন্যাসে (১৯৪৫)। বৌদ্ধ যুগের প্রেক্ষিতে লেখা এই উপন্যাসে দিব্যা বলেছিল সামন্ততান্ত্রিক পরিবারে জীবনযাপনের চেয়ে বারবধূ হিসেবে বেঁচে থাকা তার কাছে বেশি সম্মানের। স্বাধীনতা-দেশভাগের কাহিনীর পাশাপাশি নারী স্বাধীনতার প্রশ্নে যশপালের চিন্তাভাবনা একবিংশ শতাব্দীতেও যথেষ্ট আধুনিক ও প্রগতিশীল।

১২.৪ জৈনেন্দ্র কুমার

প্রেমচন্দ-উত্তর হিন্দি কথাসাহিত্যের সুখ্যাত ঔপন্যাসিক জৈনেন্দ্রের জন্ম ১৯০৫ সালে উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জেলার কৌরিয়গঞ্জ গ্রামের এক জৈন পরিবারে। দু বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে মা ও মামাজের তত্ত্বাবধানে মানুষ হন। মামা হস্তিনাপুরে একটি গুরুকুল বিদ্যালয় চালাতেন যেখানে জৈনেন্দ্র তাঁর প্রথম পর্বের শিক্ষা লাভ করেন। এখানেই আনন্দীলাল নাম পরিবর্তন করে জৈনেন্দ্র রাখা হয়। ১৯১৯-এ পঞ্জাব থেকে জৈনেন্দ্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু পড়া অসমাপ্ত রেখে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জীবিকার জন্য পরে নাগপুরে ব্যবসায়ে নামেন কিন্তু সফল হতে পারেননি। কিছুদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রে তিন মাসের কারাবাস ঘটে। জেল থেকে বেরিয়ে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় আসেন কিন্তু উৎসাহজনক কোন কিছুই ঘটে না। কিছুটা হতাশ হয়েই লেখালিখি শুরু করেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই মামা এবং দুই সঙ্গীর সঙ্গে পায়ে হেঁটে কাশ্মীর যাত্রা করেন। সময়টা বিশ শতকের দুয়ের দশকের শেষ দিক। ১৯২৯-এ প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গল্প 'খেল', গল্প-সংকলন 'পানসি' এবং প্রথম উপন্যাস 'পরখ'। যোগাযোগ গড়ে উঠল প্রেমচন্দের সঙ্গে। ১৯২৩ সালে গান্ধীজির সঙ্গে ও তাঁর সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটল এবং নৈকট্য গড়ে উঠল। পরে গান্ধীজির সভাপতিত্বে যে ভারতীয় সাহিত্য পরিষৎ গড়ে ওঠে তার সঙ্গে যুক্ত হন জৈনেন্দ্র কুমার। তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে, যা পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় বিস্তৃত, তিনি বারোটি উপন্যাস লেখেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'সুনীতা', 'ত্যাগপত্র', 'কল্যাণী', 'সুখদা', 'মুক্তিবোধ' প্রভৃতি। এছাড়াও তাঁর প্রকাশিত গল্পগুলি দশটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

জৈনেন্দ্র কুমারের দ্বিতীয় উপন্যাস 'সুনীতা' প্রকাশের পরে পরেই হিন্দি পাঠকমহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রেমচন্দ ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন বইটির এবং ঔপন্যাসিককে গোর্কির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মৈথিলীশরণ গুপ্ত বলেছিলেন এই লেখকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখক-গুণের সংমিশ্রণ ঘটেছে। অবশ্য বইটির সমালোচনাও করেছিলেন কেউ কেউ, বিশেষ করে নৈতিকতার দিক দিয়ে। সুনীতা মধ্য রাত্রিতে

এক শূন্য স্থানে হরিপ্রসন্নের সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ নগ্ন করেছিল। কিন্তু এর বিপরীতে অনেক পাঠক-সমালোচক এই মতও প্রকাশ করেছিলেন যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে সুনীতার নগ্ন হওয়ার পর্বে। শুধু সুনীতা নয়, অন্যান্য চরিত্রের নির্মাণের কারণেও উপন্যাসটি অনেকের কাছেই স্মরণীয় হয়ে আছে। শৈলীর নতুনত্বের কথাও অনেকে বলেছেন। স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু একই সঙ্গে এক দার্শনিক অনুভূতি উপন্যাসটির গদ্যকে একটি রূপ দিয়েছে।

'ত্যাগপত্র' জৈনেন্দ্র কুমারের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। কাহিনীর কেন্দ্রে আছে মৃণাল নামের একটি যুবতী যে তার চারপাশের জগতের মধ্যে নিজের মনের খোরাক পায় না। তার ভাইপো প্রমোদ তাকে বুঝতে চায়, তার কষ্টের অংশীদার হতে চায়, কিন্তু স্বাধীনচেতা নারীটি কারো দয়া বা অনুকম্পায় বাঁচতে চায় না। কাহিনীর সূত্রপাত এভাবে যে মা-বাবাকে হারিয়ে মৃণাল তার জ্যাঠামশাই ও জ্যাঠাইমার বাড়িতে লালিত হয়। মেয়েটি খুবই রূপসী এবং তার হৃদয়টি নরম এবং বড়। সে তার স্কুলের বান্ধবী শীলার ভাইকে সরলভাবেই ভালবাসে। কিন্তু জ্যাঠাইমার দৃষ্টিতে তা অপরাধ। ফলে মৃণালের কপালে জোটে অকথ্য অত্যাচার এবং তার বিয়ের ব্যবস্থা হয় এক বয়স্ক মানুষের সঙ্গে। এই জীবন মৃণাল মেনে নেয় এবং মনে করে স্বামীকে তার জীবনের পুরনো কথা বলা উচিত। কিন্তু তার এই মুক্ত মন এবং সততার কোনো মূল্যই দেয় না তার স্বামী। তাকে অপমান করে এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। খুবই দুঃস্থ অবস্থায় এক কয়লা বিক্রেতা তাকে ঘরে তোলে তার রূপের টানে। মৃণাল জানে যে মানুষটির রূপের নেশা কাটলে তার আর কোনো মূল্য থাকবে না কিন্তু মৃণাল তবু তাকে স্বামীর মতো সেবাযত্ন করে এবং ভালবাসে। ভাইপো প্রমোদ আসে তার খবর পেয়ে কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেয় মৃণাল। এখানে মৃণালের একটি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—সে বেশ্যা হতে পারে না কারণ তার জানা নেই যাকে শরীর দিচ্ছে তার কাছ থেকে কি করে অর্থ নেওয়া যায়। কয়লার ব্যবসাদার তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর মৃণাল এমন এক পরিবেশে যায় যেখানে মানুষের সঙ্গে পশুর ফারাক নেই বললেই চলে। প্রমোদ আবার তাকে সংসারে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেয় মৃণাল এবং কিছুদিনের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটে। প্রমোদ বিচারকের পদ থেকে ইস্তফা দেয়। কাকীমার বিষয়ে এতই অবিচারের পাহাড় জমেছে যে তার বিচারকের জীবিকা ও পদ অর্থহীন। সমাজে নারীর বিরুদ্ধে যে অত্যাচার তার পদত্যাগ যেন তারই প্রতিবাদ। মৃণালের অবদমিত ইচ্ছা, অব্যক্ত আবেগ এবং নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার মুখোমুখি প্রমোদের সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া উপন্যাসটিকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে।

'মুক্তিবোধ' উপন্যাসের জন্য জৈনেন্দ্র কুমার ১৯৯৬ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। উপন্যাসটি উত্তমপুরুষের বিবরণীতে লেখা। শ্রীসহায় সেই কাহিনী কথক। তিনি রাজনৈতিক মানুষ এবং মন্ত্রী কিন্তু ক্ষমতালিপ্সু নন। তাঁকে পীড়া দেয় যেভাবে রাজনীতি নৈতিকতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তিনি আহত হন যখন দেখেন গান্ধীজির আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। নারী-পুরুষ সম্পর্কের দিকটিও উপন্যাসে নানা দিক থেকে তুলে ধরা হয়েছে। সহায় অনুভব করেন তাঁর স্ত্রী রামুশ্রীর কাছে থেকে অনেক কিছুই পান না যা অন্য এক নারী নীলা দিতে পারে। এটি যৌনতার বিষয় নয়, ভালবাসা। এসবই তাঁকে ভাবায়, তাঁকে কলম ধরতে অনুপ্রাণিত করে। সব মিলে 'মুক্তিবোধ' উপন্যাস স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের দোলাচলের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র।

জৈন দর্শন, গান্ধীবাদ এবং নিজেই চড়াই-উতরাই মিলে জৈনেন্দ্র কুমারের সাহিত্যে এক আশ্চর্য গভীরতা মেলে।

১২.৫ ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'

ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'-র জন্ম ১৯২১ সালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ঔরাহি হিঙ্গনা গ্রামে। নেপালের কৈরালা পরিবার পরিচালিত একটি ইস্কুলে শৈশবের পড়াশোনা, ফলে নেপালি ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জন করেন। বেশ ভাল বাংলাও শেখেন যেহেতু গ্রামটি ছিল বাংলার সীমানা ছুঁয়ে। 'রেণু' ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেন এবং ওই বিষয়ের ওপর একটি বইও লেখেন। পরবর্তী সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনে অংশ নেন এবং জরুরি অবস্থার সময়ে, সাতের দশকে, আবার কারাবাস ঘটে। সরকারের 'পদ্মশ্রী' উপাধি গ্রহণ করেননি কারণ তৎকালীন সরকারের অনেক কাজকর্মকেই তিনি জনবিরোধী বলে মনে করেছিলেন।

'রেণু'-ই প্রথম হিন্দি কথাসাহিত্যিক যাঁর উপন্যাস একটি বিশেষ অঞ্চলের কাহিনীর প্রধান চরিত্র হিসেবে উঠে এল। তাঁর প্রধান উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'মৈলা আঁচল' (ময়লা অঞ্চল, ১৯৫৪), 'পরতি পরীকথা' (পোড়ো জমির গল্প, ১৯৫৭) ইত্যাদি। তাঁর তিনটি গল্প-সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর 'তিসরি কসম' নামে একটি ছোটগল্পে চলচ্চিত্র রূপায়ণ বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। 'রিঞ্জল ধঞ্জল' নামে একটি রিপোর্টার্জও লেখেন।

'ময়লা অঞ্চল' উপন্যাসটি প্রকাশের পরই পাঠকমহলে বিশেষ আলোড়ন তৈরী করে। পূর্ণিয়া জেলার মেরিগঞ্জ গ্রামের জনজীবনকে নিয়ে এই কাহিনী। সেই অর্থে উপন্যাসে কোনো প্লট বা গল্প নেই, গ্রামটিই বইটির ভরকেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে। কাহিনীর সময়সীমা দেড় বছর। দু খণ্ডের এই উপন্যাসের প্রথম অংশে আছে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী জীবন এবং পরের অংশ স্বাধীনতার কাছাকাছি এবং পরবর্তী কয়েকমাস। গ্রামে রয়েছে নানা জাতপাতের মানুষ এবং গ্রামের একপাশে আদিবাসী সাঁওতাল পাড়া। গ্রামের মধ্যে জাত নিয়ে সবসময়েই টানাপোড়েন রয়েছে এবং তা রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। সে কারণে কাহিনীর একটি অন্যতম চরিত্র বলদেবকে যাদব বেরা একজন সৎ কংগ্রেসকর্মী বলে সমর্থন করে না, তার প্রতি তাদের সমর্থন এই কারণে যে সেও একজন যাদব।

গ্রামে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। একটি ম্যালেরিয়া গবেষণা কেন্দ্র এবং পাশাপাশি একটি হাসাপাতাল তৈরী হয়। প্রশান্ত নামে বাঙালি একজন ডাক্তার আসেন যিনি চিকিৎসার পাশাপাশি ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের চিকিৎসা করেন। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় তহশিলদার বিশ্বনাথ প্রসাদের মেয়ে কমলার একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ডাক্তারকে জেলে পোরা হয় কারণ আদিবাসীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য তার কাজকর্ম ব্রিটিশ সরকার সন্দেহের চোখে দেখে এবং দেশ বিরোধী বলে মনে করে। একসময় সে জেল থেকে বেরিয়ে আসে এবং শিশু পুত্রটিকে কোলে নিয়ে ঘোষণা করে যে সে ঐ গ্রামের মানুষদের জন্যই কাজ করে যাবে। কাহিনীতে আশ্রমজীবন, সোস্যালিস্ট পার্টির কাজকর্ম, চরকা কাটা, ধনী চাষি এবং ক্ষেতমজুরদের মধ্যে দেনাপাওনা নিয়ে টানাপোড়েন, টিপ সই নিয়ে ঠকানো, গ্রামীণ উৎসব ইত্যাদি নানা বিষয় এসেছে।

'রেণু'-র কথাসাহিত্যের যে দিকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে রয়েছে বিহারের মিথিলা অঞ্চলটির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম এবং আন্তরিক টান। ঐ অঞ্চল নিয়ে তিনি যে উপন্যাস ও গল্প লেখেন সেখানে তিনি বইরের মানুষ নন—অনেক চরিত্রের মধ্যে তিনিও একজন। তিনি ভেতর থেকেই ভেতরের টানাপোড়েনগুলিকে দেখছেন এবং লিখছেন। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রতিবেশী মানুষজনের প্রতি তাঁর ভালবাসা। তিনি বহু বাঙালি চরিত্র গড়ে তুলেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে। নেপালি চরিত্রও রয়েছে তাঁর লেখায়। তাঁর আর একটি বিশেষত্ব হল তিনি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষজনের দৈনন্দিন অনাটকীয়ভাবে জীবন যাপনকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তাঁর গদ্য প্রায় কবিতার ভাষার মতো নান্দনিক হয়ে উঠেছে। এখানে তিনি প্রেমচন্দ থেকে হিন্দি সাহিত্যের অন্যান্য অনেক ঔপন্যাসিককেই অতিক্রম করে চলে গেছেন বলে মনে হয়। উদাহরণ হিসেবে তাঁর 'হরতনের

বিবি' গল্প থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। গল্পটি এই রকম—সামান্য দূরের গ্রাম বলরামপুরে নাচ হবে এবং সেখানে নাচ দেখতে যেতে অনেক পরিবারই উৎসাহী। বিরজুর মাও যেতে চায় কিন্তু সন্ধে হয়ে এলেও বিরজুর বাবা ফেরে না। সেই নিয়ে বিরজুর মায়ের মেজাজ তুঙ্গে। ছেলে ও মেয়েকে পেটায়। ঝগড়া করে ফেলে মাখ্‌নি পিসির সঙ্গে। সে-ও পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয় বিরজুর মাকে। পাড়াপড়শির অনেকের রাগ বিরজুর মায়ের ওপর কারণ সার্ভের সময় জমিদারের সঙ্গে লড়াই করে সে পাঁচ বিঘে জমি আদায় করে এবং তাতে ভাল পাট এবং অন্যান্য ফসল হচ্ছে। তাতে অবস্থা ফিরে গেছে। বিরজুর বাবার ওপর রেগে বিরজুর মা শুয়ে পড়ে ছেলেমেয়েকে নিয়ে। শেষে বিরজুর বাবা সত্যিই আসে এবং রাগও পড়ে বিরজুর মায়ের। সে রাঙালু দিয়ে মিষ্টি রুটি তৈরী করে। তারপর গরুর গাড়িতে চেপে মেলায় চলে। যেতে যেতে জঙ্গির বৌ এবং পাড়ার আরো কজন মেয়েকে তুলে নেয় বিরজুর মা। গল্পের শেষ দিকের সেই সমবেত যাত্রার বিবরণ এই রকম :

> গাড়ি গাঁয়ের বাইরে এসে ধান ক্ষেতের বাইরে নিয়ে যেতে থাকে। জ্যোৎস্না—কার্তিক মাসের।...ক্ষেত থেকে ধানের ঝরা ফুলের গন্ধ আসে। বাঁশ ঝাড়ের কোথাও বুনো লতায় দুধসাদা ফুল ফুটেছে। জঙ্গির ছেলের বৌ একটা বিড়ি ধরিয়ে বিরজুর মার দিকে এগিয়ে দেয়। বিরজুর মার সহসা মনে পড়ে, চম্পিয়া, সুনরী, নারানের বৌ আর জঙ্গির ছেলের বৌ, এরা চারজনেই গাঁয়ে বায়োস্কোপের গান গাইতে জানে।...বাঃ।
>
> গাড়ির চাকা ধান ক্ষেতের মাথা দিয়ে চলে। চারদিকে গাওনার গাড়ির খসখসানির শব্দ হয়।...বিরজুর মার কপালের টিপে চলকে পড়েছে জ্যোৎস্না।
>
> (অনুবাদ সুবিমল বসাক)

গল্পটি শেষ হয়েছে আরো চার-পাঁচটি ছোট ছোট অনুচ্ছেদের পরে। কিন্তু সেই অর্থে শেষ নয়। যেন চলমান জীবনের একটি অংশকে তুলে ধরা। এটি 'রেণু'-র গল্প-উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নাটকীয়তাকে বাদ দিয়ে জীবনকে ছোঁয়া, যেখানে জীবন ও সাহিত্যের ভেতর কোনো প্রাচীর থাকে না।

১২.৬ নির্মল বর্মা

নির্মল বর্মার জন্ম ১৯২৯ সালে সিমলায়। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে ১৯৫১ সালে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শেষ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। পরে অধ্যাপনায়। একসময় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন মতান্তরের কারণে। ১৯৫৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় যান সেখানকার প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে চেক কথাসাহিত্যের হিন্দি অনুবাদের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ১৯৬৮ সালে দেশে ফেরেন চেক চিন্তাবিদদের ওপর সোভিয়েত হস্তক্ষেপের পর কিছুদিন লন্ডনে কাটিয়ে। ১৯৭২ সালে যোগ দেন সিমলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ-এ, মিথ বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯৭৩ সালে তাঁর গল্প অবলম্বনে ছবি 'মায়াদর্পণ' শ্রেষ্ঠ 'নিউওয়েভ' ছবির সম্মান অর্জন করে। ১৯৭৭-এ তিনি আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামে অংশ নেন। ১৯৮৪-৮৫ সালে ভোপালে 'নিরালা সৃজনপীঠ' পদটির পরিচালক হন। ১৯৮৫ সালে বি.বি.সি. তাঁকে নিয়ে ডকুমেন্টারি তৈরি করে। ১৯৮৮ সালে তিনি সিমলায় যশপাল পদটিতে পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫০ থেকে ৬০ সাল পর্যন্ত হিন্দি নয়া কাহিনী আন্দোলনের অন্যতম লেখক ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে দিল্লিতে বসবাস করতেন।

তাঁর প্রথম গল্প-সংগ্রহ 'পরিন্দে' (পাখি) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। সংকলনের নাম-গল্পটিতে

একটি নারীর একাকীত্বের কথা ছিল যে তার মৃত স্বামীকে কিছুতেই ভুলতে পারে না। অনুভূতির এতখানি গভীর স্তর থেকে নারীটির মনের বিন্যাসটি ধরা হয়েছিল যে অনেকেই মনে করেন সেদিন হিন্দি গল্পে এক নতুন যুগ শুরু হল। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হল প্রথম গল্প-সংকলন 'জ্বলতি ঝাড়ি' (জ্বলন্ত ঝোপ) এবং একই বছর প্রথম উপন্যাস 'ওয়ে দিন' (আকাঙক্ষার দিনগুলি)। উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ-এর সমাজের প্রেক্ষিতে যেখানে এক ভারতীয় ছাত্র এবং এক অস্ট্রিয়ান যুবতীর জটিল সম্পর্ক ও বিচ্ছিন্নতার বিবরণ আছে। পরবর্তী উপন্যাস 'লাল টিন কা ছত' (লাল টিনের ছাত) কাহিনীতেও মানব-সম্পর্কের নানা জটিলতা ধরা পড়েছে। তাঁর আরো দুটি উপন্যাস ' এক চিথড়া সুখ' (এক ফালি সুখ) বা 'রাত কা রিপোর্টার' (রাতের সংবাদদাতা) উপন্যাসে মানুষের মনোজগতের কার্যকলাপকে ভিন্ন প্রেক্ষিতে ধরা হয়েছে। নির্মল বর্মার অন্য তিনটি উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলনের মধ্যে রয়েছে 'পিছলি গর্মিয়োঁ মেঁ' (গত গ্রীষ্মে), 'বীচ বহস মেঁ' (আলোচনার মাঝে), 'কাউয়া আউর কালাপানি' (কাক ও কালাপানি)। শেষ গল্পের বইটিতে তাঁর সাতটি গল্প আছে যার মধ্যে তিনটির পটভূমি ভারতবর্ষ এবং চারটির পটভূমি ইউরোপ। বাংলা অনুবাদে গল্পগুলির নাম হল—এক ফালি রোদ, অন্য জগৎ, জীবন এখানে আর ওখানে, প্রাতঃভ্রমণ, পুরুষ ও মেয়ে, কাক ও কালাপানি এবং এক দিনের অতিথি। গল্পগুলির প্রেক্ষিত দুই ভিন্ন উপমহাদেশের হলেও এক জায়গায় বেশ অদ্ভুত মিল রয়েছে। গল্পগুলিতে মানুষের জীবনের এমন এক বাস্তবতার কথা যার কোনো সংজ্ঞা নেই, কোনো সমীকরণেও বোঝা যায় না। লেখকের নিজের ভাষায় এটি অনেকখানি ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পাখির মতো। 'এক ফালি রোদ' গল্পের নারীটি জানে না সত্যিই তার সঙ্গে তার স্বামীর বিচ্ছেদ কেন হল। পরস্পরকে ভালবেসে তারা বিয়ে করে কিন্তু একদিন আবিষ্কার করে ভালবাসার বন্ধনটি আর নেই।

> দুজনে ঘুমোচ্ছিলাম। কি একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ—যেমন ছোটবেলায় কখনো কখনো হত।....খাটে এসে বসি, তার নিদ্রিত শরীরে হাত রাখি—শরীরের সেই সব অঙ্গ যা আমায় একদিন নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিল....।
> (অনুবাদ মায়া গুপ্ত)

সে রাতে মেয়েটি অনুভব করে যে মানুষটির সঙ্গে সে শুয়ে আছে তার শরীরে মেয়েটির নাম হারিয়ে গেছে। এ গল্পের প্রেক্ষিত ইউরোপ। অন্যদিকে 'কাক ও কালাপানি' গল্পের সাংবাদিক যুবক পারিবারিক সম্পত্তির কাগজে সই করাতে জ্যাঠামশাই অঘোরিবাবার কাছে যায় দিল্লি থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টার বাসযাত্রা করে। জ্যাঠামশাই হঠাৎই একদিন বাড়ি ছেড়েছিলেন সকলের অজান্তে, বহু বছর আগে। আজ সাংবাদিক ভাইপো আবিষ্কার করে ধর্মের প্রতি কোনো বাড়তি টানে তিনি এই জীবন গ্রহণ করেননি। তিনি জানান—'ওরা কি আমাকে সন্ন্যাসী মনে করছে? আমি তো এমনিই এখানে থাকি, যেমন বাড়িতে থাকতাম, কেবল জায়গাটা বদলে গেছে।' এই গল্পের প্রেক্ষিত ভারতবর্ষ কিন্তু প্রথম গল্পের নারী এবং দ্বিতীয় গল্পের পুরুষটির জীবনকে দেখার দৃষ্টিতে কোথাও যেন অনেকখানি মিল আছে। আর নির্মল বর্মার নির্মাণে গদ্য ও পদ্যের দূরত্ব বেশ কমই—কখনো কখনো মনে হয় তিনি যেন দুই শিল্পরূপের কোনো মধ্যবর্তী এলাকার স্রষ্টা।

এছাড়া স্বাধীনতা-উত্তর হিন্দি কথাসাহিত্যে যাঁদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভীষ্ম সাহনি (১৯১৫-২০০৩), মোহন রাকেশ (১৯২৫-৭২), শ্রীলাল শুক্ল (১৯২৫), রাজেন্দ্র যাদব (১৯২৯),

মন্নু ভাণ্ডারি (১৯৩১), কমলেশ্বর (১৯৩২), ঊষা প্রিয়ংবদা (১৯৩২), গিরিরাজ কিশোর (১৯৩৬), কাশীনাথ সিং (১৯৩৬) প্রমুখ।

১২.৭ অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক এবং কোন্‌টি ভুল নির্ধারণ করুন।

(ক) 'রহস্য কথা' উপন্যাসটির লেখক বালকৃষ্ণ ভট্ট।

(খ) প্রেমচন্দের প্রকৃত নাম ছিল ধনপত রায়।

(গ) 'কফন' গল্পের মাধবের বৌয়ের নাম লিখিয়া।

(ঘ) যশপাল 'বিপ্লব' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।

(ঙ) জৈনেন্দ্র কুমারের লেখার মধ্যে জৈন দর্শনের ছাপ রয়েছে।

(চ) 'রেণু'-র 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের পটভূমি দারভাঙা অঞ্চল।

(ছ) নির্মল বর্মার 'ওয়ে দিন' উপন্যাসটিকে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

(জ) সুখ্যাত নাটক 'মহাভোজ'-এর লেখক মন্নু ভাণ্ডারি।

(ঝ) 'তিসরি কসম' গল্পটির লেখক গিরিরাজ কিশোর।

(ঞ) বাংলা নাটক 'কাশীনামা'-র মূল লেখক রাজেন্দ্র যাদব।

২। পঁচিশ থেকে তিরিশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন :

(ক) হিন্দি কথাসাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক।

(খ) যশপালের 'মিথ্যাসত্য'।

(গ) 'সুনীতা'।

(ঘ) 'মুক্তিবোধ'।

৩। পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন

(ক) 'কফন'।

(খ) 'ত্যাগপত্র' উপন্যাসের মৃণাল।

(গ) নির্মল বর্মার গল্পের শৈলী।

৪। দেড়শ শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

ঔপন্যাসিক হিসেবে ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'-র বিশিষ্টতা।

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। হিন্দি গল্প সংকলন, সম্পাদনা ভীষ্ম সাহনি, সাহিত্য অকাদেমি, বাংলা অনুবাদ সুবিমল বসাক, ১৯৯৯।

২। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইন্ডিয়ান লিটরেচর, খণ্ড ৬, সাহিত্য অকাদেমি।

৩। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশি 'মিট দ্য অথার' পুস্তিকা।

একক ১৩ ❐ ভারতীয় অন্যান্য ভাষার কথাসাহিত্য

গঠন

১৩.১ প্রস্তাবনা
১৩.২ অনুশীলনী
১২.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ প্রস্তাবনা

ডোগরি, কাশ্মীরি, কোঙ্কানি, তেলুগু, মৈথিলী, মণিপুরী, নেপালি, রাজস্থানি, সংস্কৃত এবং সিন্ধি ভাষাতেও কথাসাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য আছে। স্থানাভাবে এইসব ভাষার গল্প-উপন্যাস বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হল না। কিন্তু কিছু লেখক এবং বইয়ের উল্লেখ করা যায়।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ডোগরি ভাষার উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিকরা হলেন বি.পি. সাটে (১৯১০-৭৩), শ্রীবৎস বিকল শাস্ত্রী (১৯৩১-৭০), নরেন্দ্র খাজুরীয়া (১৯৩২-৭০), বেদ রাহী (জন্ম ১৯৩৩), ওম গোস্বামী (১৯৪৭) প্রমুখ। বি. পি. সাটে 'পহেলা ফুল' এবং 'খালি গোড়' নামে দুটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেন যেখানে গ্রামের লৌকিক জীবনের ছবি রয়েছে। শ্রীবৎস বিকল শাস্ত্রীর গল্প-উপন্যাস সমাজ চেতনায় উজ্জ্বল। তিনি 'ফুল বিনা ডালি' (ডাল ছাড়া ফুল) বইয়ের জন্য ১৯৭০ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। নরেন্দ্র খাজুরীয়া তাঁর 'নীলা অম্বর কালে বাদল' (নীল আকাশ, কালো মেঘ) গল্পগ্রন্থের জন্য মরণোত্তর সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান ১৯৭০ সালে। তাঁর গল্প-উপন্যাসে দরিদ্র মানুষজনের কথা আছে এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ রয়েছে। বেদ রাহী তিনটি ভাষাতে লেখেন—ডোগরি, হিন্দি এবং উর্দু। তাঁর ডোগরি গল্প-উপন্যাসে গভীর মানবিকতা এবং সমাজ-সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে। 'আলে' নামের একটি গল্প-সংকলনের জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। ওম গোস্বামী একজন জনপ্রিয় গল্পকার। তাঁর লেখায় সমাজে পিছিয়ে থাকা মানুষজনের জীবন চিত্রিত হয়েছে। বাস্তববাদী এই কথাকারের কলমে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার এক নিপুণ ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি দেখিয়েছেন শাসন বদলায় কিন্তু শোষণ বন্ধ হয় না।

কাশ্মীরি কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য লেখকরা হলেন মোহম্মদ অমীন কামিল (জন্ম ১৯২৪), বশীর আখতার (জন্ম ১৯২৪) আখতার মোহী-উদ্-দীন (জন্ম ১৯২৮), এ.কে. রহবর (জন্ম ১৯৩৩), হরেকৃষ্ণ কাউল (জন্ম ১৯৩৪) প্রমুখ। অমীন কামিল উর্দুতে লেখা শুরু করে ১৯৫২ সালে কাশ্মীরিতে সরে যান। তিনি সাধারণ মানুষের ভাষাতে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের দুটি নাটক কাশ্মীরি ভাষাতে অনুবাদ করেছিলেন। বশীর আখতারের লেখার মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকার আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলি গুরুত্ব পেয়েছে। আখতার মহী-উদ্-দীনও উর্দু থেকে সরে কাশ্মীরি ভাষায় লেখা শুরু করেন। তাঁর লেখায় মানুষের মানবিক দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। এ. কে. রহবরের লেখার বৈশিষ্ট্য হল সূক্ষ্ম বিদ্রূপ, নৈর্ব্যক্তিকতা এবং আকর্ষণীয় কথোপকথন। হরেকৃষ্ণ কাউল প্রথমে হিন্দিতে লেখা শুরু করে পরে কাশ্মীরি ভাষাতে সরে আসেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ফুটে উঠেছে।

গোয়ার কোঙ্কানি ভাষার উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে রয়েছেন ভি. জে. পি. সালডাংহা (জন্ম ১৯২৫), প্রশান্ত কেনী (জন্ম ১৯৩৪), এ. এন. মহামব্রো (জন্ম ১৯৩৮), অলিভিনহো গোমস (জন্ম ১৯৩৪),

দামোদর মৌজো (জন্ম ১৯৪৪), শীলা কোলাম্বকার (জন্ম ১৯৪৭) প্রমুখ। সালডাংহা কবিতা, গান, নাটক ছাড়া পঁয়ত্রিশটি উপন্যাস লিখেছেন। চন্দ্রকান্ত কেনী কোঙ্কানি নতুন গল্প আন্দোলনের পথিকৃৎ। এ. এন. মহামব্রোর লেখায় রাজনীতিবিদদের অনৈতিক কাজকর্মের প্রতি তীব্র বিদ্রুপ ফুটে উঠেছে। অলিভিনহো গোমস ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিসট্রেটিভ সার্ভিসে কাজ করতেন, পরে গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন। অনেকগুলি দেশি-বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত গোমসের লেখায় বিস্তৃত জগতের ছায়া লক্ষ করা যায়। দামোদর মৌজো কোঙ্কানি কথাসাহিত্যের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক। তাঁর লেখায় খ্রিস্টান ও হিন্দু দুটি সম্প্রদায়েরই জীবনযাপনের ছবি ফুটে উঠেছে। বিষয়ের মৌলিকতা এবং চরিত্র নির্মাণের বিশেষ ক্ষমতা তাঁর সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শীলা কোলাম্বকারের লেখায় শিশুদের জীবন সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। মানুষজনের মনের জগতেরও এক উল্লেখযোগ্য বিবরণ মেলে এই মহিলা কথাসাহিত্যিকের কলমে।

তেলুগু ভাষার উল্লেখযোগ্য কথাকাররা হলেন উন্নাভ লক্ষ্মীনারায়ণ পুন্তুলু (১৮৭৭-১৯৫৮), জি. ভি. চলম (১৮৯৪-১৯৭৫), কে. কুটুম্ব রাও (১৯০৯-৮০), পালগুম্মি পদ্মরাজু (১৯১৫-৮৩), কালিপতণম রামা রাও (জন্ম ১৯২৪) প্রমুখ। উন্নাভ লক্ষ্মীনারায়ণ পুন্তুলুর 'মালপল্লী' (হরিজনপল্লী) উপন্যাসটি আধুনিক ধ্রুপদী সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯২৩ এবং ১৯৩৬ সালে বইটিকে ইংরেজ সরকার দু-বার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কারণ এর ভেতর বলশেভিক ও কমিউনিস্টদের প্রতি সমর্থন এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। আদি দলিত সাহিত্যের এটি একটি পথিকৃৎ গ্রন্থ। চলমের সুখ্যাতি তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রেম এবং যৌনতার সংস্কারমুক্ত উপস্থাপনার কারণে। তাঁর গদ্যও তেলুগু ভাষাকে অন্য এক গভীরতা এবং মর্যাদা দিয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে 'ব্রহ্মনিকম' (ব্রাহ্মণ্যবাদ), 'স্ত্রী' প্রমুখ। কুটুম্ব রাওয়ের উপন্যাসের সংখ্যা বারো এবং প্রকাশিত গল্প একশোরও বেশি। তাঁর লেখায় দারিদ্র্য, অসাম্য, নিরক্ষরতা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর চিন্তার প্রগতিশীলতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পালগুম্মি পদ্মরাজুর পরিচিতি মূলত গল্প লেখক হিসেবে। তাঁর গল্পে বিষয় ও শৈলীর অপূর্ব ভারসাম্য লক্ষ করা যায়। একজন র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হিসেবে তিনি মানুষ এবং সমাজের সংস্কারমুক্ত বিকাশের কথা বলেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে। কালিপতণম রামা রাও খুব বেশি লেখেননি কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনকে তিনি এমনই এক গভীর মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেন যে তাঁর লেখা দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

মৈথিলি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে আছেন উপেন্দ্রনাথ ঝা 'ব্যাস' (জন্ম ১৯১৭), ব্রজকিশোর বর্মা 'মণিপদ্ম' (১৯১৮-৮৬), ললিত মিশ্র (১৯৩২-৮৩), মায়ানন্দ মিশ্র (জন্ম ১৯৩৪), জীবকান্ত (জন্ম ১৯৩৬), প্রভাসকুমার চৌধরী (১৯৪১) প্রমুখ। উপেন্দ্রনাথ ঝা 'ব্যাস'-এর বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে রয়েছে 'কুমার' (উপন্যাস), 'দুই পত্র' (উপন্যাস) এবং 'বিড়ম্বর' (গল্প-সংকলন)। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ-ছ দশকের সামাজিক গোত্রান্তরের পর্বটি তাঁর লেখায় ধরা পড়েছে। মণিপদ্মের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে লৌকিক জীবন। ললিত মিশ্রের লেখায় নাটকীয়তা এবং আধুনিক বাস্তবতার প্রকাশ ঘটে। মায়ানন্দ মিশ্রের উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'বিহাড়ি, পাত ও পাথর' (হাওয়া, পাতা ও পাথর) এবং 'খোতা আত চিড়ে' (নীড় ও পাখি)। তাঁর ছোটগল্পগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি এবং চরিত্র উপস্থাপনার কুশলতার কারণে। জীবকান্তের লেখায় গ্রাম-জীবনের দৈনন্দিনতা ধরা পড়েছে। প্রভাসকুমার চৌধরীর সুখ্যাতি তাঁর বাস্তবধর্মিতার কারণে। অনাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনকে তিনি বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। আর একজন মৈথিলী কথাসাহিত্যিকের কথাও উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন গোবিন্দ ঝা (জন্ম ১৯২৩)। তাঁর লেখায় লৌকিক জীবন ধরা পড়েছে। গোবিন্দ ঝায়ের লেখায় আয়রনির ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ।

মণিপুরী কথাসাহিত্যে যাঁদের অবদান স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কমল সিং (১৮৯৯-১৯৩৪), এম. কে. বিনোদিনী দেবী (জন্ম ১৯২৬), হিজম গুণো সিং (জন্ম ১৯২৭), কুঞ্জমোহন সিং (জন্ম ১৯৩৫), পাচা মেইতেই (জন্ম ১৯৪৩) প্রমুখ। কমল সিংহের হাতে আধুনিক মণিপুরী কথাসাহিত্যের সূত্রপাত। ১৯৩২-এ প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর উপন্যাস 'মাধবী'। মাধবী এবং ধীরেন্দ্রকুমার সিংহের প্রেম-কাহিনী উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় বস্তু। কিন্তু তাদের এই প্রেম শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি, বিয়োগ ব্যথায় এর পরিণতি ঘটে। বিনোদিনী দেবীর কৈশোরের দিনগুলি কেটেছে শান্তিনিকেতনে। চলাফেরার জগৎটিও বেশ বড়। গল্প-উপন্যাসে আধুনিকতার বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি গল্প-সংকলন হল 'নানগাইরক্তা চন্দ্রমুখী' (মরুভূমির ফুল) এবং 'বড় সাহেব অম্বি সোনা তোমবি' (সোনা তোমবি বড় সাহেবকে কথা দিয়েছে)। গুণো সিং মণিপুর সরকারের বিচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং মানুষের সুখ-দুঃখের অতীত অভিজ্ঞতা তাঁর জীবিকার মাধ্যমে তিনি অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে উপন্যাস 'খুদোল' (বর্তমান) এবং 'বীর তিকেন্দ্রজিৎ রোড' এবং গল্প-সংকলন 'লংজিন সংখরবা কিসি' (হারিয়ে যাওয়া গিঁট)। 'বীর তিকেন্দ্রজিৎ রোড' বইটির জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। কুঞ্জমোহন সিংহের লেখায় সমাজে পিছিয়ে থাকা মানুষজনের দুঃখকষ্ট চিত্রিত হয়েছে। ঘটনার বিবরণ এবং চরিত্র সৃষ্টির মুন্সীয়ানার জন্যও তিনি নন্দিত হয়েছেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলন হল 'ইলিশা অমগী মহাও' (ইলিশ মাছের স্বাদ)। পাচা মেইতেইয়ের লেখায় বাইরের তুলনায় মানুষের অন্তরের অনুভূতিকে স্পর্শ করার প্রচেষ্টা বেশি। তাঁর 'ইমফাল অমসুং আইশিং নুংশিটকী ফিবম' (ইম্ফল এবং এর আবহাওয়ার অবস্থা) উপন্যাসটিতে তিনি এক যুবকের হতাশার কথা লেখেন যে কাছাড় থেকে অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে ইম্ফলে এসেছিল।

নেপালি ভাষার উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে রয়েছেন রূপনারায়ণ সিংহ (১৯০৭-৫৫), শিবকুমার রাই (জন্ম ১৯১৯), লীলাবাহাদুর ছেত্রী (জন্ম ১৯২৮) এবং ইন্দ্রবাহাদুর রাই (১৯২৭)। রূপনারায়ণ রাই নেপালি কথাসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর লেখায় আদর্শবাদ এবং রোমান্টিকতার মিশ্রণ ঘটেছে। নারীদের সুখ-দুঃখও তাঁর লেখায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলন হল 'কথা নব রত্ন' (নব রত্নকথা)। শিবকুমার রাই সমাজসংস্কার ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একসময় পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার সদস্যও ছিলেন। 'খহরে' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলন যা 'বর্ষার ঝর্ণা' নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। লীলাবাহাদুর ছেত্রীর বিশিষ্টতা একজন কঠোর বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে। 'তিন দশক বিশ অভিব্যক্তি' নামে তাঁর একটি গল্প-সংকলন আশির দশকে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বসায়িন' (উপড়ে ফেলা) প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচের দশকে। তাঁর 'ব্রহ্মপুত্রকো চেউতিনা' (ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ের কাছাকাছি) উপন্যাসটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ইন্দ্রবাহাদুর রাই একজন প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক যাঁর লেখায় জীবনকে নানা স্তরে স্পর্শ করার চেষ্টা রয়েছে। তিনি 'পরমান্ন' নামের একটি গল্পে লিখেছিলেন, 'জীবন যেন তিস্তার মতো চির-প্রবহমান এক উদ্দাম উচ্ছল পাহাড়ি ঝর্ণা।'

রাজস্থানি ভাষার কথাসাহিত্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন মুরলীধর ব্যাস (১৮৯৭-১৯৮৩), অন্নারাম 'সুদামা' (জন্ম ১৯২৩), নৃসিংহ রাজপুরোহিত (জন্ম ১৯২৪), যাদবেন্দ্র শর্মা 'চন্দ্র' (জন্ম ১৯৩২), রামেশ্বর দয়াল শ্রীমালী (জন্ম ১৯৩৮) এবং সাণওয়ার দইয় (জন্ম ১৯৪৮)। মুরলীধর ব্যাস তাঁর লেখায় গরীব পদদলিত মানুষজনের দুঃখ-কষ্ট তুলে ধরেছেন এবং সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। অন্নারাম 'সুদামা'-র লেখাতেও আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে। নারীদের দুঃখ-কষ্টের বিষয়টিও তাঁর লেখায় ফুটে উঠে। 'মহন্তী কায়া মূলকতী ধরতী' (সুগন্ধী দেহ এবং সহাস্য ভূমি) নামের একটি উপন্যাসে

নারীদের বেশ কিছু সমস্যা তুলে ধরেন। নৃসিংহ রাজপুরোহিত বিষয় এবং উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর তিনটি উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলন হল 'রাত বাসো' (রাত্রি বাস), 'অমর চুনাড়ি' (চিরকালীন ওড়না) এবং 'পরভাতীয় তারো' (প্রভাতের তারা)। যাদবেন্দ্র শর্মা 'চন্দ্র' রাজস্থানি এবং হিন্দি দুটি ভাষাতেই লিখেছেন। আঞ্চলিক উপন্যাসের লেখক হিসেবে তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি। তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'যোগ সংযোগ' এবং 'হূন গোরি কিন পীভ রী?' (কে আমার স্বামী)? রামেশ্বর দয়াল শ্রীমালীর লেখায় সামাজিক এবং রাজনৈতিক দুর্নীতির দিকটি উল্লেখযোগ্যভাবে ধরা পড়েছে। সাণওয়ার দইয়-র পরিচিতি নতুন রীতির কথাকার হিসেবে। নানা সামাজিক সমস্যা তাঁর গল্পে আধারিত হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে যাঁরা কথাসাহিত্য লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অম্বিকাদত্ত ব্যাস (১৮৫৯-১৯০০), ভট্ট মথুরানাথ শাস্ত্রী (১৮৮৯-১৯৬৪), পণ্ডিত কৃষ্ণা রাও (১৮৯০-১৯৫৪), আনন্দবর্ধন রত্নপরখী (জন্ম ১৯১৯) এবং বিশ্বনারায়ণ শাস্ত্রী (১৯২৩-২০০২)। অম্বিকাদত্ত ব্যাসের লেখা 'শিবরাজ বিজয়' উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল ১৮৮৯ থেকে ৯১ সালে এবং প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০১-এ। উপন্যাসটিতে মুসলমান অপশাসনের বিরুদ্ধে ছত্রপতি শিবাজীর বিজয়লাভের বৃত্তান্ত রয়েছে। ভট্ট মথুরানাথ শাস্ত্রী সংস্কৃত আধুনিক ছোটগল্পের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি বেশ কিছু গল্পে দেখিয়েছেন কেমন করে সুবিধাভোগী শ্রেণী ধর্ম ও আধুনিক শিক্ষাকে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করে। পণ্ডিত কৃষ্ণা রাও তাঁর একমাত্র গল্প-সংকলন 'কথামুক্তাবলী'-তে পারিবারিক জীবনের নানা সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। নারীদের সমস্যাগুলি তাঁর লেখায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আনন্দবর্ধনের 'কুসুমলক্ষ্মী' উপন্যাসে ব্রিটিশ শাসনের কালে তিরিশ ও চল্লিশের দশকের ভারতীয় সমাজের সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বনারায়ণ শাস্ত্রীর লেখা 'অবিনাশী' উপন্যাস সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে অবিনশ্বর প্রেমের একটি বিয়োগান্ত কাহিনী।

সিন্ধি ভাষার উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিকেরা হলেন আশানন্দ মামতোরা (জন্ম ১৯০৩), গোবিন্দ মালহী (জন্ম ১৯২১), সুঁদরী উত্তম চন্দ্রানী (জন্ম ১৯২৪), কলা প্রকাশ (জন্ম ১৯৩৪), পপতি হীরা নন্দানী (জন্ম ১৯২৪), মোহন কল্পনা (জন্ম ১৯৩০), লাল পুষ্প (জন্ম ১৯৩৫) প্রমুখ। আশানন্দ মামতোরা সিন্ধি ভাষায় মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সূচনা করেন। তাঁর একটি সুপরিচিত উপন্যাস হল 'সাহির' (কবি)। গোবিন্দ মালহীর উপন্যাসের সংখ্যা বারো এবং একাধিক গল্প সংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছে। প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখায় মার্কসবাদ এবং সুফিবাদের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। উত্তম চন্দ্রানী বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীতে সর্বহারা মানুষের লড়াইয়ের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নারী কথাসাহিত্যিকের লেখার মধ্যে পণপ্রথাসহ নানা সামাজিক সমস্যা ধরা পড়েছে। পপতি হীরা নন্দানীর লেখায় পারিবারিক ও সামাজিক নানা সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ চোখে পড়ে। মোহন কল্পনার লেখায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে। 'উহা সাম' (ঐ সন্ধ্যা) গল্প-সংকলনের জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

ভারতীয় কথাসাহিত্যের এটি একটি রূপরেখা। নতুন নতুন গল্প-উপন্যাস প্রতি বছরেই প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্যের গতিপথও পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে পরিচিত হতে আমাদের পাঠ-তালিকায় নিজের ভাষার কথাসাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য ভাষার গল্প-উপন্যাস পড়াও জরুরি।

১৩.২ অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক ও কোন্‌টি ভুল নির্ধারণ করুন।

(ক) ডোগরি ভাষাটি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রচলিত।

(খ) দামোদর মৌজো কাশ্মীরি ভাষার একজন লেখক?

(গ) 'মালপল্লী' কোঙ্কানি ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

(ঘ) আধুনিক মণিপুরী কথাসাহিত্যের সূত্রপাত কমল সিংহের হাতে।

(চ) রাজস্থানি কথাসাহিত্যের দু জন প্রধান কথাকার হলেন মুরলীধর ব্যাস ও অন্নারাম।

(ছ) যাদবেন্দ্র শর্মা 'চন্দ্র' আঞ্চলিক জীবনকে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন।

(জ) 'শিবরাজ বিজয়' উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র ছত্রপতি শিবাজী।

(ঝ) 'অবিনাশী' উপন্যাসের লেখক বিশ্বনারায়ণ শাস্ত্রী।

(ঞ) উত্তম চন্দ্রানীর লেখায় সর্বহারা মানুষের জীবন ফুটে উঠেছে।

২। ৫০টি শব্দে উত্তর দিন।

(ক) সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান কয়েকজন ঔপন্যাসিক।

(খ) সিন্ধি সাহিত্যে মহিলা ঔপন্যাসিক।

৩। ১৫০টি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

(ক) তেলুগু কথাসাহিত্য।

১৩.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। মডার্ন ইন্ডিয়ান লিটরেচর (খণ্ড ১ ও ২), সাহিত্য অকাদেমি।

২। সাহিত্য অকাদেমি অ্যাওয়ার্ডস (১৯৫৫-৭৮), সাহিত্য অকাদেমি।

পর্যায় - 2

আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্য : উপন্যাস

একক ১ □ মইলা আঁচল : ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'

গঠন

১.১ লেখক পরিচিতি
১.২ কাহিনির উপজীব্য
১.২.১ 'ময়লা আঁচল' হু উপন্যাসের রাজনৈতিক সামাজিক প্রেক্ষিত
১.২.২ উত্তর-বিহারের গ্রামীণ জীবনের মহাকাব্য
১.৩ 'ময়লা আঁচল' - গঠন-আঙ্গিক
১.৪ উপন্যাসের ভাষা
১.৫ প্রশান্ত ও কমলা
১.৬ অন্য কয়েকটি চরিত্র হু কালিচরণ - বাওনদাস - বালদেব
১.৬.১ কালিচরণ
১.৬.২ বাওনদাস
১.৬.৩ বালদেব ও লছমি
১.৭ অনুশীলনী
১.৭.১ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী
১.৭.২ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী
১.৭.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১.১ লেখক পরিচিতি

ফণীশ্বরনাথ 'রেণু' (১৯২১-১৯) জন্মেছিলেন বিহারের পূর্ণিয়াতে। তাঁর শৈশব, বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে ঐ জেলার মধ্যেই। নেপাল এবং বাংলার সীমান্তবর্তী ঐ অঞ্চলটি বড় হয়ে ওঠার সঙ্গেসঙ্গেই রাজনীতি এবং সাহিত্যচর্চা— দুয়েতেই সমানভাবে দীক্ষিত হন তিনি। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলে পরবর্তী সময়ে বামপন্থী আন্দোলনের শরিক হন। নেপালের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। একাধিকবার পুলিশি পীড়নের শিকারও হন 'রেণু' তাঁর এই সব রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য। জয়প্রকাশ নারায়ণের অনুগামীরূপে, ১৯৭৫ সালে ভারতবর্ষে জরুরি অবস্থা জারি হলে তিনি আবার রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কারারুদ্ধ হন। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণেই তিনি ভারত সরকারের প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

'রেণু'-র গল্প-উপন্যাসের বৃহদংশই জুড়ে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের ভারতীয় (বিশেষত, উত্তর বিহারের) গ্রামীণ জীবন। তাঁর প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শও বহু ক্ষেত্রেই সৃষ্টির অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। প্রখ্যাত হিন্দি কবি সুমিত্রানন্দন পন্থের 'ভারতমাতা গ্রামবাসিনী' কবিতার দুটি পংক্তির ("খেতোঁ মে পৈলা হৈ শ্যামল।/ধূল ভরা মৈলা সা আঁচল") অংশবিশেষকে অবলম্বন করে এই বইয়ের নামকরণ হয়েছে 'ময়লা আঁচল'।

১.২ কাহিনির উপজীব্য

দু-খণ্ডে বিস্তৃত এই বিশাল উপন্যাসের মধ্যে অজস্র চরিত্র এবং অসংখ্য ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে, যাদের প্রত্যেকটিই যে পরস্পরের সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে বাঁধা, এমন নয়। কাহিনি-বিন্যাসের অনিবার্য প্রয়োজনেই তারা এসেছে, সেকথাও বলা যাবে না। কিন্তু সবটুকু পড়ার পরে একটা সামগ্রিক আবেদন যে গড়ে ওঠে পাঠকের মনে, তাও অস্বীকার করা যাবে না কখনওই।

আগস্ট আন্দোলনের কিছু পর থেকে স্বাধীনতার প্রাথমিক কাল পর্যন্ত এই উপন্যাসের সময়-পরিসীমা। উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মেরীগঞ্জ নামে একটি গ্রামের মানুষদের জীবনের সুখদুঃখ, ওঠাপড়া, ভাঙাগড়া নিয়ে এই বইয়ের ঘটনাক্রম এগিয়ে চলেছে। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, জাতপাঁতের ভেদাভেদ একদিকে, অন্যদিকে মানুষে-মানুষে প্রীতি, ভালবাসা, সহমর্মিতা—এইসব কিছু নিয়েই মেরীগঞ্জের জীবন। আগস্ট আন্দোলনের পরবর্তীকালের ঘটনা বলে রাজনীতি-চেতনারও কিছু-কিছু প্রতিভাস এই গ্রামের কারুর-কারুর মধ্যে দেখা যায়। কংগ্রেসের অনুরাগী বালদেও, একনিষ্ঠ আদর্শবাদী কংগ্রেসি বামনাকৃতি বাওনদাস, সোস্যালিস্ট পার্টির স্বেচ্ছাসেবক কালিচরণ এবং সরকারের একাংশের চোখে কম্যুনিস্ট বলে গণ্য প্রশান্ত ডাক্তার—এরা সকলে নানা মাত্রায় রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে প্রয়াসী হয় নিজের-নিজের ভাবনা-অনুযায়ী।

মূল কাহিনির সূত্রপাত মেরীগঞ্জ গ্রামে সরকারি ম্যালেরিয়া নিবারণকেন্দ্রের পত্তনি নিয়ে। প্রশান্ত ব্যানার্জি নামে এক তরুণ ডাক্তার আসে সেখানে ভার নিয়ে। প্রশান্তর জন্মপরিচয় অজ্ঞাত;পালিকা 'মায়ের' পদবীই সে ব্যবহার করে। পাটনা মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র। মেরীগঞ্জে কাজ করতে আসে সে বহু-প্রলোভনের হাতছানি এড়িয়ে, সম্পূর্ণই মানবসেবার আবেগ নিয়ে-ম্যালেরিয়া রোগের কীভাবে নির্মূলন ঘটানো যায় দেশ থেকে, সেই গবেষণার তাগিদে।

গ্রামে এসে তাকে চিকিৎসা করতে হয় সব ধরনের রোগীরই। ঐ এলাকার তহশীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদের একমাত্র কন্যা কমলাও তার চিকিৎসায় থাকে—বরং, বলা ভাল—থাকতে ভালবাসে। একটু হিস্টোরিয়ার প্রবণতাসম্পন্ন এই তরুণী মেয়েটি প্রশান্তর প্রেমে পড়ে অচিরেই, এবং চিকিৎসার স্বার্থে সেটাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে, প্রশান্তও ধীরে ধীরে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তহশীলদার পরিবারও এই ব্যাপারটা পরোক্ষে প্রশ্রয়ই দিয়ে যেতে বাধ্য হয় নিরুপায়ভাবে।

গ্রামের একটি আশ্রমের প্রধান বৃদ্ধ মোহন্ত, রামদাস, মোহন্তর 'সেবাদাসী' তথা মঠের 'কোঠারিন' মধ্যযৌবনা লছমী আর তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কংগ্রেসকর্মী বালদেবকে নিয়ে আর একটি সমান্তরাল কাহিনি গড়ে উঠেছে উপন্যাসে। মোহন্ত সাহেবের মৃত্যুর পরে মঠ এবং কোঠারিন—দুইয়ের ওপরই ভোগদখলের স্বত্ব কায়েম করতে গিয়ে কালিচরণ নামে এক সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মীদের নেতৃত্বে গ্রামবাসীদের হাতে নাজেহাল হয়ে পালায় স্থানীয় আচার্যগুরু, লরসিংদাস

এবং উগ্রস্বভাব জনৈক নাগা সন্ন্যাসী। রামদাস সর্বসম্মতিতে মঠের প্রধান হয়। কিন্তু রামদাস এবং মঠ—উভয়কেই ছেড়ে লছমী আলাদা হয়ে গিয়ে বালদেবের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করে কিছুকাল পরে। সেন্টারের কর্মী মঙ্গলাদেবী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে কালিচরণই তাকে সেবাশুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলে। ধীরে ধীরে তাদের দুজনের মধ্যেও একটা সুন্দর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দ্বিগুণ উৎসাহে কালিচরণ 'পার্টির কাজ' করতে লেগে যায়।

কমলা এবং প্রশান্তর ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে। ওদিকে প্রশান্তর ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর-সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে—দেশের প্রবীণ চিকিৎসকরা তাঁর কাজের মূল্যায়ন করেন প্রশংসার সঙ্গে। আবার মেরীগঞ্জের আশপাশের সাঁওতালরা ধানচাষের জমির অধিকার দাবী করলে প্রবল সংঘর্ষ বাধে ; নতুন তহশীলদার হরগৌরী সিং নিহত হয়। সাঁওতাল এবং জমির মালিক—দুপক্ষেরই বেশ কিছু হতাহত হয়। শুরু হয় বড় মাপের ফৌজদারি মামলাও। ডাক্তারের সঙ্গে কমলা আরও নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়—যার ফলশ্রুতিতে সন্তান-সম্ভাবিতা হয়ে পড়ে সে। যদিও ব্যাপারটা অনেকদিন পর্যন্ত সবারই অগোচর থাকে।

এর মধ্যেই ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট এসে পড়ে: দেশ স্বাধীন হয়। সেই উন্মাদনার ঢেউ পৌঁছয় মেরীগঞ্জেও। অন্যপক্ষে টাকার জোরে তহশীলদারের পক্ষ মামলায় জেতে—সাঁওতালদের সকলেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

জেলার জনৈক কংগ্রেসি কর্তার হঠাৎ মনে হয় প্রশান্ত ডাক্তার মানুষটা আসলে কম্যুনিস্ট পার্টির লোক, তার পূর্ব-পরিচয় ঠিক জানা যায় না—অতএব সে সন্দেহভাজন। পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা তাদের প্রগাঢ় অজ্ঞানতার বশে এতদিনের 'দেবতা' প্রশান্ত ডাক্তারকে রাতারাতিই 'শয়তানের অনুচর' ভাবতে লাগল অতঃপর। কমলার মা-বাবাও এই পরিস্থিতিতে তার ওপর বিরূপ হয়ে ওঠেন স্বাভাবিকভাবেই।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ঘোরপ্যাঁচ না-বুঝে কালিচরণ একটা ডাকাতির মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নিজের বুদ্ধির দোষে। গ্রেপ্তার হয়—আবার জেল থেকে পালায়ও একদিন। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক চলিত্তর সিং-এর নামেও একটা হুলিয়ানামা বেরোয় সরকারের পক্ষ থেকে। পুলিশ চতুর্দিকে চিরুনিতল্লাশি চালায় দুজনের সন্ধানে। স্বয়ং এস. পি. সাহেব এসে হাজির হন মেরীগঞ্জে। আর ঠিক তখনই রেডিওতে ঘোষিত হয় মহাত্মা গান্ধীর হত্যার সংবাদ। সমস্ত দেশের সঙ্গে মেরীগঞ্জও শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়।

এরপরে ঘটনাগুলি ধীরে-ধীরে একটা সামগ্রিক-পরিণতির দিকে এগোতে থাকে। কমলার কোলে একটি ছেলে আসে। গাঁয়ের ' গেজেট'-স্বরূপ 'বেতার' সুমরিত দাস 'বিস্‌নাথ' তহশীলদারের নির্বন্ধে ডাক্তারের সঙ্গে কমলার কাশীর পণ্ডিতদের বিধান-অনুযায়ী 'গন্ধর্ব বিবাহের' কাহিনি সর্বত্র বলতে থাকে। কোনো অভিযোগই না টেঁকায় প্রশান্ত সসম্মানে মুক্তি পেয়ে গ্রামে ফিরে আসে—কমলাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করে সর্বসমক্ষে। বাওনদাস 'সাচ্চা কংরেসি' থেকে সদ্য কাংরেসি-হওয়া চোরাইচালানদারদের হাতে নিহত হয়। বালদেও এবং লছমি 'গ্রহস্তি' করতে থাকে। প্রশান্তর সহপাঠিনী বন্ধু মমতা এসে কমলা এবং শিশুকে দেখভাল করে সস্নেহে। ছেলের নাম হয় নীলোৎপল। নাতি হবার আনন্দে বিশ্বনাথ রায়তদের সবাইকে পাঁচ বিঘে করে জমি ফিরিয়ে দেন। স্ত্রী পুত্র এবং ভৃত্য প্যারুকে নিয়ে প্রশান্ত পাটনায় ফেরার উদ্‌যোগ করে।

দেশের মাটি ও মানুষকে নিয়ে তার গবেষণা এখনও অবশ্য শেষ হয়নি।

১.২.১ 'ময়লা আঁচল' হু উপন্যাসের রাজনৈতিক, সামাজিক ও গ্রামীণ প্রেক্ষিত

আরভিং হো তাঁর বিখ্যাত 'Politics and the Novel' গ্রন্থে বলেছেন : 'একটি রাজনৈতিক উপন্যাস বলতে আমি এমন এক ধরনের উপন্যাস বুঝি যাতে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ-সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে অথবা যাতে রাজনৈতিক ঘটনাবলীই প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে,' কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঘটনার প্রাধান্যই নয় রাজনীতি কীভাবে তার চারপাশের মানুষের জীবনকে আলোড়িত করে, প্রভাবিত করে তাকে স্পষ্ট করে তোলাই রাজনৈতিক উপন্যাসের লক্ষ্য, অর্থাৎ শুধু ঘটনা নয় মানব জীবন সত্যকে উদ্‌ঘাটনই এজাতীয় উপন্যাসের মূল লক্ষ্য, গোপাল হালদার রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপন করতে গিয়ে বলেছেন—"...রাজনীতি এক বৃহৎ সত্যের অংগীকার রূপে কেমন করে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে, জীবনকে তীব্র, চূর্ণ বা পূর্ণ করে তোলে, কেমন করে তা মানুষে মানুষে সম্পর্ককে বিচিত্রতর করে তোলে—এক কথায় কেমন করে তা চরিত্রকে করে বিকশিত।" ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসটিতেও রাজনৈতিক ঘটনা, ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা রয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখ্য হয়ে উঠেছে মানুষ। রাজনৈতিক ঘটনার ঢক্কানিনাদ এ উপন্যাসে স্তিমিত বরং প্রাঞ্জল হয়ে আছে কীভাবে পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির চাপে পাল্টে যাচ্ছে মানুষ। সতীনাথ ভাদুড়ি 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ দেখিয়েছেন—পরিবেশ বদলে দিচ্ছে মানুষকে, মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশ। এই উপন্যাসে এই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

রেণুর 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসে একদিকে রয়েছে বিদেশি বণিক ইংরেজ শোষিত ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে গান্ধীজী-কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সোসালিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, কীভাবে বিহারের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজীবনে পরিবর্তন ঘটিয়েছে—অন্যদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে রাজনৈতিক দলগুলির কার্যপদ্ধতি কীভাবে মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতা যে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন পূরণের উপায় হয়ে ওঠেনি তা দ্ব্যর্থহীন ভাবে জানিয়েছেন লেখক। আসলে ব্যক্তিগত জীবনে রেণু সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে ছিলেন। এই উপন্যাসের পটভূমি যে-'ভারতছাড় আন্দোলন' এবং 'স্বাধীনতা সংগ্রাম', তার সংগে প্রত্যক্ষত যুক্ত থাকায় তৎকালীন রাজনীতির আদর্শ এবং আদর্শভ্রষ্টতা-এই দুটি দিকই তিনি উপলব্ধি করেছেন মনে প্রাণে। স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে রাজনীতির বিকৃতরূপ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্বার্থপর, সুযোগসন্ধানী চরিত্র তাঁকে ব্যথিত করেছে, তবু তাকে তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন। কোথাও কোথাও তাঁকে প্রচারধর্মী মনে হয় যখন স্বাধীনতার উৎসবে 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়'-এর মতো স্লোগান শোনা যায়। কিন্তু একথা সত্যিই যে সোসালিস্ট পার্টির কর্মী হয়েও তিনি পার্টির নেতাদের নীতিহীনতা ও কাপুরুষতাকে ব্যঙ্গ করেছেন, সমালোচনায় তীব্র হয়েছেন,—কালিচরণের মতো সৎ, নির্লোভ, নির্ভীক এক গ্রাম্য যুবকের পরিণতির ভয়াবহতাকে তিনি ক্ষমার চোখে দেখেননি।

রেণু নিজে ছিলেন বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা। এখানকার অসহায়, নির্যাতিত, শোষিত মানুষের যন্ত্রনাকে তিনি অনেকদিন প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অঞ্চলের ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-যাদব-ভূমিহার-অন্ত্যজ শ্রেণী এবং আদিবাসি সাঁওতালদের জীবনচর্যার সংগে, তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পরেও এই জমিদার-মহাজনদের দোর্দন্ডপ্রতাপ বিন্দুমাত্র কমেনি, এই বঞ্চিত শোষিত মানুষগুলির জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি। এই নির্মম সত্যকে তিনি নির্মোহে প্রকাশ করেছেন, আসলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল 'ময়লা আঁচল',—তাই এখানে শোষক-শোষিতের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা রাজনীতির পোশাকপরা পুতুল নয়—রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ।

'ময়লা আঁচল' বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলের মেরীগঞ্জ গ্রামের সার্থক জীবনচিত্র। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী আন্দোলন এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাজনীতির বিকৃতরূপ, সুবিধেবাদী স্বার্থকেন্দ্রিকতা, শ্রেণীবৈষম্য, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, রাজনীতির নামে শোষণ ভণ্ডামির কলঙ্কময় চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে উপন্যাসে। গ্রামজীবনের হৃদয়পুরের বাস্তবিক স্পন্দন তিনি অনুভব করেছিলেন বলেই উপন্যাসের সূচনাতেই তিনি বলেছেন—"ইস্ মে ফুল ভি হ্যায়, শূল ভি হ্যায়, ধূল ভি হ্যায় গুলাল ভি, কীচড় ভি হ্যায় চন্দন ভি.....ম্যায় কিসীসে দামন বঁচাকর নিকল নহী পায়া।"

রেণুর জীবনের রাজনীতি সম্পৃক্ত হয়ে আছে এই ধূলভরা 'ময়লা সা আঁচল'-এর সঙ্গে। তিনি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল বা কোন বিশেষ সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে নয়, সৎ প্রচেষ্টায় তৎকালীন রাজনীতির মুখোশ খুলে সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন।

উপন্যাসের সূচনাতেই ম্যালেরিয়া সেন্টার খোলার উদ্যোগ পর্বে 'কালাচেথবু'কে মিলিটারিতে গ্রেফতার করেছে বলে যে ভয়ের রেশ গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে তাতেই ধরা পড়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ গ্রাম্য মানুষের অসহায়তা। সরকারি আমলা তাদের কাছে অতি বিষম বস্তু। গ্রামের মাতব্বর থেকে হতদরিদ্র মানুষ সকলেই সচকিত ও ভীত। তারা রাজদরবারে নজরানা নিয়ে যাওয়ার মত ভেট নিয়ে দেখা করতে গেছে। এই ঘটনারই অন্যদিকে বালদেবের মত সাধারণ পার্টি ভলান্টিয়র নিজের মহিমা প্রকাশে সক্ষম হয়েছে। গ্রামের এতদিনের অবহেলার পাত্র তার রাজনৈতিক পরিচয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সুযোগে সে বেশ কিছু পার্টি সদস্য ও বানিয়ে ফেলেছে এবং 'গান্হী মহাত্মা'র অনুকরণে যখন তখন অনশনের ভয় দেখিয়ে গ্রামের মানুষদের কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছে। এই বালদেবের প্রভাবেই কালিচরণের মত সৎ গ্রাম্য যুবক রাজনীতির সংস্পর্শে এসেছে এবং ক্রমে ক্রমে কংগ্রেস থেকে সোসালিস্ট পার্টির মেম্বার হয়ে গ্রামে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই উপন্যাসে বেশ কয়েকটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সমকালের রাজনীতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বালদেব যেমন সক্রিয় কর্মী থেকে ক্ষমতালোভী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে—প্রথমখণ্ডের বালদেব, গ্রামের মানুষের শ্রদ্ধা আদায়ের জন্য মরীয়া, কাপড়-কেরোসিনের কন্ট্রোল পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। মঠের কোঠারিন লছমী বালদেবের চোখে ভারতমাতার মূর্ত প্রতীক। এই লছমীকে আশ্রয় করেই দ্বিতীয় খণ্ডে দেখা যায় বালদেব নিরাপদ গৃহী জীবনের স্বাচ্ছন্দ খুঁজেছে। 'ব্রহ্মচারী ব্রতধারী' বালদেব নারীর মোহে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। এই মোহ তার স্খলনের পথ প্রস্তুত করেছে। বাওনদাসকে লেখা গান্ধীজীর চিঠিগুলো সে শপথ ভঙ্গ করে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে ভবিষ্যতে মন্ত্রীত্বের দাবির হাতিয়ার রূপে। স্বাধীনতার সমকালে কংগ্রেস রাজনীতির বিকৃত ও বীভৎস রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি এই উপন্যাসে। দেশদ্রোহী সাগরমল স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসের জেলা সভাপতি, দুলারচন্দের মত চোরাকারবারি কংগ্রেস মেম্বার, বিশ্বনাথ প্রসাদের মত প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী কংগ্রেসে ক্ষমতাবান। গাঙ্গুলিজী, বাওনদাসের মত সৎ-মানুষের মূল্য নেই এই রাজনীতিতে ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ এবং নিয়তি স্পষ্ট হয়ে উঠেচে এই বর্ণময় বর্ণনায়।

লেখক স্বয়ং সোস্যালিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কিন্তু উপন্যাসের কোথাও উগ্র আদর্শবাদের ছায়াপাত ঘটেনি। বরং সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয়দের প্রতি নিক্ষিপ্ত চরম ব্যঙ্গ ও তাদের সুবিধেবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা যায় কালিচরণের পরিণতিকে কেন্দ্র করে। কালিচরণ ও তার সঙ্গীরা পার্টি ফান্ডের টাকা জোগাড় করতে ডাকাতি পর্যন্ত করেছে, তাদের এই দুষ্কর্মের উৎসাহদাতা নেতারা তখন বিগলিত চিত্তে এই কাজকে সমর্থন করেছে। কিন্তু যখন কালিচরণকে ডাকাতির অপরাধে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তখন এই নেতারাই তাকে চিনতে অস্বীকার করেছে। এমন

কি, সে-যে পার্টি কর্মী একথাই তারা ভুলে যেতে চেয়েছে। কালিচরণের মৃত্যুর ট্র্যাজেডি ও হাহাকার পাঠককে স্তম্ভিত করে। স্বাধীনতার অচির-পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যে কালিমালিপ্ত মলিন বর্ণ ধারণ করেছিল কালিচরণের মৃত্যু তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। গান্ধীজীর সমকালীন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী বাওনদাসের পরিণতিও আমাদের সজাগ করে তোলে পরবর্তী রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে। বাওনদাস স্বাধীনভারতে নিহত হয়েছে পাকিস্তান-হিন্দুস্তান সীমান্ত অঞ্চলে কংগ্রেসেরই দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীদের হাতে। বাওনদাসের মৃত্যু নিঃসন্দেহে প্রতীকী—বাওনদাসের মৃতদেহের সংগেই লুপ্ত হয়ে গেল সততা-একনিষ্ঠতা এবং আদর্শ ও শুভ বোধ।

উপন্যাসে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের প্রসংগ থাকলেও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসের তা প্রত্যক্ষত অনুভূত হয় না। দেশভাগ বা দাংগা ও মেরীগঞ্জকে তেমনভাবে আলোড়িত করেনি। গ্রাম্য মানুষগুলোর অজ্ঞানতার প্রতি লেখকের সরস কটাক্ষ: মেরীগঞ্জের বাসিন্দারা এই ভেবে স্বস্তি পেয়েছে যে গ্রামে একঘর ও মুসলমান নেই, তা না হলে পাকিস্তান নির্ঘাত মেরীগঞ্জকে কবজা করত, দাংগা বা দেশভাগ সম্পর্কে তাদের ভাবনা এখানেই সীমায়িত। উপন্যাসের প্রথমখণ্ডে সোসালিস্ট পার্টি দ্বারা উদ্বুদ্ধ খেটে-খাওয়া সাঁওতালদের জমির দখল সংক্রান্ত বিদ্রোহের বর্ণনা রয়েছে। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং সেই ঘটনাকে ঘিরে অশিক্ষিত অজ্ঞান দরিদ্র মানুষদের আবেগ ও উচ্ছ্বাস, গ্রামে শোভাযাত্রার বর্ণনা রয়েছে। এই স্বাধীনতা তাদের জীবনে কোন পরিবর্তনই আনেনি, তাদের জীবনচর্চায় কোন নতুন সুর ধ্বনিত হয়নি, তবুও তারা আবেগে আপ্লুত।

'ময়লা আঁচল' পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক উপন্যাস নয় ঠিকই, তবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই তার প্রাণবায়ু সিঞ্চিত হয়েছে। সতীনাথের উপন্যাসে যেমন রাজনৈতিক তিক্ততা রয়েছে, রেণুর উপন্যাসে সেই তিক্ততা অনুপস্থিত। রেণুর উপন্যাসটি মূলত মেরীগঞ্জের গ্রামীণ সমস্যার মহাসমুদ্র। সেই সমুদ্রে ডুব দিয়ে তিনি মুক্তো সংগ্রহ করেছেন। সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ছদ্ম রূপের মুখোশ খুলে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার যথার্থ রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। স্বাধীন ভারতের শোষিত, নিপীড়িত নির্যাতিত জনগণকে শোষণের কালচক্র থেকে বের করে শোষণবিহীন সমাজ স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছে। তার স্বপ্নপ্রতীক হয়ে উঠেছে কমলার সন্তান ষষ্ঠীপূজার দিন গ্রামের সকলকে বিশ্বনাথ চৌধুরী পাঁচ বিঘে করে জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন। উপন্যাস শেষ হয়েছে এক নিবিড় আশ্বাসবাণীর হীরকদ্যুতিতে...."মরা মুখে হাসি ফুটেছে...একশো জোড়া চোখে খুশির চমক... যেন হাজার খানেক বাতি জ্বলে উঠেছে।"[১]

১.২.২ উত্তর-বিহারের গ্রামীণ জীবনের মহাকাব্য

'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে লেখক স্বয়ং বলেছেন—"ময়লা আঁচল আঞ্চলিক উপন্যাস, পূর্ণিয়া অঞ্চলের উপাখ্যান।" লেখকের এই মন্তব্যের আলোকে আমরা 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসটির শ্রেণী বৈশিষ্ট্য বিচারে প্রবৃত্ত হতে পারি। আঞ্চলিক উপন্যাস রূপে আমরা সেইসব উপন্যাসকেই চিহ্নিত করতে পারি, যেসব উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রগুলি একটি বিশেষ পরিবেশের অন্তর্লীন সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে। মানুষের বিচিত্রতর সমস্যা, জীবনের বহু জটিলতা, মানব মনের অপার রহস্য, নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, সংঘাত, সামাজিক নানা জটিলতার আবর্তে অংকুরিত মানবজীবন, ব্যক্তিত্বের সংঘাত, সমাজধর্ম, প্রকৃতির বিচিত্রলীলা বন্যা-প্রলয়-খরা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু গড়ে ওঠে। বিচিত্র পরিবেশে মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন পরিচয় প্রদানই ঔপন্যাসিকের স্বভাবধর্ম।

অনেক ক্ষেত্রেই তাই শিল্পী তাঁর পারিপার্শ্বিককে অস্বীকার করতে পারেন না। তাই মানুষের পরিচয় বিশ্বজনীন হলেও আঞ্চলিক সত্তা তার জীবনের অঙ্গ হয়ে যায়। রেণুর উপন্যাস তাই আঞ্চলিক হলেও সামগ্রিক অর্থে নয়, কারণ তিনি নিজেই বলেছেন মিথিলার এই ক্ষুদ্র পল্লীখানি তাঁর কাছে সমগ্র ভারতের অনগ্রসর গ্রামজীবনের প্রতীক। 'ময়লা আঁচল'-এর মূল বর্ণনীয় বিষয়—'সর্বভারতীয় জীবন'—এক বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে।

হিন্দি সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'ময়লা আঁচল' সর্বাধিক আঞ্চলিক লক্ষণাকান্ত উপন্যাস। মানুষ ও প্রকৃতির সুগভীর একান্ততা এবং বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞাত জনজীবনের নিবিড় অন্তরঙ্গ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলন গৌণ না হলেও, গ্রাম্য মানুষের অনাবিল সহজসরল জীবনকথাই এখানে মুখ্য। স্বয়ং লেখকের স্বীকারোক্তি—'ইস্ মে ফুল ভী হ্যায়, শূল ভী হ্যায়;ধূল ভী হ্যায়; গুলাল ভী হ্যায়.....ম্যায় কিসী সে ভী দামন বচাকর নিকল নেহী পায়া।" এই উপন্যাসে লেখক কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনকে প্রাধান্য না দিয়ে এক বিশিষ্ট সমাজজীবনকেই তুলে ধরেছেন। পূর্ণিয়া অঞ্চলের কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ আটগৌরে জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সংস্কার-বিশ্বাস যেমন উদ্ভাসিত হয়েছে তেমনি সংসার-বন্ধনহীন সংস্কারমুক্ত জীবনচিত্রও অপ্রতুল নয়। মানুষের জীবনচর্যায় প্রকৃতিও সঙ্গী হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের পটভূমি সংকীর্ণ হলেও তার জীবনবৈচিত্র্যের ব্যাপ্তি সুবিশাল।

বস্তুতপক্ষে 'ময়লা আঁচল' এক সম্পূর্ণ যুগ এবং সম্পূর্ণ অঞ্চলের মহাকাব্য, মেরীগঞ্জের পথ-প্রান্তর, মাঠ-ঘাট, জল-জঙ্গল, কোশী-কমলা, মালিক টৌলী থেকে দোসাদ্ টৌলী—সবই একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে। উপন্যাসের সূচনাতেই তাই মেরীগঞ্জের প্রারম্ভিক পরিচয় দান অতি মনোরম—নীলকর সাহেব মার্টিন এবং তার স্ত্রী মেরীর প্রসঙ্গ রূপকথাকল্প রোমান্টিকতায় বর্ণিত হয়েছে। 'কাঁপুনি' জ্বরে মেরীর মৃত্যু এবং তারই নামানুসারে গ্রামের নামকরণ। গ্রামের সঞ্জীবনী ধারা কমলা নদী প্রসঙ্গে প্রাচীন লোককথাকেই আশ্রয় করেছেন লেখক। এই 'কমলা মাইয়া'র মাহাত্ম্য-গান গ্রামে বহুল-চর্চিত। একদা গ্রামের কোন শুভ অনুষ্ঠানের খাওয়ানো-দাওয়ানোর সময় এই দেবী প্রসাদেই নাকি রূপোর বাসন-পত্র আগাম পেত গৃহস্বামী। পরে আবার দেবীকে তা ফেরৎও দিতে হতো। কোনো এক অসৎ গ্রামবাসী ঐ বাসনপত্র থেকে একটি বাটি সরিয়ে রেখেছিল বলে শোনা যায়। হীন কাজেই এই অলৌকিক ব্যবস্থাটি বন্ধ হয়ে গেছে। এই লোকগাথাকে অবলম্বন করে গ্রামীণ সমাজের জাতপাতের রেষারেষির ভঙ্গিটিও অপূর্ব সরসতায় বর্ণনা করেছেন লেখক—"তা সেই হীন চরিত্র গৃহস্বামী সম্পর্কে গ্রামে দুরকমের মত আছে। রাজপুতটৌলীর লোকে বলে লোকটা কায়স্থ ছিল। আর কায়স্থটৌলীর ওদের মতে, লোকটা রাজপুত।"

এই উপন্যাসের জীবন অধ্যয়ন ত্রিরৈখিক—উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং অশিক্ষিত অসহায় অতিদরিদ্র শোষিত মানুষ। গ্রামে প্রধান তিনটি ভাগ—রাজপুত, কায়স্থ এবং যাদব। সমগ্র ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি যে শ্রেণী বিভাজনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার সুষ্ঠু ও বাস্তব চিত্রায়ণ ঘটেছে এই উপন্যাসে। "মেরীগঞ্জ বড়ো গ্রাম। বারো বর্ণের লোকের বাস।" জাত পাতের ভিতর চিড় খাওয়া সম্পর্ক এখানে স্পষ্ট রূপে অঙ্কিত। রাজপুত ও কায়স্থদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই তীব্র। রাজপুত অর্থবলে এবং কায়স্থ বুদ্ধিবলে আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী। রাজপুত টৌলীর প্রধান রাজকিরপাল সিং, এবং কায়স্থ টৌলীর প্রধান বিশ্বনাথ প্রসাদ। এমন গ্রামে তৃতীয় শক্তি রূপে যাদবরাও মাথা চাড়া দিচ্ছে, তারাও ক্ষমতার লড়াই এ অংশ নিতে আগ্রহী। যদিও রাজপুত ও কায়স্থদের কাছে যাদবরা জাতিধর্মে অবজ্ঞার পাত্র এবং আভিজাত্যহীন। এছাড়া গ্রামে গ্রহাধিপতির মত বিরাজমান ব্রাহ্মণটৌলী। কায়েতটৌলীই মালিক টৌলী রূপে খ্যাত। কারণ গ্রামের তহশীলদার জমিদার বিশ্বনাথ প্রসাদ কায়েত। এছাড়াও আছে—তত্রিমা ছত্রী-টৌলী, ধনুকধারী ছত্রী-টৌলী,

কুশবাহা ছত্রীটোলী, পোলিয়া টোলী, বৈদাস টোলী ইত্যাদি নিম্নবর্ণীয় খেটে খাওয়া শোষিত মানুষ। যাদের কথা সমাজের উচ্চবিত্তেরা ভাবে না, যাদের জন্য "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।" আর রয়েছে গ্রামের বাইরে সাঁওতালটোলী, যাদের কালো শরীরের মেহনতে পাথুরে জঙ্গলে জমি হয়ে ওঠে শস্য-শ্যামলা, মুক্তোর দানার মত গমের শিস্ পূবালি হাওয়ায় দোল খায়। যারা জমিদারদের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেও মোহনবাঁশির মাতাল সুরে মেতে উঠতে পারে। যারা পরমানন্দে অন্যের জমিতে প্রাণান্তকর পরিশ্রমে ফসল ফলায়, সে ফসলে তাদের কোন অধিকারও থাকে না। গ্রামের অন্য খেটে-খাওয়া মানুষেরা এদের সঙ্গে প্রাণের টান অনুভব করে না। এই সাঁওতালরাও নিজেদের প্রাত্যহিক-জীবন, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান-সংস্কারকে সম্বল করে সকলের চেয়ে দুরেই থাকে। এই সাঁওতালটোলীর ওপর জমিদারের কোন খাস দখল নেই।

গ্রামীন জীবনে সামাজিক শ্রেণী-শোষণের পাশাপাশি রয়েছে আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় শোষন। মঠের অধ্যক্ষ সেবাদাস যুবতী লছমিকে বিকৃত লালসায় ভোগ করেছে ধর্মের দোহাই দিয়ে তাকে 'কোঠারিন' নিযুক্ত করে। সেবাদাসের মৃত্যুর পর মঠ ও মঠের কোঠারিনকে দখলের কুৎসিত খেলায় মেতে উঠেছে রামদাস এবং বহিরাগত 'লরসিং দাস'। মঠের মোহান্তের 'তিলক' পাওনা রামদাসের, কিন্তু লছমিকে দেখে এবং মঠের "নশো বিঘে চাষিজমি, কলমি আমের বাগান, দশ বিঘে জুড়ে কেবল কলারই বাগান, তাতে হাজার হাজার ফলন্ত কলা। দুকুড়ি গাই গরু, একগন্ডা গুজরাতি মোষ।"—এই সম্পত্তির নেশা কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তিলকের দিন লছমির অনুরোধে কালিচরণের দল সেখানে উপস্থিত হয়ে সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু মোহান্ত রামদাসও পার্থিব আকাঙ্ক্ষার উর্দ্ধে উঠতে পারে নি। লছমিকে দখলের নেশায় সেও উন্মত্ত হয়ে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হয়ে তাতমাটোলীর রম্‌পিয়ারিকে মঠে এনে তুলেছে। মঠ হয়ে উঠেছে আস্তাকুঁড়—লছমি মঠ ছেড়ে বালদেবকে নিয়ে অন্যত্র বাসা বেঁধেছে। লছমির মোহমায়াতেই বালদেবের আদর্শ ও স্বপ্ন ধবস্ত হয়েছে, তার কাছে 'জয়হিন্দ্' এবং 'সাহেব বন্দেগী' একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে—এই পরিণাম যন্ত্রণার এবং স্বয়ং লেখক এই যন্ত্রণার জ্বালা অনুভব করেছেন। এছাড়া গ্রামে রয়েছেন জোত্‌খিজী—যিনি প্রাচীন পন্থী। ইংরেজী ওষুদ তাঁর কাছে গোরক্ত সমান। গ্রামে কলেরার উপদ্রব তাঁর মতে ইংরেজদেরই কারসাজি। তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ তাঁর মিথ্যা অহংকার। স্ত্রীকে তিনি ইংরেজী ডাক্তার ও চিকিৎসার আওতায় আসতে দেননি। এই নিষ্ঠুরতা লেখক নির্লিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ কৌতুকে বর্ণনা করেছেন।

পূর্ণিয়ার গ্রাম্য, সাধারণ মানুষেরাই এই উপন্যাসের মূল কুশীলব। তাদের জীবনচিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়ে উপন্যাসে। ভাষায়, ভাবে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে লৌকিক আচারে-সংস্কারে, পঞ্চায়েত জমায়েতে গ্রামীণ ভারতবর্ষ যেন মেরীগঞ্জের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য মানুষ গুলোর সরলতার এক কৌতুককর বর্ণনা উপন্যাসের সূচনাতেই পাওয়া যায়—'কালা চেথরুকে মিলিটারিতে গেরেপ্তার করেছে', গোরা সৈনিক গ্রামের মানুষ চোখে দেখেনি কিন্তু বিশ্বাস করেছে কারণ—"মুসহরুর শ্বশুরের ভাইপো ফারবিস সায়েবের খানসামা; সে মিছে কথা বলবে?" সামান্য ম্যালেরিয়া সেন্টার তৈরীর পর্যবেক্ষকদের অবলম্বনে এতবড় রটনা সত্যিই হয়ে ওঠে।

এই গ্রামেরই একদিকে মালিক টোলী অন্যদিকে শ্রমিক টোলী—একদিকে শাসক অন্যদিকে শোষিত। অর্থ ও ক্ষমতার জোরে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষগুলি তাদের জালে আবদ্ধ, অন্ত্যজ নারীর সম্ভ্রম-সম্মান বিকোয় কানাকড়ির দামে—"গরীব ভূমিহীনদের অবস্থাও খামারের ঐ বলদকুলের মতই। তাদের মুখেও জালের ফাঁস।" অক্লান্ত এবং কঠোর পরিশ্রমেও এদের দুবেলা পেট ভরে না—তাই মোহান্তের 'পুরী-জিলাবি'র ভান্ডারার সংবাদে তারা পুলকিত,

কারণ এই ভোজ তাদের স্বপ্নাতীত। ব্যভিচারী ধর্মভ্রষ্ট মোহান্তের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব নিমেষে উধাও হয়ে যায়। রামপিয়ারিকে সেবাদাসী নিযুক্ত করার প্রসঙ্গে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল ভোজের কথায় তা বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যায়।

অন্ত্যজ শ্রেণীর দারিদ্র্য ও অসহায়তার সুযোগ নেয় মালিক শ্রেণী। তাদের নারীরা তাদের ভোগ্যবস্তু—এটাই সামাজিক বিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এই যৌন নিপীড়ন চর্যাপদের কাল থেকে চলে আসছে। এখানে সহদেব মিশির ও ফুলিয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। ফুলিয়ার বাবা যেহেতু সহদেবের কাছে ঋণী তাই ফুলিয়া তার সম্পত্তি। এই নিয়ে পঞ্চায়েত বসেছে—এখানে পঞ্চায়েতের প্রসঙ্গে প্রেমচন্দের 'পঞ্চপরমেশ্বর' বা শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-উপন্যাস স্মরণে আসে। পঞ্চ-ঈশ্বরের প্রতিভূ—অলঙ্ঘনীয় সামাজিক সত্তা। কিন্তু লেখক দেখাতে চেয়েছেন এক নিঃশব্দ সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে, কালিচরণ পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধতা করেছে, জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। গ্রাম্য মানুষ এক নবচেতনার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে—একদিকে তারা রাজনৈতিক মিছিলে 'ইনকিলাস্... জিন্দাবাধ' বলছে অন্যদিকে কলেরার 'জক্‌শন্' নিতে ভয় পাচ্ছে। এই দ্বান্দ্বিকতা, জটিলতা সমকালীন যুগমানসেরই রূপায়ণস্বরূপ।

এত দুঃখ-কষ্ট, অনাচার-অবিচার, শোষণ-শাসনের মধ্যেও তাদের জীবনের আনন্দধারা স্তিমিত হয়ে যায়নি। আজ ও বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে গ্রামের সকলে 'সিরবা উৎসব' বা মাছমারা উৎসবে মত্ত হয়ে ওঠে। 'সতুয়ানি উৎসবে' চৈত্রসংক্রান্তি জমিদার-দোসাদ নির্বিশেষে কারো উনুন জ্বলে না। আকাল-মন্দাতেও দক্ষিণা বাতাসে তারা 'ফাগুয়া' গায়, হোলির রঙে রাঙিয়ে ওঠে মেরীগঞ্জ। বোশেখ-জষ্টি মাসের বিকেলে তাড়বান্নায় জীবনের পুরো আনন্দের দাম তিন আনা। বছর ভরের ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয়ে যায় এই বৈঠকে। ফসলের দিনে ইন্দ্রমহারাজকে তুষ্ট করতে পূর্ণিমাতে 'জট-জট্টিন' গানের আসর বসায় মালিক টোলী, শ্রমিক টোলীর মেয়েরা। 'বিদাপত নাচ'-এর মুগ্ধ দর্শক মালিক থেকে তন্ত্রিমা সকলেই। আসলে সুখে-দুঃখে ভরা লোকজীবন সম্পর্কে আমাদের মনের অবচেতনে লুকিয়ে রয়েছে এক সুপ্ত আবেগ। নাগরিক জীবনও তৃষিত হয়ে থাকে সেই অনাস্বাদিত জীবন আস্বাদনের জন্য, লেখকের লেখনি আমাদের সেই আবেগতন্ত্রীকে স্পর্শ করেছে, যার ফলে আমরা শিহরিত এবং রোমাঞ্চিত।

রেণুর মনোভাব বস্তুবাদী শিল্পীর। তিনি গ্রাম জীবনের যে সঙ্গীত বাজাতে চেয়েছেন—তাতে জীবনের বাস্তবতা, চরিত্রের প্রত্যক্ষ জীবন্ত রূপকে ফুটিয়ে তোলাই মূল আকর্ষণ। মনের অবচেতনের অলিতে গলিতে ভ্রমণের বাসনা যেমন তাঁর নেই, তেমনি কল্পনার আতিশয্যে সৌন্দর্যের ' সোনার হরিণ' রহস্য উদ্‌ঘটিনের কামনাও তাঁর নেই। তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতির এক স্পষ্ট ভূগোল ও ইতিহাস আছে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী প্রথার সঙ্গে নবোদ্ভুত যন্ত্র শক্তির সংঘাত চিত্র অস্পষ্ট ভাবে তাঁর উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে। পূর্ণিয়া অঞ্চলের মধুরতিক্ত জীবনচিত্র তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে, উচ্চনীচ নির্বিশেষে গোটা গ্রামসমাজই উপন্যাসের নায়কত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত আদর্শবাদ, রাজনীতি চর্চা আছে, তবে তা উচ্চগ্রাম নয়, একটি সমগ্র অঞ্চলের জীবনচরিত্র, তাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ঐতিহ্য-সংস্কার, ভৌগোলিক অবস্থান, কামনা-বাসনা এবং ভবিষ্যৎ, নিয়তি মহাকাব্যিক বিপুলতা, সমুন্নতি ও বিস্তার নিয়ে এই উপন্যাসে প্রকাশিত।

১.৩ 'ময়লা আঁচল' - গঠন-আঙ্গিক

শিল্পরূপ হিসেবে উপন্যাসের বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটল আধুনিক কালে। একদিকে ব্যক্তির আত্মসচেতনতার কারণে অন্যদিকে সমাজে প্রচলিত ভারসাম্য বিঘ্নিত হবার ফলে গল্প তার পুরোন সারল্য হারিয়ে ফেলে। এই জটিল পরিস্থিতির চাহিদাতেই উপন্যাসের জন্ম। তাই আধুনিক কালের সাহিত্যকর্মের প্রধান ও শক্তিশালী শাখারূপে উপন্যাসের বিকাশ। উপন্যাসের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ কষ্টসাধ্য। কারণ কোন বিশেষ মাপ কাঠিতে উপন্যাসের ব্যাখ্যা বা বিচার চলে না। মোপাসাঁর এক উপন্যাসকে আধুনিক সমালোচক মহৎ সৃষ্টি আখ্যা দিলেও সার্থক উপন্যাস আখ্যা দিতে চাননি। সার্থক উপন্যাস বলতে আমরা তাকেই বুঝি যা সর্বগ্রাহী ও সর্বত্রচারী—কাব্যরস, কাহিনিরস এবং নাট্যরসকে সমন্বিত করার যে প্রচণ্ড শক্তি উপন্যাসের অধিগত তার মূলে রয়েছে উপন্যাসের শিল্প মহিমার স্বাতন্ত্র্যবোধ। উপন্যাস জীবনসম্পৃক্ত। জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক বোধ সঞ্চারিত করতে না পারলে উপন্যাস ব্যর্থ। হেনরি জেম্‌স তাঁর সুবিখ্যাত 'আর্ট অব ফিক্‌শন' প্রবন্ধে বলেছেন—"As people feel life so they will feel the art that is most closely related to it. This closeness of relation is what we should never forget in talking of the effort of the novel."

উপন্যাসের সমগ্রতা নির্ভর করে মূলত কাহিনির প্লট, চরিত্র, প্রতিবেশ এবং লেখকের জীবনবোধের ওপর। উপন্যাসের ব্যক্তিজীবন কোন একক ব্যক্তি নয়, কাহিনিও কোন একক কাহিনি নয়। ব্যক্তিজীবনের ..... যদি সমাজ জীবনের মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়—তবেই তা মহৎ সৃষ্টি বলা যায়। টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা' এবং ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারি'—দুটি উপন্যাসের বিষয়ই বিবাহিতা নারীর প্রেম। কিন্তু সমগ্রতার বোধে দুটি ভিন্ন, 'আনা কারেনিনা'র বিশাল নৈতিক তাৎপর্য 'মাদাম বোভারি'তে অনুপস্থিত। 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতার অচির-পরবর্তীকাল অর্থাৎ আনুমানিক চার পাঁচ বছরের সময়কালে বিধৃত পূর্ণিয়ার আখ্যান। 'জাগরি' এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-উপন্যাস দ্বয়ের সময় কাল ও ৪২'-এর ভারত ছাড় আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পরবর্তী কিছু সময়। 'জাগরি'তে পূর্ণিয়ার শিক্ষিত সমাজ এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত এই দুই সম্প্রদায়ের মিশ্রণ ঘটেছে। তবে জাগরি কিংবা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ ভাববৈচিত্র্য এবং মানবচরিত্র বিশ্লেষণ বৈচিত্র্য আরো গভীর স্তর ছুঁয়েছে। মানবচরিত্রের দ্বন্দ্ব জটিলতা, অন্ধকার গূঢ়েষণা অত্যন্ত সুক্ষ্ম ভাবে বিম্বিত। রেণু চারিত্রিক জটিলতার তুলনায় আর্থ-সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক অবস্থাকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি মেরীগঞ্জের জীবন সম্পৃক্ত। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি ব্যক্তি নয় সমষ্টি রূপে প্রতিষ্ঠিত। 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের একটি চরিত্রও যদি স্থানচ্যুত হয় বা অন্য প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তারা তাদের নিজস্ব দীপ্তি হারিয়ে নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। এই উপন্যাসের তহশীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদ তার কন্যা কমলা, মঠের কোঠারিন লছমি-বালদেব, গ্রামের বেতার সুরমিত দাস, গোঁয়ার কালিচরণ, তন্ত্রিমাটোলীর ফুলিয়া-রমজুদাসের বৌ-এরা সকলে মিলে মেরীগঞ্জের আত্মিক সত্তার প্রতীক।

উপন্যাস গঠন : রেখচিত্র

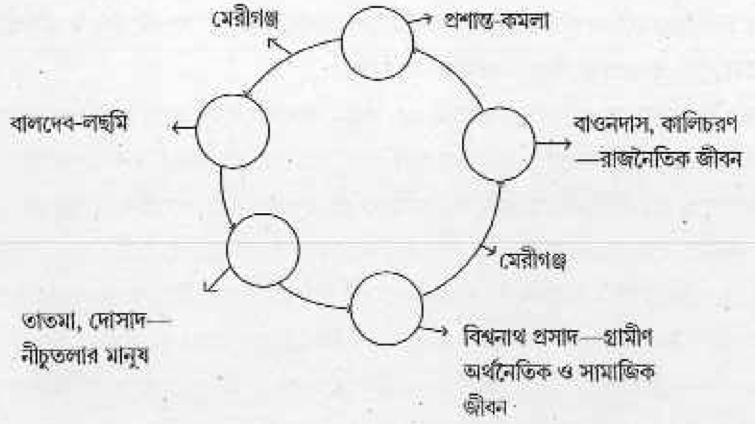

১. উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনাবলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। যদিও প্রশান্ত কমলার সংগে বিশ্বমান প্রসাদের সম্পর্ক সূত্র রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য চরিত্রগুলি সম্পৃক্ত নয়।

২. নীচেরতলার তাতমা-দোসাদরা অত্যাচারিত অবহেলিত কিন্তু তারা আপাত দৃষ্টিতে উপন্যাসের মূলস্রোত বিচ্ছিন্ন।

৩. আসলে এই উপন্যাসের আপাত বিচ্ছিন্ন চরিত্র ও ঘটনাবলি এক অমোঘ বৃত্তের আকর্ষনে পরস্পর সংযুক্ত—তা হল মেরীগঞ্জ। এই চরিত্র ও ঘটনাগুলি একান্ত ভাবেই মেরীগঞ্জ কেন্দ্রিত। একমাত্র প্রশান্ত ব্যতীত অন্য সকলেই মেরীগঞ্জের মাটি-আলো-বাতাসেই জীবন্ত।

৪. উপন্যাসটি যেন এক নিখুঁত ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি। যেখানে বিভিন্ন স্বাদী ও ভিন্ন বর্ণী ছবির সম্মিলিত রূপ পরিস্ফুট হয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত, প্রথম খণ্ডে তেতাল্লিশটি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বাইশটি অধ্যায়। প্রথম খণ্ডটি স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ড স্বাধীনতা লাভ এবং তৎপরবর্তী বছরখানেক সময়, উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের জীবন অধ্যয়ন গভীরতা অনেক বেশী, তুলনায় দ্বিতীয় খণ্ডটি এলোমেলো এবং লেখক দ্রুত পরিণতির পথে এগিয়েছেন। উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডে মেরীগঞ্জের পরিচয় দান, সামাজিক অবস্থার পরিচয় এবং চরিত্রবিন্যাসে আকর্ষণীয়, দ্বিতীয় খণ্ডে কাহিনি সূত্রবদ্ধ করতে অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক রং মেলাতে লেখক ব্যর্থ হয়েছেন। প্রথম খণ্ডে কয়েকটি কাহিনী সমান্তরালভাবে গ্রথিত—প্রশান্ত, কমলা, বালদেও-লছমি এবং স্বতন্ত্রভাবে কালিচরণ। উপন্যাসে এক বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের প্রতীক হয়ে এসেছিল বামনদাস, যার পরিণতি অংকনে লেখক এক চিরস্থায়ী তীক্ষ্ণতম ব্যঞ্জনার রেশ রেখে যেতে পেরেছেন। কালিচরণের পরিণতি ও রাজনৈতিক সুবিধেবাদের চরম নিদর্শন হয়ে রয়েছে উপন্যাসে।

উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে প্রশান্ত-কমলার কাহিনির সূচনা তাদের সম্পর্ক নিবিড়তর হয়েছে এই পর্যায়। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রশান্ত কমলার সন্তানের আগমনের মধ্যে দিয়েই নবযুগের সূচনাকে ব্যঞ্জিত করেছেন। উপন্যাসে প্রশান্ত একমাত্র বহিরাগত ব্যক্তি, যে পরবর্তীকালে মেরীগঞ্জের সংগে একাত্ম হয়ে পড়েছে, কখনো কখনো মনে হয় লেখকের আদর্শবাদের রূপকার রূপে প্রশান্ত চরিত্রটি অংকিত হয়েছে। কমলা দেশমাতৃকার প্রতীক হয়ে উঠেছে। তবে দ্বিতীয় খণ্ডে

প্রশান্ত কমলার সম্পর্কের পারস্পরিক স্তরবিন্যাস লেখক দেখান নি। বিশ্বনাথ প্রসাদ প্রথম খণ্ডে যে অভিজাত দৃঢ়চেতা পুরুষ রূপে উপস্থিত, দ্বিতীয় খণ্ডে তিনিই এক সাধারণ গ্রাম্য অর্থবান মানুষের মত আচরণ করেছেন। কমলার পিতা হিসেবে দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর চারিত্রিক মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এমনকি প্রশান্তকে প্রথমবার দেখেই তাঁর মনের মধ্যে যে ভাব-বৈলক্ষণ্য ঘটে তার কোনো পূর্বসূত্র লেখক কিন্তু উদ্‌ঘাটিত করেননি।

উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাহিনি হল লছ্‌মি ও বালদেবের প্রণয় কথা প্রথম খণ্ডের কাহিনি-সম্ভারের সর্বময়ী কর্ত্রী লছ্‌মি, তার চারিত্রিক দীপ্তিতে কমলা ম্লান হয়ে গেছে। মঠের 'কোঠারিণ' উপন্যাসের 'কোঠারিণ' হয়ে উঠেছে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে এই দীপ্তিময়ী কাহিনী পরিমতিকে প্রভাবিত করতে পারেনি, যদিও সে সম্ভাবনা তার মধ্যেই বহুলাংশে ছিল। লছ্‌মির যন্ত্রনা বা তার সম্পর্ক পরিণতি নিতান্ত সাধারণ স্তরেই রয়ে গেছে। আসলে প্রশান্ত-কমলার কাহিনীকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি লছ্‌মির প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার অপ্রতুলতাও এ ব্যাপারে দায়ী হতে পারে। এটি উপন্যাসের শিল্পগুনকে ক্ষুণ্ণ করেছে। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের সমাজপ্রেক্ষিত, চরিত্রের ক্রমবিকাশ এবং যুগ পরিবর্তন—এই তিনটি স্তরকে দ্বিতীয় খণ্ডে সুশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন, তবু যে রঙে রাঙাতে চেয়েছিলেন সেই জৌলুষ ও সজীবতা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

১.৪ উপন্যাসের ভাষা

'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের ভাষা প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার, আমরা মূলত অনুবাদ পাঠ করেছি। অনেক সমালোচক মনে করেন মূল গ্রন্থ ব্যতীত ভাষা বিন্যাস বা ভাষার ব্যবহার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কারণ অনুবাদের মাধ্যমে মূলের রস গ্রহণ সম্ভব নয়। তবে এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে মতটি প্রযোজ্য নয়, কারণ অনুবাদ গ্রন্থটি (N.B.T. প্রকাশিত) মূলের ভাব-রস এমন কি কখনো কখনো রূপও অক্ষুণ্ণ রেখে এমনই সু-অনুদিত যে ভাষার ক্ষেত্রেও আমরা প্রায় মূল হিন্দী উপন্যাসটিরই রসাস্বাদন করতে পারি। এক্ষেত্রে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার—কাব্যের ক্ষেত্রে অনুবাদ যেমন অনেক সময় মূল কাব্যের রসাস্বাদনে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটে না। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ যেমন অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স', কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল', কাফকার 'ট্রায়াল', ব্রেখট বা লোরকার বিভিন্ন নাটকের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি অনুবাদের মাধ্যমেই ভাষার ভিন্নতা সেখানে রসাস্বাদনের পরিপন্থী হয়নি।

ভাষার সার্থক প্রয়োগ দ্বারা ভাব প্রকাশের একটা বিশিষ্ট রীতি বা স্টাইল গড়ে ওঠে। প্রত্যেক শিল্পীরই ভাব প্রকাশের একটা বিশিষ্ট রীতি আছে। এই রচনারীতিতে প্রতিবিম্বিত হয় তাঁর মানসিকতা, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, কল্পনার প্রসার বুদ্ধির সক্রিয়তা, রসবোধের অনুভূতির ঔজ্জ্বল্য। 'ময়লা আঁচল' উপন্যাস অবলম্বনে রেণুর রচনারীতির এক বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য হিন্দি সাহিত্যে গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীকালে অন্যান্য শিল্পী-সাহিত্যিকরা অনুসরণ করেছেন। রেণুর প্রয়োগকুশলতায় মিথিলার 'আঞ্চলিক ভাষা' এবং 'পরিশীলিত ভাষা'—এই দুয়ের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। উপন্যাসের কথনভঙ্গিটি যেন নির্ভেজাল গ্রাম্য এক পর্যবেক্ষকের। এই উপন্যাসের রচনারীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—লেখক সত্তার বৌদ্ধিক উপস্থিতি কোথাও অনুভূত হয়নি। এ যেন মেরীগঞ্জের তাতমা-দোসাদদেরই রচনা। অবশ্য প্রশান্ত চরিত্রের উপস্থিতি, তার ভাব পরিমণ্ডল এবং পর্যবেক্ষণ লেখক অন্য সুরে বেঁধেছেন—সেখানে

শিক্ষিত পরিশীলিত মনন স্পষ্ট হয়ে আছে। উদাহরণের সাহায্যে উপন্যাসের এই ললিত সুষমাময় স্টাইলটি আলোকিত হতে পারে।

উপন্যাসের সূচনা নাটকীয়ভাবে এবং সংলাপ প্রাধান্য এ উপন্যাসের বিশিষ্টতা। গ্রামে সরকারি লোক আসায়, গ্রাম শুদ্ধ লোক ভয়ে তটস্থ, তারা শুনেছে—"ঢোল-বাজায় গ্রাম কে গ্রাম আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে, দুধের বাচ্চাটাও জ্যান্ত বেরুতে পারেনি। মুসহরুর শ্বশুর স্বচক্ষে দেখেছে—ঝলসানো মরা মাছের মতন মরা মানুষের লাশ মাসের পর মাস পড়ে পড়ে পচেছে, কাগে অব্দি ছুঁতে পায়নি : মেলেটারি পাহারা দিচ্ছিল, মুসহরুর শ্বশুরের ভাইপো ফারবিস সাহেবের খানসামা; সে মিছে কথা বলবে? পুরো চার বছর বাদে আজ বুঝি এ গাঁয়ের পালা পড়েছে। দোহাই মা কালী। দোহাই বাবা নরসিংহ।"

মেরীগঞ্জের পরিচয় দিতে গিয়েও লেখক অশিক্ষিতের সারল্যকেই মূলধন করেছেন—"নতুন বৌকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে যুবক বর গাড়োয়ানকে বলে—এই যে ভাই, এখানটায় একটু আস্তে হাঁকাও তো, কনেকে সাহেবের কুঠি দেখাব। ...এই দেখ ম্যাকে সাহেবের কুঠি।...আর ঐ যে ওখানে হাওদাটা দেখছ এতে নীল মাড়াই হত।

নতুন বৌ দুহাতে গাড়ির পরদা সরিয়ে, ঘোমটা একটু মাথার পেছন দিকে হেলিয়ে ঈষৎ ঝুকে পড়ে বাইরে তাকায়—শেয়াকুলের দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের মাঝখানে ইট পাথরের ভগ্নস্তূপ। কুঠি আবার কোথায়।" গ্রামের লোকেদের অতীত অহংকার এই কুঠিবাড়ি, যদিও আজ তা স্মৃতি।

গ্রামে ম্যালেরিয়া সেন্টার খোলার সুবাদে কংগ্রেসের ভলান্টিয়র রূপে বালদেবের সদ্য প্রাপ্ত সম্মান এবং গ্রামে সেই সম্মান রক্ষার কৌতুককর প্রয়াস লক্ষিত হয়েছে। রাজপুতটোলীর হরগৌরী অকারণে বালদেবের সঙ্গে ঝগড়া অশান্তি ও অপমানজনক আচরণ করলে, বালদেব সত্যকার অহিংসাবাদীর মত আচরণ করে। কালিচরণের দল ক্ষেপে উঠলে তাদের শান্ত করে—

> " '....আপনারা হিংসাবাদ করতে যাচ্ছিলেন। এর জন্য আমাকে অনশন করতে হবে। ভারতমাতা কা, গান্ধীজী কা রাস্তা এ নয়.... ।' "

সত্যিই সত্যিই গেয়ানি আদমী বালদেবজী। অন্তোলন, অনসন, আর...আর যেন কী?...হিংসাকত। কেউ কিছু বুঝলে! নেয়ানের কথা বোঝা সকলের কম্ম নয়।"

গ্রামে ডাক্তারের আগমনকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য সামাজিক কলহ, তাদের কৌতুকপ্রিয়তা এবং আন্তরিকতা ও প্রকাশ পেয়েছে। যাদবটোলীর খেলাওন যাদবের অভিমান ভাঙ্গিয়েছেন রামকিরপাল সিং, ভাণ্ডারায় জ্যোতিষী ঠাকুরের অনুপস্থিতি সকলের কাছে কৌতুককর ঠেকেছে—

> "সিংজী আমুদে মানুষ। সকাল থেকেই সকলকে হাসাচ্ছেন। খেলাওন যাদব অভিমান করে বসেছিল, তাকেও ধরে নিয়ে এলেন। জ্যোতিষী ঠাকুর এলেন না, বললেন—দাঁতের যন্ত্রণা। শুনে সিংজী বললেন—ওর বোধহয় পেটের ভেতর দাঁতের ব্যথা হয়েছে। আজকাল তো শুনতে পাই, ডাক্তারেরা সবাইকে নকল দাঁত দেয়। তা ডাগডর সায়েবকে বলে কেউ আমাদের গণক ঠাকুরের জন্য দুপাটি দাঁত বাঁধিয়ে দাও না গো। আরে দাদা, সভাগাছীতে কনেপক্ষ কি দাঁত ধরে নাড়িয়ে দেখে য়্যাঁ।"

তন্ত্রিমাটোলীর মহিলা-মহলে কেচ্ছা কেলেংকারি অতি স্বাভাবিক। আবহমান কাল ধরে বাবুটোলীর যাতায়াত এদের অন্দরে, যদিও সামাজিক ভাবে জল অচল। তন্ত্রিমা ফুলিয়ার বিয়েকে কেন্দ্র করে তার মা ও প্রতিবেশিনী রমজুদাসের বৌ-এর কলজের মধ্যে দিয়ে সামাজিক শৈথিল্য এবং যৌন নিপীড়নের চিত্র ফুটে উঠছে—

"হ্যাঁ গো ফুলিয়ার মা। তোমাদের কি বাছা লজ্জা-শরমও নেই, ধর্মভয় ও নেই। বলি আর কতকাল মেয়ের রোজগারে লালপাড় শাড়ির ঠাট দেখিয়ে বেড়াবে? সবকিছুর একটা সীমা আছে বাপু, জোয়ান-গতরের বেওয়া মেয়ে দুধেলা গাই-এর সমান মানছি। তা বলে এমন দোওয়া দুইবে যে ধড়ের রক্তটুকুও শুষে নেবে।"

কংগ্রেসের মিছিলে যোগ দিতে মেরীগঞ্জ থেকে লোক এনেছে বালদেও, সঙ্গে কালিচরণ। এই গ্রাম্য মানুষ গুলো যত না রাজনীতির টানে এসেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহ তাদের প্রথমবার পূর্ণিয়া শহর দেখার, রেলগাড়ি চড়ার—এ এক অভূতপূর্ব অনুভূতি—

"তাহলে এই শহর পুরনিয়া। পাকা সড়ক, হাওয়াগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, পাকা দালান কোঠা,.............. মেরীগঞ্জের এই মিছিলে এমন জনাচারেক ব্যক্তি আছে, যারা এর আগেও পুরনিয়ায় এসেছে। অনেকে অবিশ্যি আজই পয়েলাবার রেলগাড়িতে চাপছে। তাদের কলজেয় ধকধক আওয়াজ হচ্ছে।"

পূর্ণিয়ার লোকে অবাক হয়ে এই অনপড়দের 'ইনকিলাস্...জিন্দাবাদ'—স্লোগানে আকাশ বিদীর্ণ করা মিছিল দেখেছে।

এই গ্রাম্য অমার্জিত ভাষাভঙ্গির পাশাপাশি প্রশান্তের প্রসঙ্গে লেখক শিক্ষিত মননঋদ্ধ বর্ণনাভঙ্গির সাহায্য নিয়েছেন—গ্রামে পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গেই মেরীগঞ্জ এবং তার বাসিন্দাদের সম্পর্কে প্রশান্তের মতামত—

"এ এক নতুন পৃথিবী। জায়গাটাকে স্বচ্ছন্দে বজ্র দেহাত বলতে পার।.......পিয়ারুর মতে এখানকার কাকেদেরও ম্যালেরিয়া আছে। ....গাঁয়ের লোকগুলো বড় সরল, অবিশ্যি সারল্য মানে যদি অশিক্ষা, অজ্ঞতা আর অন্ধবিশ্বাস বোঝায় তা হলে এরা বাস্তবিকই সরল! তবে যদি বৈষয়িক বুদ্ধির কথা তোল, তবে তোমার-আমার মতন লোককে এরা দুবেলা ঠকাতে পারে।"

গ্রামে কলেরার নিরাময়ে এগিয়ে আশে পাশের আরো গ্রামগুলিকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে ডাক্তারের তার নিজস্ব উপলব্ধি :

"ভয়বিহ্বল মানুষ, রোগ আর হতাশায় আতুর মানুষের চোখের ভাষা পড়েছে, পড়ার চেষ্টা করেছে। মাঝারি কিষানের বাড়ীতে গেছে, সেই সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকের ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে যাবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তার হয়েছে।...সাতমাসের বাচ্চাকে লোকে বেতোশাক আর পাটের পাতা খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখছে তাও দেখে এসেছে। দেখেছে—দৈন্য আর দুর্দশার আর আবর্জনার মধ্যে সৌন্দর্যের জন্ম হচ্ছে।"

উপন্যাসের একেবারে অন্তিম লগ্নে জেল ফেরত ডাক্তার এসেছে তার প্রেয়সী, তার সন্তানের জননীকে স্বীকৃতি দিতে, তার সমস্ত জীবনানুসন্ধান এই পর্বে উপনিষদের গাম্ভীর্যে মহিমাময়—

"মানুষ অপরাজেয়, বিধাতার সৃজনশক্তির সবচেয়ে বড় বহিঃপ্রকাশ—মানুষ। তাঁর শক্তিসত্তার শ্রেষ্ঠ প্রতীক মানুষ। অমিত-শক্তিধর বিষবাষ্প বিধৃত মারনাযুধের সাধ্য নেই মানুষকে হারিয়ে দেবার, মানুষকে ফুরিয়ে ফেলার।"

লেখকের সর্বলোকচারী মানবতাবাদের জয়গান এবং আশাবাদের ধারক হয়ে উঠেছে প্রশান্ত। তার উপলব্ধির মাধ্যমেই উপন্যাসটির সার্বজনীন সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লেখক অসংখ্য দেহাতি শব্দের এবং লোকগীতির ব্যবহার করেছেন—যা উপন্যাসটিকে আরো সুস্বাদু করে তুলেছে, গ্রামীণ জীবন নিবিড় বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছে। 'জয়হিন্দ'-এর বদলে 'জয়হিন্ন', 'আন্দোলন'কে 'অন্ডোলন', 'অনশন'—'আন্টসান্ট', 'নওজোয়ান'কে 'লওজোমান', 'ভাইসচেয়ারম্যান'কে 'ভৈসচরমন' 'জ্যোতিষী' কে 'জোতসি', 'ভাষণ'কে 'ভাসন', 'ডিস্ট্রিক্‌ট্‌ বোর্ড' কে 'ডিস্টিবোড' 'মুসলিমলীগ' কে 'মুসলিং' ইত্যাদি অসংখ্য শব্দে উপন্যাসের

গ্রাম জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর তাঁর এই বিশিষ্ট ভাষাশৈলী উপন্যাসটি বিশুদ্ধ বাস্তবতার দৃঢ় প্রত্যয়ভূমিতে স্থাপন করেছে।

১.৫ প্রশান্ত ও কমলা

এই উপন্যাস রেণুর প্রথম রচনা। হিন্দি কথাসাহিত্যে এক নতুন শিল্পশৈলীর প্রবর্তন করেন রেণু। এই উপন্যাসের পটভূমিকা ভারতছাড় আন্দোলন এবং তার পরবর্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ও উত্তর বিহারের জনজীবনের গভীর নিবিড় চিত্রায়ণ। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতার অচির পরবর্তী সময়ে মানুষের রাজনৈতিক জীবন ব্যক্তিগত জীবন আশ্চর্যভাবে সমন্বিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই জীবননাট্য। এই জীবননাট্যের কুশীলবরা সকলেই পূর্ণিয়া অঞ্চলের মেরীগঞ্জ গ্রামের অনক্ষর খেটে খাওয়া মানুষ, পিছিয়ে পড়া মানুষ অবশ্য জমিদার-জোতদারের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। উপন্যাসে কালিচরণ-বাওনদাস-বালদেব যেমন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিশ্বনাথ প্রসাদ, রামকিরপাল সিংরা গ্রামের মাথা জমিদার। দোসাদ-তাতমা-ধনুকধারী-ছত্রীরা গ্রামের নিম্নবর্ণ শোষিতের দল। ডাক্তার প্রশান্ত এ গ্রামে বহিরাগত। স্কলারশিপের মোহ ত্যাগ করে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কারের আশায় এই তরুণ ডাক্তার মেরীগঞ্জে এসেছে। প্রশান্তের আগমন গ্রামের মানুষদের কৌতূহলী করে তুলেছে, এই বহিরাগত মানুষটির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে গ্রামীণ আগ্রহ মেরীগঞ্জের বিশিষ্টতাকেই মনে করিয়ে দেয়।

প্রশান্ত নিছক সমাজসেবার আদর্শকে সম্বল করে মেরীগঞ্জে এসেছে, মেরীগঞ্জ সম্পর্কে তার প্রাথমিক ধারণা তার বন্ধু মমতাকে লেখা চিঠিতে অনুভূত হয়—"এ এক নতুন পৃথিবী, জায়গাটাকে স্বচ্ছন্দে বজ্রদেহাত বলতে পার।" এই অশিক্ষিত, অন্ধবিশ্বাসী, অথচ বৈষয়িক বিষয়ে কুটিল মানুষগুলির সারল্যে সে মুগ্ধ। উপন্যাসের প্রথম থেকেই তাই প্রশান্ত আমরা দেখেছি এক সহানুভূতিশীল কর্মনিষ্ঠ দর্শক রূপে, সে পরবর্তীকালে একটু একটু করে মেরীগঞ্জের মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে সেখানকারই একজন হয়ে উঠতে পেরেছে।

মেরীগঞ্জে আগমনের সূত্রেই বিশ্বনাথ প্রসাদের কন্যা কমলার বিকার জনিত অসুখ সারাতে তার সংস্পর্শে এসেছে। একমাত্র আদরিণী কন্যার প্রতি প্রশ্রয় প্রবীণ দম্পতির একটু বেশীই, তারা কমলাকে দেবীর দান বলে মনে করে। এই অপরূপ লাবণ্যময়ী সহজ সরল নারীর সান্নিধ্যে শুরু হয় প্রশান্তের নতুন জীবন। তার নিজের জন্মবৃত্তান্ত তার অজ্ঞাত। এক আশ্রমবাসিনীর কাছে সে পালিত হয়েছে, একসময় তিনিও তাকে জনসমুদ্রে ভাসিয়ে চলে গেছেন। তার মনের অবচেতনে নারীর যে অসহায় মাতৃমূর্তি অঙ্কিত হয়ে আছে, তারই ফলে সে নারীকে প্রেমিকার চোখে কখনো দেখতে পারেনি। কমলার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ডাক্তারের মনে এই প্রথম মোহ সঞ্চারিত হয়েছে।

মেরীগঞ্জে প্রশান্তের জীবনের একদিকে কমলা অন্যদিকে গ্রামের অনাথ-আতুর অসহায় মানুষগুলো—যারা সাতমাসের বাচ্চাকে বেতোশাক সেদ্ধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে, আবার হোলির দিন সব ভুলে এক হয়ে যায় তাদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-আবেগ। এই ভালবাসার টানেই প্রশান্ত আপন করে নেয় গণেশের বৃদ্ধা দিদিমাকে—যে গ্রামে 'ডাইনি' বলে খ্যাত বৃদ্ধার দোষ এই যে, ঐ অশিক্ষিত অমার্জিত সমাজে সে রুচিশীল। গণেশের দিদিমার শোচনীয় মৃত্যুর পর গণেশের দায়িত্ব ডাক্তার স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নেয়।

গ্রামের অভ্যন্তরীণ জীবনে ডাক্তার একটু একটু করে মিশে যাচ্ছিল। গ্রামের মানুষগুলোও যাকে এতদিন বাইরের

মানুষ মনে করে সসম্ভ্রমে দূরে থেকেছে, নিজেদের বিপদে-আপদে তাকেই কাছের মানুষের মত পাশে পেয়ে হৃদয়ে বরণ করে নিয়েছে। সোসালিস্ট পার্টির মন্ত্রে দীক্ষিত কালিচরণের আদর্শে আপ্লুত হয়ে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষগুলো তাদের কর্ষিত জমি আগলাতে রুখে দাঁড়ালে গ্রামে ঝড় বয়ে যায়। বিশ্বনাথ প্রসাসের জমি লুঠ হয়ে যায়। সাঁওতালদের এই বিদ্রোহে গ্রামের সমস্ত জাতি বর্ণের মানুষ একত্রিত হয়। রাজপুতটোলীর হরগৌরী সিং নিহত হয়, আদিবাসীদেরও প্রচুর রক্তক্ষয় ঘটে। এই বিদ্রোহে পরোক্ষ ইন্ধনদাতা রূপে সন্দেহে ডাক্তারকে নজরবন্দী করা হয়। ডাক্তারের বাড়ী তল্লাশী করে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া না গেলেও সরকারপক্ষ তাকে 'কম্যুনিস্ট' চর বলেই প্রমান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রশান্তের কারাবাস কালেই দেশের স্বাধীনতা এসেছে। কমলা-প্রশান্তের সম্পর্ক কতটা গভীর নিবিড় হয়ে উঠেছিল তার ইঙ্গিত উপন্যাসের প্রথম অংশে পাওয়া গেলেও তা সুনিশ্চিত হয় প্রশান্তের কারাবাসকালে কমলার সন্তান সম্ভাবনার সংবাদে এবং সন্তানের জন্মের মধ্যে দিয়ে। চৌধুরী বিশ্বনাথ প্রসাদের মত অভিজ্ঞ মানুষও এঘটনার জেরে দিশেহারা বোধ করেছেন। এই কলঙ্ক গোপন করতে তাঁরা কমলাকে অন্দরমহলের অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছেন। আসন্ন স্বাধীনতা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের শিকড়ে টান দিয়েছে। মানুষ গ্রাম থেকে নগরমুখী হয়েছে। মূল্যবোধের ও জীবনবোধের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে শঙ্কিত বিশ্বনাথ প্রসাদ।

ডাক্তার জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, মমতা তাকে আনতে গেছে। প্রশান্ত গ্রামে ফিরে এসেছে। বিশ্বনাথ প্রসাদ রাগ, দুঃখ, অভিমান ভুলে প্রশান্তকে বুকে টেনে নিয়েছেন। সুমরিত দাস গ্রামের লোকেদের বলেছে—কমলার মঙ্গলের জন্যই এতদিন বিয়ের ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছিল। গ্রামের মানুষ সব বুঝেও এই সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি সম্পন্ন মানুষের বিরুদ্ধে সরব হতে পারে না। উপন্যাসের পরিণতি সূচিত হয়েছে প্রশান্ত-কমলার সন্তানের আগমনের মধ্যে দিয়েই-গ্রামের মানুষ যন্ত্রণা, বিরুদ্ধতা ভুলে নীলোৎপলের ষষ্ঠীপুজোয় একত্রিত হয়েছে। এই আনন্দোৎসবে বিশ্বনাথ প্রসাদ ঘোষণা করেছেন সকলকে পাঁচ বিঘে করে জমি ফিরিয়ে দেবেন। খেলাওন যাদবের সমস্ত জমিই ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি সহর্ষে বলেছেন—"আরে ভাই এসব আমি দেব কেন।....দিচ্ছে নতুন মালিক।" এই নতুন মালিক প্রশান্ত কমলার নবজাত পুত্র। তহশীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদ বুঝেছেন পুরাতন কাল শেষ হয়ে এল, নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এই শোষিত অবহেলিত মানুষগুলোকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাই নতুন যুগের সঙ্গে তাল রাখতে তিনি ফিরিয়ে দিলেন জমি। প্রশান্তও আবার নতুন করে কাজ শুরু করতে চায়—সে ভালবাসার চাষ করবে—"পল্লীমায়ের ময়লা আঁচলের ছায়ায়।"

এ উপন্যাসে প্রশান্ত-কমলার ঘটনাই প্রধান, তবে একমাত্র নয়। উপন্যাসে বহুবিচিত্র বর্ণের সমারোহ। প্রশান্ত উজ্জ্বল, তারই চোখে অনেক সময় মেরীগঞ্জ উদ্ঘাটিত হয়েছে। লেখকের নিজস্ব ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক রূপেও সে আত্মপ্রকাশ করেছে। তুলনায় কমলার উপস্থিতি নগণ্য। মনে হয় যেন ভারতমাতার প্রতীক রূপেই কমলাকে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন লেখক। আবার গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের সম্মিলিত রূপের প্রতীক তাদের সন্তানের হাতে ভাবীকালের ভারতবর্ষের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন লেখক। এই সম্মিলিত রূপই নতুন ভারতকে শক্তি জোগাবে এই নিশ্চিত প্রতীতিতেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

১.৬ অন্য কয়েকটি চরিত্র : কালিচরণ - বাওনদাস - বালদেও

'ময়লা আঁচল' উপন্যাসকে কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করার কাজ বড় সহজ নয়। একে রাজনৈতিক উপন্যাস আখ্যা দিলে-উপন্যাসটির মূলভাব অনুসারী হয় না। 'ময়লা আঁচল' পূর্ণিয়ার এক অখ্যাত গ্রাম মেরীগঞ্জের কাহিনি—যে কাহিনি এক বিশেষ কালসীমা অতিকম করেছে। যেহেতু উপন্যাসটি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কিছু সময়ের সাক্ষী, তাই রাজনৈতিক কিয়াকলাপ এখানে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ব্যতীত উপন্যাস অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত হয়ে থাকার আশঙ্কা ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের আবেগ-উত্তাপ থেকে মেরীগঞ্জ ও নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেনি। সমাজের ভিত্তিভূমিতেই উপন্যাসের কায়া নির্মিত হয়। উপন্যাসের চরিত্রগুলিকেও তাই সমাজ পটভূমিতেই দাঁড়াতে হয়।

এই উপন্যাসের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এসেছে কালিচরণ, বাওনদাস ও বালদেব। মেরীগঞ্জের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়, একদিকে বিদেশী ইংরেজ শোষিত ভারতের মুক্তি আন্দোলনে গান্ধীজী, কংগ্রেসের কার্যকলাপ, সোসালিস্ট, কম্যুনিস্ট ইত্যাদি রাজনৈতিক দলগুলির জন্ম ও শক্তিবৃদ্ধি কীভাবে মেরীগঞ্জকে আন্দোলিত করেছে। অন্যদিকে স্বাধীনতা লাভের পর এই রাজনৈতিক দলগুলির কার্য-পদ্ধতি, তাদের মূল্যবোধের স্খলন এবং তারই প্রতিকিয়ায় এই অজ্ঞান-অশিক্ষিত মানুষগুলির করুণ পরিণতি।

১.৬.১ কালিচরণ

রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্ব ও মিথ্যাচারের বলি কালিচরণ। সহজ, সরল অথচ একগুঁয়ে নির্ভীক এই যাদব তনয় প্রথমত কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরে সোসালিস্ট পার্টির জন্যই মনে প্রাণে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। গ্রামের জমিদার সম্পর্কে খেটে খাওয়া মানুষগুলিকে সাবধান করেছে, গ্রামে সোসালিস্ট পার্টির মূলমন্ত্র প্রচার করেছে—"জো রোঁয়েগা সো কাটেগা। জো কাটেগা সো বাঁটেগা।" গ্রামে সাঁওতালরা এই ডাকে সাড়া দেয়, এবং বিপর্যয় নেমে আসে—এই প্রথম তহশীলদারের বিরুদ্ধে এই দীন হীন মানুষগুলি মাথা তোলার সাহস পায়। এই লড়াই-তে গ্রামের সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে জোট বাঁধে। হরগৌরী সিং নিহত হয়। প্রধান সাক্ষী রূপে ডাক পড়ে কালিচরণ, বালদেবের। তারপর মিথ্যে অপরাধের বোঝা কাঁধে নিয়ে গ্রেফতার হয় কালিচরণ। যে-পার্টির জন্য সে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছে, আজ বিপদকালে সেই পার্টিই মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। পুঁজিবাদের বিনাশই যাদের লক্ষ্য ছিল তারা নিজেরাই পুঁজিবাদের পরিপোষক হয়ে ওঠে। কালিচরণের আবেগকে তারা কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছে। জেল থেকে পালিয়ে কালিচরণ চরকা সেন্টারের মাস্টারণি মঙ্গলার কাছে যায়। তার জীবনে প্রেমের নিঃশব্দ আগমন সে বুঝতে পারেনি, যখন অনুভব করেছে, আশ্রয় পেতে চেয়েছে—সেই মুহূর্তে তার জীবনে ঘনিয়ে এসেছে করুণ পরিণতি। এক নিরপরাধ, আদর্শনিষ্ঠ, শুভ বুদ্ধি ও বোধ সম্পন্ন যুবক অন্যায় অবিচারের পাথুরে দেওয়ালের আড়ালে হারিয়ে গেছে।

১.৬.২ বাওনদাস

বাওনদাসের পরিচয় উপন্যাসে কংগ্রেসের কর্মী হিসেবে, কিন্তু তাঁকে 'গান্ধীজি' চেনেন, নেহরুজি চেনেন, রাজেন্দ্রবাবুও চেনেন," গান্ধীবাদের কঠোর পরীক্ষায়, সত্যের ও সহনশীলতার আদর্শের সগৌরবে উত্তীর্ণ এই দেড়হাতি কুশ্রী মানুষটি গান্ধীবাদের সত্যিইকার পূজারী ও প্রচারক। সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর বোকাবাওয়া, রাজা রাও-এর 'কান্থাপুরা'র মূর্তি এবং এই বাওনদাস গান্ধীবাদের একনিষ্ঠ প্রচারক। এই উপন্যাসে বাওনদাস এবং ডাক্তার প্রশান্তের মানবতাবাদী 'লোককল্যাণ ব্রত' গান্ধীবাদেরই নামান্তর মাত্র। উপন্যাসে ৪২'-এর ভারতছাড় আন্দোলনের স্মৃতির রেশ, সেদিনের তপ্ত আবেগের স্পর্শ আমরা পেয়েছি বাওনদাসের স্মৃতির সরণী বেয়েই। বাওনদাস ও কালিচরণ এঁরা দুজনেই মতাদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও একনিষ্ঠতায় ও আদর্শবোধে সমার্থক। এরা নিঃস্বার্থ ভাবে দেশসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু এদের ক্ষমতা কতটুকু ?—তাই প্রাক-স্বাধীনতার মুহূর্তে বাওনদাসের মনে হয়েছে ভারত মাতা কাঁদছে। চারিদিকে রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা, জাতপাতের নামে বিবাদ-বিশৃঙ্খলা, অযোগ্য অর্থবানদের হাতে ক্ষমতার রাশ তাঁকে হতাশ বিষণ্ণ করেছে। স্বাধীনতা তাঁকে খুশি করতে পারেনি। 'সুরাজী' তে নাম লেখানোর পর থেকে গান্ধীজি তার ধ্যানজ্ঞান—কংগ্রেসের মধ্যেও যে মূল্যবোধের অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা অনুভব করে ক্লান্ত ক্ষুব্ধ বাওনদাস শেষ চেষ্টা করতে চেয়েছেন। বালদেবের কাছে গান্ধীজির লেখা চিঠিগুলো রেখে তিনি বেরিয়ে পড়েছে ভারতমাতার অশ্রুমোচনের উপায় নিবারণে। কংগ্রেস আজ অর্থবানদের হাতের মুঠোয়, বিশ্বনাথ প্রসাদ জেলার সভাপতি, একদা দেশদ্রোহী সাগরমল স্বাধীনতার পর নরপত্ নগরের সভাপতি। দুলারচন্দের মত চোরাকারবারী পার্টির পৃষ্ঠপোষক। ধর্মের নামে ভারতবর্ষ বিভক্ত—পাকিস্তান ও ভারত। সীমান্তে এই চোরাকারবারিদের রুখতেই বাওনদাসের অসম অভিযান। কিন্তু তাদের গাড়ীর চাকাতেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে প্রাণ দিতে হল ভারতমাতার এই নির্ভীক সন্তান। ক্ষমতার লড়াই থেকে দূরে থাকা, সরল অথচ আত্মবিশ্বাসী, সত্যনিষ্ঠ মানুষটির ভাগ্যে জুটল এই নির্দয়-নিষ্ঠুর পুরস্কার। সীমান্তে সাগর নদীর পারে পড়ে থাকা তার মৃতদেহ পাকিস্তানি সৈন্যরা চিনতে পেরে জলে ভাসিয়ে দেয়। কেবল নদীর ধারে গাছে আটকে থাকে তার ঝোলার একটুকরো কাপড় সাক্ষী রইল সমকালীন রাজনৈতিক আদর্শভ্রষ্টতার এবং একই সঙ্গে আদর্শপ্রাণতার—"বাসন তার অতিখর্ব পায়ের দুটিমাত্র পদক্ষেপে দুটি স্বাধীন দেশের হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান—সততা আর মানবতার জরীপ করে গেল।" তার ঝোলার টুকরো পীরের মর্যাদা পেয়ে মানুষের মানসিক বাসনাপূর্তির প্রতীক হয়ে রইল। এই অবতারত্ব প্রাপ্তি যেন পরোক্ষ ব্যঙ্গ। গান্ধীজিও অবতার রূপে পূজিত কিন্তু তার আদর্শবোধ নিক্ষিপ্ত হয়েছে অন্ধকারের আড়ালে। বাওনদাসের নিজের মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি, কিন্তু তারই একটু নিদর্শন অন্যের-জনসাধারণের কামনাপূর্তির প্রতিমূর্তি হয়ে রইল।

১.৬.৩ বালদেও ও লছমি

এই উপন্যাসের রাজনৈতিক মেরুর একদিকে যেমন কালিচরণ বাওনদাস তেমনি বিপরীত কোটিতে অবস্থান বালদেবের। বালদেব নিজেও কংগ্রেসের সমর্থক। সেই সূত্রে বাওনদাসের ঘনিষ্ঠ। কিন্তু মানসিকতায় ও আচরণে ভিন্ন ধর্মের মানুষ। উপন্যাসের সূচনাতেই আমরা তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। গ্রামে ম্যালেরিয়া সেন্টার খোলার তদ্বির করতে সরকারি লোকেদের আগমন ঘটলে, ভীত গ্রামবাসীরা বালদেবকে ধরে নিয়ে গেছে সরকার বাহাদুরের রোষদৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি

পেতে—'হুজুর এই স্বদেশীওয়ালাটার নাম বালদেও গোপ। দুবছর জেল খেটে এয়েছে।....খদ্দর পরে, জয়হিন্ন বলে।" কিন্তু জেলার সরকারি লোকেরা বালদেবকে চিনতে পেরে যখন সেন্টার তৈরির দায়িত্বে তাকে সামিল করতে চেয়েছে তখন থেকেই গ্রামে বালদেওর প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। যাদব টোলীর মুখিয়া তাকে সাদরে বাড়ীতে নিয়ে যায়। সেন্টারের কাজে শ্রমিকদের মজুরির প্রশ্নে হরগৌরী সিং বালদেবকে অপমান করে, যাদব কালিচরণের দল এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বালদেব কালিচরণের রাজনৈতিক গুরু, সে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়ে যায়। এই হিংসাবাদ বুঝতে বালদেব গান্ধীর অনুকরণে অনশনের কথা বলে, এখানেই তার আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গ্রামের লোকেদের কাছে বালদেও অমূল্যরতন। মঠের মোহান্তের ভান্ডারার প্রসঙ্গে বালদেও প্রথম কোঠারিণ লছমির সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায় এবং এই দীপ্তিময়ী নারী তার চোখে নেশা লাগায়। এরপর একটু একটু করে সে মোহজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার কন্ট্রোলের কাপড়ের পারমিট, রেশম কটনের সুযোগ দেশসেবার অছিলায় অধিকার ও মর্যাদা অর্জনের মোহ। কিন্তু প্রয়োজনে সে সুযোগ সন্ধানী ও পলায়নপর মনোভাবের অধিকারী। মোহান্তের মৃত্যুর পর নতুন মোহান্ত নির্বাচনে মঠে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল—সেখানে সব জেনেও সত্যের পক্ষে লছমির পক্ষে সে দাঁড়াতে চায়নি। সমস্যার সমাধান করেছে কালিচরণ। অবশ্য কালিচরণ তার স্বরূপ অনুধাবনে সমর্থ হয়ে দূরে সরে গিয়েছিল। লছমির প্রতি মোহান্ধতাই তাকে 'কণ্ঠী' নিতে উৎসাহিত করেছে। সামাজিক পালাবদলের মুহূর্তে গ্রামের মানুষের কাছে তার কদর কমে যাওয়ার ভয়ে সে দিশেহারা বোধ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত লছমির কাছেই আশ্রয় নিয়েছে।

উপন্যাসের শেষপর্বে লছমি মঠ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে বালদেবকে সঙ্গে নিয়ে। লছমির অন্নে প্রতিপালিত হয়েও সে লছমিকেই সন্দেহ করেছে। লছমির চোখে বালদেব অবতার, তার সেই ধারণা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে যখন লছমি জানতে পারে বাওনদাসের চিঠিগুলি বালদেও গাঙ্গুলিজিকে না দিয়ে নিজের কাছে রেখেছে ভবিষ্যতের সুখের আনায়, এই চিঠিগুলো তাকে মন্ত্রীত্ব পাইয়ে দিতে পারবে এই লোভে। বালদেব-লছমির সম্পর্ক এখানেই আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। লছমির শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা ধ্বংস হয়ে পড়ে থেকে দুই নর-নারীর বাধ্যতামূলক যুগল জীবন।

এই উপন্যাসে মঠের কোঠারিণ লছমি উপন্যাসেরও কোঠারিণ হয়ে উঠতে পারত। তার ব্যক্তিত্ব, স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ, তার নিষ্ঠা, আবেগ অন্য সব নারীকে ম্লান করে দিয়েছে। বালদেব লছমির সম্পর্কের টানাপোড়েন ও অন্যকোন চরিত্রে লক্ষিত হয় না। বালদেব ক্ষমতালোভী, তবে লছমির প্রতি একনিষ্ঠ। লছমিও ব্যক্তিত্বের জোরেই সবকিছু অস্বীকার করে বালদেবকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পেরেছে। কিন্তু তাদের পরিণতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। লেখক আরেকটু মনোযোগ দিলে বালদেব-লছমি উপন্যাসের প্রধান হতে পারত। কিংবা হয়ত প্রশান্ত-কমলাকে সযত্নে অঙ্কিত করতে গিয়ে বালদেব-লছমির চিত্রটিতে বর্ণের খামতি ঘটেছে।

১.৭ অনুশীলনী

১.৭.১ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. আঞ্চলিক উপন্যাস রূপে 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের সার্থকতা বিচার করুন।
২. এই উপন্যাসের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটি বিশ্লেষণ করুন।

৩. এই উপন্যাসের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির বিশ্লেষণ করে দেখান।
৪. উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক কে? প্রশান্ত, নাকি মেরীগঞ্জ গ্রাম? আলোচনা করুন।
৫. এ উপন্যাসে কালিচরণ এবং বাওনদাস চরিত্র দুটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৬. এই উপন্যাসে বালদেব ও লছমির উপকাহিনিটির গুরুত্ব কতটা, দেখান।
৭. 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের গঠন-আঙ্গিক বিশ্লেষণ করুন।
৮. 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের ভাষার বিশেষত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।
৯. এই উপন্যাসে প্রতিফলিত উত্তর বিহারের গ্রামীণ জীবনের চিত্ররূপটি দিন।
১০. সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এবং ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'ময়লা আঁচল' উপন্যাস দুটির তুলনামূলক বিচার।

১.৭.২ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতো দেশবরেণ্য রাষ্ট্রনেতাদের এই উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে দেখানো কতটা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়?
২. তহশীলদার বিশ্বনাথপ্রসাদ এই কাহিনিতে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?
৩. উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে রেণুজি নীলোৎপলকে উপলক্ষ করে যে-দার্শনিক ভাবনার উদ্ভাস ঘটিয়েছেন, তার তাৎপর্য কী?
৪. 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসকে পূর্ণিয়া অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির অ্যালবামরূপে অভিহিত করা যায় কি?
৫. কালিচরণ সহসা কাহিনি থেকে মুছে গেল কেন? এটা কি প্লট বিন্যাসের অসঙ্গতি?
৬. বাওনদাসের মৃত্যু এই উপন্যাসে কতটা জরুরি ছিল?
৭. মমতা এবং মাসী প্রশান্তর জীবনে কতখানি প্রভাব ফেলেছে?
৮. সাঁওতালদের জমির জন্য লড়াই এই কাহিনিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

১.৭.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'জাট-জাট্টিন' খেলা কাকে বলে?
২. ৩১ জানুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখটি কেন উল্লেখযোগ্য?
৩. ডকালী মিয়া কার নাম?
৪. চলিত্তর কর্মকার কে?
৫. মঙ্গলার কর্মক্ষেত্র কোথায় ছিল?
৬. 'রাজকমল' বলে কে, কাকে ডেকেছিল?
৭. 'পেটবৈরাগী' কে?
৮. 'ময়লা আঁচল' কথাটি কে প্রথম কাব্যে ব্যবহার করেন?
৯. 'সুসীল কীরতন' মানে কী?
১০. 'কচরাহী মোগলাই' উর্দু ভাষা কোথায় ব্যবহৃত হয়?
১১. 'জুলুম বাত' কখন-কখন বলা হয়?
১২. মেরীগঞ্জ নাম কে রেখেছিল? কেন?

একক ২ ❒ এক চাদর মইলি সি (ময়লা চাদর)

গঠন

২.১ লেখক পরিচয়
২.২ কাহিনির উপজীব্য
২.৩ ঘটনাক্রমের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বিশ্লেষণ
২.৪ উপন্যাসের শিল্প আঙ্গিক : রাণু এবং মঙ্গালের সম্পর্কের স্তর-বিবর্তন
২.৫ প্রতীক ও ব্যঞ্জনা এবং উপন্যাসের পরিণতিতে আধ্যাত্মিকতার অনুরণন
২.৬ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী
২.৭ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী
২.৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

২.১ লেখক পরিচয়

আধুনিক উর্দু কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক রাজিন্দর সিং বেদীর (১৯১৫-১৯৮৪) জন্ম বর্তমান পাকিস্তানের আন্তর্ভুক্ত শিয়ালকোট জেলার দালেজি গ্রামে। ছাত্রাবস্থায়েই তিনি ইংরেজী ও পাঞ্জাবী ভাষায় কবিতা ও ছোটগল্প রচনা করেছেন। যদিও তাঁর প্রাথমিক রচনাগুলি রচনা সমগ্রে স্থান পায়নি, লাহোর পোস্ট অফিসের করণিক রূপে তাঁর জীবিকার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে কিছুদিনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশনা বিভাগে এবং আকাশবাণীতে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি সোমাবতী দেবীর সঙ্গো বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হন। ১৯৪৬ সালে তিনি লাহোরের সঙ্গম পাবলিকেশন-এর সঙ্গো যুক্ত হন বটে, কিন্তু দেশভাগের সময় ১৯৪৭-এ দিল্লীতে চলে আসেন। ১৯৪৮ সালে লেখক সঙ্ঘের প্রতিনিধি রূপে জম্মু-কাশ্মীর পরিভ্রমণ কালে সেখানকার রেডিও স্টেশনে অধিকর্তার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালে বেদী আবার দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে চলে যান বোম্বাইতে। এই সময়েই তিনি বলিউডের চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গো যুক্ত হয়ে পড়েন। বেদী চলচ্চিত্রের কাহিনী, চিত্রনাট্য এবং সংলাপ লিখেছেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'দেবদাস', 'মির্জা গালিব', 'দাগ', 'মধুমতী', 'অনুরাধা', 'অনুপমা', 'অভিমান' ইত্যাদি, কয়েকটি ছবি পরিচালনা এবং প্রযোজনাও করেছেন বেদী। তাঁর পরিচালিত 'দস্তক' ছবিটি রাস্ট্রীয় পুরস্কার পায়।

রাজিন্দার সিং বেদীর সাহিত্যিক জীবনের পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময়ে তিনি ৭০টির মত ছোট গল্প লিখেছেন, যেগুলি সংকলিত হয়েছে 'দানা ও দাম' (১৯৩৬), 'গ্রহণ' (১৯৪২), 'কোকজ্বলি' (১৯৪৯), 'আপনা

দুখ্ মুঝে দে দো' (১৯৬৫) 'হাত হামারে কলম হুয়ে' (১৯৭৪), এবং 'মুক্তি বোধ' (১৯৮২) এর মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য সমস্ত গল্পগুলিই এই গ্রন্থগুলিতে সংকলিত রয়েছে।

বেদী উর্দুতে বেশ কিছু নাটকও রচনা করেন, যার মধ্যে উল্লেখ্য—'বে জান চিজেঁ' (১৯৪৩), 'সাত মেল' (১৯৪৬), তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'এক চাদর মইলি সি' (১৯৬২) সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত হন। 'পদ্মশ্রী' এবং 'গালিব' পুরস্কারেও ভূষিত হন বেদী। ১৯৭৭ সালে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনিও অসুস্থ এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। স্ত্রী এবং পুত্রের মৃত্যুর আঘাত কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ১৯৮৪ সালে নিঃসঙ্গ বিক্ষত হৃদয় এই মানুষটির মৃত্যু উর্দু সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি করে দিয়ে যায়। সাদাত হাসান মান্টো, ইসমত চুগতাই, কৃষনচন্দর এবং রাজিন্দার সিং বেদী একত্রেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় উর্দু কথাসাহিত্যের চার জ্যোতিষ্ক (চারো সিতারেঁ) বলে অভিহিত করা হতো।

২.২ কাহিনির উপজীব্য

এ-কাহিনির পটভূমি পশ্চিম পঞ্জাবের কোটলা গ্রাম। ঐ গ্রামের দরিদ্র এক্কাচালক তলোকের স্ত্রী—রাণু হল এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। বেদী মূলত ছোট গল্পকারই যেহেতু, তাই ছোটগল্পের লক্ষণই এই উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে সুস্পষ্ট। এগারোটি পরিচ্ছেদে সজ্জিত উপন্যাসটি চলেছে দ্রুত গতিতে। রাণুর স্বামী তলোকে এক্কা চালায়, যার সংসার বাবা-মা-ভাই এবং সন্তান-সন্ততিতে পূর্ণ। এই হতদরিদ্র সংসারে একমাত্র রোজগেরে মানুষ তলোকেই। গাঁয়ের পাশেই দেবীর মন্দিরের সূত্রেই জামেশাই গ্রামে তীর্থ যাত্রীদের আগমন ঘটে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষের রোজগারের উপায় এই মন্দির ও তীর্থযাত্রীরা। গ্রামের সাধারণ মানুষেরা শান্ত, নির্বিরোধ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিল। আচমকা তাদের জীবনে এক দুর্ঘটনা ঘটল। এক দিন তলোকে একটি কিশোরী তীর্থ-যাত্রিণীকে অন্যতম মুরুব্বি চৌধুরী মেহেরবান দাসের ধর্মশালায় পৌঁছিয়ে দেয়। সেখানে চৌধুরী এবং এক সাধুর দ্বারা নৃশংসভাবে ধর্ষিতা হয়ে মেয়েটি অবশেষে মারা যায়। ধর্মশালায় এই ধরণের অনাচার অত্যাচার জেনেও মেহেরবান দাসের আদেশ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তলোকের ছিল না। কিন্তু বস্তুতপক্ষে নির্দোষ তলোকে ঐ মেয়েটির ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত ভাইয়ের হাতে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় খুন হয়। মেহেরবান দাস এবং ছেলেটি, দুজনেই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। তলোকের এই আচম্বিতে অপঘাতজনিত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কাহিনী ঘনীভূত হয়েছে।

তলোকের মৃত্যুটা রাণুকে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত করে ফেলে স্বামী হিসেবে যে খুব স্নেহ-প্রেম-মমতাময় কিংবা সমব্যথী ছিল, তা নয় ; বরং তার রুক্ষ মেজাজকে সামলে চলতে রাণু প্রায়শই হাঁফিয়ে উঠত। কিন্তু এতদিন তবু তার মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন ছিল, আশ্রয় ছিল। যে-সমাজে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রায় শূন্য, সেখানে স্বামীর রোজগারই বাঁচবার একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ—সেখানে সেই স্বামীর এভাবে আকস্মিক মৃত্যুতে অস্তিত্বের সংকট এবং জীবন সংকটই প্রবল হয়ে ওঠে রাণুর মতো অসহায় মেয়েদের ক্ষেত্রে। এই সংকট থেকে তার মুক্তির একটা উপায় বার করে গ্রামীণ মুরুব্বিরা ('পঞ্চ')—তাঁর বিধান দেন বয়সে অনেক ছোট, প্রায় কোলে-পিঠে করে মানুষ করা দেওর মঙ্গলকেই বিয়ে করে রাণুর সংসারে নিরাপত্তা আনতে।

গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষেরা সবাই একত্রিত হয়ে তার সংসারের এবং সন্তানের মঙ্গলের জন্য এই যে বিধান দেয় স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে রাণুর পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। যাকে প্রায় সন্তান-স্নেহেই লালন-পালন করেছে সে একদা তার সঙ্গে বিয়ের এই প্রস্তাব তো, তারপক্ষে অভাবনীয়, রাণু এ-বিবাহে অসম্মতি জানায় ঠিকই কিন্তু পঞ্চায়েতের মতে, একেবার একলা একটি যুবতী মেয়ে এভাবে থাকলে সামাজিক-বিপর্যয়েরই কারণ হয়ে উঠবে হয়ত সে। এখান থেকেই রাণু আর মঙ্গলের মানসিক যন্ত্রণারও সূচনা হয়। মঙ্গল ইতিমধ্যেই সালামতি নামে এক মুসলমান নারীর প্রতি প্রণয়াসক্ত। যদিও লেখক হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব দিতে চাননি। তাই মালামতির প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে পর্দায় তেমন রং ফলাতে পারেনি। রাণু এবং মঙ্গলের পারস্পরিক সম্পর্কের টানা পোড়েনে ব্যক্তি বনাম সমাজের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ধীর-ধীরে।

রাণুর বিবাহ-প্রস্তাবের পাশাপাশি তার বড় মেয়ে 'বড়ি'র বিবাহের প্রস্তাবও উঠে আসছে। তার শাশুড়ি জন্দা নাতনির জন্য পাত্র ঠিক করেছে। রাণুর তাতে সায় নেই, মেয়ের জীবনে নিজের জীবনের প্রতিবিম্ব দেখে রাণু আতংকিত। এই টানাপোড়েনের মধ্যে বিধবা বৌদিকে বিয়ে করতে ঘোরতর ভাবে অনিচ্ছুক দেওর মঙ্গলের ওপরই 'চাদর টানল' (আঞ্চলিক প্রথা এখানে বিবাহের সময় পাত্রী পাত্রের গায়ে চাদর জড়িয়ে দেয়।) নিরুপায় রাণু। গ্রামের লোকের প্রহারে প্রায় আধমরা হয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হওয়া মঙ্গল এবং কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত ও কিছুটা বিভ্রান্ত রাণুর নতুন জীবন যাত্রার সূচনা হল অতঃপর। এখানেই কাহিনির প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি।

রাণু ও মঙ্গলের বিবাহিত-জীবন শুরু হয় কিন্তু এক অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। অন্য অনেক লেখকের কলমে যে রাত্রিটির বর্ণনা নিতান্তই শরীরসর্বস্ব হয়ে উঠতে পারত, বেদী তাঁর লেখনীর জাদুতে সেই রাত্রিকে একটি সুন্দর কবিতার মতো নান্দনিক স্তরে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। কিন্তু তার পরেই তিনি কবিতা থেকে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি করেছেন তাঁর পাত্রপাত্রীদের বড়ি (এবং মঙ্গলও) এই বিয়েকে মেনে নিতে পারছে না। মঙ্গল অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, রাণুর ওপর কোনো অত্যাচার না করলেও স্ত্রীর স্বাভাবিক মর্যাদা মঙ্গল তাকে দেয়না। মঙ্গল তখনো সালামতির আতপ্ত আকর্ষণেই নিমজ্জিত। সংসারে কিছুটা নিশ্চিন্তি এসেছে ঠিকই, কিন্তু রাণুর মধ্যে স্ত্রী ও মায়ের যে 'দ্বিধা'-বিভক্ত সত্তার দ্বন্দ্ব—সেই নিদারুণ মানসিক বিপর্যয় থেকে সেও মুক্ত হতে পারছে না। মঙ্গল শীতল, নিস্পৃহ—রাণু এক তীব্র, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাময় অথচ মধুর, এক আনুভূতিতে একাকার জীবন নিয়ে হতবুদ্ধি-প্রায়!

এরপরেই মঙ্গলের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। তার মানসিক অস্থিরতা, এবং সালামতি-কেন্দ্রিক আপরাধবোধের প্রতিক্রিয়াটা আকস্মাৎই তাকে রাণুর প্রতি মনোযোগী করে তোলে সালামাতির সান্নিধ্যে তার মধ্যে যে জীবনতৃষ্ণা জেগেছে, সেই জীবনের স্বাদ এখন তাকে দিতে পারে শুধু রাণুই। রাণুর কাছেই সে পাবে চিরন্তন স্থায়িত্ব। আর রাণুর মধ্যে নীড় ও নিরাপত্তার চাহিদা তার মাতৃসত্তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। তাদের দুজনের দাম্পত্য সম্পদের পাথরটাও গলেছে একটু-একটু করে এর পরে.

লেখক নিবিড়-নৈপুণ্যে নারীর মনের জটিল সূক্ষ্ম রহস্যময়তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। মঙ্গলের আত্মবিস্মরণের তাগিদে প্রবলভাবে মাতাল হয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে রাণু জীবনে প্রথম মঙ্গলের কাছে মার

খেয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই রাণুর অনুভবের মধ্যে মৃত তলোকে আর প্রত্যক্ষ-মঙ্গাল মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই ঘটনার পরিণামে মঙ্গালের মনের মধ্যে একটা প্রবল বিবেক দংশন শুরু হয় : এত মার খাওয়া সত্ত্বেও রাণুর দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, ক্রোধ, আক্রোশ কিছুই প্রকাশ পায়নি—আর তখনই একটা বিপন্ন-বিস্ময়ের বোধ কাজ করেছে মঙ্গালের মধ্যে। সেই মুহূর্ত থেকে রাণু আর ওর পালিকা বা ধাত্রী তথা 'মা' নয় ; সে শুধুই 'বৌদি'। এরপর স্বাভাবিক ভাবেই জীবনের সহজাত অনুসূত্রে তারা সর্ববিধঅর্থে 'দম্পতি' হয়ে উঠল।

কাহিনিটি মধ্যপর্বের সমাপ্তির পর এর পরিণতি সূচিত হয়েছে দ্রুতগতিতে। কাহিনির অন্তর্লীন অবসন্নতার বাধা কেটে গিয়ে মসৃণতা এসেছে। সালামতি কাহিনি থেকে মুছে গেছে। কয়েকমাস পরে রাণুর কোলে যে-সন্তান আসছে, সেই অনাগত শিশুই তাকে আর মঙ্গালকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধতে চলেছে। মঙ্গাল বড়ির জন্য সুপাত্রের সংবাদ এনেছে সেই পাত্র আর কেউ নয়, তলোকের অনাগত মৃত্যু ঘটেছিল যার হাতে। আনিচ্ছাকৃত সেই হত্যার জন্য এখন সে অনুতপ্ত, তাই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই যেন সে কোটলা গ্রামে ফিরে এসেছে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে। রাণুর পক্ষে এও এক প্রবল যন্ত্রণার উপলক্ষ ; একদিকে স্বামীর হত্যার যন্ত্রণাময় স্মৃতি, অন্যদিকে মেয়ের জীবনে সুন্দর ভবিষ্যতের হাতছানি। শেষ পর্যন্ত তার বৃদ্ধ শ্বশুর হুজুর সিং-এর দার্শনিক-সুলভ নৈর্ব্যক্তিক একটা বিশ্লেষণ, সমবেত পরিচিত জনের অনুরোধ এবং তার মাতৃ সত্তার আকুলতার প্রাবল্য রাণুকে বিয়েতে রাজি করায়। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এক অনন্তব্যাপ্ত আস্তিক্যবাদী, আধ্যাত্মিক অণুরণনের মধ্যে। সমস্ত অসংলগ্নতা এবং জটিলতার সমাপ্তি ঘটিয়ে জীবন জয়ী হয়েছে শেষ পরিণামে।

২.৩ ঘটনাক্রমের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বিশ্লেষণ

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঞ্জাবের এক অখ্যাত গ্রাম কোটলায় তারই দারিদ্র্য পীড়িত এক পরিবারের কথা মূলত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা-কেন্দ্রিত এই উপন্যাসের পটভূমি। দারিদ্র-পীড়িত-সাংসারিক পটভূমি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন লেখক। রাণুর মনোবিশ্লেষণে লেখক এই দারিদ্র্যের পটভূমি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাননি। এক প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের 'দিন-আনা দিন-খাওয়া' অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ এ-কাহিনির চরিত্র। ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করার সুযোগ তাদের নেই ; গ্রামের মন্দির তাদের জীবিকা অর্জনের উপায় স্বরূপ। একটি কিশোরী তীর্থ যাত্রিণীকে গ্রামের ধর্মশালায় পৌঁছে দেবার পরে ধর্ষিতা হয়ে তার মৃত্যুবরণের সূত্রে গল্পের নির্মম করুণ ঘটনার সূচনা। এই প্রারম্ভিক ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই গল্পটির পরিণতি সূচিত হয়েছে।

ঐ ধর্মশালায় গ্রামের ক্ষমতাশালী লোকেদের দ্বারা নানা ধরনের কুৎসিত অনাচার হয় জেনেও, তলোকে মেহেরবান দাসের মতো রাক্ষসের কাছে মেয়েটিকে পৌঁছে দিয়েছে। কারণ মেহেরবানের মতন ক্ষমতাবান মানুষের অবাধ্য হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মেয়েটির সম্ভাব্য পরিণতি তার অজানা ছিল না—তবু দারিদ্র্যই

তাকে বাধ্য করেছে জঘন্য একাজের আনিচ্ছুক সহায়ক হতে। পরের দিন মেয়েটির ক্রোধোন্মত্ত ভাই-এর হাতে তলোকে খুন হয়ে যায়। তবুও কিছু পরে, নিজের যন্ত্রণাকে সাময়িকভাবে ভুলে মেহেরবান দাসের গ্রেফতারে রাণু আনন্দে উদ্বেল হয়। এই পরিচ্ছেদে আশুভ বোধের প্রতীক রূপে অসুর কিংবা দেবী অম্বার প্রতীক ব্যবহার খুবই ইঙ্গিতময়। এই পর্যায়ে বেদীর ঐ ইঙ্গিতময়তা, প্রতীক ধর্মিতায় একদিকে যেমন আবছায়াঘেরা এক অন্ধকারাচ্ছন্ন রহস্য রয়েছে, অন্যদিকে তেমনিই রয়েছে নিষ্ঠুর বাস্তবের উদ্‌ভাষন। এই বর্ণনার অসচ্ছ আলো-আঁধারি উপন্যাসটিকে পরিণামের আধ্যাত্মিক জটিলতার পূর্বসংকেত দিয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

স্বামীর মৃত্যুতে রাণুর জীবনে যে করুণ ও নির্মম অবস্থার সূচনা হল, তা প্রায় অবর্ণনীয়। রাণুর পারিবারিক দুর্দশা বাড়ল, সংসারের খরচ বিশেষ কমল না—তার নিজের ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার সঙ্গে-সঙ্গে তার বড় মেয়ের ভবিষ্যতের চিন্তা বাড়ল। স্বামীর সঙ্গে রাণুর সম্পর্ক বিশেষ মধুর ছিল না তবে আমাদের মতো দেশের এই ভঙ্গুর অর্থনৈতিক কাঠামোয় মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সেখানে প্রায় শূন্য সেখানে স্বামী যেমনই হোক মাথার ওপর একটা ছত্রচ্ছায়া, বলে ধার্য হয়। রাণুর মাথার ওপর সেই আচ্ছাদন ঘুচে গেছে। এতদিন কায়ক্লেশে হলেও সংসারে একটা রোজগারের উৎস ছিল, এখন তাও আর নেই। তার নিজের কোনো যোগ্যতা নেই সংসারের হাল ধরবার। রাণুর স্বামী হারানোর কান্নায় তাই দুঃখের আবেগ নয়, তার সামাজিক আবস্থানের দিকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন সমস্যা বড়িকে নিয়ে, সে যৌবন ও কৈশোরের বিপজ্জনক মধ্য পর্যায় পৌঁছেছে। এই সময়েই নানা ধরণের দুর্মর আলোছায়ার হাতছানি মনকে প্রলুব্ধ করে। প্রয়োজন হয় তখন স্নেহ-মমতার আড়াল, পিতার শাসন, মায়ের নজরদারি।

রাণুর দাম্পত্যজীবনের কোনো মধুর স্মৃতি তাকে সঞ্জীবিত করে না। তলোকের সঙ্গে তার আদৌ কিছু আবেগের সম্পর্ক ছিল না, তবু তলোকের মৃত্যু তাকে চরম বিপন্নই করেছে। সেই মৃত্যুর জন্য অকারণে তাকেই দায়ী করেছে দজ্জাল শাশুড়ি জন্দা—আসলে একটাই পরিচিত সমাজ মনস্কতা। স্বামীর মৃত্যুতে যে মেয়েটির সামাজিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, তাকেই সেজন্য দায়ী করা এই সমাজেরই রীতি। তাই তাকে এককালে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় তোলা হতো, কঠোর নিয়মরীতির জালে আবদ্ধ করা হতো। সংসারের দুর্দশার জন্য রাণুকেই জন্দা দায়ী করেছে, তার অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে। এর হাত থেকে রেহাই পেতে সে এমন কি গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করেও সংসার চালানোর কথা নিরুপায় ভাবে ভেবেছে। এখানেই মঙ্গালের সঙ্গে রাণুর বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। পাঞ্জাবে এই বিবাহ প্রথাটি 'কারিবা' নামে পরিচিত। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে এই প্রথা অসম্ভব বলে মনে হলেও গ্রামীণ ভারতবর্ষে এই প্রথার প্রচলন রয়েছে। আমাদের পুরাণেও এই প্রথার উল্লেখ রয়েছে—'সুগ্রীব-তারা'! 'বিভীষণ-মন্দোদরী'র বিবাহ-প্রসঙ্গ এই সূত্রে অবশ্যই স্মরণীয় পরাশর সংহিতাতেও পাওয়া যায় "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ" (স্বামী দুশ্চরিত্র, মৃত, নিরুদ্দেশ, ক্লীব বা সমাজে পতিত হলে) নারী পুনর্বার বিবাহ করতে অধিকারী। অবশ্য বেশী বয়সের স্বামীর তুলনায় কমবয়সী দেওরের সঙ্গে মানসিক নৈকট্য অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। আসলে রাণুর সমস্যা আন্যত্র ; সে মঙ্গালকে

প্রায় কোলে-পিঠে করেই মানুষ করেছে ; লালন-পালন করেছে। তাই সামাজিক নির্দেশে মঙ্গালকে বিয়ে করে সংসার বাঁচানোর কথায় সে বিব্রত ও বিপন্নই শুধু হয়নি মানসিকভাবে প্রবল দীর্ণতায় গ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

রাণু ও মঙ্গালের বিবাহ-প্রস্তাব গ্রামে প্রাথমিক স্তরে হালকাভাবে আলোচিত হলেও ক্রমেই তা গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রামের পঞ্চায়েতেও এপ্রসঙ্গা উত্থাপিত হয়েছে। এই উপন্যাসে যে-পঞ্চায়েত উল্লেখিত হয়েছে, তার কোনো রাজনৈতিক-ভিত্তি নেই। সেই ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারী গ্রামের প্রধান মানুষদের সমবেত মঞ্চ। এই মঞ্চ—ঈশ্বরের প্রতিনিধি 'পঞ্চ পরমেশ্বর'। (এই পঞ্চায়েতকে বিধানদাতারূপেই আমরা দেখতে পাই তারাশংকরের 'গণদেবতা'য় ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'ময়লা-আঁচল'—উপন্যাসেও)। এখানেও পঞ্চায়েতই সিন্ধান্ত নিয়েছে—রাণুকে একলা থাকতে দেওয়া চলে না, তার দায়িত্ব নিতে হবে মঙ্গালকে। একলা থাকলে রাণু ভ্রষ্ট হ'লে ? সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আবার সালামতির সঙ্গেও যেন মঙ্গালের যাতে সম্পর্ক তৈরি না হতে পারে—সেদিক থেকেও নিশ্চিন্ত হতে পঞ্চায়েতের এই রায়। এখানেই সমষ্টি বনাম ব্যষ্টি, ব্যক্তি বনাম সমাজের সংসর্গ শুরু হয়েছে।

বড়ির বিয়ের এমন একটা সম্বন্ধ নিতে এসেছে শাশুড়ি জন্দা, যেখানে সে স্বস্তি বা সম্মান কোনোটাই পাবে না। জন্দা রাণুকে রাজী করাতে অনেক মিষ্টি কথা বলেছে ; কিন্তু রাণু এ বিয়েতে রাজি নয়। এই বিয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সে মেয়ের সম্ভাব্য ভবিষ্যতে নিজের দুর্ভাগ্যেরই ছায়া দেখতে পাচ্ছে যেন। রাণুর এই মানসিকতা কোন বিরূপতার সৃষ্টি করে না।

এই পর্যায়ের শেষ দিকে রাণুর মধ্যে সহসা একটা ভাব-বৈলক্ষণ্যই যেন প্রকাশ পেয়েছে। রাণুর কথায় আচরণে ঠাঁট-ঠমক প্রকাশ পাচ্ছে। আসলে তার নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষাই তাকে মঙ্গালের সঙ্গে বিয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিরূপতা কাটিয়ে দিচ্ছে। রাণু আর মঙ্গালের সম্পর্ক এতদিন ছিল এক তরফে স্নেহের ও শাসনের, অন্যপক্ষে ভালবাসার ও মান্যতার। মানুষের মনের গভীরে কতগুলি বিশিষ্ট আবেগ ঘনিষ্ঠভাবে অলক্ষ্যে স্তরায়িত হয়ে থাকে ; স্নেহ-মায়া-মমতা শ্রদ্ধা-এই সমস্ত আবেগগুলিই প্রেমে পরিণত হতে পারে যে-কোনো সময়ে তবে তার জন্য বিশেষ কোনো একটি ঘটনার অনুষঙ্গ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। রাণুর জীবনে তলোকের মৃত্যু ছাড়াও অন্য ঘটনার ছায়াপাত আবশ্যিক সামাজিক অনুশাসন এবং নিজের ও সন্তানদের নিরাপত্তার আকুতি—এখানে সেই বিশেষ ঘটনা হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। তবে রাণু ও মঙ্গালের এই নূতন সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বানুগ 'ঈডিপাস-কমপ্লেক্স'-এর সূত্রটি প্রযোজ্য নয়, কারণ এ যাবৎ রাণুর মঙ্গালের প্রতি মনোভাবটা মাতৃতুল্য স্নেহের হলেও তাদের মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। কতকটা মায়ের মতো হলেও, সে 'মা' নয় মঙ্গালের।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :

এই অংশে মুসলিম মেয়ে সালামতি এবং হিন্দু পরিবারের ছেলে মঙ্গালের মধ্যে প্রেমজনিত পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতা পাঠককে হঠাৎ কিছুটা হতচকিত করলেও, সেটা তেমন ভাবে মূল উপন্যাস সম্পৃক্ত নয়। একমাত্র একজন পরিচিত কেউ মঙ্গালকে সালামতির সঙ্গে দেখে বিস্মিত হয়। হয়ত বা এই ঘটনাই রাণু ও মঙ্গালের বিবাহকে ত্বরান্বিত করেছে।

এই পর্যায়ে পঞ্জাবের প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় হিন্দু নিম্নবিত্তদের বিবাহের বিষয়ে বিশদ এক বর্ণনা আছে। এখানে 'আধময়লা চাদর' কথাটির ব্যবহার ত্রিমাত্রিক। প্রথমত,—এদের প্রায় সকলেরই অবস্থা এমনই দীনহীন যে বিয়ের অনুষ্ঠানেও একটু ঝকঝকে সাজগোজের আয়োজন সম্ভব হয়নি। একেবারে অসুন্দর দেখতে যে মেয়ে, তাকেও বিয়ের দিনে যথা সম্ভব সুপরিচ্ছন্ন সুন্দর পরিবেশে সুন্দর সাজসজ্জায় সাজানোর চেষ্টা করা হয়. সর্বত্রই কিন্তু এদের আর্যসামাজিক স্তরে এই আধময়লা চাদর ব্যঞ্জনায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। দ্বিতীয়ত, আমাদের সমাজ-মানসের পরোতে-পরোতে তো অজস্র ধুলোময়লাই জড়ো হয়ে আছে। সমাজের সেই গ্লানিই যেন এই বিবাহোপরারই স্বরূপ চাদরটাকে ময়লা ও জীর্ণ হয়েছে এখানে। সেই জীর্ণতাকে ঢেকে রেখেই যেন সবটুকু মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। তৃতীয়ত, রাণুর প্রগাঢ় সনস্তাত্ত্বিক সমস্যাও এর মাধ্যমে ব্যঞ্জিত। যদি রাণুর একটা অর্থনৈতিক সুস্থিতি থাকত, তাহলে সে এই অসম বিবাহে আদৌ রাজি হতো না। দেওরের সঙ্গে বিয়েটা তাদের সমাজ পরিবেশে আসম্ভাব্য না-হলেও, মঙ্গাল তো তার কাছে পুত্রবৎ। সমাজ রাণুর আর্থিক সুস্থিতির ব্যবস্থা করতে পারে না, কিন্তু তার ওপর চাপিয়ে দেয় এক অস্বস্তিকর, অনিচ্ছুক, প্রায় অসঙ্গত গাঁটছড়ার বন্ধন। এই সামাজিক আক্ষমতাতেই চাদরটি ময়লা। এর প্রত্যেকটি কারণই পরস্পর-সংপৃক্ত। গ্রামের লোকেরা আনিচ্ছুক মঙ্গালকে মেরে ধরে আধমড়া করে বিয়ের বাসরে উপস্থিত করে এবং এই অনিচ্ছার বিয়েকে কেন্দ্র করেও গ্রামের মানুষের নিরানন্দ জীবনে একটু আনন্দের ছোঁয়া লাগে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ :

রাণু ও মঙ্গালের জীবনে যে এক প্রবল পরিবর্তন ঘটেছে তারই সুসংহত পরিচয় দিয়েছেন লেখক। রাণু এখন এক নতুন পরিচয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত। এতক্ষণ সে ছিল শুধুই বৌদি ; ভগ্নী বা মাতৃ স্থানীয়া। হঠাৎ চকিতে তাকে স্ত্রীর ভূমিকায় পেয়ে মঙ্গালের মধ্যেও এক অদ্ভুত, অকল্পনীয় ভাবের মুর্চ্ছন ঘটছে। রাণুর হাতের ছোঁয়া তার কাছে পরিচিত, কিন্তু তার ব্যঞ্জনাটা পাল্টে গেছে। পুরনো সম্পর্ক ক্রমে বিস্মৃতির অন্তরালে গিয়ে একটু একটু করে প্রোজ্জ্বল হচ্ছে রাণুর বধূমূর্তি। মঙ্গাল এক অনাস্বাদিত পূর্ব অনুভূতিতে আপ্লুত। রাণু ও তার সম্পর্ক যেন এক অস্পষ্ট, আবছায়া নীহারিকার বৃত্তে ঘনীভূত হচ্ছে। তাদের দুজনের কাছেই সেই অস্পষ্টতা অমোঘ যন্ত্রনার উপলক্ষ্য কিন্তু এর থেকে মুক্তির উপায়ও তাদের নেই। রাণু নিজের মনের গভীরে তলোকের সঙ্গে দাম্পত্যস্মৃতির উপস্থিতি ভুলে এই নতুন দাম্পত্যে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। আসলে মাধুর্যহীন, প্রেমহীন প্রথম দাম্পত্যটা তার জীবনে কোনো সুখস্মৃতি রেখে যায়নি। তবে মঙ্গাল-রাণুর দাম্পত্য জীবনের প্রথম রাত্রি অন্য কোনো লেখকের লেখনীতে যে আসঙ্গচিত্রণে উগ্র হয়ে উঠতে পারত, এখানে বেদীর লেখায়

তা হতে দেখিনা। এই রাত্রিকে তিনি এক স্নিগ্ধ কবিতার স্তরে তুলে নিয়ে গেছেন। রূপকথার মতো মায়াবি এক আলোকে যেন সেইরাত্রি স্বপ্নময়।

কিন্তু এরপরেই লেখক স্নিগ্ধ কবিতা থেকে কঠিন বাস্তবের জমিনে নেমে এসেছেন। বড়ি এই বিয়ে মেনে নিতে পারছে না, সে যখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আকাশকুসুম ভাবনায় মগ্ন ঠিক তখনি তার মায়ের এই দ্বিতীয় বিয়েটা তাকে বিধ্বস্তপ্রায় করে দিয়েছে। রাণুর শাশুড়ি-শ্বশুর নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে বিয়েটাকে ; বন্ধুরা কৌতুক করছে। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছে। মঙ্গল আগের তুলনায় অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। রাণুর ওপর কোনো অত্যাচার না করলেও, স্ত্রী হিসেবে তার প্রাপ্য মনোযোগটাও দিচ্ছে না। এই অংশে সালামতি যেন রক্ত পিপাসু এক রাক্ষসীর মতো আচরণ করেছে।

এই অংশের গল্প একটু ঢিলেঢালা, কিন্তু তার ফলেই আবার উপন্যাসের রসব্যাপ্তিও ঘটেছে। ছোটগল্পের মতো দ্রুতগতি সম্পন্ন হলে উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিকাশ সর্বদা সম্ভব হয় না। তাছাড়া এর আরো একটি দিক হল—এই স্তিমিত অবস্থাটা উপন্যাসের পরিণতির সম্পর্কে আগ্রহ বাড়িয়েই দেয়। গঠন আঙ্গিকের দিক থেকেও এটি দুর্বলতা নয়, অত্যন্ত সচেতন ভাবে এই অংশটাকে শিথিলবন্ধ করা হয়েছে, যার ফলে পরে পরিণতির দ্রুততাটা ত্বরান্বিত বলেই প্রতীত হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ :

এই পরিচ্ছেদে মঙ্গালের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে দেখা যায়। সালামতির সঙ্গে দেখা করার আগে সে রাণুর জন্য চুলের ক্লিপ কিনে নিয়ে আসছে। এই 'অভাবনীয়' উপহারে রাণু প্রায় বিহ্বল ; সে কেঁদে ফেলে। তাদের সম্পর্কের পাথর গলছে একটু-একটু করে। সালামতিকে উপলক্ষ্য করেই রাণুর প্রতি সচেতন ভাবে আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়ছে মঙ্গালও। আসলে মানুষের মনে এমন সব বিচিত্র জটিল ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে যা বুদ্ধির অগম্য। সালামতি অবশ্য রাণুর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কিন্তু সালামতির সান্নিধ্যে যে-জীবনতৃষ্ণা মঙ্গালের মনের মধ্যে জেগেছে, সেই জীবনের আস্বাদন ও চিরন্তন স্থায়িত্ব সে পেতে পারে শুধু রাণুরই কাছে যে, এটা ও মঙ্গাল বুঝেছে। অর্থাৎ জীবনের পরিপূর্ণতার আস্বাদ পেতে মঙ্গালের একমাত্র অবলম্বন রাণুই, এই সত্য প্রতীত হয়েছে তার কাছে।

রাণু কিন্তু মঙ্গালের ওপর কোনোভাবে জোর করতে পারে না কারণ সে তো নিজেই জানে না, তার নিজস্ব অবস্থানটা কি ? নারীর মনের এই সূক্ষ্ম সংবেদনশীল অনুভূতির জটিলতাকে নিবিড় এবং অনুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক এই অংশে।

মদের বোতলকে উপলক্ষ্য করেই তলোকের মতো মঙ্গালের কাছেও মার খেয়েছে রাণু, এবং এই সূত্রেই তারা আবার ঘনিষ্ঠও হয়েছে শারীরিকভাবে। রাণুর ওপর নির্দয় প্রহারের প্রতিক্রিয়ার শীতলতা মঙ্গালের মনে যে-বিবেক যন্ত্রণা জাগায়, তারই ফলশ্রুতিতে এই প্রথম তারা যথা-অর্থে-দম্পতি হয়ে উঠল। এই সামগ্রিক নৈকট্যেই গল্পের বিস্তার ও পরিণতি। এখানেই মঙ্গাল তাকে শেষবার 'বৌদি' সম্বোধন করেছে। দেওর-বৌদি সম্পর্কের ওপর যবনিকাপাত হয়ে এখান থেকেই তাদের নতুন সম্পর্ক বাস্তব হয়ে উঠল।

নবম পরিচ্ছেদ :

মঙ্গল এবং রাণুর মধ্যে যে-মানসিক বাধার প্রাচীর ছিল এতদিন, এবারে তা ভেঙ্গে পড়েছে। সালামতিও এই পরিচ্ছেদেই মুছে গেল। মঙ্গলের ওপর সে প্রতিশোধও নিতে পারল না, যেমন, তেমনি আবার খানিকটা হতাশ ও নিশ্চিন্তও বোধ করেছে।

দশম পরিচ্ছেদ :

কাহিনীর মধ্যপর্ব প্রায় শেষ। তাদের সম্পর্কের মধ্যে যে-অন্তর্লীন অবসন্নতা ছিল তা এতদিনে মসৃণ হয়ে এসেছে। দুখের রাতের শেষে সুখের সূর্যের কিরণস্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্বন্ধের প্রত্যাশিত স্বাচ্ছন্দ্যে যে ব্যত্যয় ঘটেছিল তা কেটে গিয়ে পারস্পরিক নির্ভরতা এসেছে। রাণুর স্ত্রীসুলভ আবদার-অনুরোধ-শাসন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা এমন স্বতঃস্ফূর্ত, আসলে, স্বামী হিসেবে রাণুর মনে তলোকের ছায়াই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকায় অনুষঙ্গে মঙ্গলের মধ্যে তলোকের সেই ছায়াসম্পাতই রাণুকে সহজ করে দিয়েছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ :

এটি কাহিনির শেষপর্ব। সাত বছর পরের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। কোটলায় সে বছর প্রচুর যাত্রী সমাগম হয়েছে। তারই সূত্রে মঙ্গল নিয়ে এসেছে। একটা সুখবর ধরে নেওয়া যায়, কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। সেই যে-ছেলেটি উন্মত্ত ক্রোধের বশে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তলোকেকে খুন করেছিল, সে এতদিনে কারামুক্ত হয়েছে। আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়ে সে ফিরে এসেছে মঙ্গলের কাছে। তাদের যে-অপূরণীয় ক্ষতি সে করে ফেলেছে তারই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে বড়িকে বিয়ে করার প্রস্তাব রেখেছে। তাই বড়িকে কেন্দ্র করে সমগ্র পরিবারটিই একটা নতুন সুখের পরিণামের দিকে এগিয়ে গেছে। এদিকে রাণুরও সন্তান সম্ভাবনা মঙ্গলের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনকে একটি অচ্ছেদ্য-বন্ধনে পুরোপুরি আবদ্ধ করেছে। এতদিন পর্যন্তও রাণুর মধ্যে যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল সন্তানের আসন্ন আগমনের মধ্যে দিয়ে তা অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু আবারও রাণু মাতৃত্ব ও পত্নীত্বের দ্বন্দ্বে জর্জরিত, বড়ির জন্য এই যে-সম্বন্ধ একটি সুস্বচ্ছল ঘর থেকে এসেছে, তা যেন বস্তুত আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। রাণুর কাছে তা অভাবনীয় মাতৃসত্তার সুখ। আবার, এই ছেলেটিই তো তার স্বামী তলোকের হত্যাকারী। তার সমস্ত দুর্দশার কারণ। স্বামীর হত্যাকারীকে সে কীভাবে জামাই হিসেবে বরণ করে নেবে? পিতৃঘাতকের সঙ্গে কিভাবে মেয়ের বিয়ে দেবে—এখানেও তার মাতৃসত্তা ও পত্নীসত্তার বিরোধ। এ-উপন্যাসের আন্তর্গত মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যটুকু অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে। একই মানুষের মধ্যে একই মুহূর্তে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী ভাব উন্মীলন এবং সত্তার দ্বন্দ্ব উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য।

অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, যেমন—'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'গৃহদাহ' এগুলিতে বাইরের ঘটনার সংঘাতেই দ্বন্দ্ব প্রকটিত। কিন্তু এখানে বাইরের ঘটনা নয়, একটি মানুষের নিজের মধ্যেই সংঘাত ঘনিয়ে উঠেছে। রাণুর শ্বশুর হুজুর সিং-কে নতুন ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। তারই নৈর্ব্যক্তিক আধ্যাত্মিক ভাবস্পর্শে এবং বড়ির নীরব আকুলতায় রাণুর অশান্ত মন শান্ত হয়ে আসে। সে বিয়েতে সম্মতি দেয়। বড়ির

বিয়ের কথায় গোটা গ্রামই আনন্দে মেতে ওঠে। উপন্যাসের সমাপ্তি এক নিবিড় আস্তিক্যবাদী অনুভবে ও তৃপ্তিতে, যেটি লেখকের নিজস্ব দার্শনিক কোটিতে মন্ডিত হয়ে আছে।

২.৪ উপন্যাসের শিল্প আঙ্গিক : রাণু এবং মঙ্গালের সম্পর্কের স্তর-বিবর্তন

'একচাদর মইলি সি' খুবই ছোট উপন্যাস, এই উপন্যাসের পটভূমি যেমন বিরাট বিস্তৃত নয় তেমনি এখানে অজস্র চরিত্র সমাবেশও নেই। একটিমাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা তথা কেন্দ্রীয় চরিত্র রাণু। উপন্যাসের মুখ্য সমস্যা—একটি বিশেষ আর্থসামাজিক কাঠামোর সূত্রে এক অভাবী বধূর বিচিত্র জীবন চর্যা। তার ওঠা-পড়া, ভাঙ্গা-গড়ার বিচিত্র কাহিনীই এউপন্যাসের উপজীব্য। স্বামীর মৃত্যুর পর রাণুর হতদরিদ্র সংসারের হাল ধরতে সক্ষম তার দেওর মঙ্গাল। মঙ্গালকে রাণু পুত্রস্নেহে লালন পালন করেছে। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে এবং সামাজিক অনুশাসনের প্রতি দায়বধ্যতায় তাকে মঙ্গালকে স্বামী রূপে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছে। রাণুর মধ্যে মাতৃসত্তা এবং অন্যতর বোধির বিরোধ স্পষ্ট হয়েছে।

তলোকের মৃত্যুর আগেও সংসারে অভাব ছিল, দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু তলোকের মৃত্যুর পর অনিশ্চয়তা সীমাহীন হয়ে উঠল। তলোকের মৃত্যুর পর সদ্যবিধবা রাণুকে ভাবতে হয়েছে—"তোর সামনে পিছনে কেউ নেই, তুই বিধবা হয়ে গেলি-তোর রূপ তো এখন বাজারে বসার মতোও নেই। তোকে দিয়ে তো ব্যবসাও চলবে না—তোর এখন কি দাম রইল।[১] এই নির্মম বাস্তব বোধ তাকে বাধ্য করেছে পুত্রবৎ মঙ্গালকে স্বামী রূপে স্বীকৃতি দিতে। মৃত্যুর শোকের আবেগকে ছাপিয়ে গেছে বেঁচে থাকার তাগিদ। নারী জীবনের এই বঞ্চনার ইতিহাস বিমল করের 'আঙুরলতা' গল্পেও বিধৃত হয়েছে, প্রেমচন্দের 'কফন' গল্পে দারিদ্র্যের নির্মমতা জ্বলন্ত হয়ে আছে, যেখানে মৃত্যুর থেকে বড় হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার চাহিদা। তলোকের মৃত্যুতে শাশুড়ি জন্দা রাণুকেই দায়ী করল—আসলে এটাই সমাজ মনস্কতা। শাশুড়ির লাঞ্ছনা গঞ্জনা এক সময় চরমে উঠেছে। এদিকে সমাজে রাণু ও মঙ্গালের বিয়ের কথা উঠছে। পঞ্চের মতে একলা নারীর সামাজিক অবস্থানও বিপজ্জনক।

পঞ্জাবের গ্রামীণ সমাজের কোথাও কোথাও স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার প্রথাকে 'কারিবা প্রথা' বলা হয়। আমাদের পুরাণেও এর যথেষ্ট উদাহরণ মেলে যেমন—বিভীষণ-মন্দোদরীর বিবাহ প্রসঙ্গ, সুগ্রীব-তারার বিবাহ প্রসঙ্গ ইত্যাদি। পরাশর সংহিতাতেও রয়েছে—"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে",-ইত্যাদি ক্ষেত্রে "পতিরন্যো" বিধেয় বলে বিহিত আছে। ঋগ্বেদেরও একটি সূক্তের উল্লেখ করা যেতে পারে—"হে নারী তুমি তোমার স্বামীর জ্বলন্ত চিতা থেকে দেবরের হাত ধরে নেমে এসো", 'দেবর' শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এই বিবাহ প্রসঙ্গ—'দেবর' অর্থাৎ 'দ্বিতীয় বর'। প্রাচীনকালে সম্পত্তি সুরক্ষিত করতে, সম্পত্তি হস্তান্তর বা বন্টন এড়াতে এই বিবাহ প্রথা সিদ্ধ ছিল। আমাদের সাহিত্যেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। বয়সে বড় স্বামীর তুলনায় সমবয়সী দেবরের সঙ্গে মানসিক নৈকট্য সাহিত্যেও জায়গা করে নিয়েছে যেমন—'নষ্টনীড়'। কিন্তু

রাণুর মূল সমস্যা সে মঙ্গলকে সন্তান স্নেহে লালন পালন করেছে। রাণু আমাদের শরৎচন্দ্রের 'বৌদিদি'—আর এখানেই তাদের মানসিক সমস্যার সূত্রপাত।

রাণুর সমবয়সিনিরা তাকে এই বিবাহ প্রস্তাব দিতেই রাণুর দিক থেকে একটা প্রবল বাধা এসেছে—"মঙ্গল ছেলেমানুষ, ওকে আমি নিজের ছেলের মত মানুষ করেছি।... না না একথা আমি ভাবতেও পারছি না।"[২] গ্রামের পঞ্চায়েতেও রাণু-মঙ্গলের বিবাহ প্রসঙ্গ ক্রমেই গুরুত্ব পেয়েছে। মঙ্গলের সঙ্গে মুসলিম মেয়ে সালামতির সম্পর্ক গড়ে ওঠাতেও গ্রামীণ সমাজ চিন্তিত। এখানে সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও এ উপন্যাসে লেখক হিন্দু মুসলমান সম্পর্ককে তেমন গুরুত্ব দিতে চাননি। মঙ্গল এবিয়েতে রাজী নয়। রাণু এক তীব্র দোলাচলতায় আক্রান্ত। তার মধ্যে 'হ্যাঁ'-সূচক এবং 'না'-সূচক এই দুই বিরোধী আবেগের তাড়নাই কাজ করছে। রাণু একটা ঘর চায়, যেখানে সে নিজে এবং তার সন্তানেরা একটা নিশ্চিন্তির আশ্রয় খুঁজে পাবে। একটু নিরাপত্তাবোধের আশ্বাস, নীড়ের উষ্ণতার আহ্বান তাকে এই বিয়ের ব্যাপারে আর বিরূপ থাকতে দিচ্ছে না। বিয়ের দিন পলাতক মঙ্গলকে মেরে আধমরা করে বিবাহ বাসরে উপস্থিত করে গ্রামের লোকেরা। সেখানেই ঘোরতর অনিচ্ছুক মঙ্গলের ওপর চাদর টানল রাণু। এভাবেই উদ্‌ভ্রান্ত-বিভ্রান্ত রাণু মঙ্গলের বিবাহিত জীবনের সূচনা।

তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রিতেই রাণু—মা-বোন এবং বর্তমানে স্ত্রী-এই ত্রিধা সত্তায় বিভক্ত হয়ে মঙ্গলের সেবা করেছে। তাদের জীবনের এই সামগ্রিক রূপান্তর লেখক অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। মঙ্গলের কাছে এই স্পর্শ অনাস্বাদিত, অন্যদিকে রাণুর মধ্যেও এক অদ্ভুত ভাললাগা, সে নিজের অতীত অস্তিত্ব ভুলে যাচ্ছে। এই রাত্রি মান্টো বা সমরেশের কলমে অন্যমাত্রা পেত। কিন্তু ব্যঞ্জনায় ও ব্যাপ্তিতে বেদী এই মুহূর্তকে সুকবিতার স্তরে উন্নীত করেছে।

এরপরেই লেখক কবিতার স্তর থেকে বাস্তবের ভূমিতে নেমে এসেছেন। সংসার আগের চেয়ে মজবুত হয়েছে ঠিকই কিন্তু মঙ্গল এই বিয়ে মেনে নিতে পারছে না। রাণুর ওপর কোন অত্যাচার না করলেও স্ত্রীর স্বাভাবিক মনোযোগ বা অধিকার রাণু পাচ্ছে না। রাণুর এক মানসিক বিপর্যয় চলেছে—যা থেকে সে পরিত্রানের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ না পাওয়ার অনুভূতি, তারই মধ্যে মিশে আছে মাধুর্য। মঙ্গল রাণুর প্রতি শীতল ও নিস্পৃহ। সালামতির সঙ্গে তার সম্পর্ক এখনো আতপ্ত। কিন্তু এই সম্পর্কের গ্লানিবোধ তাকে অস্থির করে রেখেছে এবং তার মদ্যপানের মাত্রাও বেড়েছে।

এই গ্লানিবোধ এবং অপরাধবোধের ছায়াতেই এরপর মঙ্গলের মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেছে। সালামতিকে কেন্দ্র করেই তাদের দাম্পত্য শীতলতার পাথর গলেছে। রাণুর ক্ষেত্রে যেমন নীড় ও নিরাপত্তার চাহিদা তার মাতৃসত্তাকে আড়াল করেছে, মঙ্গলের ক্ষেত্রে তেমনি সালামতি কেন্দ্রিত অতৃপ্ত আবেগ রাণুকে অবলম্বন করতে চেয়েছে। মঙ্গলের মধ্যে যে জীবনতৃষ্ণা সালামতি জাগিয়ে তুলেছে, সেই জীবনের স্বাদ মঙ্গলকে দিতে পারে রাণু। তাই সালামতির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে রাণুর জন্য চুলের ক্লিপ কিনে এনেছে কুণ্ঠিত মঙ্গল।

মঙ্গলের মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করেই রাণু প্রথম মার খেয়েছে মঙ্গলের কাছে। একসময় তলোকের কাছেও একই কারণে মার খেয়েছে রাণু, এই মুহূর্তে তলোকে আর মঙ্গল এক হয়ে যাচ্ছে রাণুর চেতনার জগতে। মঙ্গলের কাছে বিনা প্রতিবাদে মার খাওয়ায় মঙ্গল বিস্মিত, একই সঙ্গে অপরাধ বোধে আচ্ছন্ন।

রাণুর মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, ক্রোধ, আক্রোশ কিছুই যখন প্রকাশ পেল না—তখন মঙ্গাল সেই বিপন্ন বিস্ময় বোধ কাটিয়ে মঙ্গাল রাণুর মধ্যে এক চিরন্তন নারীকে আবিষ্কার করল। যে নারী তার পালিকা-ধাত্রী নয়, যে শুধুই বউদি—"আজ তোকে ভারী সুন্দর লাগছে বউদি",—মঙ্গাল এখানেই রাণুকে শেষবার 'বউদি' সম্বোধন করেছে। তারপর জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই তারা সবার্থে দম্পতি হয়ে উঠল।

রাজিন্দর সিং বেদী এই জটিল রূপান্তরণকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে অংকন করেছেন, যার ফলে রাণু-মঙ্গালের মধ্যের সম্পর্কের দ্বিস্তরিক অভিঘাত আমাদের বাস্তবদৃষ্টি কিংবা সংস্কারকে বিঘ্নিত করে না। কোনো-কোনো আধুনিক সমালোচক (যেমন জয়রতন) রাণু-মঙ্গালের সম্পর্ককে 'ঈডিপাস-কমপ্লেক্স-এর আওতায় আনতে চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স' প্রসঙ্গ এখানে কিছুটা আরোপিত। ফ্রয়েড বলেছেন, মা ও ছেলের সম্পর্কের মধ্যে নির্জ্ঞান মনের স্তরে এই ভাবনা ক্রিয়াশীল থাকে। রাণুর কাছে মঙ্গাল একটা সময়ে সন্তান স্নেহে পালিত হলেও, বস্তুত সে তার আত্মজ নয়; তাই ফ্রয়েডীয়-তত্ত্ব এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এখানে যে বোধ সক্রিয়তা হল—মাতৃত্বের সঙ্গে অন্যান্য সত্তার সাময়িক সংঘাতের সঞ্জাত লব্ধফল। মাতৃত্ব এবং পত্নীত্ব—এই দুয়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই মূলত সর্বব্যাপ্ত এই উপন্যাসে।

২.৫ প্রতীক ও ব্যঞ্জনা এবং উপন্যাসের পরিণতিতে আধ্যাত্মিকতার অনুরণন

ছোটগল্পকার রূপে রাজিন্দর সিং বেদীর প্রতিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। ছোটগল্পের গতি এবং ব্যঞ্জনামুখ্যতা এই উপন্যাসেরও মূল সুর হয়ে বেজেছে। এই উপন্যাস বেদীর আশ্চর্য এক সৃষ্টি। বিশেষ-বিশেষ কয়েকটি ঘটনা এই উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রন করেছে, এবং দুই প্রধান চরিত্রের (রাণু ও মঙ্গাল) চেতন অবচেতনের অবিরাম টানাপোড়েন এবং তাদের মনের জটিলতম গ্রন্থিগুলিকে আলোকিত করেছেন লেখক প্রতীক ও ব্যঞ্জনায়। বেদীর রচনায় পুরাণ-প্রতীতির এবং সংকেতের ব্যবহার প্রাচুর্য এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই উপন্যাসেও সেই লক্ষণ স্পষ্ট। উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদে পরিস্থিতি ও মানসিকতা বোঝাতে লেখক সংকেত প্রতীকের সাহায্য নিয়েছেন—ক্রমানুসারে তার উল্লেখ করা যেতে পারে—

১. উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে তীর্থযাত্রিণী মেয়েটিকে মেহেরবান দাসের ধর্মশালায় পৌঁছোতে যাবার সময় মেয়েটিকে দেবী অম্বার সঙ্গে সমীকৃত করে দেখেছে। এখানে শুভ এবং অশুভ বোধ বা দুই ভিন্ন সত্তার বিরোধ এবং অশুভ শক্তির কাছে শুভ বোধের পরাভব সূচিত হয়েছে—"তলোকে আজ যে মহিলা যাত্রীটিকে মেহেরবান দাসের ধর্মশালায় পৌঁছে দিয়ে আসে, তার বয়স বড় জোর বারো কি তেরো। দেবীর কাছে তো আত্মরক্ষার জন্য ত্রিশূল ছিল। সেই ত্রিশূল দিয়ে সে অসুরদের মাথা কেটে ফেলেছিল। কিন্তু এই নিষ্পাপ মেয়েটির ছিল শুধু গোলাপী রং-এর নরম দুটি হাত। সে সেই দুটি হাত অসুরদের সামনে শুধু জড়ো করতে পারত; কিন্তু সেই হাত আত্মরক্ষায় অচল।"[১] এখানে দেবীর তাৎক্ষণিক বিপর্যয় দ্যোতিত হয়েছে।

২. উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তলোকে ও রাণুর দাম্পত্য কলহের পরিসমাপ্তি তলোকের আত্মসমর্পণে। রাত্রির অন্ধকারের এই জীবননাট্য মান্টোর হাতে যে জৈবিকতায় উগ্র হয়ে উঠতে পারত, বেদী সেই পাশবিকতাকে শুধু মাত্র সংকেতেই ধরে রাখতে চেয়েছেন—"তলোকের মাথায় তখন আজকের হাঙ্গামার চেয়ে বোধহয় মহিলা তীর্থযাত্রীর ব্যাপারটাই বেশি করে ঢুকেছিল। কারণ আজকের অন্ধকারে সে রাণুকেই তীর্থযাত্রী ভেবে, নিজে মেহের বান দাসের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।"[২] মেহেরবান দাসের ভূমিকা তলোকের মধ্যেও অসুরত্ব সঞ্চারিত হয়েছে।

৩. দ্বিতীয় অধ্যায়েরই শেষের দিকে ধর্ষিতা মেয়েটির ভাই এর অপ্রকৃতিস্থ ভয়াল রূপ আবার শুভ ও অশুভ শক্তির দ্বন্দ্বকে মনে করিয়ে দেয়। মেহেরবান দাসের মত অসুরকে হত্যা করে সে যেন দেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে—"যেন দেবী স্বয়ং ওর ওপর ভর করেছে। ওর দুটো চোখে যেন প্রতিশোধের আগুন। সেই আগুন ভরা দৃষ্টিতে সে বার বার তলোকেকে দেখছিল।"[৩] তলোকেকে হত্যা করে দেবীই যেন অসুর নিধন করলেন এরকম একটা ব্যঞ্জনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

৪. ষষ্ঠ অধ্যায়ে মঙ্গল-রাণুর বিবাহ প্রসঙ্গে আবার পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। "যেন পার্বতীকে নিতে এসেছেন শিব"[৪]—শিব-পাবর্তীর বিবাহ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখক রাণুকে দেবীর সঙ্গে একীভূত করে দিয়েছেন। উমা বা পার্বতী যেমন গভীর তপস্যায় শিবকে স্বামীরূপে পেয়েছিলেন তেমনি একটা আশ্রয় ও নিরাপত্তাবোধের জন্য 'স্বামী' নামক এক নৈর্ব্যক্তিক অথচ একান্ত বাস্তব চরিত্রের জন্য রাণুর তপস্যার নিষ্ঠা পার্বতীর কঠোর তপস্যার মতই।

৫. অষ্টম পরিচ্ছেদে রাণু-মঙ্গলের মধ্যে চূড়ান্ত অশান্তি হয়ে যাওয়ার পর, বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত রাণু মঙ্গলকে অবাক করে দিয়ে তার মদের চাটের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়েছে, তার এই প্রতিরোধহীন সহযোগিতায় মঙ্গল বিস্মিত—"মঙ্গল গ্লাসটা মুখের কাছে তুলতেই রাণু বাধা দিয়ে বলল 'দাঁড়াও' যেন ওর কিছু মনে পড়ে গেছে, রাণু বাইরে গেল, কিছুক্ষন পর যখন ফিরল তখন ওর হাতে ভাঙ্গা একটা কাঁচের প্লেট আর সেই প্লেটে টকটকে টাটকা হৃদয়ের মত একটা আট টুকরো করা টম্যাটো।"[৫] এই আট টুকরো টম্যাটো পদ্মফুলের আকৃতির দ্যোতক—মনোবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায় পদ্মফুলও নরনারীর মিলন দ্যোতক। রাণু-মঙ্গলের মিলনই যেন লেখক এই পদ্মফুলের ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন।

৬. একাদশ অধ্যায়ে লেখক মানব মনের জটিলতম অন্ধকারের দিকটি সংকেত ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করেছেন ; একই সঙ্গে এই অধ্যায়ে তিনি এক গভীর আস্তিক্যবাদী চেতনাতেও আস্থাশীলতার প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বড়ির বিয়েকে উপলক্ষ্য করে রাণুর মধ্যে নানা বিপ্রতীপ ভাব ভাবনা কাজ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তার মাতৃসত্তাই জয়ী হয়েছে। বড়ির পাণিপ্রার্থী তলোকের হত্যাকারী ছেলেটির প্রতি তার মনোভাব এক দুর্জ্ঞেয় আলো-আঁধারিতে রহস্যময়। একদিকে তার 'পত্নী'সত্তা তাকে বাধা দিচ্ছে জামাতা রূপে তার স্বামীর হত্যাকারীকে অস্বীকার করতে অন্যদিকে তার 'মাতৃ'সত্তা এই অভাবনীয় প্রাপ্তিতে আত্মহারা। এই দুয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনে শ্বশুর হুজুরসিং-এর নিবিড় ও নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিক

উপলব্ধি তাকে শান্তির ও স্বস্তির পথ দেখিয়েছে—"তোমার যে মুক্তো একবার হারিয়ে গেছে, তার সন্ধান আর কোনদিনই তুমি পাবে না," জীবন প্রবহমান অতীতকে আঁকড়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে এক অপরাজেয় শক্তি যা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই আধ্যাত্মিক অনুভবেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

৭. বড়ির বিয়েতে সম্মতি জানিয়ে রাণু মন্দির চূড়ায় 'কাটা হাত' ও 'কাটা সুত্ত'র যে দৃষ্টি বিভ্রমের শিকার হয়েছে। লেখক অত্যন্ত সচেতনতায় এই বিভ্রমের মধ্যে দিয়ে 'মানবী' রাণু এবং 'দেবী' রাণুর মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। 'মানবী' রাণুর অবচেতনের পাপবোধ তার দুর্বলতা বড়ির বিয়ের প্রাক্কালে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। এই রক্তাক্ত দৃশ্যের মধ্যে হত্যার সেই ভয়ালতা প্রতীকায়িত। আবার 'মন্দিরের ঘন্টা' এবং 'মসজিদের আজান'—এক অতীন্দ্রিয় মিলনের সুর বয়ে এনেছে, যা শেষ পর্যন্ত সমস্ত আলো-আঁধারি, যন্ত্রনা-কষ্ট অতিক্রম করে জীবনের সবুজদ্বীপে উপনীত হয়েছে।

'ময়লা চাদর'—নামকরণটিও প্রতীকধর্মী, উপন্যাসের এই নামকরণ ত্রি-মাত্রিক ব্যঞ্জনায় মন্ডিত হয়েছে। প্রথমত, রাণু যে সমাজের বাসিন্দা এবং তার অর্থনৈতিক অবস্থা এমনই করুন যে বিয়ের মত এমন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানেও একটু পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে সাজসজ্জার আয়োজন সম্ভব হয়নি। অতি দারিদ্র পীড়িত সংসারের শ্রীহীনা মেয়েটিকে ও বিয়ের দিন শ্রীময়ী করে তোলার একটা চেষ্টা থাকে, কিন্তু রাণু অর্থনৈতিক অবস্থা দরিদ্র থেকেও দরিদ্রতর তাই সে বঞ্চিত হয়েছে—আর্থসামাজিক স্তরটি ব্যঞ্জিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গোটা সমাজটাই যেন এক ময়লা চাদরের মত। সমাজের গ্লানি, শোষণ, অপরাধে চাদরটি ময়লা হয়েছে, আমাদের সমাজ মানসিকতায় সংস্কার শোষনের যে অজস্র ধুলো জমে আছে, তাকে আমরা যথাসম্ভব ঢেকে রাখার চেষ্টা করি। চাদর নামক আচ্ছাদন এই ধুলো ময়লায় জর্জরিত। তৃতীয়ত, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। রাণু-মঙ্গালের সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত। যদি রাণুর অর্থনৈতিক সুস্থিতি থাকত, তাহলে সে এই বিষম বিবাহে বাধ্য হয়ে রাজী হত না। সাধারণভাবে দেওরের সঙ্গে বিয়ে বিষম না হলেও এখানে মঙ্গাল রাণুর কাছে পুত্রবৎ। রাণুর মধ্যে মাতৃভাব ও বাৎসল্য প্রবল ছিল। সমাজ রাণুকে অর্থনৈতিক নিশ্চিন্ততা দিতে না পেরে এই অসম সম্পর্ককে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছে। সামাজিক এই অক্ষমতা এবং রাণুর অসহায়তা ও বাধ্যতাকেই 'ময়লা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এই তিনটি কারণই পরস্পর সম্পৃক্ত। তাই নামকরণই কাহিনির মূল বক্তব্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

২.৬ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. 'ময়লা চাদর' উপন্যাস অবলম্বনে রাণু ও মঙ্গালের সম্পর্কের বিভিন্নমাত্রিক বিবর্তনটি বিবৃত করুন।

২. "রাণুর চরিত্রের মূল আকর্ষণ নিহিত রয়েছে তার মনের অন্দরমহলে তার মাতৃসত্তা ও পত্নীসত্তার

দ্বন্দ্বে"—এই মন্তব্যটির যাথার্থ্য কতটা বিচার করুন।

৩. " 'ময়লা চাদর' উপন্যাসের সুকঠোর বাস্তবতার সঙ্গেই ওতঃপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে এক আধ্যাত্মিক আস্তিক্যবোধ"—আলোচনা করুন।

৪. এই উপন্যাসের নামকরণের যাথার্থ্য কতটা আছে বিচার করুন।

৫. উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণ করে, ভারতের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অসহায় অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. "প্রতীক-সংকেত প্রয়োগ এবং পুরাণ-প্রতীতির অভিব্যক্তি রাজিন্দার সিং বেদীর রচনাশৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য"—এই উপন্যাস অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৭. "মঙ্গল এই উপন্যাসের নায়কের মর্যাদা দাবী করতে পারলেও, এ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু রাণু"—আলোচনা করুন।

৮. মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস কাকে বলে? মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রূপে 'ময়লাচাদর' উপন্যাসের সাফল্য বিচার করুন।

২.৭ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. 'কারিবা' প্রথা কী?

২. বড়ির চরিত্রের গুরুত্ব এ উপন্যাসে কতটা?

৩. রাণুর শ্বশুর হুজুর সিং কীভাবে এই কাহিনির পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন?

৪. সালামতি চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা, এই উপন্যাসে কতখানি?

৫. তলোকে চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা এ কাহিনিতে আদৌ কি আছে?

৬. ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, এই উপন্যাসে গ্রাম-সমাজের ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

২.৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'নুহ' কে? এই উপন্যাসে তিনি কখন কেন উল্লেখিত হয়েছেন?

২. রাণুকে চুলের ক্লিপ উপহার দেবার তাৎপর্য কী?

৩. 'দোঁহাজন' মানে কী?

৪. জাঁহাল্লুম কে? তাকে তলোকে কী বলেছিল?

৫. 'হোলে দিলটি' কী?

৬. 'গীল্ধা' কাকে বলে?

৭. তলোকের অপঘাতমৃত্যুর পর কাদের কত বছর করে সাজা হয়?

৮. 'রঙগিজ' বলে কে, কাকে ডাকত ?

৯. 'নোহা' বলতে কী বোঝায় ?

১০. মঙ্গল তার মাকে কী বলে ডাকত ?

১১. রাণুর সঙ্গে মঙ্গলের বয়সের পার্থক্য কতটা ?

১২. 'শহেরা' এবং 'কলগি' কাকে বলে ?

একক ৩ ❑ সংস্কার : ইউ. আর. অনন্তমূর্তি

গঠন

৩.১ লেখক পরিচিতি :
৩.২ 'সংস্কার : কাহিনির উপজীব্য
৩.৩ কাহিনির অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব
৩.৩.১ প্রাণেশাচার্যের পরিপ্রেক্ষিতে
৩.৩.২ নারাণাপান্না ও তার মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে
৩.৪ উপন্যাসের ভাবরূপ এবং গঠনাঙ্গিক
৩.৫ উপন্যাসের কাহিনি পরিকাঠামোয় জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সমস্যা
৩.৫.১
৩.৫.২
৩.৫.৩
৩.৫.৪
৩.৫.৫
৩.৫.৬
৩.৬ দুর্বাসাপুরের অন্ত্যেবাসীদের জীবন :
৩.৭ দুর্বাসাপুরের প্লেগ মহামারীর চিত্রায়ণ
৩.৮ প্রাণেশাচার্যর অসহায়বোধের ছবি
৩.৯ উপন্যাসের মোড়বদল : প্রাণেশাচার্য ও চন্দ্রীর 'মানুষি দুর্বলতা'
৩.১০ প্রাণেশাচার্যর অন্তর্দ্বন্দ্ব
৩.১১ প্রাণেশাচার্যর সংস্কারমুক্তির পথে কমশপদক্ষেপ
৩.১২ প্রাণেশাচার্যর সামগ্রিক মানসিকতার রূপান্তর
৩.১৩ প্রাণেশাচার্যর আত্মবীক্ষণ
৩.১৪ সংস্কার বনাম যুক্তিবাদ বনাম ভাব-বিদ্রোহ
৩.১৫ 'সংস্কার' এবং ভারতীয় সাহিত্যের আরও দুটি মৃতদেহ-সৎকার সংক্রান্ত কাহিনী প্রাসঙ্গিক তুলনা
৩.১৫.১ অভাগীর স্বর্গ / শরৎচন্দ্র
৩.১৫.২ 'সদ্গতি' / প্রেমচন্দ
৩.১৬ 'সংস্কার' : সামগ্রিক মূল্যায়ন
৩.১৬.১ সম্পর্কের টানাপোড়েন
৩.১৬.২ চন্দ্রীর মূল্যায়ন
৩.১৭ লেখকের অভীপ্সিত তত্ত্বের মূল্যায়ন
৩.১৮ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী
৩.১৯ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী
৩.২০ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

৩.১ লেখক পরিচিতি :

একালের কন্নড় কথাসাহিত্যের অন্যতম মুখ্য লেখক হলেন ইউ. আর. অনন্তমূর্তি। তাঁর জন্ম ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। কর্মজীবনের শুরু ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে। পরে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর এবং কেরলের মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হন তিনি। সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি পদেও বৃত ছিলেন তিনি। কয়েকটি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত অধ্যাপকরূপেও তিনি গেছেন। অনন্তমূর্তির এই বইটি রচিত হয় ১৯৬৫ সালে। ঐ বছর তিনি বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মার্কসবাদ ও উপন্যাস-সাহিত্য' বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ. ডি. উপাধি পান। এ ছাড়াও তাঁর আরও দুটি বিখ্যাত উপন্যাস হল 'ভারতীপুর' (১৯৭৩) এবং 'অবস্থী' (১৯৭৮)। মোট চারখানি গল্প সংকলনও আছে তাঁর। এছাড়াও কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। 'সংস্কার' অনন্তমূর্তির সবচেয়ে বিখ্যাত বই। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ছাড়াও বিদেশি কয়েকটি ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বইটি তুলনামূলক সাহিত্যের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হয়েছে। এই বইয়ের চলচ্চিত্ররূপটি ১৯৭০ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে স্বর্ণকমল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কারও অর্জন করেছে এটি। অনন্তমূর্তির বিখ্যাত ছোটগল্প 'ঘটশ্রাদ্ধ'-ও রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে।

অনন্তমূর্তির এই বইটিকে নোবেল জয়ী ঔপন্যাসিক ভি. এস. নইপল তাঁর 'India : A Wounded Civilisation' বইতে এদেশের জনজীবনের এক অসামান্য শিল্পঋদ্ধ দলিল হিশেবে পরিচিত করেছেন। তাঁর এই বক্তব্য নিঃসন্দেহেই প্রণিধানের যোগ্য।

৩.২ 'সংস্কার : কাহিনির উপজীব্য

এই উপন্যাসের পটভূমি কর্ণাটকের উত্তরাঞ্চলের তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্তী একটি ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম, দুর্বাসাপুর। অগ্রহার গোষ্ঠীর এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সামাজিক-বিড়ম্বনারূপ জনৈক নারাণাপ্পার মৃত্যু এবং তার শবদেহ সংকারের সমস্যা নিয়ে কাহিনির কমবিবর্তন ঘটেছে। নারাণাপ্পা ব্রাহ্মণ বংশে জন্মালেও কোনও ধর্মীয়-সংস্কার মানত না ; মদ-মাংস খাওয়া, মুসলিম বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে খানাপিনা করা এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পরে চন্দ্রী নামে একটি তথাকথিত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য যুবতীকে রক্ষিতারূপে নিয়ে বসবাস করা-ইত্যাদি নানা কারণে সে স্ব-সমাজের চোখে পতিত বলে গণ্য হতো। শহর থেকে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে জীবনাবসান ঘটলে, তার অন্তিম-সংস্কার আদৌ করা উচিত কি-না এবং উচিত হলে সেটা কীভাবে সম্ভব—এই নিয়ে তার জ্ঞাতি পড়শিরা স্বাভাবিক অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করে।

গ্রামের সকলে মিলে ঐ অঞ্চলে পাণ্ডিত্য এবং ধর্মপ্রাণতার জন্য বিখ্যাত এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত প্রাণেশাচার্যর কাছে বিধান নিতে যায় ; কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনিও কোনও শাস্ত্রসম্মত সমাধান করতে পারেন না। প্রাণেশাচার্য তাঁর চিররুগ্ণা, শয্যাশায়ী স্ত্রী ভাগীরথীর সেবাযত্ন করে, পূজাহ্নিক সেরে এবং শাস্ত্র ও কাব্য পাঠ-পর্যালোচনা করেই জীবন কাটাচ্ছেন গত বিশ বছর ধরে। নারাণাপ্পার মৃত্যুর পর তার মরদেহের সংকার যাতে হয়

সেই জন্য চন্দ্রী নিজের সমস্ত সোনার গয়নাগাটি খুলে দিয়ে কাকুতি-মিনতি করে গ্রামের মানুষের কাছে। এর ফলে সমস্যা আরও বাড়ে। নারাণাপ্পার জ্ঞাতিরা ঐ গয়নার লোভে ঝগড়ায় মাতে পরস্পরের সঙ্গে। অথচ, 'অনাচারী'-র শবসংকারের 'শাস্ত্রীয়' বিধান না-থাকায় কিছুরই সমাধান সম্ভব হয় না। এদিকে মৃতদেহ পচতে শুরু করে এবং ধীরে-ধীরে দুর্বাসাপুরেও প্লেগ হানা দেয় তার সূত্রে।

আজীবন রুগ্না, শয্যাশায়িনী স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ থেকেও সহসা এক রাত্রে প্রাণেশাচার্যের পদস্খলন হয়। তাঁর মতো জ্ঞানীও এই সামাজিক জটিলতা কাটানোর কোনও পন্থা নির্দেশ করতে পারছেন না—এমনই প্রবল এক মানসিক উচাটনের মধ্যে, তাঁরই বাড়ির বাগানে আশ্রয় নেওয়া চন্দ্রীর কাছে অসহায়ভাবে তিনি একটু সহানুভূতি পেতে চেয়ে, পরিণামে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। চন্দ্রীর সঙ্গে তাঁর শারীরিক ঘনিষ্ঠতা ঘটে যায় অনিবার্যভাবেই এর ফলে। সমস্ত যৌবনকালটা রোগাক্রান্ত পঙ্গু স্ত্রীর সেবা করেই তাঁকে কাটাতে হয়েছে, তাই বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের আড়ালে যে পিপাসার্ত জৈবিক সত্তাটি আত্মগোপন করেছিল প্রাণেশাচার্যর মধ্যে, সহসাই সে ঐ রাত্রে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলে। (প্রথম পর্বের সমাপ্তি এইখানে।)

এর ফলে প্রাণেশাচার্যর অন্তরে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। চন্দ্রীকে নিয়ে সহসা ঘটে-যাওয়া এই যৌন-অভিজ্ঞতা একই সঙ্গে তাঁকে অনাস্বাদিতপূর্বক-তৃপ্তি এবং প্রবল আত্মগ্লানির টানাপোড়েনে দীর্ণ করে তুলল। ভাগীরথীরও মৃত্যু ঘটল ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই।

সকলের অগোচরে সুখে এবং বেদনায় জর্জর হয়ে চন্দ্রী তার প্রয়াত রক্ষকের পচাগলা দেহটার সংকার করে নারাণাপ্পারই এক মুসলিম সহচর আহমেদ বেরির সাহায্য নিয়ে। তারপর সেই রাতের অন্ধকারেই সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় তার নিজের গাঁয়ে ; কুন্দপুরে।

ভাগীরথীরও সংকার সারেন প্রাণেশচার্য গ্রামের লোকের সাহায্য নিয়ে। তার আগেই গাঁয়ের আরেকজন—দাসাচার্যেরও মৃত্যু ঘটেছে প্লেগে ;তারও দেহের সংকার করা হয়েছে। প্রাণেশাচার্যও গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন তবে কোথায় তাঁর গন্তব্য, সেটা তাঁরও জানা নেই। (দ্বিতীয় পর্ব এখানে শেষ হয়েছে।)

পথ চলতে-চলতে প্রাণেশাচার্যের সঙ্গে আলাপ হয় পুট্টার। যে জানায় কর্ণাটকের রক্ষণশীল সামাজিক পরিকাঠামোয় সেও অস্পৃশ্য বলে গণ্য। এই তরুণটি অতিভাষী এবং গায়ে-পড়া স্বভাবের হলেও অত্যন্ত সরলপ্রাণ। প্রাণেশাচার্যর কাছে ওর সাহচর্য প্রথমে অস্বস্তিকর বলে মনে হলেও, পরে কিন্তু ওর সারল্যের জন্যেই ওকে একটু-একটু ভালও লাগে ওঁর। প্রাণেশাচার্য যে কে তিনি সর্বজনমান্য কত বড় পণ্ডিত—এ সব পুট্টা কিছুই জানেনা। তার কাছে উনি একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ মাত্র। তাই খুব সহজেই ওঁর সঙ্গে সে মিশতে পারে। ও তাঁকে নিয়ে যায় তারপরিচিত এক বারাঙ্গনার ঘরে ;তার নাম পদ্মাবতী। তার চোখ-ধাঁধানো রূপযৌবন প্রাণেশাচার্যকে চকিতের জন্য বিভ্রান্ত করলেও, নিজেকে সামলে নেন তিনি। পদ্মাবতী নামে সেই মেয়েটির ঘর ছেড়ে তিনি ফের বেরিয়ে পড়লেন। পুট্টাও তাঁর সঙ্গ নিল যথারীতি।

একটা মন্দিরের পংক্তিভোজে অন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রাণেশাচার্য বসেন বটে পুট্টার নির্বন্ধে। কিন্তু তাঁর মনে অজস্র দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থাকে : চন্দ্রীর সঙ্গে ঐভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে পদস্খলন ঘটা ; স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়া ; ঠিক ঐ ঘটনার পরেই স্ত্রীর মৃত্যু ; পদ্মাবতীর ঘরে সাময়িক আতিথ্য গ্রহণ ; অশৌচগ্রস্ত অবস্থায় সামাজিক পংক্তিভোজনে বসা ; পরিচয় গোপন করে রাখা—এই সব নানা কারণে মনে গভীরে এক প্রবল উদ্‌ভ্রান্ততা তাঁকে গ্রাস করে

বসেছিল। ইতিমধ্যেই পরিবেশনকারীদের একজন তাঁকে চিনেও ফেলে... প্রাণেশাচার্য কোনও মতে এক ফাঁকে পংক্তি ছেড়ে উঠে পালিয়ে যান। পুট্টা বিস্মিত হয় তাঁকে ওভাবে খাওয়া ফেলে উঠতে দেখে। পদ্মাবতীর ঘরে ফিরে যাবার কথা মনে করায় সে।

প্রাণেশাচার্য সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে স্থির করেন দুর্বাসাপুরেই তিনি ফিরবেন। কিন্তু ঠিক কোন্ কারণে? তিনিও যে সামাজিক-বিচারে নারাণাপ্পার মতোই ভ্রষ্ট, ব্রাত্য—এইটে গ্রামের অগ্রহারীরা কীভাবে দেবে? সেই দোলাচল-সংশয়ের কাব্যেই চিরাভ্যস্ত সংস্কারমুক্ত মনে প্রাণেশাচার্য পথ চলতি একটি গোরুর গাড়িতে ঠাঁই করে নেন নিজের গ্রামে ফিরবার জন্য। এই খানেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

৩.৩ কাহিনির অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব

পাপ-পুণ্য, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, সামাজিক নীতিবিধান এবং তার ব্যত্যয়, ইত্যাদি নানা ধরণের সুজটিল দ্বান্দ্বিকতার টানাপোড়েনে কাহিনিটি গড়ে উঠেছে। বাসনা, কামনা, লোভ একদিকে, অন্যদিকে সংযম, আত্মগ্লানি এবং চিত্তপরিশুদ্ধি—এই সব অনুভবের অনুষঙ্গে প্রাণেশাচার্য তাঁর নিজের কাছেই আপনার পরিচয়ের সত্যস্বরূপ সন্ধান করেছেন আপন সত্তার এই অন্বেষণ এক সুগভীর সত্যকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে প্রাণেশাচার্যর নিজেরই কাছে। অস্তিত্বের এই সংকটকে অতিক্রম করতে তাঁকে খুব সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই জীবনের অনেক দুর্জ্ঞেয়তার পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। পরিণামে সংস্কারমুক্ত এক নির্মোহ মনকে খুঁজে পেয়ে আপন অস্তিত্বের অবস্থান তাঁর কাছে চিহ্নিত হয়েছে নিশ্চিত প্রত্যয়ে।

৩.৩.১ প্রাণেশাচার্যের পরিপ্রেক্ষিতে

ইউ. আর. অনন্তমূর্তির সংস্কার উপন্যাসটি শুধুমাত্র কর্ণাটকের গ্রামজীবনের প্রতিলিপি এমনটা নয়, বরং বলা যেতে পারে কর্ণাটকের পিছিয়ে পড়া মানুষের আয়নায় সমগ্র ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতিলিপি। সমাজের অমোঘ অস্তিত্ব মানুষের জীবনে। সংস্কার পরিণত হয়েছে ভ্রান্ত বিশ্বাসে। সেই বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে সংসারের আর পাঁচটা সুখ-দুঃখ নিয়ে অনায়াসে জীবন কাটিয়ে দেয় অগ্রহারের সাধারণ মানুষগুলো। ব্যতিক্রম নারাণাপ্পা এবং প্রাণেশাচার্য। নারাণাপ্পা অগ্রহারের ধর্ম বিশ্বাসী মানুষগুলোর সামনে একটা প্রশ্ন চিহ্নের মত। জীবনের সবটুকু রঙ আবছা হয়ে যাবে ধর্মের আবরণে—এই মিথ্যাচারকে নারাণাপ্পা মানতে পারেনা। অতএব বিদ্রোহী হয়। মৎস-মাংসের স্বাদ গ্রহণকরে নির্বিচারে। মদ্যপাণ করে আকণ্ঠ। অস্পৃশ্য চন্দ্রীর সঙ্গে বসবাস করে—সমাজপতিদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। তীব্র জীবনতৃষ্ণায় পান করে পৃথিবীর সব রূপ-রস-গন্ধ। দু-পায়ে মাড়িয়ে যায় দুর্বল এবং ভণ্ড ব্রাহ্মণদের ভীরু সমালোচনা। এর ঠিক বিপরীতে প্রাণেশাচার্য। আচারসর্বস্ব লোভী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আচার্যেরও দুস্তর ব্যবধান। তিনি নারাণাপ্পার মত স্বেচ্ছাচারী নন, ধর্মের অনুশাসনে কঠিন করে নিজেকে বাঁধবার চেষ্টা করেন কিন্তু মনোজগতে তাঁর প্রতিনিয়ত নানান ঘাত-প্রতিঘাত। যেসব প্রশ্ন নিজের প্রাত্যহিক কর্মের মধ্যে দিয়েই প্রাণেশচার্যর

মনে যেসব প্রশ্ন জমা হয়, নিষ্ঠাবাণ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের মধ্যে তার উত্তর খোঁজেন। সংযমের কঠিন আচারে বাঁধা তাঁর দাম্পত্য। অথচ সেটা যে অর্থহীন ছিল, সেখানে প্রাণের সাড়া ছিলনা, তা প্রমাণ হয়ে যায় চন্দ্রীর সঙ্গে শরীরী সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসের তিনটি পর্ব। প্রথম পর্ব শুরু হয়েছে প্রাণেশাচার্যের প্রাত্যহিক কর্মের মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসের শেষে আচারভ্রষ্ট প্রাণেশাচার্যের অগ্রহারে ফিরে আসার ইঙ্গিত। অগ্রহারে প্লেগ মহামারীর আকার নিয়েছে। সেই মহামারীতে মারা গেছে প্রাণেশাচার্যর স্ত্রী ভগীরথী। মারা গেছে দাসাচার্য, গুন্ড়াচার্য, পদ্মনাভাচার্যের মত ব্রাহ্মণেরা। প্লেগ রোগ বয়ে এনে ছিল নারাণাপ্পা। সে নিজেও মরেছে। নারাণাপ্পা ছিল প্রাণেশাচার্যর প্রতিস্পর্ধী। প্রাণেশাচার্যর কামনা বাসনাহীন সংযমী জীবনকে নারাণাপ্পা আত্মপ্রতারণা মনে করত। ভয় দেখাতো, সংযমের মুখোশ খুলে দেবার। জীবনকালে প্রাণেশাচার্য সে কাজে সফল হয়নি। মৃত্যুর পর নারাণাপ্পার রক্ষিতা চন্দ্রীর কাছেই কিন্তু ভেঙে গেছে আচার্যের আজীবন সঞ্চি ত সংযম। আচার্যর জীবন জিজ্ঞাসা ছিলই কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেকে মিথ্যে প্রবোধ দেবার একটা খেলা প্রতিনিয়ত তাঁর মনে মনে চলত। নারাণাপ্পা আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রায় বাঁচার অর্থ খুঁজে পায়নি। অগ্রহারের নিস্তরঙ্গ অভ্যাসনিষ্ঠ জীবনে সে নিজের ঠিকানা খুঁজে পায়নি। জীবনের চাহিদাকে মেটাতে গিয়ে সমাজকে সে অস্বীকার করেছে। প্রাণেশাচার্য নারাণাপ্পার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রেষ্ঠত্ব বোধে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন একদিন তাঁর মতো নৈতিক জীবনে টেনে আনতে পারবেন নারাণাপ্পাকে। অথচ নারাণাপ্পা তার স্বেচ্ছাচারী জীবনদর্শন নিয়েই মরেছে, বরং প্রাণেশাচার্য বিচ্যুত হয়েছেন তাঁর মতাদর্শ থেকে। দুর্গাভট্টর মত সাধুতার আড়াল রেখে এদিকে ওদিক থেকে মধু সংগ্রহের উঞ্ছবৃত্তি নয়, চন্দ্রীকে সম্ভোগ করেছেন তিনি। আর তখনই বুঝেছেন, নারাণাপ্পার মত সাহস তাঁর নেই। জীবনকে গ্রহণ করতেও পারেন না, বর্জন করার মত সত্যকার সংযমও তাঁর নেই। নারাণাপ্পা যে সত্যকে দিনের আলোর মত স্পষ্ট করে স্বীকার করত, সমাজপতিদের ভয় দেখাত তাকে সমাজচ্যুত করলে সে মুসলমান হয়ে যাবে। নিজেকে এভাবে প্রকাশ করবার সততাটুকু অর্জন করবার জন্যই প্রাণেশাচার্যের লেগেছিল একটা প্রস্তুতি পর্ব। নিজেকে আরও একটু যাচাই করে নিতে গিয়ে নিজের সত্যস্বরূপে খুঁজে পেয়েছিলেন আচার্য। অন্ত্যজ যুবক পুট্টার সঙ্গে পথ চলতে চলতে নিজেকে যতই দেখেছেন, ততই বিস্মিত হয়েছেন। মনে মনে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন নারাণাপ্পার কাছে। নারাণাপ্পা, মহাবল, ভগীরথী, চন্দ্রী, অগ্রহারের ব্রাহ্মসমাজ—সব মিলে জট পাকিয়েছে প্রাণেশাচার্যর ভাবনা। রুগ্না স্ত্রী ভগীরথীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি ছিল একটা সংযমী অভ্যাসমাত্র। যৌবনের স্বভাবধর্মকে অবদমিত করে রেখেছিলেন আচার্য—তাঁর ধর্মবোধ দিয়ে। সংস্কৃত কাব্য পড়তেন। অগ্রহারের আগ্রহী শ্রোতাদের শোনাতেন কালিদাসের শকুন্তলা। সেখানে রমণী শরীরের বর্ণনা পড়তেন আচার্য কিন্তু ভাবাবেগে আপ্লুত হতেন না। প্রাণেশাচার্যর এই অন্তরের সঙ্গে যোগাযোগহীন ধর্মাচরণ, নির্লিপ্ত সাহিত্যপাঠ যে আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র, নারাণাপ্পা খুব স্পষ্ট করেই সেকথা জানিয়ে দেয়। "আপনি পুরাণ থেকে রসালো কাহিনি শোনান কিন্তু শিক্ষা দেন কৃচ্ছ সাধনের"। নারাণাপ্পার মৃত্যু ঘটেছে কিন্তু যে প্রাণেশাচার্য জীবনের সব চাহিদাকে অবদমিত করে আত্মপীড়নের সুখে ডুবে ছিলেন, তাঁরও তো মৃত্যু ঘটেছে। চন্দ্রীর সঙ্গে সহবাসের আগে যে প্রাণেশাচার্য অগ্রহারের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, চন্দ্রীর সঙ্গে সহবাসের পর তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। চন্দ্রীর সঙ্গে সহবাসের আগে যে প্রাণেশাচার্য অগ্রহারের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, চন্দ্রীর সঙ্গে সহবাসের পর তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। প্রথম পর্বের নয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যে প্রাণেশাচার্যকে দেখা যায়, প্রথম পর্বের পরিচ্ছেদে সেই মানুষটি মরে যাচ্ছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্বে অন্য এক প্রাণেশাচার্য। যাকে পুট্টা নামের অন্ত্যজ শ্রেণীর ছেলেটি আচার্যকে পদ্মাবতী

নামের বারাঙ্গানার কাছে পৌঁছে দেয়। পংক্তিভোজনে বসে পাশের ব্রাহ্মণটি নিজের অণূঢ়া কন্যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করে।

৩.৩.২ নারাণাপ্পা ও তার মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে

এর ঠিক পাশাপাশি ঘটে যাচ্ছিল আরও একটা ঘটনা। নারাণাপ্পার শব পচে গিয়ে গোটা অগ্রহারের বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। নারাণাপ্পার শব সৎকারে করা যাচ্ছিল না। জন্মসূত্রে সে ব্রাহ্মণ। উন্মার্গগামী কিন্তু সমাজচ্যুত নয়। অধঃপতিত নারাণাপ্পা অগ্রহারের ব্রাহ্মণ সমাজে উৎপাতের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রাহ্মণরা বারবার প্রাণেশাচার্যর কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। প্রাণেশাচার্য কিন্তু নারাণাপ্পাকে জাতিচ্যুত করতে পারেননি মূলত তিনটি কারণে :

এক. নারাণাপ্পার মৃত্যুপথযাত্রী মা'র কাছে প্রাণেশাচার্য কথা দিয়েছিলেন তিনি নারাণাপ্পাকে ধর্মপথে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।

দুই. ব্রাহ্মণ শূদ্রাণী নিয়ে ঘর করতে পারে। শাস্ত্রেই তার ব্যাখ্যা আছে। শাস্ত্রের পরিভাষায় এর নাম অনুলোম বিবাহ। অতএব নারাণাপ্পা ধর্মভ্রষ্ট হয়নি। খাওয়ার বিষয়টাও শাস্ত্র অননুমোদিত নয়। শাক্তরা আমিশ খায়। প্রাণেশাচার্য শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া পথ হাঁটেন না। অতএব শাস্ত্রীয় সহায়তায় নারাণাপ্পাকে সমাজচ্যুত করতে পারেননি প্রাণেশাচার্য।

তিন. প্রাণেশাচার্য দেখেছেন মহাবলকে। ভোগসুখের মধ্যে দিয়ে জীবনকে খোঁজার ব্যাকুলতাকে এর আগেও দেখেছেন আচার্য। তাঁর জীবনেও অজস্র প্রশ্ন ভীড় করে প্রতিনিয়ত। সেকারণে অপরাধীর কাঠগড়ায় নারাণাপ্পাকে দাঁড় করাতে পারছিলেন না আচার্য। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল অবিরত।

৩.৪ উপন্যাসের ভাবরূপ এবং গঠনাঙ্গিক

উপরের উল্লেখিত বিষয় গুলির জন্যই মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে সমস্ত উপন্যাসটাই সংগঠিত হয়েছে এই সব কারণগুলির অনুষঙ্গে :

নারাণাপ্পার মৃত্যু।

প্রাণেশাচার্যর শাস্ত্র অনুসন্ধান ও হতাশা।

চন্দ্রীর সঙ্গে সহসা সম্পর্ক ঘটা—প্রাণেশাচার্য মূল্যবোধ ভাঙছেন—পথে নেমেছেন।

মনোজগতে তোলপাড়—প্রাণেশাচার্য প্রাণপণে নিজেকে সংহত করেছেন—প্রস্তুত করেছেন।

একটা শব পড়ে আছে। মড়ার জাত নিয়ে ব্রাহ্মণসমাজ উত্তাল। প্রাণেশাচার্যর কাছে তারা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনতে চায়। প্রাণেশাচার্য তন্নতন্ন করে পুঁথির পাতা খোঁজেন। বিধান না পেয়ে মারুতিদেবের মন্দিরে যান। সেখানেও স্পষ্ট নির্দেশ পাননা। ইতিমধ্যে মৃতদেহে পচন ধরে। প্লেগ রোগ ছড়াতে থাকে। ব্রাহ্মণের দল একদিকে অসহায়তায় দিশেহারা, তার ওপর একটা আতঙ্ক বিমূঢ় করে রাখে। ইঁদুরদের অস্বাভাবিক মৃত্যু একটা বিভীষিকাময় পরিবেশ তৈরী করে

দেয়। অথচ সংস্কারের প্রভাব এতটাই যে মানুষের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। যে প্রাণেশাচার্য শাস্ত্রের জটিল বিচার বিশ্লেষণ করতে সিদ্ধ হস্ত, মড়ার জাত নিয়ে তিনিও চিন্তাগ্রস্ত। আসলে সংস্কার এখানে প্রথমে ritual কিন্তু ক্রমশই তা পরিণত হয়েছে অন্ধবিশ্বাসে। একটা মৃতদেহকে ঘিরে কয়েকজন সংস্কারসর্বস্ব মানুষ। সমস্ত বিষয়টাকে রূপকাশ্রিত বলে গণ্য করে এভাবেও ভাবা যেতে পারে হয়ত বা :

মৃত দেহ = যুগার্জিত সংস্কারচ্ছন্ন

সেটিকে দাহ করা = যুগার্জিত ঐ কুসংস্কারের নির্মঞ্জন

মৃতদেহে পচন ধরে। সেই শরীরটা আশ্রয় করে কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ সমাজের যে ছবি স্পষ্ট হয়ে যায়, সেটাও পচাগলা একটা সমাজ—ঠিক নারাণাপ্পার মৃতদেহেরই মত। বরং পাশাপাশি অন্ত্যজ জীবনের যেটুকু পরিচয় দিয়েছেন অনন্তমূর্তি, সেখানে জীবনের সাড়া আছে। চন্দ্রী, বেল্লীদের মনোজগতের খবর ততটা দেননি লেখক। যেটুকু ছবি রয়েছে তা যৌনজীবনেরই মূলত কিন্তু তার মধ্যে থেকে প্রাণের সাড়া স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। বিশেষত, গ্রামের ব্রাহ্মণদের চিন্তার ধোঁয়াশা যেখানে জট পাকিয়ে, সেখানে মৃতদেহ সৎকার করে ফেলার প্রয়োজনটা চন্দ্রী অন্তত বুঝেছে। প্রাণেশাচার্যের মত শাস্ত্র জানেনা সে কিন্তু এটুকু জানে মৃতদেহে পচন ধরে পরিবেশ বিষাক্ত হচ্ছে। তার একদা ভালবাসার মানুষটির মৃতদেহ সৎকারের অভাবে বীভৎস হয়ে উঠছে। গরুড়াচার্য, লক্ষণাচার্যরা চলে যান পারিজাতপুরে। উদ্দেশ্য সেখানকার স্মার্ত ব্রাহ্মণদের কাছে নারাণাপ্পার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে দেওয়া এবং যদি কোন সমাধান সূত্র পাওয়া যায় অথবা স্মার্ত ব্রাহ্মণরা যদি মৃতদেহ সৎকারে রাজি হয়ে যান, তেমনটা চেষ্টা করা। এখানে আবার নতুন সমস্যা যুক্ত হয়। সমস্যাটা চন্দ্রীর গয়না সম্পর্কিত। চন্দ্রীর গয়না নারাণাপ্পার সৎকার সমস্যাকে একটু জটিল করে তোলে। চন্দ্রী যদিও নারাণাপ্পার সঙ্গসুখ এবং একসঙ্গে অনেকটা সময় কাটানোর জন্য যে মমত্ববোধ—এইসব অনুভূতি থেকেই গয়নাগুলো বার দিয়েছিল। একটা সরল হিসেব ছিল তার। কিন্তু ফল হয়েছিল অন্যরকম। নারাণাপ্পার মৃতদেহের সৎকার সংক্রান্ত যে সমস্যা, গয়নাগুলোকে ঘিরে সেই সমস্যার চরিত্র বদল হয়েছে।

৩.৫ উপন্যাসের কাহিনি পরিকাঠামোয় জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সমস্যা

৩.৫.১

> "শুধু প্রাণেশাচার্য বললেন—
> —তাহলে নারাণাপ্পার শেষকৃত্য কে করবেন?"

প্রাণেশাচার্যর এই প্রশ্নকে ঘিরে অগ্রহারের ব্রাহ্মণদের যে মতামত, তার মধ্যে থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় নারাণাপ্পার শেষকৃত্যের দায় নিতে প্রস্তুত নন নারাণাপ্পার নিকটজন গারুড়াচার্য, লক্ষ্মণাচার্যরা। মানবিকতার কথা তো কষ্টকল্পিত, পরিবেশ তথা গোটা অগ্রহারের ভালটুকুকেও প্রাধান্য দিতে পারেননি উপস্থিত ব্রাহ্মণরা। নারাণাপ্পার সঙ্গে সমস্তরকম সম্বন্ধসূত্র অতএব অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে গরুড়াচার্য এবং লক্ষ্মণাচার্য।

গরুড়াচার্য : "...নারাণাপ্পা নামেই জ্ঞাত। একপুরুষের নয়। অনেক পুরুষের। কিন্তু জ্ঞাত শত্রু। ...আমি তাই শপথ করেছি এ জন্মে তো বটেই বংশ পরম্পরায় আমরা ওর সঙ্গে শত্রুতা করে যাব, বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ কোনো অনুষ্ঠানেই ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না। কেউ কারো বাড়ি পাত পাড়বো না—আতিথ্যও করবো না।"

লক্ষ্মণাচার্য : "— লোকটা ছিল একেবারে কালাপাহাড়। বিয়ে করা বউকে ছেড়ে অন্য মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করতো।... নারাণাপ্পা আমার আত্মীয়। বৌয়ের মামতুতো ভাই। তাই বলে তো এসব কথা চেপে যেতে পারি না!"

● ৩.৫.২

"ব্রাহ্মণীরা বিস্ফারিত চোখে সেই স্তুপীকৃত গয়না দেখছিল। মিনসেগুলোর কথাবার্তার ধরণ ধারণ মোটেই মনঃপুত হচ্ছিল না তাদের। গরুড়ের ব্রাহ্মণী সীতা ভাবলো তার ছেলে বদ সঙ্গে মিশে মিলিটারিতে ঢুকলো তো লক্ষ্মণের কি? আবার লক্ষ্মণের ব্রাহ্মণী অনুসূয়া ভাবলো, তার জামাই বেপাত্তা হলো কি হলো না তার জন্যে গরুড়ের এতো মাথাব্যথা কেন?"

"—এ কি রকম বিধান হলো আপনাদের? সব যদি নিয়ম মতো ঘটতো তাহলে তো গয়নাগুলো আমার বোনেরই পাওয়া উচিত ছিল। কথা শেষে কেঁদে ফেললো অনসূয়া। মনে মনে স্ত্রীর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারলো না লক্ষ্মণ। কিন্তু হঠাৎ গায়ে পড়ে কোনো আগ্রহ দেখালো না। পাছে তার অভিসন্ধির আঁচ পায় কেউ।..."

"গরুড়াচার্য কিন্তু নিঃশব্দে হজম করতে পারল না ব্যাপারটা। উগ্রকণ্ঠে বলে উঠলো।—তা কি করে হয়? ধর্মস্থলের আচার্য যে বিধান দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী গয়নাগুলোর অধিকার শুধু আমার।

"তারপর একে একে গা থেকে সোনার গয়নাগুলো খুলে প্রাণেশাচার্যর পায়ের কাছে রাখল। চুড়ি, হার, কঙ্কণ। ব্রাহ্মণরা বিহ্বল। বিস্ময়াবিষ্ট প্রাণেশাচার্যও।"

● ৩.৫.৩

মূল সমস্যা, অর্থাৎ একটি মৃতদেহের সৎকার—সেটা কিন্তু অনিরসিত থেকেই যাচ্ছে। সমস্যাটির চরিত্র বদলে যাচ্ছে মাত্র। চন্দ্রীর গয়নাগুলোর প্রশ্ন সৎকারের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার পর সেইসব ব্রাহ্মণদের বক্তব্য—বিষয়ই বদলে গেছে। যারা নারাণাপ্পার সঙ্গে সমস্তরকম সম্পর্ক অস্বীকার করতে উঠে পড়ে লেগেছিল তারা নারাণাপ্পার ঘনিষ্ঠতম

আত্মীয় হওয়ার দাবী পেশ করছে— বলাবাহুল্য সামনে রাশীকৃত চন্দ্রীর গয়না। এখানে উপন্যাসের বিষয়বস্তু বদলে যেতে পারত। বাকী উপন্যাস নারাণাপ্পার মৃতদেহ সৎকারের জন্য অগ্রহারের ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেতে পারত। সেই প্রতিযোগিতার কারণে মৃতদেহটি একইভাবে পচতে পারত। কিন্তু পরবর্তী গল্প যে অন্যদিকে চলে গেছে তার কারণ প্রাণেশাচার্যর অনিবার্য প্রভাব। তাঁরই পরামর্শে অগ্রহারের ব্রাহ্মণসমাজ পারিজাতপুরে গেছে। পারিজাতপুরের স্মার্ত ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে তেমন কোন সমাধানসূত্র না পেয়েই ফিরে আসতে হয়েছে তাদের।

● ৩.৫.৪

নারাণাপ্পার মৃত্যুর পর সময় যতই এগিয়েছে, ব্রাহ্মণদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ততটাই কমে এসেছে। চক্ষুলজ্জার প্রাথমিক বাধাটুকু কাটিয়েই গরুড় আর লক্ষ্মণ সরাসরি প্রাণেশাচার্যকে জানিয়েছে তাদের অভিসন্ধির কথা। মৃতদেহ সৎকার না করতে চাওয়ার বিষয়টা অবশেষে পরিণত হয়েছে প্রতিযোগিতায়। মৃতদেহ সৎকার করার জন্য ব্রাহ্মণরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। গরুড়াচার্য নিঃশব্দে একা একা প্রাণেশাচার্যর কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে—

> "ঠাকুর! আমি না দেখলে কে দেখবে আমার শ্যামকে? কে-ই বা তাকে ছাড়িয়ে আনবে মিলিটারি থেকে? ইতিমধ্যে আমার যদি ভালো মন্দ একটা কিছু হয়ে যায়— কে করবে শেষ কাজ? তাই বলছিলুম, যদি নারাণাপ্পার সৎকারের কাজটা আমায় করতে দেন—"

লক্ষ্মণাচার্যও প্রাণেশাচার্যের কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে—

> "—আচার্য! শাস্ত্রে যদি আপত্তি না থাকে তবে নারাণাপ্পার শেষকৃত্য করতে আমারও আপত্তি নেই। সে আমার ভায়রা-ভাই। তাই না? সেক্ষেত্রে তার অন্ত্যেষ্ঠির অধিকার শুধু আমারই। না কি বলুন?"

এই গয়নালোলুপ ব্রাহ্মণদের ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রাণেশাচার্য। প্রাণপণে শাস্ত্র ঘেঁটে বিধান খুঁজে নিয়েছেন প্রাণেশাচার্য। প্রাণেশাচার্য এখানে শিশুর মত সারল্য আর ঔৎসুক্য নিয়ে পুঁথির পাতা উল্টে যাচ্ছেন—কোথায় সামাধান? কোথায় উত্তর?" প্রাণেশাচার্যর বিধান শোনার জন্য লোলুপ ব্রাহ্মণদের সংগে সংগে অপেক্ষা করেছিল আরও একজন। নারাণাপ্পার রক্ষিতা চন্দ্রী। প্রাণাচার্যর বাড়ির বারান্দায় সে অপেক্ষা করছিল। গরুড়াচার্য লক্ষ্মণাচার্যর মনে যেমন নারাণাপ্পার সৎকার নিয়ে উদ্বেগ ছিল, চন্দ্রীর মনেও তেমনি উদ্বেগ ছিল। সে উদ্বেগ অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

● ৩.৫.৫

> "কিন্তু এঁরা যদি শেষকৃত্যের বিধান না দেন! ওর আত্মার সদগতি হবে না তাহলে। পিশাচে রূপান্তরিত হবে ওর আত্মা। না না। তা সে কখনও হতে দেবে না। সে যে নারাণাপ্পার নুন খেয়েছে। কিন্তু—"

প্রাণেশাচার্য নিবিষ্ট মনে পুঁথির পাতা উল্টে চলেছেন অগ্রহারের মানুষরা যে যার ঘরে যখন একটা আতঙ্কের রাত্রি কাটাচ্ছিল। চন্দ্রী আচার্যর ব্যাকুল অন্বেষণ দেখছিল একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতা নিয়ে। দেখতে দেখতেই আর একটা অনুভূতি তাঁকে গ্রাস করছিল।

"মা বলতো—বেশ্যা যদি কোন পুণ্যাত্মার ঔরসে গর্ভিণী হয় তা হলো মহাপুণ্যফল। ঠিক তেমন পুণ্যাত্মা মানুষ প্রাণেশাচার্য। জীবনে নারীসঙ্গসুখ পেলেন না। দেহসুখ দিতে পারেন নি ব্রাহ্মণী। দেবেই বা কি করে। একখণ্ড কাঠের মতন শরীরটা তার। তবু যেন কোন আক্ষেপ নেই প্রাণেশাচার্যর। কি ক্ষমা—সুন্দর চোখের চাহনি। কেমন অনাবিল অপাপবিদ্ধ মুখের হাসি। মানুষটাকে ঘিরে যেন একটা জ্যোতির্বলয় ফুটে আছে। এমন মানুষের আশীর্বাদ পাওয়া মহাপুণ্যের। সে কি পাবে তা এজন্মে?"

● ৩.৫.৬

বস্তুতপক্ষে পরবর্তীসময়ে প্রাণেশাচার্যর সঙ্গে চন্দ্রীর যে দৈহিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছে, তার প্রস্তুতিপর্ব কিন্তু এই রাত্তিরটা জুড়েই। পুঁথিতে বিধান খোঁজায় মগ্ন প্রাণেশাচার্য—দোলাচলচিত্ত চন্দ্রী এবং শয্যাশায়ী ভগীরথী—এই তিন মানবমানবী প্রাণেশাচার্যর বাড়িতে। সমস্ত অগ্রহীর যখন একটা আসন্ন অনিবার্য বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে বিহ্বল, তখন চন্দ্রী ক্রমশই যেন প্রস্তুত হয়ে উঠছিল। প্রাণেশাচার্য বিয়ে করেছিলেন রুগ্ন ভগীরথীকে। নিষ্ঠাবান নিঃসঙ্গ মানুষটি আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন। নিজের নিস্কাম কর্তব্যপরায়ণতাকে অটুট বলে ভাবতে শুরু করেছিল। নারী-পুরুষের যে জৈবিক সম্পর্ক, তাকে অস্বীকার করে যেতে প্রাণশাচার্যও যে পারেন না, সেটা তাঁর নিজের কাছেও ধরা পড়ে গেছে। হয়তো এই অনুভূতি আচার্য দেবের কাছেও নতুন ছিল। "অন্ধকারে যুবতী নারীর সামনে এমনভাবে এসে দাঁড়ানো তাঁর উচিত হয় নি। তাড়াতাড়ি বালিশ আর কম্বল চন্দ্রীর দিকে এগিয়ে দিলেন। এগুলো রাখো। তারপর বেরিয়ে গেলেন। চন্দ্রীর যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেল। দরজায় চৌকাঠ পেরিয়ে প্রাণেশাচার্য থামলেন। ফিরে তাকালেন চন্দ্রীর দিকে। লণ্ঠনের অপ্রচুর আলোয় যুবতী চন্দ্রীকে স্ফুটনোন্মুখ কুঁড়ির মতন দেখাচ্ছিল। মেয়েটার দিকে আসতে গিয়ে চকিতে ঝলক দিয়ে উঠলো একটা নতুন চিন্তা। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে গেলেন।"—'তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে' আসার অর্থই প্রাণেশের আত্মসংযমে একটা প্রশ্নচিহ্ন।

৩.৬ দুর্বাসাপুরের অন্ত্যেবাসীদের জীবন :

অগ্রহারে ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি আর একটা মাটি সংলগ্ন মানুষের জীবনযাত্রার কথা রয়েছে। বস্তুতপক্ষে চন্দ্রী সেই সমাজ থেকেই উঠে আসা। যদিও চন্দ্রী অগ্রহারের মানুষ নয়। 'সংস্কার' এ বেল্লী, চিন্নী, ছৌ—ইত্যাদিরা অগ্রহারের অন্ত্যজ সমাজের মানুষ। ব্রাহ্মণদের মতো নিয়মের জটিলতা তাদের ছিল না। ব্রাহ্মণরা পাঁজি-পুঁথি-দিনক্ষণ মিলিয়ে জীবন নির্বাহ করে। নারাণাপ্পার শব পড়ে থাকার জন্য অগ্রহারের ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের অভুক্ত থাকতে হয়। অভুক্ত অবশ্য বেল্লীরাও থাকে কিন্তু সেটা অভাবের কারণে—অন্নের সংস্থান থাকে না বলে। অগ্রহার-ব্রাহ্মণদের 'বামুনাই' যে বস্তুতপক্ষে কতটা অন্তঃসারশূন্য, এই তথাকথিত অন্ত্যজরা তারই পরিচয় প্রকট করে দেয়।

৩.৭ দুর্বাসাপুরের প্লেগ মহামারীর চিত্রায়ণ

যে রাতে চন্দ্রী নারাণাপ্পার কথা ভাবতে-ভাবতেই নিজেকে প্রাণেশাচার্যের কাছে সমর্পণ করার জন্য হয়ত বা অজ্ঞাতেই প্রস্তুত হচ্ছিল সেই রাতের থেকেই প্লেগের সংক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল অগ্রহারে। নারাণাপ্পার মৃত্যু

ঘটেছিল প্লেগে আক্রান্ত হয়ে। মানুষ যে সংস্কারে অন্ধ হয়ে যায়, অগ্রহারের ব্রাহ্মণ সমাজ যে অন্ধ ছিল তার প্রমাণ পাবার জন্য উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত যেতে হয়না। নারাণাপ্পা যে শিমোগা শহরে গিয়েছিল সেকথা অগ্রহারের ব্রাহ্মণরা জানত কিন্তু অগ্রহারের ছোট্ট সীমাটুকুর বাইরের কোন খবর তাদের জানা ছিলনা। মঞ্জাইয়ার বাড়িতে গিয়ে নারাণাপ্পার ফুলে যাওয়ার কথা বলতেই মঞ্জাইয়া চমকে উঠেছিল। অথচ গরুড়াচার্য, লক্ষ্মণাচার্যরা এতটাই অজ্ঞ এবং অন্ধ ছিল যে একটি মারাত্মক অসুখের সংকমণ সম্পর্কে কোন ধারণাই তাদের ছিল না। বস্তুতপক্ষে নারাণাপ্পার মৃত্যুতে যে আশঙ্কা অগ্রহারের ব্রাহ্মণদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল, সেই আশঙ্কার ধার দিয়েও ব্রাহ্মণকুল যায়নি। তারা অনেক বেশী শঙ্কিত ছিল শাস্ত্রবিধি নিয়ে, নারাণাপ্পার সৎকার নিয়ে এবং চন্দ্রীর গয়না নিয়ে। অথচ এই সহজ সত্যিটা মঞ্জাইয়া বুঝতে পেরেছে প্রথমেই। পারিজাতপুরে গিয়ে ব্রাহ্মণরা মঞ্জাইয়াকে নারাণাপ্পার মৃত্যুর প্রাথমিক বর্ণনা দিতেই তাই মঞ্জাইয়া চমকে উঠেছে।

> "—ঠিক চারদিনের জ্বর। ব্যস! সব শেষ। শেষটায় শরীর ফুলে গিয়েছিল। শরীর ফুলে যাবার কথা শুনে মনে মনে শিউরে উঠলো মঞ্জাইয়া। চকিতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—শিব! শিব!"

৩.৮ প্রাণেশাচার্যর অসহায়বোধের ছবি

প্রাণেশাচার্য শাস্ত্র ঘেঁটে নারাণাপ্পার মৃতদেহ সৎকার সংকান্ত বিধান খোঁজার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন নারাণাপ্পার আচরণবিধির। প্রাণেশাচার্য আসলে বুঝতে পেরেছিলেন নারাণাপ্পার মনে সত্যি অজস্র প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গেছে। প্রাণেশাচার্য শাস্ত্রের সীমাবদ্ধতাকেও উপলব্ধি করতে পারছিলেন। প্রাণেশ যে নারাণাপ্পার মনে জমতে থাকা প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দিতে পারেননি, সে জন্য নারাণাপ্পার সামনে লজ্জিতও হয়েছিলেন। তার প্রমাণ প্রাণেশাচার্যর কুণ্ঠা। প্রাণেশাচার্য যে নারাণাপ্পাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর হতে পারেননি, তারও কারণ প্রাণেশাচার্যর কুণ্ঠা। নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে পারছিলেন না আচার্যদেব। অগ্রহারের সেই সব ব্রাহ্মণরা, যারা নারাণাপ্পার অনাচার নিয়ে কমাগত অভিযোগ করে যাচ্ছিল আচার্যের কাছে, সেইসব ব্রাহ্মণদের আসলে নারাণাপ্পার বিদ্রোহকে বোঝার কোন দায় ছিল না। নারাণাপ্পার জন্য কারো ছেলে, কারো জামাই অধঃপাতে যাচ্ছে অতএব নারাণাপ্পাকে সমাজচ্যুত করলে তাদের সমস্যা কিছুটা কমে যাবে, এমনটাই ধরে নিয়েছিল লক্ষ্মণাচার্য—গরুড়াচার্যরা।—এই সব ভাবনা ভীড় করেছে প্রাণেশাচার্যর মনে। এইসব ভাবতে ভাবতেই তিনি কমাগত পুঁথির পাতা উল্টে বিধান খুঁজে গেছেন। নিতান্তই অমনযোগের সঙ্গে প্রাত্যহিক কাজ করে গেছেন। স্ত্রী ভগীরথীকে খাইয়েছেন, তাকে প্রাকৃতিক কাজকর্মও করেছেন।

শাস্ত্রে নারাণাপ্পার সৎকার সম্বন্ধীয় কোন বিধান খুঁজে না পেয়েই কিন্তু প্রাণেশাচার্য মন্দিরে মারুতিদেবের কাছে গেছেন সমাধান চাইতে। গেছেন একটা অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে। বস্তুত পক্ষে জন্ম এবং অধ্যয়ন ও জীবিকা সূত্রে অর্জিত প্রতিটি বিশ্বাস ও সংস্কার এইভাবেই ভাঙতে শুরু হয়েছে। উপন্যাসে আচার্যের স্খলন ও বিশ্বাস—সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার যে প্রকিয়া তা এখান থেকেই শুরু। আচার্য মারুতিদেবের মন্দিরে গেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে মারুতিদেব বলে দেবেন সেই বিধান যা শাস্ত্রে মেলেনি। হতাশ হয়েছেন প্রাণেশাচার্য।

"প্রাণেশাচার্য মরিয়া হয়ে অপেক্ষা করছেন। দেবতার কৃপা কি পাবেন না তিনি? পাবেন না কোনো নির্দেশ? বিনা সৎকারে বাসি মড়া পচবে। এ কি বিষম অগ্নিপরীক্ষা তাঁর? বেশ, অন্ত্যেষ্টিতে যদি বাধা থাকে তাহলে অন্তত তোমার বাঁ দিকের ফুল ফেলে একটা নির্দেশ দাও। ঠাকুর শুনলেন না তার প্রার্থনা।"

—তবুও একথাই সত্যি যে আচার্য দেবতার নির্দেশ না পেয়ে উঠে যাননি দেবমূর্তির সামনে থেকে। প্রাণেশাচার্য উঠে গিয়েছিলেন রুগ্না স্ত্রীর কথা মনে পড়ায়। অর্থাৎ আদ্যন্ত একজন মানুষ প্রাণেশাচার্য। নিজের দুর্বলতার জন্য, অক্ষমতার জন্য অসহায় বোধ করেন প্রাণেশাচার্য। অথচ তাঁর ওপর যে বিশ্বাস ও আস্থা অগ্রহারের ব্রাহ্মণদের ছিল, তাতে তিনি অনায়াসে মিথ্যাচার করতে পারতেন। আচার্যর যতই শাস্ত্রজ্ঞান থাক, আসলে তিনি যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তার যুক্তি দিয়েই বুঝেছিলেন মানুষের জীবনকে শুধুমাত্র শাস্ত্র দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না।

৩.৯ উপন্যাসের মোড়বদল : প্রাণেশাচার্য ও চন্দ্রীর 'মানুষি দুর্বলতা'

হতাশ প্রাণেশাচার্য মারুতিদেবের কাছে কোন সমাধানসূত্র না পেয়ে যখন মন্দির থেকে ফিরে আসছিলেন তখনই চন্দ্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। চন্দ্রী আহ্বান করেছে আচার্যদেবকে। যুবতী নারীর সেই আহ্বানকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি প্রাণেশাচার্যর। এক তীব্র শরীরী অবেগ নিয়ে মিলিত হন চন্দ্রীর সঙ্গে। তবুও অনুভূতিহীন সেই সংসর্গ নয়। এক বিচিত্র বোধে আক্রান্ত হন আচার্য। একদিকে উপোসী—ক্ষুধার্ত শরীরের আগ্রাসী আক্রমণ, অন্যদিকে অর্জিত ও চর্চিত ধর্মবোধ। যে ধর্ম তাঁকে শিখিয়েছে স্ত্রী ব্যতীত অন্য সব নারীকে মাতৃসমা ভাবতে। শরীরী সুখের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিলেন প্রাণেশাচার্য। ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে মৃতদেহ সৎকার না হওয়া পর্যন্ত অভুক্ত থাকতে হয়েছিল তাঁকে। তথাকথিত নীচুজাতের মেয়ে চন্দ্রীর কিন্তু সেই সমস্যা ছিল না। নারাণাপ্পার মৃত্যু তাঁকে নিরাশ্রয় করেছে—ব্যথিতও হয়েছে সে কিন্তু খিদে পেলে স্বচ্ছন্দে আচার্যদেবের বাগানে গিয়ে কলা পেড়ে খায় :

"প্রাণেশাচার্যর উঁচু বারান্দায় একা বসেছিল চন্দ্রী। চোখে ঘুম নেই। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। জীবন কখনো সারাবেলা এমনভাবে অভুক্ত কাটায় নি সে। উপবাস তার কাছে আত্মপীড়ন ছাড়া কিছু নয়..."

—এ হেন চন্দ্রী শুধু শরীরী সুখই দেয়নি, যত্ন করে কলা খাইয়েছে কোলের ওপর শুইয়ে। ঠিক মায়ের মত করেই। সমস্ত অনুভূতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েই 'তখন অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আচার্য।

৩.১০ প্রাণেশাচার্যর অন্তর্দ্বন্দ্ব

উপন্যাসের প্রথম পর্বের প্রাণেশাচার্যর সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের প্রাণেশাচার্যর বিরাট পার্থক্য। যেন জাদু ঘুম ভেঙে উঠে দেখেছেন তিনি নারাণাপ্পার রক্ষিতা চন্দ্রীর কোলে শুয়ে আছেন তিনি। শরীর ও মনের ক্ষুধা মিটেছে তাঁর। তারপর অনিবার্য অবসন্নতায় তলিয়ে গেছেন। জেগে উঠেছেন আর একটা জীবন নিয়ে—পুনর্জন্ম হয়েছে তাঁর।

মনে পড়ে গেছে ভগীরথীর কথা। কর্তব্যের অবহেলা করেছেন তিনি। হয়ত বা জীবনে এই প্রথমবার। এতদিন রুগ্না স্ত্রীর সেবা করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন তিনি। ভালবাসা ছিলনা সেই সম্পর্কে। চন্দ্রীর সঙ্গে সহবাসের পর তিনি বুঝতে পেরেছেন সেই জীবনের অর্থহীনতা। বস্তুতপক্ষে চন্দ্রীর সঙ্গে একদিনের শরীরী সংযোগ আচার্যের মনকে এতখানি নাড়া দিয়েছিল যে তার বিচ্ছেদ ভেবে বিষণ্ণ হচ্ছিলেন তিনি ঃ

"...তাঁর জীবনে এসে পড়েছে এই দুই নারী। এরা দু'জনেই যদি ছেড়ে চলে যান তাঁকে? শূন্যতাবোধে ছেয়ে গেল আচার্যর মন। মনে হলো তিনি বোধহয় অসহায় হয়ে পড়বেন।" কাম-ক্রোধ-সমস্ত-কিছুকে জয় করে জীবনের সাধনায় অনেকখানি এগিয়ে তিনি। কিন্তু সে যে এক ভ্রান্ত অভিজ্ঞতা ছিল, তা প্রমাণ হয়ে যেতেই এক অচেনা প্রাণেশাচার্য বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর উপলব্ধির জগৎটাই বদলে গেছে :

> "নিজের অজান্তেই ইচ্ছে আর কামনার বিরুদ্ধে চলবার চেষ্টা করেছি। জোর করে কৃচ্ছসাধন করেছি। দেহ-সুখ থেকে বঞ্চি ত করেছি নিজেকে। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রীর মধ্যেই মুক্তি পেয়েছে আমার কামনা।"

সেই 'মুক্তি'র স্বাদ পেয়েছেন বলেই আশ্চর্য আর নারাণাপ্পার সৎকার না হওয়া মৃতদেহ নিয়ে নতুন কোন ভাবনার পথে পা বাড়াননি।

৩.১১ প্রাণেশাচার্যর সংস্কারমুক্তির পথে ক্রমশপদক্ষেপ

'সংস্কার' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব আসলে প্রথম পর্বের ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতিক্রিয়া মাত্র। উল্লেখ করা যেতে পারে আচার্যের স্ত্রী ভগীরথী মারা গেছেন প্লেগে। আসলে এভাবে মারা না গেলেও প্রাণেশাচার্যের যে পরিবর্তন এখানে ঘটেছে সেই পরিবর্তনের ফলে প্রাণেশাচার্যর কাছে ভগীরথী মৃত সত্তা। তবুও অনস্বীকার্য যে প্রাণেশাচার্যের কাছে ভগীরথীই ছিল একমাত্র বন্ধন। আচার-বিচার-অন্যায়-অশাস্ত্রীয় ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণাগুলো উল্টেপাল্টে গিয়ে যখন একটা নতুন পথের আলো দেখতে পাচ্ছেন প্রাণেশাচার্য, তখন ভগীরথীর মৃত্যু অবশ্যম্ভবী।

উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে অন্য এক প্রাণেশাচার্যের গল্প রয়েছে। প্রথম পর্বে যে আচার্য তথা অগ্রহারের ব্রাহ্মণ সমাজ নারাণাপ্পার সঙ্গে তথাকথিত নীচু জাতির মেয়ে চন্দ্রীর সম্পর্ক নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সেই আচার্যই তৃতীয় পর্বে গিয়ে পুট্টার সঙ্গে পথ-পরিক্রমা করেছেন। পথে বেরিয়ে আচার্য নতুন করে চিনতে পেরেছেন নিজেকে। বুঝেছেন এতকাল তাঁর সবটুকু পূর্ণ ছিল মিথ্যে অভিমানে। কিছু শেখানো শাস্ত্রবাক্য দিয়ে দেবতাকে ভোলাতে গিয়ে শুধু নিজেকেই ভুলিয়েছেন।

> "আচার্যর মনে হলো এতদিন ধরে তিনি শুধু পণ্ডশ্রমই করেছেন। তোতা পাখির মতন শেখানো বুলি আওড়েছেন অভ্যাসের বসে। কোনো স্থির প্রতীতি ঈশ্বর সম্বন্ধে হয়নি।"

আত্ম প্রবঞ্চনা করেছেন শাস্ত্রজ্ঞ প্রাণেশাচার্য। এতকাল ধরে শুধুমাত্র নিজেকে ভুলিয়েছেন তিনি। 'ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়ার পিছন হতে' শুধুমাত্র সংস্কারকে আঁকড়ে মিথ্যের সাধনা করে গেছেন। প্রাণেশাচার্য বুঝতে পারছেন কিন্তু সংস্কার ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া এত সহজে শুরু হয়নি। জন্মার্জিত সংস্কার ভেঙে বাইরে এসে

সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মত মনের জোর নারাণাপ্পার ছিল। সে মদ খেতো মাংস খেতো—সে সব কথা গোপন করবার কোন ইচ্ছেই তার ছিল না। অগ্রহারের ব্রাহ্মণ সমাজে নারাণাপ্পা একটা ঝড়—একটা উল্কার মতন নিয়মহীন গতিবেগ। নারাণাপ্পা চন্দ্রীর সঙ্গে বসবাস করতে পারে। সেকথা কাউকে বলতে তার কোন দ্বিধা নেই। প্রাণেশাচার্য স্পষ্ট বুঝতে পারছেন সংস্কারের অর্থহীনতাকে কিন্তু দুর্বল তিনি। বুঝতে পারছেন—'এতদিন শুধু ভাবের ঘরে চুরি করেছেন। কি পেয়েছেন? শুধু নিজেই ঠকেছেন।'—অথচ এত কিছুর পরেও পুট্টা যখন তাঁকে চলকলা বাঁধা একজন সাধারণ পুরোহিত ভেবেছে, তিনি অভিমান করেছেন :

"তাই লোকটার প্রশ্নে আত্মাভিমান আহত হলেও ধীরে ধীরে বললেন—হুঁ।"

৩.১২ প্রাণেশাচার্যর সামগ্রিক মানসিকতার রূপান্তর

পুট্টার সঙ্গে পথ পরিক্রমা আসলে একটা গোটা জীবন পার হয়ে হেঁটে চলে আসা। যে জীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে সংস্কার রয়েছে। তবুও সহজ নয় বলেই যখনই কোন মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে গেছেন।

গ্রামের একজন লোকের কাছে শুনেছেন শেষাপ্পা সেই গ্রামে আছে। প্রাণেশাচার্যর প্রতিক্রিয়া : "শেষাপ্পা এখানে আছে শুনে অব্দি অশান্তি ভোগ করছিলেন প্রাণেশাচার্য। এখানে এই অবস্থায় শেষাপ্পার মুখোমুখি হতে চান না তিনি।"

"আগেই হাঁটতে শুরু করেছিলেন। এবার পথ চলা ত্বরিত হলো। হঠাৎ মনে হলো কেউ তাঁকে পিছন থেকে অনুসরণ করছে। একজোড়া অনুসন্ধিৎসু চোখের দৃষ্টি সেঁটে আছে তাঁর পিঠের সঙ্গে। মনে মনে অস্বস্তি বোধ বেড়ে গেল। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল পিছন ফিরে দেখেন। কিন্তু সাহস হলো না। যদি মানুষটা চেনা হয়।"

"প্রতি মুহূর্তেই তাঁর ভয়—এই বুঝি কেউ চিনে ফেলে বেদান্ত দর্শনের মহামান্য পণ্ডিত প্রাণেশাচার্যকে। এইরকম একটা অশুচি পরিবেশে তাঁকে কফি খেতে দেখলে লোকে না জানি কি ভাববে। হয়ত আঁতকে উঠবে।..."

"জলে নেবে রুট্টাও তখন হাত পা ধুচ্ছিল। তাকে দেখে হঠাৎই একটা ভয় পেয়ে বসল প্রাণেশাচার্যকে। মেল্লীগের মানুষেরা তাঁকে চিনে ফেলবে না তো?..."

"প্রাণেশাচার্য জানেন তেমন সাহস, আত্মবিশ্বাস তাঁর নেই। ওইরকম কিছু ঘটে গেলে তাঁকে মুখ লুকিয়েই থাকতে হবে। একটা ঘেন্না দলা পাকিয়ে উঠলো গলার মধ্যে। থু করে থুথু ফেলে তিনি যেন নিজের প্রতি ধিক্কার জানালেন।"

"এখন যদি সবাই তাঁকে চিনে ফেলে। আঙুল দেখিয়ে বলে এই সেই লোক।"

"ব্রাহ্মণের প্রায় পিছু পিছু এসে পড়লো পরিবেশনকারী। প্রত্যেক পাতে একহাতা করে পায়েস ঢেলে দিয়ে গেল। তার পেছনে বলিষ্ঠ চেহারার আরও দু'জন পরিবেশনকারী। একজন আনছে ভাত। আনতে আসতেই আসতেই চেঁচাচ্ছে—সরো। পথ ছাড়! পরের পদ শশা আর মসুরের স্যালাড। একজন করে আসছে আর আচার্যর মনে আতঙ্ক হচ্ছে। এই লোকটা যদি চিনে ফেলে আমায়? কি করব তখন?"

এইভাবে শঙ্কিত হতে হতেই প্রাণেশাচার্য খুঁজে পেয়েছেন বিদ্রোহ করবার শক্তি। যে শক্তি মহাবলের ছিল, নারণাপ্পার ছিল। চন্দ্রীর সঙ্গে সহবাসের পরেই প্রাণেশাচার্য চন্দ্রীকে বলেছিলেন, অগ্রহারের ব্রাহ্মসমাজের কাছে সে যেন সমস্ত কথা স্বীকার করে—প্রাণেশাচার্যর সামনে দাঁড়িয়ে। অথচ যখন লক্ষ্মণ, গরুড়দের মুখোমুখি হলেন, ভয়ে কণ্টকিত হয়েছিলেন তিনি। চন্দ্রী কোন কথা না বলায় স্বস্তি বোধ করেছিলেন। মহাবল অথবা নারাণাপ্পার মত সত্যি কথা স্পষ্ট ঘোষণা করে বাঁচার জন্য যে মানসিক জোর প্রয়োজন ছিল তাঁর, সেই জোর সংগ্রহ করেছেন পথ চলে। উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায় জুড়ে তারই প্রস্তুতিপর্ব।

৩.১৩ প্রাণেশাচার্যর আত্মবীক্ষণ

প্রাণেশাচার্য এ কাহিনীর নায়ক যিনি একজন নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ, মান্য পণ্ডিত। তাঁর সংস্কার মুক্ত হয়ে ওঠাই 'সংস্কার' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। আরও একটা উল্টো স্রোত কিন্তু চলছিল—সংস্কার অন্ধ সমাজের বিপ্রতীপে। তারা মহাবল—নারাণাপ্পারা। শ্রীপতির মত যুব সমাজ আস্তে আস্তে ঝুঁকছিল যাদের দিকে। মহাবল বা নারাণাপ্পা দুজনেই কিন্তু তাদের জীবনদর্শনের কথা অকপটে জানিয়েছে। তারা সামাজিকতার-নীতিনিষ্ঠের মুখোশ পরে তার আড়ালে ব্যাভিচার করেনি। বস্তুতপক্ষে তেমন ব্যাভিচারে সমাজের আপত্তি থাকেনা। প্রমাণ (১) নারাণাপ্পার সৎকার প্রশ্নে দুর্গাভট্ট বলে : "আমাদের যাঁরা পূর্বপুরুষ তাঁরা সবাই এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে। এখানে এসে দ্রাবিড় মেয়েছেলে নিয়ে দিব্যি কাটালেন। ভেবো না আমি মজা করবার জন্যে বলছি। দক্ষিণ কানাডার বাশ্রুরের বেশ্যালয়ে তো অনেকেই যায়।

(২) নারাণাপ্পার সৎকার নিয়ে যখন প্রাণেশাচার্যর বাড়িতে ব্রাহ্মণরা বিতর্কে উত্তাল তখন : "দুর্গাভট্টের কাছে সমস্যাটা একেবারেই অন্যরকম। অবিচলিতভাবে নিজের জায়গায় বসে সে লুকিয়ে লুকিয়ে চন্দ্রীকে দেখছিল।"

(৩) গরুড়াচার্য লুকিয়ে চুরিয়ে কামিনদের বুকে হাত দিত। তাতে কিন্তু যায় আসে নি। তার জন্য তাকে একঘরেও হতে হয়নি, তাকে নিয়ে কোন প্রশ্নও ওঠেনি।

(৪) প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লী সমাজ' উপন্যাস থেকে দুটো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সেখানে কুঁয়াপুর গ্রামের যারা সমাজপতি, সেই গোবিন্দ গাঙ্গুলি, বেণী ঘোষালের যে বিধবা ভ্রাতৃবধূ—ইত্যাদির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল, সেটা কিন্তু গ্রামের কারো অজানা ছিল না। সেই নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি কেননা 'ব্যাটাছেলের একটু আধটু দোষঘাট' নিয়ে সমাজের ততক্ষণ মাথাব্যথা থাকে না যতক্ষণ সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার দিকে সে আঙুল না ওঠায়।

এখানে গরুরাচার্য বা গোবিন্দ গাঙ্গুলি বেণী ঘোষালদের চেয়ে নারাণাপ্পার অবস্থান এখানেই আলাদা যে নারাণাপ্পা তার ভোগবাসনাকে লুকিয়ে ফেলে সামাজিকতার মুখোশ পরতে চায়নি। পতিতালয়ে লুকিয়ে চন্দ্রীদের মত কোন নিম্নবর্ণের মানুষীর কাছে গেলে সমাজ তাতে ভ্রুক্ষেপ করত না। নারাণাপ্পা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এই সমাজব্যবস্থাকে যেখানে কৃচ্ছসাধনের নামে মানুষ আত্মপীড়ন করে অথবা নিজেকে ভোলায়—প্রাণেশাচার্যর মত।

৩.১৪ সংস্কার বনাম যুক্তিবাদ বনাম ভাব-বিদ্রোহ

উনিশ শতকের যে যুক্তিবাদী আন্দোলন বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কারকে ভাসিয়ে দিয়েছিল, সেখানে ডিরোজিও প্রভাবিত ইয়ং বেঙ্গলের ভূমিকাও কিন্তু বিতর্কিত ছিল। সেখানে ঠিক নারাণাপ্পার ঢঙেই তরুণ তুর্কীর দল উত্যক্ত করতে শুরু করেছিল ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের। ব্রাহ্মণদের তারা বাড়ির ছাদ থেকে চিৎকার করে বলত 'আমরা গরু খেয়েছি গো'। ঠিক সেই ভাবেই নারাণাপ্পা আক্রমণ করেছে প্রাণেশাচার্য তথা অগ্রহারের ব্রাহ্মণ সমাজকে।

"আচার্য বোঝাবার চেষ্টা করলেন।—তোমার জীবন নিয়ে যা খুশি করো না কেন! কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু ছেলেগুলোকে নষ্ট করছো কেন?

> —নষ্ট ওরা নয়। নষ্ট আপনারা। এখানকার এই ব্রাহ্মণসমাজ। গরুড়ের কথাই ধরুন। বলুন, বিধবার সম্পত্তিও হাতিয়েছে কিনা। তবুও নাকি ওটা বামুন। যেহেতু ওর বৃত্তি হলো বামুনের। লাথি মারি অমন বামনাই গিরির মাথায়। তার চেয়ে বরং মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করবো—সেও ভালো। তবু ওসব বামনাই গোঁড়ামি আমি মানতে পারবো না। যাক, আমায় আর উত্তেজিত করবেন না। হয়ত আপনার সম্মান রেখে কথা বলতে পারবো না। আপনি বরং এখন যান। মোটকথা আপনাদের সঙ্গে আমার বনবে না। যদ্দিন বাঁচবো ওই ভণ্ডামির সঙ্গে লড়ে যাব। দেখা যাক কে জেতে—আমি না আপনারা।"

অতএব নারাণাপ্পা যে সমাজকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছিল খুব সচেতনভাবেই, সেকথা নিজের মুখেই স্বীকার করেছে। যেখানে সাহিত্য, শাস্ত্র সবেতেই যৌনতার ছড়াছড়ি সেখানে মানুষকে বীতকাম হবার উপদেশ কেমন করে দেওয়া হয় সেই প্রশ্নও তুলেছে নারাণাপ্পা। আচার্যের কাছে নীতিপাঠ নিতে গিয়েই যে তার রক্তে আগুন লেগেছিল, সেকথা আচার্যকে জানিয়েছে নারাণাপ্পা। অতএব নারাণাপ্পা শুধুমাত্র একজন অনাচারী যুবক এমনটা ভাবলে তার ভুল মূল্যায়ন হবে। নারাণাপ্পা শুধুমাত্র বিপথগামী হলে অগ্রহারের ব্রাহ্মণসমাজ এত বিচলিত হত না। নারাণাপ্পা আসলে ভণ্ড সমাজের দিকে আঙুল তুলেছিল বলেই তাকে পতিত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণরা। যদিও সেই জোর স্বয়ং প্রাণেশাচার্যেরও ছিল না। নারাণাপ্পা প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল শ্রীপতিদের মত যুবকদেরও। লক্ষ্মণাচার্যের কৃপণতা, গরুড়াচার্যের মত উঞ্ছবৃত্তি আর ব্রাহ্মণদের বর্ণহীন জীবনের বাইরে, পারস্পরিক লড়াইয়ের বাইরে একটা জীবন খুঁজছিল শ্রীপতি-নারাণাপ্পারা।

৩.১৫ 'সংস্কার' এবং ভারতীয় সাহিত্যের আরও দুটি মৃতদেহ-সৎকার সংক্রান্ত কাহিনির প্রাসঙ্গিক তুলনা

ইউ. আর. অনন্তমূর্তির 'সংস্কার' উপন্যাসের মূল সমস্যা নারাণাপ্পা এবং নারাণাপ্পার মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ সৎকার সংক্রান্ত নানান জটিলতা। শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা না মেলায় পচছিল এক পথভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের মৃতদেহ। প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল নারাণাপ্পা। সেই মৃতদেহ থেকে দূষিত হয়েছিল সারা অগ্রহার। মূল বিতর্ক ছিল নারাণাপ্পার ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে। নারাণাপ্পা ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি ভেঙে মাছ খেত, সে চন্দ্রীর মত একজন নীচুবর্ণের মেয়ের সঙ্গে প্রকাশ্যেই বসবাস করত, মদ্যপান করত আকণ্ঠ। অথচ শাস্ত্রমতে তাকে পতিত করা হয়নি। অথবা বলা ভাল তাকে পতিত করা যায়নি। তার বিপুল প্রাণ শক্তি আর সাহসের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন স্বয়ং প্রাণেশাচার্যও। অতএব একজন ব্রাহ্মণের শব সৎকার করার কথা ব্রাহ্মণদেরই। আসলে অনাচারী ব্রাহ্মণদের নিয়ে কোন সুস্পষ্ট শাস্ত্রীয় নির্দেশ নেই। ভারতবর্ষে যেখানে জাতপাত নিয়ে সমাজের মাথাব্যথার শেষ ছিল না, সেখানে মৃতদেহ সংক্রান্ত সমস্যা যে বারেবারেই এসেছে, কথাসাহিত্যে তার প্রমাণ আছে। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ' এবং প্রেমচন্দের 'সদ্‌গতি'—গল্পদুটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

৩.১৫.১ অভাগীর স্বর্গ / শরৎচন্দ্র

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে ঠাকুরদাস মুখুজ্যের স্ত্রীর দাহকার্য দেখে অভাগীর সাধ হয়েছিল রথে চড়ে স্বর্গে যাওয়ার। সেই ইচ্ছে নিয়েই হতভাগ্য এই নিম্নবর্ণের মেয়েটির মৃত্যু হয়েছিল। একমাত্র ছেলে কাঙালীচরণকে জানিয়ে গিয়েছিল সেই সাধের কথা।

"বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকার কেবল রুগ্ন-মাতার গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশান যাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা-দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া! কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তার পরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন নয় কাঙালী, সেই ত হরি। তার আকাশজোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই স্বর্গের রথ। কাঙালীচরণ, বাবা আমার।

— কেন মা?

— তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুনমার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

— কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বলতে নেই।

— মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটজাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবে না— দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস্! ছেলের হাতের আগুন—রথকে যে আসতেই হবে।"

অভাগী এতসব স্বপ্ন বুকে নিয়ে মরে অথচ তার মৃত্যুর পর ঠাকুরদাস মুখুজ্যে, তার সুপুত্ররা, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইত্যাদির প্রতিকিয়া :

"ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে—না, মুখে একটু নুনো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দি গে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড়ছেলে ব্যস্ত—সমস্তভাবে এই পথে কোথায় যাইতে—ছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখছেন ভট্চাযমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।"

৩.১৫.২ 'সদ্গতি' / প্রেমচন্দ

কাঙালীর বেদনাকে, তার মায়ের স্বপ্নকে বোঝেনি এই সমাজ কেননা সে ছোটজাত। একজন মৃত মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু জাতপাতের ওপরে ওঠা যাচ্ছেনা। মড়ার জাত নিয়ে এই সমাজে প্রশ্ন উঠেছে বারেবারেই। প্রেমচন্দের 'সদগতি' গল্পে পণ্ডিতজীর বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে দুখী মারা যায়। গোঁড় জাতির বলে তাঁকে দিয়ে রদ্দুরে সারাদিন অমানবিক পরিশ্রম করানো হয়েছে। একটু জল পর্যন্ত তাকে দেওয়া হয়নি কেননা সে অচ্ছুৎ। দুখী মারা গেছে বলে পণ্ডিতজীর কোন দুঃখ নেই। সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুখীর মৃতদেহ। দুখী মারা গেছে পণ্ডিতজীর বাড়ির সামনে :

"এক ঘর ব্যতীত গ্রামের সকলেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ঐ একঘরই গোঁড়। লোকের যাতায়াতের রাস্তার, খাবার জলের কি উপায় হবে? চামারের মৃতদেহের পাশ দিয়ে কি পবিত্র ব্রাহ্মণেরা জল নিতে পারে"?

দুখীর মৃতদেহ পচতে থাকে। চামাররা অস্বীকার করে মৃতদেহ নিয়ে যেতে। অবশেষে :

"পণ্ডিতজী দড়ি বার করে এক ফাঁস তৈরী করে মড়ার পায়ে কসিয়ে দিয়ে টানতে টানতে গ্রামের বাইরে রেখে এলেন। গৃহে ফিরে গঙ্গায় স্নান করে সর্বত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করলেন। তারপর দুর্গা স্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন।

অতএব নারাণাপ্পার মৃতদেহ নিয়ে—তার সৎকার নিয়ে যে প্রশ্ন অগ্রহীরের ব্রাহ্মণ সমাজে উঠেছে, তা নতুন নয়। দুখী অভাগীরা ছোটজাত ছিল বলে তাদের অবহেলা করা যত সহজ ছিল, ব্রাহ্মণ নারাণাপ্পার ক্ষেত্রে ততটা ছিলনা—তফাৎ এইটুকুই।

৩.১৬ 'সংস্কার' হ্ল সামগ্রিক মূল্যায়ন

ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক রীতি আচার, নৈতিকতার বোধ এই কাহিনির পদে-পদে প্রশ্নচিহ্ন তৈরী করে রেখেছে। একটি বিশেষ চরিত্রের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন—আত্মানুসন্ধান ধর্ম বা নৈতিকতার দিক থেকে সাধারণভাবে আমরা পাপ বা পুণ্যের নিরিখে বিচার করি। পাপ-পুণ্য শব্দদুটি একান্তই আপেক্ষিক। প্রাণেশাচার্য একথা উপলব্ধি করেছেন সারা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে।

লেখক দেখিয়েছেন, নারাণাপ্পাকে যারা পাপী হিসেবে চিহ্নিত করেছে, সত্যিকার ভালমন্দ, পাপপুণ্য, শ্রেয়াশ্রেয়ের

বিচারে পাপ তাদেরও কম নয়। নারাণাপ্পা অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ কিন্তু গয়ানগুলো স্পৃশ্য, পূতপবিত্র! সামাজিক রীতিনীতি নিরর্থক, বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এসবের কোন সদর্থক ভূমিকা নেই সেকথা ওরাও বোঝে। সামাজিক বিচারে ধর্মের বেরাটোপ চাপানো হয়েছে। এখানে একটা fundamental question উঠে এসেছে। ধর্মীয় অনুশাসনের অধিকাংশই যুক্তিহীন সামাজিক প্রথা, যার দ্বারা মানুষকে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়। উনিশ শতকে লেখা বাংলা প্রহসনগুলিতে যার অজস্র উদাহরণ রয়েছে।

শেষ বিচারে দেখা যাচ্ছে মোক্ষশাস্ত্র নয়, অর্থশাস্ত্রই পাপপুণ্যের চূড়ান্ত নিয়ামক। ধর্ম মানুষকে লাঞ্ছিত করে, শুভবুদ্ধিকে ধ্বংস করে।

প্রাণেশাচার্য ক্রমশই সত্যসন্ধানের জন্য একটার পর একটা অন্ধ গোঁড়ামির পাঁচিল ডিঙিয়ে যাচ্ছেন। এতদিনকার পবিত্রতার ধারণা বর্জন করে তাঁর চরিত্রের উত্তরণ ঘটেছে। নারাণাপ্পা নিজের মনের কাছে সৎ। তার মধ্যে কোন পাপবোধ নেই। এই দুইজন সামাজিকতার মাপকাঠিতে বিপরীত মেরুর। একটা সময়ে বিপরীত মেরুবিন্দু দুটি পাশাপাশি চলে আসছে। তার সঙ্গে আরও একজন মানুষ—তাঁর সহপাঠী মহাবল।

৩.১৬.১ সম্পর্কের টানাপোড়েন

উপন্যাসটির কাহিনিতে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত। চরিত্রগুলো বহুক্ষেত্রে বিচিত্র জটিলতার পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। প্রাণেশাচার্য ও ভগীরথীর সম্পর্ক অদ্ভুত রকমের অস্বাভাবিক। স্ত্রীর প্রতি প্রাণেশের প্রবল কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ব কিন্তু ভালবাসা আছে কি নেই, সে প্রসঙ্গ অব্যক্ত। অপরদিকে ভগীরথীরও স্বামীর প্রতি ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রবল— কিছুটা প্রত্যাশিত হীনমন্যতাও। সেই পতিভক্তি থেকেই একধরণের আত্মগ্লানি হয় নিজের রুগ্ন স্বাস্থ্যের প্রতি যা বিয়ের পর থেকে প্রাণেশকে সুখ-স্বস্তি দিতে পারেনি। তবু এ পক্ষেও ভালবাসা আছে কিনা বোঝা যায় না।

সম্পর্কের এই বিচিত্র টানাপোড়েনে মিথোষ্ক্রিয়া ঘটে ; জটিলতর হয়ে ওঠে সম্পর্ক। হয় ঘৃণা, নয়ত সহজ, স্বাভাবিকতা—সম্পর্ক সাধারণত এমনটাই হয়। কিন্তু এখানে দায়বদ্ধতার পেছনে রয়েছে সামাজিক অনুশাসন, ধর্মীয় সংস্কার। তবু আশ্চর্য, এই দম্পতিই গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে আদর্শ স্থানীয়। পারস্পরিক কর্তব্য ও ভক্তি পরায়ণতার প্রতীক। প্রাণেশের কর্তব্যবোধ বিবেক ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতায় মিশ্রিত—চিররুগ্না সঙ্গিনীকে সেবা না করে অবহেলা করলে আচার্যের ধর্ম পালন করা হবে না—বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে পারবেন না—অতএব তিনি এই সম্পর্ককে সযত্নে লালন করেন। সুতরাং এই কর্তব্য অবিমিশ্র নয়। আর অগ্রহারের কাছে সেই কর্তব্যই ভালবাসার নামান্তর। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেও সামাজিক অনুশাসন আর সংস্কারই ক্রিয়াশীল। ভগীরথী যখন বলে—আমাদের সমাজে কত বাপ তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে বর্তে যাবে। তুমি আচার্য। কাশীতে গিয়ে শাস্ত্র পড়ে এসেছ।—তখন এই সমাজের রক্ষণশীলতার আর একটা পর্ব উন্মোচিত হয়। সেখানে দ্বিতীয় বিবাহের প্রশ্ন এবং সেই হতভাগিনী দ্বিতীয়া স্ত্রীর একমাত্র কাজ হবে স্বামী এবং চিররুগ্না ভগীরথীর সেবা করা। বিবাহিত জীবনে জৈবিক চাহিদার ক্ষেত্রে প্রাণেশাচার্যর তৃষ্ণা (যা আদৌ অস্বাভাবিক নয়) অবদমিত ছিল। পূর্ণের পদপরশ তার জীবনে পড়েনি। তৃপ্তির প্রশ্ন অতএব ছিলনা তাই স্ত্রীর জীবনের অন্তিম পর্যায়ে চন্দ্রীর সঙ্গে প্রাণেশের যে দৈহিক সম্পর্ক ঘটে, সামাজিকতার বিচারে তা পদস্খলন হলেও, রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে তিনি অন্যায় করেন নি।

প্রাণেশাচার্য রুগ্ন স্ত্রীর সেবাযত্ন করতেন তার নিজের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যেত। মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন এই ভেবে যে পুণ্যের পথে তিনি অনেকদূর এগিয়ে যাচ্ছেন। এই আমিত্ব, আত্মশ্লাঘার উপলব্ধিই গ্রীক নাটকের পরিভাষায় tragic plot.।

৩.১৬.২ চন্দ্রীর মূল্যায়ন

নারাণাপ্পার মৃত্যুর পরে চন্দ্রী তার সৎকারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে গায়ের গয়না খুলে দিতে পারে নারাণাপ্পার প্রতি প্রেমে, আবেগে। তবু সে ভ্রষ্টা। ভারতীয় পুরাণে কুন্তী, দ্রৌপদী, তারা, মন্দোদরী, অহল্যা—এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বহুচারিণী। দেবতার মহিমা—আর্যসুলভ মহত্ব দিয়ে তাদের আড়ালে করা হয়েছে কিন্তু চন্দ্রী ভূমিপুত্রী—তার জন্য ঘৃণা আর অসম্মানই বরাদ্দ।

সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাণেশাচার্যই কাহিনী শেষে প্রখরতম হয়ে উঠলেন। এ কাহিনীর শুরু অন্ধ সংস্কারে, শেষ পরিমার্জনায়, পরিশীলনে নারাণাপ্পা সর্বদা এসেছে পরোক্ষ উল্লেখে। অন্যের স্মৃতিচারণে। সেভাবেই সে কাহিনিকে প্রভাবিত করেছে। অগ্রহারের শ্রেষ্ঠ মানুষটির সম্পূর্ণ রূপান্তরের উৎস নারাণাপ্পা। ভাসিয়ে দেবার মত শক্তি তার ছিল, চন্দ্রীরও ছিল—সে প্রমাণ হয়ে গেছে। 'রক্তকরবী' নাটকে রঞ্জন, নন্দিনী যেম যক্ষপুরীর অন্ধকার রাজ্যকে আলোয় ভাসিয়ে দিয়েছিল, তেমনি করেই নাড়া দিয়েছে নারাণাপ্পা।

মনুর বিধানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্রাণী, বৈশ্যানী বিবাহ করতে পারে। ব্রাহ্মণের ছেলে শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম নিলে ব্রাহ্মণ হবে কিন্তু কৌলিন্য থাকবে না, পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে এবং কোন ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করতেও পারবে না। পারিজাতপুর—অগ্রহারের ব্রাহ্মণকুল সকলেই একটা অন্ধকার বিধানের মধ্যে ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছে। ধর্মের তমোচেতনা, হতবুদ্ধির নির্মোক যখন খসে যায় প্রাণেশাচার্যর, তখন তিনি বুঝতে পারেন সংস্কারের অসাড়তাকে, শাস্ত্রের ত্রুটিকে।

নারাণাপ্পাই ছিল প্রাণেশাচার্যর একমাত্র প্রতিস্পর্ধী। তবুও নারাণাপ্পার প্রতি দুর্বলতা ছিল প্রাণেশাচার্যর। আচার্যকে সামনে রেখে নারাণাপ্পা ধিক্কার জানিয়েছে গোটা ব্রাহ্মণ সমাজকেই। নারাণাপ্পা নির্বোধ পাপাচারী মাত্র নয়, সে সচেতন, হিন্দু সমাজ ও শাস্ত্রের অনেক তথ্যই তার সঞ্চয়ে।

৩.১৭ লেখকের অভীপ্সিত তত্ত্বের মূল্যায়ন

সংস্কারকের মন নিয়ে কলম ধরেননি অনন্তমূর্তি। বিদ্রোহীর মন নিয়ে কলম ধরেছেন তিনি। তাই ধর্মীয় গোঁড়ামির একটা উত্তুঙ্গ পাহাড় নির্মাণ করিয়েছেন আর তা অতিক্রম করিয়েছেন প্রাণেশাচার্যকে। আসলে একটা জায়গায় গিয়ে বিজ্ঞান (physics) এবং দর্শন (metaphysics) এ-দুয়ের একই প্রশ্ন—সৃষ্টির আগে কি? সৃষ্টির পরে কি? মাঝখানের ছোটবড় হিসেবে নিকেশগুলোকে মিটিয়ে ফেললে তবেই সেই অনুসন্ধানে পৌঁছানো যায়—প্রাণেশ সেই পথেই

হাঁটছেন। চন্দ্রীর সঙ্গে সহবাসের পরেই তাঁর আত্মগ্লানি—বা বলা যেতে পারে পথ হাঁটা শুরু হয়েছে—এমন আত্মগ্লানির ধ্রুবপদী নিদর্শন হল ভীষ্মের শরশয্যা। ঠিক ভীষ্মের মতই শরশয্যা হয়ে উঠেছিল এই জীবনটা—প্রাণেশাচার্যর কাছে। তা থেকে পালাতে চেয়েছেন প্রাণেশ—পালাতে চেয়েছেন নিজের বিবেকদংশন থেকে। "মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়"—সেই মানব অগ্নিস্নাত—অপাপবিদ্ধ। প্রাণেশাচার্যর একটা অর্থে মৃত্যু ঘটেছে, এখন তাঁর উত্তরণ মানবিকতার পথে। এতদিন তিনি ধর্মের নামে যা করে এসেছেন তা অস্বাভাবিক। আজ বুঝেছেন তা ছিল নীরস, স্বভাবের স্রোতে গা ভাসিয়েছেন তিনি। সেই স্রোতকে সাঁতরে পেরোনোর সাধনাই শুরু করেছেন প্রাণেশাচার্য।

৩.১৮ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. প্রাণেশাচার্যের চরিত্রটি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করুন। তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মগ্লানি এবং গ্লানিমোচনের পরম্পরাটিও বিশ্লেষণ করুন।

২. 'সংস্কার' উপন্যাসের মূল কাহিনিটির রূপরেখা বিন্যাস করে এর প্লট সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. ব্যক্তিমানুষ ও সংস্কারের দ্বন্দ্বে চূড়ান্ত জয় হয়েছে মানবিকতারই—আলোচনা করে দেখান।

৪. 'সমাজদ্রোহী' বলে নিন্দিত নারাণাপ্পা আসলে আদ্যন্ত মানবিক এবং প্রতিবাদী একটি চরিত্র—আলোচনা করুন।

৫. "আমাদের সামাজিক আয়তনে মৃতদেহ সৎকারেও জাতপাতের প্রশ্ন যে বারেবারেই এসেছে, ভারতীয় কথা সাহিত্যে তার অজস্র প্রমাণ আছে।"—আলোচনা করুন।

৬. "কুসংস্কার মানুষই গড়ে তুললেও, পরিণামে সে তার নিজের সৃষ্টির হাতেই বন্দী হয় ; আবার সেই বন্দীত্বও সে নিজেই ঘোচায়।"—'সংস্কার' উপন্যাস অবলম্বনে এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটির বিচার করুন।

৩.১৯ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী

১. পুট্টার চরিত্রের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে এই উপন্যাসে—আলোচনা করুন।

২. চন্দ্রীর চরিত্রের আগাগোড়া ভরে রয়েছে সরল মানবিকতা ও প্রগাঢ় প্রাণপ্রাচুর্য"—আলোচনা করুন।

৩. "শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার আড়ালে ব্রাহ্মণসমাজের যে কুৎসিত ছবি অনন্তমূর্তি এঁকেছেন, শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের সমাজপতিদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট।" এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে, দুটি কাহিনির মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪. গরুড়াচার্য এবং লক্ষ্মণাচার্যের চরিত্র দুটির তুলনামূলক রূপরেখা অঙ্কন করুন।

৫. চন্দ্রীর দেওয়া গয়নাকে কেন্দ্র করে অগ্রহারের ব্রাহ্মণসমাজে যে-প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, নারাণাপ্পার সৎকার-সমস্যাকে তা কতটা প্রভাবিত করেছিল বলে আপনার মনে হয়?

৬. চন্দ্রী এবং প্রাণেশাচার্যর মধ্যে আকস্মিকভাবে ঘটে-যাওয়া 'মানুষি দুর্বলতা' এই কাহিনিতে কীভবে মোড় ফিরিয়েছে?
৭. 'সংস্কার' নামটি এই উপন্যাসের পক্ষে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করুন।
৮. 'সংস্কার' উপন্যাসের অন্তর্নিহিত মূল দার্শনিক তত্ত্বটি কী, বুঝিয়ে বলুন।
৯. দুর্বাসাপুর নামটির সঙ্গে বিজড়িত পুরাণকথাটি কী, বলুন?
১০. 'সংস্কার', 'সদ্গতি' ও 'অভাগীর স্বর্গ'—এদের মধ্যে ভাবগাম্ভীর্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি?

৩.২০ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. নারাণাপ্পা এবং গরুড়ের মধ্যে আত্মীয়তার কী সম্পর্ক ছিল?
২. প্রাণেশাচার্যর সহপাঠীর কী নাম ছিল?
৩. অগ্রহার তথা দুর্বাসাপুরে কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল?
৪. লক্ষ্মী দেওস্মার বয়স কত ছিল?
৫. মারুতিদেব কে?
৬. পুট্টা কোন্ গোষ্ঠীর সন্তান ছিল?
৭. প্রাণেশাচার্য কত টাকায় সোনার আংটি বেচেছিলেন?
৮. কোন্ শহর থেকে এসে দুর্বাসাপুরে প্লেগ ছড়িয়েছিল নারাণাপ্পা?
৯. কুন্দপুরে কার বাড়ি ছিল?
১০. নারাণাপ্পার ভায়রাভাইয়ের নাম কী?

পর্যায় - 3

আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্য : ছোটগল্প

পূর্বকথা

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বর্গ হলো ভারতীয় ভাষার ছোটগল্প। ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ছাব্বিশটি ভাষার প্রায় সবকটিতেই লেখা হয়েছে অসংখ্য ছোটগল্প। বিষয়বস্তুতে, উপস্থাপনারীতিতে, সাহিত্যগুণে এদের বৈচিত্র্য বহুমুখী, যেমন বহুধাব্যাপ্ত বিভিন্ন ভাষার লেখকদের সৃষ্টিপ্রতিভা। কিন্তু ভাষার ব্যবধানের কারণে বহু বিশিষ্ট লেখকদের রচনা হয়ত সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে তাঁর নিজস্ব ভাষাভাষী মানুষদের গণ্ডীতে। বঞ্চিত হতে হয় অন্য ভাষাভাষী আগ্রহী পাঠকদের। এই গ্রন্থে সেই অপরিচয়ের দূরত্ব ঘুচিয়ে দেবার প্রয়াসে সঙ্কলিত করা হয়েছে প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় লেখা দশটি অনবদ্য ছোটগল্প। গল্পগুলিকে অঞ্চলের ভিত্তিতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চি ম চারটি বর্গে সাজানো রয়েছে। উত্তরভারতের থেকে নেওয়া হয়েছে উর্দু, পাঞ্জাবী ও হিন্দী ভাষায় লেখা তিনটি গল্প, দক্ষিণের প্রতিনিধিও তিনটি গল্প—তামিল, তেলুগু ও মালয়ালম ভাষায় লেখা, পূর্বভারতের অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার দুটি গল্প এবং পশ্চি মভারতের মারাঠী ও গুজরাতী ভাষার দুটি গল্প সম্পূর্ণ করেছে তালিকাটি। প্রতিটি গল্পই স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদে সংযোজিত করা আছে মূল অলোচনার সঙ্গে। কোনো গল্পের বিষয় দেশভাগ, কোনোটির প্রেক্ষাপটে রয়েছে জেলের অভ্যন্তর কিংবা চলন্ত ট্রেন, মধ্যবিত্ত জীবনের নিরুপায়তা এসেছে কোনো কাহিনিতে এবং অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়েছে সাধারণ মানুষ তথা অববর্গীয়রা। মনস্তত্ত্ব, সমাজ, মানবিকতা, প্রেম, নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে নানান্ নিরীক্ষার মাধ্যমে জীবনের বহু মৌলিক প্রশ্নকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্থাপন করা হয়েছে, তাদের উত্তর খোঁজারও প্রয়াস করা হয়েছে এই সব গল্পে বহু সমস্যা এবং সর্বোপরি মানুষ ও সমাজের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মাধ্যমে জীবনের দর্শনকে ছুঁতে চাওয়ার প্রয়াস করেছেন এগুলির লেখকরা।

০.১ লেখকদের সম্পর্কে কিছু কথা

১. সাদত হাসান মান্টো : উর্দুভাষার বিশিষ্ট রূপকার মান্টোর জন্ম ১৯১২, লুধিয়ানায়; মৃত্যু ১৯৫৫, লাহোরে। অবিভক্ত ভারতে অমৃতসর ও আলিগড়ে শিক্ষালাভ করেন। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে চলে যান। তিরিশ দশকের গোড়ায় আত্মপ্রকাশ করে তিনি প্রথমে বিদেশী ক্লাসিক অনুবাদ করলেও, এরপর ছোটগল্প ও নাটকের জনপ্রিয় লেখক হিসেবে গণ্য হন। তাঁর বহু কাহিনি ও চিত্রনাট্য তদানীন্তন বোম্বাইয়ে চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। প্রতিবাদী মানসিকতার জন্য বহুবার আইনি বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। এছাড়া তাঁর একাধিক লেখা অশ্লীলতার অভিযোগে নিষিদ্ধ ও হয়েছে। প্রায়শই সমাজের নিম্নবর্গের নিপীড়িত মানুষরা তাঁর রচনার কুশীলব হয়েছেন। সমাজের অবিচারে কিভাবে মানবজীবন বিধ্বস্ত হয় তা নিয়ে তীক্ষ্ণ নিরীক্ষাও রয়েছে তাঁর লেখায়। দেশত্যাগের পরে পাকিস্তানে গিয়েও তিনি শিকড়কে উপড়ে ফেলতে পারেননি (হয়ত চানও নি)। সেই যন্ত্রণার কথা বারবার প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ওই পর্বের লেখাগুলিতে, যার অন্তর্গত পাঠ্যগল্প 'টোবা টেক সিং'-ও। তাঁর বিশিষ্ট গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'ঠাণ্ডী গোস্ত', 'কালি সালওয়ার', 'ধুঁয়া', 'জানাজে'। প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গাঞ্জে ফারিস্তে', নাটকের মধ্যে রয়েছে 'আফসানে ঔর ড্রামে' 'ইস মঝধারে মেঁ' ইত্যাদি।

২. অমৃতা প্রীতম : পাঞ্জাবী ভাষার এই শক্তিশালী লেখিকার জন্ম ১৯১৯, প্রয়াণ ২০০৫ । মূলত কবি হিসেবে তিনি খ্যাতিমান হলেও ছোটগল্পের আঙিনায় তাঁর স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল বিচরণ লক্ষণীয়। অতি ধর্মপ্রাণ বাবার আদর্শে বড়ো হয়ে অমৃতার প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থগুলিতে ধর্মবোধ ও প্রচলিত ছন্দোরীতির প্রবল উপস্থিতি থাকলেও, পরবর্তীকালে মার্কসীয় দর্শনভাবনায় তাঁর আস্থার কারণে কাব্যভাবনাতেও আমূল পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই দর্শনেরই অংশভাক মানবতাবাদের একটি অনুভাবনা নারীবাদী আন্দোলনের নিরিখে প্রকাশিত হয় তাঁর পরবর্তীকালের নানা লেখায়। তাঁর প্রতিটি রচনাতেই তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছেনারীর অস্তিত্বের সংকট, সামাজিক পীড়নের কথা, সঙ্গে এসেছে একান্ত ব্যক্তিগত রোম্যান্টিক আবেগের অভিপ্রকাশও। আরও পরবর্তী রচনায় প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। নারীর একাধিক সত্তার অনুসন্ধান মূল সুর হয়ে থেকেছে প্রায়শই। প্রায় আঠারোটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ঠাণ্ডীয়া কিরণা', 'সাঁঝ দি লালি', 'লোকপীর', 'পাথরগীতে', 'সুনহেরে' (সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত ১৯৫৫), উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি লিখেছেন চব্বিশটি উপন্যাস, পনেরোটি ছোটগল্প-সংকলন ও তেইশ খণ্ড প্রবন্ধ-সংকলন, যারে অনেকগুলিই নানান ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় অনুদিত। ১৯৬৯ সালে তিনি পদ্মশ্রী উপাধি পান এবং ১৯৮২ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন।

৩. প্রেমচন্দ : এঁর আসল নাম ধনপতরাই শ্রীবাস্তব। হিন্দী ও উর্দু-ভাষার এই লেখকের জীবনব্যাপ্তি ১৮৮০ থেকে ১৯৩৬। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান এই লেখক চল্লিশ বছর বয়সে বি.এ. পাশ করেন। সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করেন গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। উর্দুতে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও ১৯১৬ সালে মান্নান দ্বিবেদীর পরামর্শে হিন্দীতেই লিখতে শুরু করেন। হিন্দী কথাসাহিত্য রচনায় তিনি এক নতুন যুগের সূচনা করেন। প্রচলিত রোম্যান্টিক কাহিনির পরিবর্তে তিনি তাঁর রচনার বিষয়বস্তু করলেন আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও সাধারণ মানুষের জীবনের সত্যকাহিনি যা একান্ত বাস্তব। আর্যসমাজের প্রভাবে তাঁর লেখায় সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ তার বিষয়টি খুবই স্পষ্ট, সাধারণ মানুষদের প্রতি সহমর্মিতাও প্রবল। মানবতাবাদী এই লেখকের অস্তিত্বের ধারক তাঁর সততা, নৈতিকতা ও স্পষ্টবাদিতা। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত লেখার মধ্যে রয়েছে দুটি উপন্যাস 'গোদান' ও 'রঙ্গভূমি'। মোট দুশো তিয়াত্তরটি ছোটগল্প তিনি লিখেছেন ১৯১৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কফন', 'সদ্‌গতি', 'নেশা' ইত্যাদি। দীর্ঘ এই কুড়ি বছরের সাহিত্যকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে : যথাক্রমে—ক. পরীক্ষানিরীক্ষার স্তর (১৯১৬-১৮), খ. অগ্রগতির স্তর (১৯২০-২৯) এবং গ. সর্বোচ্চ সৃজনশীলতার স্তর (১৯৩০-১৯৩৬)। হিন্দীসাহিত্যের পুরোধা পুরুষ হিসেবেই তিনি স্বীকৃত।

৪. জয়কান্তন : তামিল লেখক দণ্ডপাণি জয়কান্তনের জন্ম ১৯৩৪-এ। বর্তমানে তিনি তামিল কথাসাহিত্যের সবচেয়ে অগ্রগণ্য লেখক বলে গণ্য। তাঁর প্রায় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নেই এবং অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ছেলেবেলায় পথনাটিকা 'কোঠু' দেখে তাঁর শিল্পসংস্কৃতি বিষয়ে প্রথম উৎসাহ জাগে। তারপর সিনেমার আকর্ষণ তাঁকে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত করায়। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন অল্পবয়সেই। রাজনৈতিক প্রয়োজনে বহু জায়গায় কাজ করতে গিয়ে তিনি জীবন ও মানুষ বিষয়ে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যার নির্যাস পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। এছাড়া বন্ধু তামিলোলির সহায়তায় তিনি পড়াশুনো শেখেন এবং বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকের লেখার সঙ্গেও পরিচিত হন। এরপর বালিকান্নান নামে আরেক বন্ধু তাঁকে পরিচিত করার পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে। এভাবে ধীরে ধীরে তাঁর মননশীলতা পরিপূর্ণতার দিকে এগোয় এবং তিনি লিখতে শুরু করেন। কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন এবং বক্তা হিসেবে সুপরিচিত হন। এক অপরাভবী, চাপের

কাছে নতিস্বীকার না করার মনোভাব, স্পষ্টবাদিতা ও বিশ্বাসের তীব্রতার জন্যে বহু সময়ে অনেক সংকটেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। তাঁর বিবেকসঞ্জাত অনুভূতি জীবন-অভিজ্ঞতার রসে জারিত হয়ে রূপ নিয়েছে তাঁর সাহিত্যে। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্ত। তামিল ছোটগল্পকার হিসেবেও তিনি অনন্য। 'ত্রিশঙ্কু স্বর্গম' একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। এছাড়া তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'ওরু নাদিগাই নাটকম্ পারক্কিরাল' (অভিনেত্রী নাটক দেখছে), 'যুগসন্ধি'।

৫. আচন্ট শারদা দেবী : তেলুগু এই লেখিকা তিরুপতির শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। ইতি তেলুগু গল্পলেখিকা হিসেবে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত। এঁর গল্পে প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এছাড়া গদ্যরচনায় কাব্যরসের মাধুর্য সঞ্চারিত করতে পারাও তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য; প্রাচীন সাহিত্যের নিবিড় পাঠের প্রভাবে কিছু কিছু ট্র্যাডিশনাল উপাদানও তাঁর গল্প লক্ষিত হয়।

৬. ভি. এম. বশীর : ভৈকম মুহম্মদ বশীর ১৯১০ সালে কেরলের এক মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে তিনি জেলবাস করেন। তারপর পুলিশের রক্তচক্ষু এড়িয়ে ছদ্মনামে তিনি আত্মগোপন করে থাকেন প্রায় সাতবছর। উত্তর ভারতে। কেরালায় ফিরে তিনি একটি গল্প লেখেন যা সরকার বিরোধী বলে গণ্য হয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। জেলে যেতে হয় আবার। কিন্তু সেই কারাবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন এক অনবদ্য কাহিনি 'মাথিলুকাল' (দেয়াল) যা মালয়ালম সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে বিবেচিত হয়। স্বাধীনতাপরের পরিস্থিতি দেখে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন—একটি সাপ্তাহিকীতে লিখে দিলগুজরান করার সূত্রে কমিউনিস্ট বলে চিহ্নিত হয়ে আবারও জেলে যান। এভাবেই সাহিত্য ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকে তাঁর জীবনে। মোট দশ খণ্ডে পঁচাত্তরটি গল্প লেখেন তিনি মূলত নিজের সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষদের নিয়ে, এবং সমস্যাসঙ্কুল জীবনে প্রেমের মূল্য কতটা সেটিও নিরীক্ষা করেন—আর সব তিক্ততা ও নিষ্ঠুরতাকেই লেখায় উপস্থিত করেন ব্যঙ্গ অথবা হাস্যবিজল্পনার মাধ্যমে—যা তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যই হয়ে উঠেছে। তেরোটি উপন্যাসও লিখেছেন তিনি যার মধ্যে রয়েছে 'প্রেমলেখনম্' (প্রেমপত্র), 'শব্দঙ্গল' (কণ্ঠ) ইত্যাদি। মাললায়ম সাহিত্যে বশীরের সবচেয়ে বড়ো অবদান 'ক্রমান্বয়ী গল্প' রচনারীতি উদ্ভাবন যেখানে প্রতিটি অধ্যায় এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্প হলেও একযোগে একটি সুপিনদ্ধ উপন্যাস তৈরি হয়। মালয়ালম সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসের প্রথম প্রয়াসও তাঁর হাতেই।

৭. মহিম বরা : মহিম বরা আসামের অন্যতম বিশিষ্ট কবি ও ছোটগল্পকার—জন্ম ১৯২৬-এ। নওগঙ কলেজের অধ্যাপক এই লেখক পঞ্চাশের দশকেই নিজের লেখনীর জন্য সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। আসামের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনের আনন্দ-বেদনার চিত্র তাঁর লেখায় বারবার এসেছে। জীবনবাদী এই লেখকের সংবেদনশীলতা ও সহানুভূতিই ব্যক্ত হয়েছে এই গল্পগুলির মাধ্যমে। তাঁর বিখ্যাত গল্পসংকলনগুলি হল 'কাঠনিবারীঘাট', 'এখন নদীর মৃত্যু' ইত্যাদি। উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হেরোয়া দিগন্তর মায়া'। কবিতা সংকলনটির নাম 'রাঙ্গা জিয়ান'।

৮. গোপীনাথ মহান্তি : গোপীনাথ মোহান্তি ওড়িয়া সাহিত্যের সর্বজনমান্য লেখকদের মধ্যে অন্যতম। ১৯১৪ সালে জন্ম। জীবনের বেশিরভাগটাই কাটান ওড়িশার কোরাপুটের আদিবাসী অঞ্চলে, যে অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে

তাঁর বহু লেখায়। ১৯৬৪ সালে মাটি 'মাঠালা' উপন্যাসের জন্য তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর 'অমৃতর সন্তান' উপন্যাসটি বর্তমানে প্রায় মহাকাব্যের মতো মর্যাদা পায়। এছাড়াও 'পরজা', 'অপহঞ্চ ' প্রভৃতি উপন্যাসেও তিনি আদিবাসী জীবনের সারল্য, বঞ্চনা ও যন্ত্রণার কথা বলেছেন—সরকারী আমলা ও মহাজনদের অত্যাচারের কথাও এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক সভ্যতার কলুষে বিষাক্ত না হয়ে কিভাবে প্রকৃতির কোলে সরল আদিবাসীরা নিশ্চিন্তে রয়ে গেছে—সেই পরম সত্যই উদঘাটিত তাঁর লেখায়। প্রকৃতিও এসেছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে। অন্যান্য রচনা হলো—'তন্ত্রিকারা', 'হরিজন', 'লয়বিলয়' ইত্যাদি। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আদিবাসী জীবনের কথা বলবার মাধ্যমেই তিনি ওড়িয়া সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন।।

৯. অরবিন্দ গোখলে : ১৯১৯ সালে এই আধুনিক মারাঠী গল্পের রচয়িতার জন্ম। বিজ্ঞান ও তারপর সাংবাদিকতা নিয়ে উচ্চশিক্ষালাভের পর তিনি পুনেতে অধ্যাপনা করেন দীর্ঘদিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন সময়ে তিনি মারাঠী সাহিত্যে নতুন বর্গের ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে অন্যতমরূপে স্বীকৃত হন ভাবে ও গ্যাডগিলের পাশে। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সৃষ্টিশৈলী ছিল। গোখলের কাহিনি সাধারণত আবর্তিত হয় একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। এক নিরাসক্ত দূরত্বে দাঁড়িয়ে তিনি সেই চরিত্রের বিশ্লেষণ করেন। তিনি কখনো নৈতিকতার পাঠ দেননা—বরং জীবনের বাস্তবতার একটি খণ্ডরূপকেই তুলে ধরেন তাঁর গল্পে। তাঁর গল্পশৈলী নিপুণ আকারে ও সংক্ষিপ্ত। বেশ কয়েকশো গল্প তিনি লিখেছেন যেগুলি পঁচিশটি খণ্ডে সংকলিত হয়েছে— যেমন 'নজরানা', 'মাহের', 'নাকোশি' ইত্যাদি।

১০. ঝবেরচান্দ মেঘানী : ঝবেরচান্দ কালিদাস মেঘানীর জন্ম ১৮৯৬ সালে, মৃত্যু ১৯৪৭-এ। লোকসংস্কৃতিবিদ ও সাহিত্যিক হিসেবেই তিনি প্রখ্যাত। কলকাতায় চাকরীসূত্রে দীর্ঘদিন বসবাসের সুবাদে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগের প্রভাবও তাঁর লেখায় লক্ষিত হয় খুবই বেশী করে। পত্রিকার লেখালেখির মাধ্যমে সাহিত্যচর্চার শুরু। মানুষ, লোকজীবন ও মাতৃভূমির প্রতি টান—এই সবই তাঁর রচনার উপাদান হয়েছে। একান্ন বছরের জীবনে তিনি মোট অষ্ট-আশিটি গ্রন্থ লিখেছিলেন—যার মধ্যে রয়েছে প্রায় সব বর্গেরই রচনা—উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, জীবনচরিত, ভাবানুবাদ ইত্যাদি। লৌকিক জীবনের প্রতি জীবনভোর আকর্ষণের ফলে সৌরাষ্ট্রের লোকজীবন, লোককথা, কিংবদন্তি, ব্যালাড ইত্যাদির প্রভাব বেশি করে দেখা যায় তাঁর লেখায়। তাঁর কবিতার বই হিসেবে 'যুগবন্দনা', 'রবীন্দ্রবীণা' উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্প সংকলনের মধ্যে বিশিষ্ট হলো 'মেঘালিনী নাবালিকাওঁ' (তিন খণ্ড), 'প্রতিমাওঁ' ইত্যাদি। তেরোটি উপন্যাসের মধ্যে বিখ্যাত হল 'নিরঞ্জন', 'সমরাঙ্গন'। গুজরাতী সাহিত্যে মেঘানীর সবথেকে বড়ো অবদান হলো এইটিই যে, এর আগে লেখকরা মূলত শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজকেই বিষয়বস্তু করলেও কিন্তু মেঘানীই প্রথম লেখক যিনি গুজরাতী কথাসাহিত্যে গ্রামীণ জীবনকে প্রতিভাসিত করলেন।।

টোবা টেক সিং

(উর্দু)

সাদত হাসান মাণ্টো

১.১ ☐ কাহিনি

দেশ ভাগ হবার দু-তিন বছর পরে, পাকিস্তান ও ভারত সরকার ঠিক করলে, আগে যেমন কয়েদিদের বেলায় ঘটেছে, তেমনি, দু-দেশের পাগলদেরও বদলা-বদলি করা উচিত। তার মানে হলো, ভারতের পাগলাগারদগুলোর যত মুসলমান পাগল আছে, তারা যাবে পাকিস্তানে, আর পাকিস্তানের পাগলাগারদে যত হিন্দু আর শিখ পাগল আছে, তাদেরকে তুলে দেয়া হবে ভারতের হাতে। পরিকল্পনাটা ভালোই হয়তো, কিংবা আদপেই হয়তো ভালো নয়, কিন্তু দু-দেশের সব মাতব্বর বোদ্ধারা উঁচু মহলে অনেকগুলো সভা-সমাবেশ করে, অনেক বিচার-বিবেচনার পর শেষটায় এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছেছিলোন। বদলাবদলির জন্যে একটা তারিখও ঠিক করে ফেলা হলো। কোন-কোন মুসলমান পাগলের পরিবার তখনও ভারতে আছে, সেটা তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে দেখা হলো, কেননা তারা ভারতেই থেকে যাবে, বাকিদের সীমান্ত পারে করে পাঠিয়ে দেয়া হবে। পাকিস্তানে অবশ্য হিন্দু বা শিখ আর প্রায় কেউই নেই, কাজেই তাদের আর পাকিস্তানে রাখার কথাই ওঠে না। ফলে, সব হিন্দু আর শিখ পাগলকেই, কড়া পুলিশ পাহারায়, নিরাপদে সীমান্তে পৌঁছে দেয়া হবে।

এই বদলের খবরটা ভারতে কীভাবে নেয়া হয়েছিলো, জানা নেই, কিন্তু খবরটা যখন এখানে লাহোর পাগলাগারদে গিয়ে পৌঁছুলো, তখন হুলুস্থুল পড়ে গেলো—পর-পর অনেকগুলো তুলকালাম ও অদ্ভুত ব্যাপারও সেখানে ঘটে গেলো। এক মুসলমান পাগল, যে বারো বছর ধরে রোজ 'দৈনিক জমিদার' কাগজ পড়েছে, একদিনও কামাই দেয়নি, তাকে তার এক দোস্ত জিগেস করলে, 'মৌলবীসাহেব, এই পাকিস্তান জিনিষটা কী, বলুন তো?' অনেকক্ষণ ধরে মাথা ঘামিয়ে ভেবে সে উত্তর দিলে, 'ওটা ভারতেরই একটা জায়গা, ওখানে ওরা দাড়ি কামাবার ব্লেড বানায়।' এই কথা শুনে দোস্ত যার-পর-নেই খুশি হয়ে চলে গেলো।

তেমনি, এক শিখ পাগলকে আরেক জন শিখ জিগেস করলে, 'সর্দারজি, আমাদের কেন হিন্দুস্থানে পাঠানো হচ্ছে বলতে পারেন? আমরা তো ওদের ভাষাই জানি না।' সর্দারজি হেসে উত্তর দিলে, 'হুম, আমি কিন্তু হিন্দুস্থানের ভাষা জানি।' তারপর সে-ভাষায় তার দখল বোঝাবার জন্যে সে দু-লাইন ছড়া আউড়ে দিলে :

'আছে যত লোক হিন্দুস্থানি
ডিপো সব ডাহা শয়তানির।
চলনে-বলনে সব হাম্‌বড়া
দেমাকে ধরাকে তারা দ্যাখে সরা।'

একদিন স্নান করার সময় এক মুসলমান এমন প্রচণ্ডভাবে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে জিগির তুললে যে পা পিছলে মেঝেয় পড়লো চিৎপটাং, আর জ্ঞান হারিয়ে ফেললে।

পাগলাগারদে আবার এমন পাগলও ছিলো, যারা মোটেই পাগল নয়। এরা সবাই প্রায় খুনে, যাদের

করিৎকর্মা আত্মীয়স্বজন কর্তাদের ঘুষ খাইয়ে পাগলের সার্টিফিকেট জোগাড় করেছে, যাতে তারা এইভাবে জল্লাদ এবং ফাঁসির দড়ি এড়াতে পারে। তাদের কারু-কারু আবছা একটা ধারণা ছিলো বটে, কেন দেশটা দু-টুকরো হচ্ছে, আর পাকিস্তান বলতেই বা কী বোঝায়। কিন্তু, ব্যাস, ঐটুকুই। এমনকী তারাও জানতো না সত্যি কী ঘটছে বা ঘটতে চলেছে। খবরকাগজগুলো থেকে থোড়াই আন্দাজ মেলে, আর ওয়ার্ডারগুলোও হয় বুড়বাক নয়তো গণ্ডমূর্খ, অতএব তাদের সঙ্গে কথা বলেও খুব-একটা জানার উপায় নেই। অনেক জিগেস-টিগেস করে তারা যা জেনেছে তা হলো মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্ বলে কে-একজন, যাঁকে সবাই জানে কায়েদ-এ-আজম বলে, মুসলমানদের জন্যে একটা আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, পাকিস্তান যার নাম। 'কোথায় এই পাকিস্তান? ঠিক কোনখানে আছে এ-দেশ?' কারুরই কিছু জানা নেই। পাগলদের মধ্যে যারা একটু প্রাঞ্জলভাবে চিন্তা করতে পারতো, তারাও এই গোলমেলে গুজব-টুজব শুনে ফাঁপরে পড়ে গেলো : কোথায় আছে তারা—পাকিস্তানে, না হিন্দুস্থানে? যদি তারা ভারতেই থেকে থাকে, তবে কোথায় এই পাকিস্তান? আর যদি তারা পাকিস্তানেই আছে, তবে এটা কী করে সম্ভব যে কিছুদিন আগেও এ-জায়গাটা ছিলো ভারতেরই অংশ? এক পাগল আবার ভারত-পাকিস্তানের এই ধাঁধাটায় এতই নাজেহাল হয়ে পড়লো যে সে আরো-পাগল হয়ে গেলো। একদিন ঝাঁট দিতে-দিতে হঠাৎ সে চড়ে বসলো একটা গাছে, তারপর গ্যাঁট হয়ে একটা ডালে বসে পাক্কা দু-ঘন্টা ধরে ভারত-পাকিস্তানের এই তাজ্জব প্রশ্নটা নিয়ে বক্তৃতা চালিয়ে গেলো। পাহারাওলারা যখন তাকে বললে নিচে নেমে আসতে, সে হুড়মুড় করে আরো উঁচুতে চড়ে বসলো, বললে, 'ভারত বা পাকিস্তান—এ-দুটোর কোথাও আমি থাকতে চাই না। আমি এই গাছেই থাকবো।' অনেক হৈ-চৈ উত্তেজনার পর, তার মগজ একটু সাফ হবার পর, সে কাঁদতে-কাঁদতে গাছ থেকে নেমে এসে তার হিন্দু ও শিখ বন্ধুদের আলিঙ্গন করলে। তাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার ভয়েই তার বেজায় কষ্ট হচ্ছিলো।

এক মুসলমান রেডিও-ইঞ্জিনিয়ার—তার আবার এম. এসসি. ডিগ্রি ছিলো—নিজেকে অন্যদের কাছ থেকে তফাতে রাখতো। সে চুপচাপ একা-একাই তার সময় কাটাতো পাগলাগারদের সবচেয়ে নিরিবিলি কোণগুলোয় হাঁটাহাঁটি করে। একবার যখন সে ওভাবে পায়চারি করছে, হঠাৎ সে তার সব পোশাক-আশাক খুলে ওয়ার্ডারের হাতে তুলে দিলে, আর উদোম ন্যাংটো হয়েই সারা বাগানে হেঁটে বেড়াতে লাগলো।

এক মোটাসোটা মুসলমান পাগল এককালে চিনিওটে মুসলিম লিগের হয়ে দারুণ কাজ করতো; তার অভ্যেস ছিলো দিনে ১৫-১৬ বার স্নান করা। হঠাৎ তার কী খেয়াল হলো, সে স্নান করাই বন্ধ করে দিলে। তার নাম ছিলো মুহম্মদ আলি; তো একদিন সে তার কুঠুরি থেকে ঘোষণা করলে যে সে আর কেউ নয়, স্বয়ং মুহম্মদ আলি জিন্নাহ, কায়েদ-এ-আজম। তার দেখাদেখি, এক শিখ পাগলও ঘোষণা করলে যে সে হচ্ছে মাস্টার তারা সিং। তারা প্রায় হাতাহাতি শুরু করে দেবে, এমন সময় দুজনকেই বিপজ্জনক ঘোষণা করে আলাদা-আলাদা কুঠুরিতে বন্ধ করে রাখা হলো। তারপর সেখানে ছিলো লাহোরের এক তরুণ হিন্দু উকিল, প্রেমে ব্যর্থ হয়েই সে তার কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিলো। সে যখন জানতে পারলে যে অমৃতসর ভারতে পড়েছে, তার বেজায় মনখারাপ হয়ে গেলো। যে হিন্দু মেয়েটি তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে, সে ঐ অমৃতসরেরই মেয়ে। সেই পাগলদশাতেও সে মেয়েটির স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি, ফলে সে যাবতীয় হিন্দুমুসলমান নেতাকে প্রাণভরে গালাগাল দিতে শুরু করলে—তার মতে, তারাই দেশটা দু-ভাগ হবার জন্যে দায়ী। যা তাকে কষ্ট দিচ্ছিলো তা হলো এখন কিনা তার প্রেমিকা একজন ভারতীয় হয়ে গেছে, আর সে নিজে কিনা পাকিস্তানি।

বদলাবদলির খবর ছড়িয়ে পড়বামাত্র কয়েকজন মুসলমান পাগল এই উকিলের কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে। তারা তাকে বললে অমন মন খারাপ না-করতে, তাকে তো শিগগিরই ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে— সেখানে সে তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলতে পারবে। কিন্তু এই লাহোর ছেড়ে যাবার কথাটা তার পছন্দ হলো না, তার ধারণা অমৃতসরে গিয়ে ওকালতি ব্যবসাটা জমিয়ে তোলা বেশ কঠিনই হবে।

তারপর ছিলো জনা-দুই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান/ইওরোপিয়ান ওয়ার্ডে। তারা যখন শুনলে যে ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে ইংরেজরা দেশে ফিরে গেছে, তারা একেবারে বোম্‌কে গেলো। তারা তক্ষুনি গোপন সভা ডেকে তাদের এই অদ্ভুত দশা আলোচনা করতে শুরু করে দিলে। ঘণ্টার পর ঘন্টা ধরে চলতে লাগলো তাদের সভা, আর যে-সব বিষয় নিয়ে তাদের মগজ ভির্মি খাচ্ছিলো, তা হলো এই : 'এই পাগলাগারদে এখন তাদের পদমর্যাদা কী হবে? তারা কি বিলিতি খাবার-দাবার সব বাতিল করে দেবে না কি?... তারা কি তাদের মাখন-মাখানো টোস্টই পাবে, নাকি ঐ হতচ্ছাড়া ভারতীয় চাপাটি খেতে বাধ্য হবে?'

এক শিখ ছিলো পাগলাগারদে, গত পনেরো বছর ধরেই সে আছে। বেশির ভাগ সময়েই সে বিড়বিড় করছে কী-সব, কান পাতলে শোনা যায় কথাগুলো, 'ও পার্‌ড়ি, গুড-গুড ডি, আফেকাস ডি, বেধিয়ানা ডি, মুঙ ডি ডাল অভ দি ল্যান্টার্না।' কিন্তু তার একটা তাজ্জব ব্যাপার এই যে দিনে-রাতে কখনোই সে ঘুমোয় না। পাহারাওলারা একবাক্যে বলে যে এই দীর্ঘ বন্দীদশায় তাকে তারা একবারও ঘুমোতে দেখা তো দূরের কথা, শুতেও দ্যাখেনি। কেবল মাঝে-মধ্যে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। সারাক্ষণ ওভাবে ঠায় সটান দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে তার পা-দুটি ফুলে ঢোল, বেশ কষ্টও পায়। তাহলে কী হবে, এক মুহূর্তের জন্যেও সে ঠাণ্ডা হয় না। কিন্তু যখনই সে কাউকে ভারত-পাকিস্তান নিয়ে কিছু বলতে শোনে, অথবা শোনে পাগল বদলা-বদলির বিষয়, সে গভীর মন দিয়ে প্রত্যেকটি কথা যেন গিলে খায়। সে-সময় কেউ যদি তার মতামত জিগেস করে, সে কিন্তু খুবই গম্ভীরভাবে বলে ওঠে, 'ও পারড়ি, গুড-গুড ডি, আফেকাস ডি, বেধিয়ানা ডি, মুঙ ডি ডাল অভ দি পাকিস্তান গবর্মেণ্ট।'

কিছুদিন পর সে 'অভ দি পাকিস্তান গবর্মেণ্টে'র বদলে বলতে লাগলো 'অভ দি টোবা টেক সিং গবর্মেণ্ট' আর টোবা টেক সিং কোথায় সে-সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লাগলো—টোবা টেক সিং গ্রামেই তার বাড়ি। কিন্তু কেউ তার কোনো খোঁজ রাখে না, কেউ জানে না টোবা টেক সিং পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে, আর সে তাতে আরো বেজায় বিচলিত হয়ে পড়ে। কয়েকজন ব্যাপারটা খোলসা করে বোঝাতে গিয়ে নিজেরাই বিষম ধাঁধায় পড়ে গেলো, কারণ তারা শুনেছে যে শিয়ালকোট শহর, সেটা এককালে একটা ভারতীয় শহর ছিলো, সে নাকি এখন পাকিস্তানে পড়েছে। এই অবস্থায় কে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে লাহোর, যা কিনা এখন পাকিস্তানে আছে, সে কখনো ভারতে চলে যাবে না;অথবা আস্ত ভারতই যে কখনও পাকিস্তানের অংশ হয়ে যাবে না, তা-ই বা কে জানে? কিংবা কেউ কি হলফ করে বলতে পারে যে ভারত-পাকিস্তান চিরদিনই থাকবে এই ধরাতলে—কোনোদিন তারা পৃথিবীর বুক থেকে বেমালুম হাপিশ হয়ে যাবে না!

শুকনো আর অগোছালো থাকতো বলে, এই শিখ পাগলের চুল পড়ে গিয়েছিলো। ক্বচিৎ সে স্নান করতো, তার পাকানো দাড়ি আর সামান্য যা দু-এক গাছা চুল ছিলো, সব কেমন জট পাকিয়ে গিয়েছিলো। এমনিতে গোবেচারি দেখতে হলে কী হবে, এ-সবের জন্যেই তাকে কেমন ভয়ংকর দেখাতো। কিন্তু গত পনেরো বছরে কারু সঙ্গে তার কখনো কোনো তর্কাতর্কি বা ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। পাগলাগারদের পুরোনো কর্মচারীরা তার সম্বন্ধে এইটুকুই

জানতো যে টোবা টেক সিং-এ তার নাকি বিস্তর জমিজিরেত ছিলো। সম্পন্ন চাষী হিশেবে দিব্যি দিন কাটছিলো তার, যখন আচমকা একদিন তার মাথাখারাপ হয়ে যায়। তারপর তার কয়েকজন আত্মীয় তাকে ভারি শেকলে বেঁধে পাগলাগারদে নিয়ে আসে। তাকে ভর্তি করে নেয়া হয়। মাসে একবার তার আত্মীয়রা আসে তাকে দেখতে, অবস্থার কোনো উন্নতি হলো কী না খোঁজ নেয়। এই সূচি অনুযায়ীই চলছিলো এতগুলো বছর, কিন্তু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হবার পর ব্যবস্থাটা বিগড়ে যায়। তারপর একসময় তাকে এখানে দেখতে আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

এই শিখের নাম বিষণ সিং, কিন্তু সবাই তাকে ডাকতো টোবা টেক সিং বলে। সময় সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই ছিলো না; সময় কাকে বলে, তা-ই যেন তার মাথায় ঢুকতো না; এটা কোন মাস, কোন বছর, সে এখানে ভর্তি হবার পর কত বছর কেটে গেছে, সে-সব কিছুই সে জানতো না। কিন্তু কেমন করে যেন সে টের পেয়ে যেতো মাসের কবে তার আত্মীয়-বন্ধুরা তাকে দেখতে আসবে, আর প্রধান ওয়ার্ডারকে সে এজন্যে তৈরি থাকতে বলে দিনটা মনে করিয়ে দিতো। যেদিন তাকে দেখতে আসবে সেদিন সে ভালো করে স্নান করতো, অনেকক্ষণ ধরে গায়ে সজোরে সাবান ডলতো, তেল মেখে দু-চার গাছা চুলই আঁচড়ে নিতো। তারপর সে নিজের জামাকাপড় চেয়ে নিতো। আর সেজেগুজে তার অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতো। কিছু বললে সে হয় চুপ করে থাকতো, নয়তো বলে উঠতো 'পারডি, গুড-গুড ডি, আফেকাস ডি, হেভিয়ানো ডি, মুণ্ড ডি ভাল অভ দি ল্যান্টার্ন।'

বিষণ সিং-এর এক মেয়ে ছিলো, এখন সে সুন্দরী এক পঞ্চ দশী কিশোরী। সে মাঝে-মাঝেই বাবাকে দেখতে আসতো, কিন্তু এই কিশোরী যে কে, এ-সম্বন্ধে বিষণ সিং-এর কোনো ধারণাই ছিলো না। কিন্তু সেই শৈশব থেকেই বাবার মুখোমুখি হলেই আজও এই মেয়ে অঝোর ধারায় চোখের জল ফ্যালে।

ভারত পাকিস্তান বিষয়ে আলোচনা যখন এতই তুঙ্গে উঠেছে, আর তাকে এড়ানো যাচ্ছে না, বিষণ সিং সববাইকে টোবা টেক সিং কোথায় এই প্রশ্ন জিগেস করতে লাগলো। কিন্তু সন্তোষজনক কোনো উত্তর না-পেয়ে তার অস্থিরতা দিনে-দিনে কেবল বেড়েই চললো। তার মেয়ে এবং অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুদের আসাতেও আচমকা ছেদ পড়েছে। শুধু তা-ই নয়, অ্যাদ্দিন ধরে মনের মধ্যে আগে তাকে যে-স্বর বলে দিতো যে আজ তার প্রিয়জনেরা তাকে দেখতে আসবে, সেই স্বরটাও যেন হারিয়ে গিয়েছে, তার কোনো সাড়া নেই আর। এখন সে আগের চাইতে আরো উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে বন্ধুদের দেখা পাবার জন্যে, তাদের শুভেচ্ছা, তারা প্রতিবারই যে-সব ফলমূল, মণ্ডামেঠাই আর জামাকাপড় নিয়ে আসে—সে-সব পাবার জন্যে সে এখন দারুণ উৎসুক হয়ে থাকে। তার কেমন যেন মনে হতে থাকে যে একমাত্র এরাই ঠিক করে জানতো টোবা টেক সিং সত্যি কোথায়—ভারতে না পাকিস্তানে, কারণ মনে-মনে সে কেমন করে যেন জানে যে, এরা আসতো টোবা টেক সিং থেকেই, যেখানে এককালে তার বিস্তর জমিজিরেত ছিলো।

পাগলাগারদের এক বদ্ধ উন্মাদের ধারণা ছিলো যে সে-ই হচ্ছে স্বয়ং 'খোদাতালা'। একবার যখন বিষণ সিং তাকে বললে টোবা টেক সিং-এর হেঁয়ালিটার সমাধান করে দিতে, 'খোদাতালা' হো-হো করে হেসে উঠলো, অট্টহাসিটাই তার অভ্যেস, 'এ পাকিস্তানেও নয়, ভারতেও নয়—কারণ টোবা টেক সিংকে যে কোথায় ফেলা হবে, সে-সম্বন্ধে কোনো হুকুমই আমি এখনও দিইনি।'

বিষণ সিং 'খোদাতালা'র হাতে-পায়ে ধরে কতরকম কাকুতিমিনতি করলে, বললে, যে এক্ষুনি যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে চিরকালের মতো ঠিক করে ফেলা হয় টোবা টেক সিং কোথায়। কিন্তু 'খোদাতালা' সবসময়েই এমন

ভঙ্গি করলে যেন সে ভয়ানক ব্যস্ত—একটু হাঁফ ছাড়বারও তার ফুরসৎ নেই। সব সময়েই 'খোদাতালা' তাকে এই বলে এড়িয়ে যেতে লাগলো যে সে এখন দারুণ জটপাকানো সব সমস্যা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। শেষে বিষণ সিং একদিন 'খোদাতালা'র ওপর দারুণ চটে গিয়ে চীৎকার করে উঠলো, 'ও পারডি, গুড-গুড ডি, আফেকাস ডি, হেভিয়ানা ডি, মুগু ডি ডাল অভ ওয়া-ই-গুরুজি ডি খালসা আউর ওয়া-ই-গুরুজি ডি ফতেহ, জো বোলে সো নিহাল, সৎশ্রী আকাল।' হয়তো সে 'খোদাতালা'কে বলতে চাচ্ছিলো যে, তোমার কর্তৃত্ব শুধু মুসলমানদের ওপরেই খাটে। তুমি যদি শিখদেরও 'খোদাতালা' হতে তাহলে তুমি এমনভাবে আমার কাকুতিমিনতি এড়িয়ে যেতে পারতে না।

পাগলদের বদলাবদলি শুরু হবার দিন কয়েক আগে, টোবা টেক সিং থেকে বিষণ সিং-এর এক মুসলমান বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। সে যেহেতু আগে কখনও তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি, বিষণ সিং তাকে দেখেও মোটেই পাত্তা দেয়নি, বরং ভেতরে চলে আসার জন্যে পেছন ফিরছিলো। কিন্তু পাহারাওলা তাকে থামালে, 'এ তোমার বন্ধু ফজল দীন, কতদূর থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।' বিষণ সিং তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কী-সব বিড়বিড় করতে লাগলো। ফজল দীন এগিয়ে এসে বিষণ সিং-এর কাঁধে হাত রেখে বললে, 'কত ভাবি একদিন এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবো কিন্তু কেমন করে যেন কিছুতেই আর সুযোগ হয়ে ওঠে না। আজ তোমাকে এই খবরটাই দিতে এসেছি যে তোমার আত্মীয়স্বজনরা সবাই নিরাপদে সীমান্ত পেরিয়ে হিন্দুস্থানে চলে গিয়েছে...আমার যতদুর সাধ্যি, তাদের সাহায্য করবার চেষ্টা করেছি। আর তোমার মেয়ে রূপ কাউর...' কী-একটা বলতে গিয়ে ফজল দীন চট করে কথাটা গিলে ফেললে। বিষণ সিংকে দেখে মনে হচ্ছিলো সে যেন প্রাণপণে কী-একটা কথা মনে করবার চেষ্টা করছে। 'ও...হ্যাঁ, সেও ভালো আছে, আর অন্যদের সঙ্গে সেও হিন্দুস্থান চলে গিয়েছে', তার প্রাথমিক দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠে ফজল দীন বললে।

বিষণ সিং চুপ করেই রইলো। ফজল দীন বলে চললো, 'তোমার আত্মীয়রা আমায় তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলে গেছে। তো, এখন তো শুনছি, তুমিও হিন্দুস্থানে চলে যাচ্ছো; তাহলে গিয়ে, ভাই বলবীর সিং, ভাই ওয়াধাওয়া সিং আর বহিনজি অমৃত কাউরকে আমার সালাম জানিও। ভাই বলবীর সিংকে বোলো যে ফজল দীন ভালোই আছে, আর সে যে দুই খয়েরি রঙের মহিষানি রেখে গিয়েছিলো তাদের বাচ্চা হয়েছে। একজন বাচ্চা দিয়েছে মাদি—সে মাত্র ছ-দিন বেঁচে ছিলো, অন্যটা এক মদ্দা বাচ্চা দিয়েছে। এখন যখন তোমার সঙ্গে ওদের সবার আবার দেখা হবে ওদের বোলো যে ওদের কোনো কাজে লাগতে পারলে আমি সবসময়েই খুব খুশি হবো। আর, ও, হ্যাঁ, এই-যে, আমি তোমার জন্যে কিছু মারওয়াভা এনেছি।'

বিষণ সিং তার কাছ থেকে মেঠাই-এর ঠোঙাটি নিয়ে পাহারাওলার হাতে তুলে দিলে, ফজল দীনকে জিগেস করলে, 'টোবা টেক সিং কোথায়?'

'কোথায় আবার? যেখানে ছিলো, সেখানেই আছে।' ফজল দীন আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলো। এ-রকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে সে খানিকটা হতভম্বই হয়ে গেছে। 'সে কি পাকিস্তানে, না ভারতবর্ষে?' বিষেণ সিং আবারও জিগেশ করলে। 'ভারতবর্ষে? না, না, পাকিস্তানে', উত্তর দিলে ফজল দীন। বিষণ সিং যে কেন শুধু এই খবরটাই এত করে জানতে চাচ্ছে, সেটা সে আদপেই বুঝতে পারছিলো না। বিষণ সিং তখন বিড়বিড় করে বলতে-বলতে

চলে গেলো : 'ও পারডি, গুড-গুড ডি, আফেকাস ড্রি বোধিয়ানা ডি, মুগু ডি ডাল অভ ডি পাকিস্তান আউর হিন্দুস্থান অভ দূর ফিট্‌টে মুন্‌হ্।'

বদলাবদলির জন্যে সব প্রাথমিক ব্যবস্থাই অবশেষে সুসম্পন্ন হয়েছে। কোন-কোন পাগল আসবে, কোন-কোন পাগল চলে যাবে, তার ফর্দ বিলি করা হয়েছে, এবং অবশেষে এলো সেই দিন।

কনকনে শীত, শীতকালের এটাই সবচেয়ে কড়া সময়। বাসের পর বাস ভর্তি করে হিন্দু আর শিখ পাগলদের নিয়ে কয়েকজন অফিসার কড়া পুলিশ পাহারায় লাহোর পাগলাগারদ ছেড়ে সীমান্তের দিকে চললেন। ওয়াগা সীমান্তে দুই দেশের সুপারিনটেন্ডেন্টদের মধ্যে বৈঠক হলো, তার পরই কাজ শুরু হয়ে গেলো। কাজ চললো সন্ধে অব্দি, তারপর সন্ধে পেরিয়ে মাঝরাতও কেটে গেলো।

পাগলদের বুঝিয়ে-শুঝিয়ে বাস থেকে নামিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন দেশের কর্মচারীদের কাছে তুলে দেয়া দেখা গেলো দারুণ কঠিন কাজ। অনেকেই বাস থেকে নামতে একবাক্যে অস্বীকার করলে। যারা নেমে এলো, তাদের সামলানো দেখা গেলো আরো কঠিন। খোলামেলায় নেমেই, তারা যে যেদিকে পারে ছুট লাগালো। এই পাগলদের মধ্যে কেউ-কেউ অ্যাদ্দিন জামাকাপড় না-পরেই দিন কাটিয়েছে, তাদের পোশাক পরানো এক গলদঘর্ম ব্যাপার। কেউ-কেউ চেঁচিয়ে গান জুড়ে দিলে, অন্যরা তোড়ে গালাগাল দিয়ে চললো সববাইকে। এই কানে তালাধরানো গোলমালের মধ্যে কিছুই ভালো করে বোঝবার জো ছিলো না। তার ওপর আবার জেনানা পাগলদের শোরগোল চ্যাঁচামেচি ও হুলস্থুল কাণ্ডটাকে আরো জোরদার করে তুললো।

চেনা পরিবেশ থেকে তাদের উপড়ে নিয়ে কোথায় যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বেশির ভাগ পাগলেরই এটা পছন্দ হয়নি। কোনো-কোনো পাগল আবার মাঝেমাঝে জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে পায়, কেউ-কেউ আবার দারুণ সেয়ানাও, তারা দু দলে ভাগ হয়ে গিয়ে জিগির তুললো : 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ!' অথবা 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ!' অবস্থাটা এমন চরমে গিয়ে পৌঁছুলো যে এই বুঝি রক্তারক্তি দাঙ্গা বেধে যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগেই দাঙ্গাটা ঠেকানো গেলো।

যখন বিষণ সিং-এর পালা এলো, এবং কর্মচারীরা নানারকম নথি পূরণ করতে লাগলো, বিষণ সিং তাদের একজনকে জিগেস করলে, 'টোবা টেক সিং কোথায়? পাকিস্তানে, না হিন্দুস্থানে?' কর্মচারীরা হো-হো করে হেসে উঠলো, বললে, 'পাকিস্তানে।' এই শুনেই বিষণ সিং হাত ছাড়িয়ে তার পুরোনো ইয়ারদোস্তদের কাছে ছুটে চলে গেলো। পাকিস্তানি পাহারাওলারা যখন তাকে ঠেলে অন্যদিকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, সে এক ইঞ্চি ও নড়লো না, ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। 'টোবা টেক সিং কোথায়, আমি জানি।' সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার জুড়ে দিলে : 'ও পারডি, গুড-গুড ডি, আফেকাস ডি, হেভিয়ানা ডি, মুগু ডি ডাল ডি অভ টোবা টেক সিং আউর পাকিস্তান!'

সীমান্ত পেরুবার জন্যে সবাই মিলে তাকে যা-যা করা যায়, তা-ই করলে; অনুনয়-বিনয়, জোর-জুলুম, ধাক্কাধাক্কি, যুক্তি-জবরদস্তি। কর্মচারীরা বললে, 'দ্যাখো, টোবা টেক সিং আগেই হিন্দুস্থান যাবে বলে রওনা হয়ে গেছে। দৈবাৎ যদি এখনও না গিয়ে থাকে, তবে শিগগিরই ওখানে পৌঁছে যাবে।' কিন্তু এ-সব কথার কোনো প্রতিক্রিয়াই হলো না তার ওপর। তারা যখন গায়ের জোরে তাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, সে দৃঢ়ভাবে অটল হয়ে তার ফুলে-ওঠা পা রাখলে ঐ না-পাকিস্তান না-হিন্দুস্থান মাঝখানের জমিটায়—যেন সে ঘাড় শক্ত করে প্রতিরোধের যুদ্ধ শুরু করেছে, কার সাধ্য তাকে নিয়ে যাক দেখি ওদিকে! লোকটা যেহেতু এমনিতে নিরীহ আর

নির্বিরোধ, কারু কোনো ক্ষতি করবে না, তারা তাকে আর জোর-জুলুম করার চেষ্টা করলে না।

সূর্য ওঠবার কিছুক্ষণ আগে, তখনও ঠায়-দাঁড়িয়ে-থাকা বিষণ সিং-এর গলা চিরে একটা তীব্র বিলাপ বেরিয়ে এলো। কর্মচারীরা, কর্তারা, সবাই ছুটে এলো ঊর্ধ্বশ্বাসে। দেখতে পেলে যে-লোকটা গত পনেরো বছর দিনরাত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কাটিয়েছে, সে পড়ে আছে জমির ওপর, উপুড় হয়ে। তার পেছনে কাঁটাতারের বেড়া, সেদিকে ভারতবর্ষ। সামনে ঐরকমই আরেকটা কাঁটাতারের বেড়া, তার ওপাশে পাকিস্তান। মাঝখানে, যে-জায়গাটা কোনো দেশেরই নয়, সেখানে পড়ে আছে বিষণ সিং বা টোবা টেক সিং-এর মৃতদেহ।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

❒

২.১ ❒ কাহিনির পরিপ্রেক্ষিত

'টোবা টেক সিং' গল্পটির প্রেক্ষাপট ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের 'উপহার'-স্বরূপ প্রাপ্ত দেশভাগ। দেশবিভাগের জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে বিশেষ করে বাংলা, উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা ছোটগল্পগুলি। আসলে রাজনৈতিক প্রয়োজনে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়েছিল একদিকে পাঞ্জাব, অন্যদিকে বাংলাদেশ। এই দুটি প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভৌগোলিক পরিচয়ে দুটি ভিন্ন দেশের মধ্যে বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল।

তাই বাঁটোয়ারা হয়ে-যাওয়া প্রদেশের প্রেক্ষিতে লেখা গল্পের মধ্যে মর্মস্পর্শিতার ছাপ সবচেয়ে বেশি ; 'টোবা টেক্ সিং' গল্পটিও সেই বর্গেরই। এই গল্পটির বিশেষত্ব আরো একটি জায়গায়—এই গল্পের স্রষ্টার বেদনার্ত ও নিগৃহীত মনটিকেই প্রকাশিত হতে দেখা যায় লেখার মধ্যে। আসলে ঐ বিভাজনের নির্মম অভিঘাত অন্য অনেক লেখকদের মতোই প্রত্যক্ষভাবে নিজের জীবনের ওপর পড়তে দেখেছিলেন গল্পকার সাদত হাসান মান্টো। উর্দুতে দেশভাগ ও দাঙ্গা নিয়ে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি গল্প তিনিই লিখেছেন। তদানীন্তন বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতের ধর্মীয় সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও নীচতায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি পাকিস্তানে চলে গেছিলেন—মুসলিম রাষ্ট্রে নাম-পরিচয়ে অনেক সুস্থির থাকবেন এই ভেবে। কিন্তু তাঁর জন্মের, পরিচয়ের শিকড় থেকে গেছিল খণ্ডিত ভারতবর্ষেই। তাই কোনোদিনই নিজেকে পাকিস্তানের মানুষ বলে ভাবতে পারেননি। অস্তিত্বের সংকটে ভুগেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। এই সংকট শুধু মান্টোর নয় —দেশবিভাজনের অভিঘাতে ভিটেমাটি ছেড়ে উৎখাত হয়ে 'পর'-দেশে চলে যেতে বাধ্য হওয়ায় এমন অস্তিত্বজনিত সংকটে ভুগেছেন বহু মানুষই।

২.২ ❒ কাহিনি-সংশ্লেষ

আলোচ্য গল্পটিতে সেই অস্তিত্বের সংকটই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। আর সেইটিই ব্যক্ত হয়েছে মুখ্যচরিত্র পাগল বিষণ সিং-এর মাধ্যমে, বা বলা যেতে পারে যে, মান্টোর অস্তিত্বের সংকটই যেন প্রতিভাসিত বিষণের মাধ্যমে। দেশবিভাগের আগে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় বিষণ সিং ছিল 'অখণ্ড' ভারতভূমির 'টোবা টেক সিং' নামক এক গ্রামের জমিদার। মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটায় তাকে নিয়ে যাওয়া হল একটি পাগলাগারদে চিকিৎসার জন্য। দেশবিভাগের পরে সরকারী সিদ্ধান্তে যখন কয়েদি বিনিময় শুরু হলো খণ্ডিত দেশ ও সদ্যোজাত দেশটির

মধ্যে, তখন দুপক্ষের সরকারী মাথারা ঠিক করলেন দুদেশের পাগলদেরও বদলাবদলি করা উচিত। অর্থাৎ ভারতবর্ষের পাগলাগারদের মুসলমান পাগলরা চলে যাবে পাকিস্তানে, আর সেখানকার পাগলাগারদের শিখ ও হিন্দু পাগলরা চলে যাবে ভারতে। এই খবর বিষণ সিং-(তখন সে তার নিজের নাম ভুলে যাওয়ায়, সবাই তাকে ডাকে 'টোবা টেক সিং' বলে)-এর কানে এসে পৌঁছোলে সে জানতে চায় 'টোবা টেক সিং' কোথায়? উত্তরে, সেটি যেখানে ছিল সেখানেই আছে জেনে ভারি আশ্বস্ত হয় সে। এরপর আসে পাগল-বিনিময়ের নির্ধারিত দিনটি। রাতের আঁধারে সীমান্তে এসে দুপক্ষ মিলিত হয়। পাগলদের বাস থেকে নামিয়ে ওপারে পাঠানোয় দেখা দেয় মহা হাঙ্গামা। বেশির ভাগ পাগলেরই পছন্দ হয় না যে চেনা পরিবেশ থেকে তাদের উপড়ে কোথায়-না-কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের এই আপত্তির কারণ এই জন্যেই যে তারা শুনেছে যে, শিয়ালকোট শহর এককালে ভারতীয় শহর ছিল, সেটা নাকি এখন পাকিস্তানে পড়েছে। তাদের ভয় হয়—এই অবস্থায় কেউ কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে যে লাহোর, যা কিনা এখন পাকিস্তানে পড়েছে, সেটা কখনো ভারতে চলে যাবে না—অথবা আস্ত ভারতই পাকিস্তানের অংশভুক্ত হয়ে যাবে কিনা তারও কোনো ঠিকানা নেই।—তাহলে এই সব টানাপোড়েনে আসলে কোথায় থাকবে এইসব পাগলরা? সরকারী কর্মচারীরা বিষণ সিংকেও জানায় 'পাকিস্তানে' পড়েছে তার 'টোবা টেক সিং' যা কিনা আগে ছিল ভারতবর্ষে। 'টোবা টেক সিং' যেখানে ছিল, সেখান থেকে 'অন্য কোথাও' চলে গেছে শোনবামাত্র সে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে—এমনিতেই পাগলাগারদে কাটানো দীর্ঘ পনেরোটা বছর সে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে— কেউ কখনো তাকে শুতে দেখেনি। ফলে পাদুটো ফুলে শক্ত হয়ে গেছে তার—মাটি থেকে নড়ানো খুবই কঠিন। —তো, এই পরিস্থিতিতে তাকে সীমান্ত পার করবার জন্য সবাই মিলে প্রথমে অনুনয়-বিনয়, তারপর জোরজুলুম, তারপর ধাক্কাধাক্কি, জবরদস্তি করেও কোনো ফল হলো না। সে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দুটি দেশের সীমানায় মধ্যবর্তী নামহীন জায়গাটিতে তথা No man's land-এ। এবারে চলতে লাগল অবাধে পাগল-বিনিময়। সূর্যোদয়ের খানিক আগে একটি আর্ত চীৎকার করে পনেরো বছর ধরে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল। তার ধরাশায়ী শরীরের দুইপ্রান্তে রইল দুদেশের সীমানা-নির্ধারক কাঁটাতারের বেড়া আর যথাক্রমে দুদেশের সরকারী কর্মচারী ও. পাগলরা।

৩.১ ❑ কাহিনি-বিশ্লেষণ

অর্থাৎ টোবা টেক সিং ওরফে বিষণ সিং পড়ে রইল এমন একটা ভূমিতে—যা না পাকিস্তানে, না হিন্দুস্থানে। তার এই শেষ আশ্রয় হলো সেই মুক্তাঞ্চলে যা কোনো দেশের, রাজনীতির কি ধর্মের নয়—এমনকি মানুষেরও নয়—কারণ সেটি হল 'No man's land', অর্থাৎ 'কোনো মানুষের মালিকানাবিহীন ভূমি।' সেখান থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক স্বার্থপ্রসূত সরকারী নিয়মে একটি মানুষকে তার শিকড়, তার জন্মভূমি কি তার অস্তিত্বের সঠিক অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আসলে বিষণ সিং-এর নিজস্ব অস্তিত্ব প্রথমে লুপ্ত হয়েছিল 'টোবা টেক সিং' নামের আড়ালে। তবু নিজের না হোক মাতৃভূমির পরিচয়ে অন্তত সে বেঁচে থাকছিল। নইলে পাগলাগারদের বন্দীদের পরিচয় হয় নিছক একটি সংখ্যার দ্বারা। কিন্তু দেশবিভাগের পরে যখন সে জানল তার মাতৃভূমির পরিচয়টাই বদলে গেছে, তখন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতেও সে অনুভব করল নিজের সংকট : মাতৃভূমির পরিচয়ই যদি

বদলে যায়, তাহলে এবারে কোন্ পরিচয়ে সে বাঁচবে? তার থেকেও বড়ো সমস্যা হল, যে নিজেই এখন 'টোবা টেক সিং'-এর প্রতীক, সেই জায়গার পরিচয়ই যদি বদলে যায়—যদি সেটা 'অন্য জায়গায়' চলে গিয়ে থাকে, তাহলে তো সেটা আর 'টোবা টেক সিং' থাকে না—হয়ে যায় একটা অচেনা জায়গা—যার সঙ্গে বিষণের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না; তাহলে সে কী করে সেখানে থাকবে, কী সূত্রেই বা তার নাম 'টোবা টেক সিং' হবে? সে তো এখন আর বিষণও নয়—তাহলে? নামবিহীন ও অবস্থানবিহীন হয়ে, অপরিচিত লোকেদের, অচেনা 'জায়গায়' তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।—এরই প্রতিবাদে সে দাঁড়িয়ে পড়ে No man's land-এ—যেটা চেনা-অচেনার গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়-যে জায়গায় পরিচয় কখনো বদলাবে না—যেটা কখনো 'অন্য জায়গায়' চলে যাবে না। তার মতো নামহীন, 'ভূমীহীন, লোকেদের জন্য নিঃসন্দেহে এইটিই আদর্শস্থান ।

৩.২ ◻ লেখকের আত্মবীক্ষণ এবং উপলব্ধির সূচনা

অস্তিত্বের এই সংকটময় অবস্থান আসলে মান্টোর নিজেরই। আলোচনার গোড়াতেই বলা হয়েছে যে পরিস্থিতির সঙ্গে সমঝোতা করতে না পেরে মান্টো পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁর হৃদয় পড়েছিল ভারতেই। তাই মৃত্যুর দিন অবধি নিজেকে ভারতীয় বলেই ভাবা মানুষটির শারীরিক অবস্থান তাঁকে এতটাই যন্ত্রণা দিয়েছিল যে দিনভর নেশাগ্রস্ত থেকে তিনি সেই শোক ভোলার ব্যর্থ প্রয়াস করেছিলেন। এ যেন তাঁর গল্পের নায়কের মতোই অস্তিত্বের অবস্থানগত সংকট—দৈহিক অবস্থানের সঙ্গে মানসিক অবস্থানের বিরোধ। কিন্তু গল্পের নায়ক 'পাগল' হবার সুবাদে 'সুস্থ'-জগতের নিয়মভঙ্গ করে শান্তি খুঁজতে যেতে পারে 'No man's land'-এর পরিচয়হীনতার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। আর 'সুস্থ' হবার অপরাধে তার স্রষ্টাকে জীবন অতিবাহিত ও বিসর্জন দিতে হয় 'পরদেশে'। —আর ঠিক এই সূত্রেই মান্টো এক নির্মম কশাঘাত করেছেন তথাকথিত 'সুস্থ' মানুষদের। বস্তুত এই গল্পটিতে নানা ধরনের একাধিক পাগলের প্রসঙ্গ আছে যারা 'টোবা টেক সিং'-এর সঙ্গে জেলে বন্দী ছিল। তাদের অসংলগ্নতা, অপ্রকৃতিস্থতা সবই তাদের মানসিক বৈকল্যের পরিচায়ক। কিন্তু তাদের 'বিকৃত' মস্তিষ্কের পাগলামির মধ্যে দিয়েই তারা তথাকথিত 'সুস্থ'-মস্তিষ্কওয়ালা ক্ষমতাসীন পণ্ডিত ও আমলাদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছে যে বাঁটোয়ারা করা যায় সবকিছুই—শুধু যায় না 'মানুষ' নামক সত্যটিকে ; কারণ জোর করে কোনো রাজনৈতিক স্বার্থপ্রসূত সরকারী নিয়ম চাপিয়ে দিয়ে মানুষকে তার শিকড়, তার জন্মভূমি কি তার অস্তিত্বের সঠিক অবস্থান থেকে উপড়ে নেওয়া যায় না—যেমন যায়নি বিষণ সিং ওরফে টোবা টেক সিংকে। তাই 'পাগল' যারা, তারাই আসলে এখানে সেই হৃদয়ানুভূতি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে—যে বোধ থেকে বঞ্চিত তাদের তথাকথিত 'সুস্থ' অধিকর্তারা। কারা যে 'আসল পাগল', আর কারা যে 'আসলে স্বাভাবিক'—পরোক্ষ ব্যঙ্গের চাবুকে তা যেন মূর্তিমন্ত করে তুলেছেন মান্টো আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মপ্রতিকল্পরূপ বিষণ সিংকে তার শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন না করে চরিতার্থ করেছেন তাঁর গর্বকে, তাঁর স্বপ্নকে যা তাঁর জীবদ্দশায় অপূর্ণ থেকে গেছে। তিনি শিকড় থেকে উৎপাটিত হয়ে গেলেও, বিষণ সিং পেরেছে আক্ষরিক অর্থে পা-শক্ত করে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বকে জানান্ দিতে; আর এর জন্যই মান্টো বেছে নিয়েছেন পাকিস্তান নয়, ভারতবর্ষও নয়—'No man's land'-কেই, কারণ ওই দুটি দেশই মানবিকতার অবমাননার জন্য সমান দোষী তাঁর চোখে। তার এই প্রতিবাদ ও বিজয় আসলে মান্টোরই দার্শনিক বিজয় হয়ে

এই গল্পটিকে করে তুলেছে মর্মস্পর্শী ও রাজনৈতিক অপচেষ্টার প্রতিবাদের প্রতীকস্বরূপ—যার মাধ্যমে পাঠকরা স্পর্শ করতে পেরেছেন গল্পকার মান্টোর ব্যক্তিগত বেদনাকেও।

৩.৩ □ কাহিনির-তত্ত্বপ্রতীতি

এই গল্পের অন্তর্লীন বেদনাকে মান্টো যেভাবে ব্যঙ্গনিপুণ শৈলীতে ব্যক্ত করেছেন, তা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় ঠিক ঐ একই, অর্থাৎ দেশভাগের, পরিপ্রেক্ষিতে লেখা অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি ছড়াকে :

"ভুল হয়ে গেছে বিলকুল।
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে,
ভাগ হয় নি কো নজরুল।"

অন্নদাশঙ্কর ছড়ার শেষে ঐ "ভুল"-টুকু 'বেঁচে থাকুক', এমনই আকাঙ্ক্ষা করেছেন, কারণ "আস্ত বাঙালি" একজনই আছে তাঁর বিচারে : নজরুল—যাঁকে দু-দেশই 'আপন' বলে মনে করে।...ঠিক সেই ভাবে, এই গল্পের বিষণ সিং ওরফে টোবা টেক সিংকেও একমাত্র 'আস্ত মানুষ' বলে মনে করলে হয়ত ভুল হবে না—কারণ নিজের অস্তিত্বকে জন্মভূমি আর বাসভূমির দ্বন্দ্ব পেরিয়ে সে স্বমহিম দৃঢ়তায় ঘোষিত করতে পেরেছে।

আসলে বিষণ সিং যেমন পাকিস্তানের না হিন্দুস্থানের—মান্টোও ঠিক তেমনিই ছিলেন জীবদ্দশায়। ভারতে জন্ম ও কর্ম সত্ত্বেও দেশবিভাগের পর ধর্মীয় বিদ্বেষের বলি হয়ে তাঁকে মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু 'শিকড়' উপড়ে গেলেও তার টান তিনি কোনোদিনই এড়াতে পারেননি। তাই পাকিস্তানে তাঁর শরীর থাকলেও মন পড়ে থাকত ভারতেই। মদের নেশায় নিজের সত্তার এই দ্বিখণ্ডীকরণ তিনি ভুলে থাকতে চাইতেন, পারতেন না। তাই শেষ অবধি তিনি না থাকতে পারলেন হিন্দুস্তানে, না মানাতে পারলেন পাকিস্তানে—অর্থাৎ কোনো দেশটিকেই আপন ভাবার অধিকার ও মানসিকতা (যথাক্রমে) তাঁর হলো না। তাই বিষণের ওই আপাত-নিরস্তিত্ব অবস্থানের সংকেতের মধ্যে দিয়ে স্বয়ং লেখকেরই আত্মপ্রকাশ হয়েছে বলে অনুভূত হয় সংবেদনশীল পাঠকের মনে।

কিন্তু 'টোবা টেক সিং' সত্যিই কোথায় তাহলে? 'টোবা টেক সিং' না সাবেক হিন্দুস্তানে, না বিভক্ত হয়ে-যাওয়া পাকিস্তানে—আসলে তার অবস্থান তো বিষণ সিংয়েরই মনে। তাই সে পাকিস্তান কি হিন্দুস্তান কোথাও না গিয়ে বেছে নিল "No man's land"—কারণ সেখানেই সে নিজের 'অন্তরের ম্যাপে' চিরবিরাজমান টোবা টেক সিং-কে সর্বদা অনুভব করতে পারবে। এখানেই তার দ্বি-ধাগ্রস্ত সত্তার পূর্ণতা।।

কনেদেখা

(পাঞ্জাবী)

অমৃতা প্রীতম

১.১ ❐ কাহিনি

এটা পৃথিবীর সব চাইতে দীর্ঘ এবং সব চাইতে সংক্ষিপ্ত কাহিনি।

গাঁয়ে বাকসির বাবার আশি একর জমি, কিন্তু তরুণ বাকসি ক্রমশই জমির কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলো।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে কাছেই একটা নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকে আর লক্ষ্য করে দূরের শহরটার আলোগুলোকে।

গ্রামটা একটু উঁচুতে থাকার দরুণ শহরটাকে মনে হয় যেন অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে ছোট্ট একটুকরো আলোকিত অঞ্চল। বাকসি এ কথাও জানে যে ওই শহরের পরেই রয়েছে এক ঝলমলে মহানগর।

সূর্যটা অস্তে যেতেই দূরের আলোগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর বাকসির মনে হয়, আলোগুলো যেন তাকে ডাকছে।

অবশেষে একদিন সে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললো। পা থেকে কাদামাটি ধুয়ে, নতুন জুতো পরে, অসন্তুষ্ট বাবা-মার কাছ থেকে কিছু টাকাকড়ি নিয়ে সে রওনা হয়ে গেলো শহরের পথে।

সে গ্রাম ছেড়ে এসেছিলো বাকসা হিসেবে, মিস্টার বাকসি হবার জন্যে তাকে পেরিয়ে আসতে হলো অনেক দীর্ঘ পথ।

দিল্লীর একটা বড়োসড়ো সচিবালয়ে মিস্টার বাকসি একটা চাকরি পেয়ে গেলো। সামান্য একটা কেরানি হলেও প্রতিদিন লাল পাথরে গড়া বাড়িটাতে ঢোকার সময় সে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। স্যুটবুট পরে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় অফিসে গিয়ে ঢুকলেও, তার ভেতরকার গ্রাম্য ছেলেটা প্রতিবারই বাড়িটাতে ঢোকার সময় তাকিয়ে থাকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে।

সহকর্মীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয় হলো। কিন্তু গাঁয়ের জাগিরা, যার নিজস্ব একটা ঘোড়া আছে আর কারমা, যে গ্রামের সব চাইতে বড়ো কুয়োটার মালিক—তাদের মতো বন্ধু একটিও হলো না। তার একমাত্র বন্ধু রইলো সে নিজে।

একদিন এক বিচিত্র খেয়ালে সে তার সহকর্মীকে বললো, "দিল্লী একটা অদ্ভুত শহর। এখানে নোংরা আছে, সরু রাস্তা আছে, প্রাসাদের মতো বাড়ি আছে, ফুলে-ভরা বাগান আছে আবার অনেক ধ্বংসস্তূপও আছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি নিজেই দিল্লী। এই দিল্লী শহরটা আমার মধ্যেই রয়েছে।" তার কথাগুলো আগুনের মতো সমস্ত অফিসে ছড়িয়ে পড়লো। সহকর্মীরা উপহাস করে তার নাম রাখলো, মিস্টার দিল্লী। সেই থেকে বাকসি নিজের সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই কোনোদিন কথা বলেনি।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সে ভাবে, খালি পায়ে ক্ষেতে কাজ করার সময়েও সে আকাশের দিকে হাত বাড়াতো। অথচ এমন মোজাপরা অবস্থাতেও তার পায়ের নিচ থেকে মাটিটা সরে গিয়ে, তাকে এমন করে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখছে

কেন। বহু বছর আগে গ্রামে স্কুলের কুর্সিগুলো তাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করতো। কিন্তু এখন পালা শেষ করে অফিসের কুর্সিতে বসে, তার সে আকর্ষণটা দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে।

বাকসির মনে হয়, তার সঙ্গী বাকসা—যে তার সঙ্গে শহরে এসেছিলো, সে ওকে ছেড়ে চলে গেছে। বাকসি ভাবে, "আসলে বাকসাকেই শহর টেনেছিলো। নইলে শহরে কিইবা এমন আছে! ঘড়ির দুটো কাঁটার মতো সময়টা আবার ঠিক একই জায়গায় ফিরে আসে। দিনের বেলা আমি এই ছোট্ট অফিস ঘরটাতে বন্দী হয়ে থাকি আর রাতে ওই ছোট্ট কুঠরিটা বন্দী করে রাখে আমাকে।"

বাকসি ভাবে, গ্রামে মোষগুলোর জন্যে ডালপালা কেটে দেবার সময় বইপত্র সব সময় তার দৃষ্টিকে আড়াল করে রাখতো। এখন তার টেবিলটা ফাইলে বোঝাই, ফাইলে অজস্র কাগজপত্র—অথচ ওদিকে সে তাকিয়েও দেখে না। বাকসি বুঝতে পারে, বই আর অফিস-ফাইলের মধ্যে একটা বিরাট প্রভেদ রয়ে গেছে। তাই সান্ধ্য-কলেজে যোগ দিয়ে সে তার বেশির ভাগ সময়টাই পড়াশুনোয় কাটাতে থাকে।

একদিন বাকসি একটা কবিতা সঙ্কলনের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এবারে তার পায়ের তলায় মাটিটা শক্ত হয়ে ওঠে। মাঝরাতে সে অনুভব করে, কবিতারও একটা শহর আছে, সে শহরের আলোগুলো অনেক বেশি ঝলমলে এবং তারা বাকসিকে নিজেদের কাছে টানছে।

সেই পথে মাইলের পর মাইল হেঁটে একদিন রাতে লেখিকার নামের দিকে চোখ পড়লো বাকসির। 'অমৃতা প্রীতম'। বইটা উলটে কবির ছবিটার দিকে তাকালো সে। অনুভব করলো, তার শরীরের ভেতর দিয়ে একটা শিহরন বয়ে গেলো। গ্রামেই তার যৌবন এসেছে। কিন্তু গ্রামের বা শহরের কোনো নারীই তার মধ্যে এ ধরনের অনুভূতি জাগিয়ে তোলেনি। জীবনে এই প্রথম একটি নারীর জন্যে তার সমস্ত দেহ মন আকুল হয়ে উঠলো। সারা রাত সে স্বপ্ন দেখলো, অমৃতা প্রীতমের হাতে সে মেহেন্দি লাগিয়ে দিচ্ছে, ছুঁতে চেষ্টা করছে ওর ওড়নায় বসানো নক্ষত্রগুলোকে।

পরদিন সকালে এবং পরপর অনেকগুলো সকালেই ঘুম ভেঙে বাকসির মনে হয়েছে অমৃতা প্রীতম যেন এইমাত্র তার ঘর থেকে বাইরে গেছে, তার বিছানায় তখনও ছড়িয়ে রয়েছে ওর অসংখ্য কবিতা।

দৈনন্দিন নিয়মমাফিক বিছানা ছেড়ে ওঠা, চা পান করা, ক্যান্টিনে খাওয়া, লাইব্রেরিতে পড়াশুনো করা—সমস্ত কিছুই যেন এক অপরূপ কবিতার চরণ হয়ে উঠলো তার কাছে।

তারপর আচমকা ঋতু পরিবর্তনের মতো এক নিবিড় শূন্যতা ঘিরে ফেললো তাকে। কুয়াশার মতো এক গাঢ় নৈঃশব্দ্য নেমে এলো বাকসির ওপরে, বৃথাই নিজের সচেতনতা ফিরে পাবার চেষ্টা করলো সে। হঠাৎ নৈঃশব্দ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে একটা আওয়াজ তার কানে এসে পৌঁছলো। আওয়াজটা লতা মঙ্গেশকারের—তার নতুন কেনা রেকর্ড প্লেয়ারে ওর গান বাজছিলো। নৈঃশব্দ্যের-কূপে-সাথীকে-ডাকা নাইটিংগেলের মতো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো ওর কণ্ঠস্বর।

রেকর্ডটা শেষ হয়ে আসতেই বাকসি ছুটে গিয়ে সেটাকে নতুন করে চালিয়ে দিলো—অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো রেকর্ডের খামে ছাপা লতা মঙ্গেশকারের মুখের দিকে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো সে, শুধু সুরের হিল্লোল ছড়িয়ে ছিলো তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। সেদিন এবং আরও অনেক রাত সে কাটিয়ে দিলো লতা মঙ্গেশকারের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে, ওর আঙ্গুলে বিয়ের আংটি পরিয়ে দেবার প্রচেষ্টায়। আর সোনার সুতোয় বোনা শাড়ি পরে লতা তার বিছানায় বসে গান গাইলো সারা রাত ধরে।

অনেকগুলো রাত লতা মঙ্গেশকারের কণ্ঠস্বরে ডুবে রইলো বাকসি। কিন্তু তারপর ফের আবিষ্কার করলো, নৈঃশব্দ্যের আরও গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে সে।

একদিন সকালে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে এক সুন্দরী মহিলার ছবির দিকে চোখ পড়লো তার। মহিলার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ছবিটার মতোই নিষ্পলক চোখে সে খবরটা পড়ে জানলো, ওটা এক বিখ্যাত নর্তকীর, 'মিস ইণ্ডিয়া' হিসেবে নির্বাচিতা ইন্দ্রাণী রহমানের ছবি।

সেদিন সারা রাত ধরে সে এক নর্তকীর পায়ের ছন্দে ছন্দে গাওয়া বিয়ের গান শুনলো, তার সাধারণ রাত্রিবাসটা হয়ে গেলো সুন্দর একটা রেশমি পোশাক, সমস্ত সময়টা সে কাটিয়ে দিলো ইন্দ্রাণী রহমানের জন্যে মুক্তো বেছে বেছে।

কোথায় সে যেন পড়েছিলো, ইন্দ্রাণী আধা-বাঙালি। তারপর থেকে সে রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে, ইন্দ্রাণীর দীর্ঘ কালো চুল থেকে ভেসে আসা নারকেলের গন্ধ পেত।

একদিন সকালে একটা নুড়িতে পা রেখেই সে স্তব্ধ হয়ে থেমে গেলো। কারণ তার মনে হয়েছিলো, ওটা ইন্দ্রাণীর নুপুর থেকে খসে পড়া একটা ঝুনঝুনি।

খবরের কাগজে আবহাওয়া-বার্তা থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে ওরা এমন সব খবর দেয়, যাতে আবহাওয়াই বদলে যায়। বাকসির কাছে এমনি একটা খবর হলো, ইন্দ্রাণী রহমান ইউরোপে চলে গেছে।

আবার শুরু হলো শূন্যতার দিন, আবার তাকে দাঁড়াতে হলো অনস্তিত্বের ওপরে। এখন তার পায়ের নিচে মাটি নেই, আকাশও নেই মাথার ওপরে।

বাতাসের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে একদিন জয়পুর ভবনের গ্যালারিতে নিজেকে আবিষ্কার করলো বাকসি। সেখানে দেয়ালে দেয়ালে ঝোলানো রঙের পৃথিবী। ওখানে কিছু কিছু মুখ বিষণ্ণ আর নিশ্চুপ, তাদের সঙ্গে নিজের এক আশ্চর্য সাদৃশ্য অনুভব করলো সে। ওখানেই ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতে পারতো বাকসি। কিন্তু একখানা বিশেষ ছবির মুখোমুখি হয়ে তার মনে হলো, সে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে অনন্তকাল ধরে। যেন মোহাবিষ্ট হয়ে ওখানেই নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। অবশেষে তত্ত্বাবধায়ক তার কাছে এগিয়ে এসে বললো, 'স্যার, বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। আপনি আবার কাল আসতে পারেন।'

কথাহীন-পরম-আবেশ থেকে নিজেকে টেনে এনে সে জিগেস করলো, 'ইনি কে?'

'আপনি জানেন না, স্যার?' তত্ত্বাবধায়ক অবাক হয়ে গেলো। 'এখানকার সমস্ত ছবিই তো ওর আঁকা। উনি বিখ্যাত শিল্পী অমৃতা শেরগিল।'

বাকসি অনুভব করলো ইন্দ্রাণী রহমান, লতা মঙ্গেশকার আর অমৃতা প্রীতমের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছিলো— এবারেও সেই একই অনুভূতি সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলছে তাকে। সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উঠছিলো, সানাইয়ের সুর শুনতে পাচ্ছিলো সে। ...কিন্তু আচমকা কবরের তীক্ষ্ণ হিমতা তাকে আঁকড়ে ধরলো। তত্ত্বাবধায়ক তখন বলছিলো, 'অমৃতা শেরগিল অনেক দিন হলো মারা গেছেন। খুব অল্প বয়সেই মারা গেছেন উনি। যদি বেঁচে থাকতেন...'

নিজের আত্মাটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে বাকসির নিজের দেহটাই যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সে চিৎকার করে বলে, 'কেন পৃথিবীতে আমি এতো দেরি করে জন্মালাম। বড্ডো দেরি হয়ে গেছে! পৃথিবীটা এখন প্রাণহীন...'

মাসের পর মাস কেটে যায়। বাকসির অবস্থা এখন দেহ-খুঁজে-বেড়ানো আত্মার মতো। ইতিমধ্যে সে মাস্টার্স

ডিগ্রীটা পেয়ে গেছে। একদিন আত্মদর্শনের সময় সে ভাবলো, 'হয়তো আমি কবি হতে চেয়েছিলাম, তাই কবিতার প্রতীক হিশেবে অমৃতা প্রীতমকে নিজের করে পেতে চেষ্টা করেছি...হয়তো আমার সুরবোধ ছিলো, তাই লতা মঙ্গেশকার আমাকে আকর্ষণ করেছে...হয়তো নৃত্যশিল্প আমাকে বিমুগ্ধ করেছিলো, তাই মুক্তো বাছার সময় আমি ইন্দ্রাণী রহমানকে আমার কনে বলে কল্পনা করেছি...হয়তো রঙের বর্ণালি আমাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলো, তাই আমি কল্পনা করেছিলাম অমৃতা শেরগিল...'

সব কটা নৌকা পুড়িয়ে দিয়ে নদীর ধারে বসে-থাকা মাঝির মতো সেদিন অফিসের কুর্সিতে বসেছিলো সে। ভাবছিলো, 'আমি একটা ব্যর্থতা। আমি কিছুই হতে পারিনি...আমি স্রেফ একটা অর্থহীন অস্তিত্ব!' অবহেলায় উড়ছিলো তার কাগজপত্রগুলো।

একদিন সে বাবা-মার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলো। তাঁরা ওকে মিনতি করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন বাড়িতে ফিরে যাবার জন্যে। হারমানা-হাতে পদত্যাগ পত্র লিখে, গ্রামে রওনা হলো বাকসি।

গ্রামে ফিরে বাবা-মা এবং জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করলো সে। তারপর ক্ষেতখামারের কাজে নিজেকে নিয়োগ করে বাবা-মার ইচ্ছে মতো গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে করলো।

বিয়ের রাতে কনের ঘোমটা খোলার জন্যে মা পরিবারের পুরুষানুক্রমিক পাঁচ টুকরো সোনা তার হাতে তুলে দিলেন। ওগুলোর মধ্যে থেকে চারটে টুকরো বেছে বাকিটা মার কাছে ফিরিয়ে দিলো সে। তারপর কনের কাছে এগিয়ে গিয়ে, বাসরশয্যায় বসে জীবনে বাস্তবতার আবরণ উন্মোচনের জন্যে একে তার স্বপ্নের চার কনের প্রতীক হিসেবে ওই চার টুকরো সোনা উপহার দিলো।

অনুবাদ : জয়া মিত্র

২.১ ◻ কাহিনি-সংশ্লেষ

চাষীঘরের ছেলে বাকসা মাটির কাছ থেকে সরে গিয়ে ক্রমেই কল্পনার রঙিন জগতে মগ্ন হয়ে পড়ছিল—গ্রামের নদীর ধার থেকে দেখা দূরবর্তী শহরগুলির আলোগুলো যেন তাকে ডাকতো ঐ জগতে সামিল হবার জন্য। অবশেষে একদিন সে পা থেকে কাদামাটি ধুয়ে নতুন বুটজুতো পরে শহরের পথে রওনা দিল রঙিন কল্পনার জগৎটির খোঁজে। শহরে পৌঁছে বাকসা হয়ে গেল মিস্টার বাকসি, দিল্লীর সচিবালয়ের স্যুটবুট পরা অফিসবাবু। যদিও জামার নীচে গ্রামের ভীতু বাকসা মাঝেমাঝেই জানান দেয় তার অস্তিত্ব। তাই শহুরে কোনো ছেলের সঙ্গেই তার নিছক পরিচয় পেরিয়ে বন্ধুত্ব হলো না—যেমনটি ছিল গ্রামের কারমা কি জাগিরার সঙ্গে। সে নিজের মধ্যে দিল্লী শহরের অবস্থান অনুভব করত আর প্রতিদিন মনে করত যে যখন সে খালিপায়ে থাকত, তখন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেও তার মোজাপরা পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে, আর তাকে যেন শূন্যে ঝুলে থাকতে হচ্ছে। বইপত্রে ডুবে গিয়ে সে চাইল শূন্যতাকে ভরাট করতে। নিঃসঙ্গতার মাঝে হঠাৎই একদিন তার হাতে এল অমৃতা প্রীতমের কবিতার বই। সারারাত কবিতা পড়ে সে অনুভব করে আবার যেন তার পায়ের তলায় জমির স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে—কবির ছবি দেখে জীবনে প্রথম তার দেহ-মন আকুল হয়ে উঠল। সে তারপর সারারাত স্বপ্ন দেখল যে প্রীতমের হাতে

সে মেহেন্দি লাগিয়ে দিচ্ছে। তার পর থেকে অনেকগুলো দিন ধরে তার পুরো জীবনটাই হয়ে দাঁড়াল যেন এক অপরূপ কবিতার চরণ। ঋতু পরিবর্তনের মতোই একদিন আবার বিষণ্ণতা গ্রাস করল তাকে। নিঃসঙ্গতার নৈঃশব্দ্যকে অবশেষে ভেঙে খান্ খান্ করল লতা মঙ্গেশকরের গান—রেকর্ডপ্লেয়ারের ধাতব আওয়াজ বেয়ে। লতা মঙ্গেশকরের ছবি দেখে আবারও বাকসি মগ্ন হলো—গায়িকার হাতের আঙ্গুলে বিয়ের আংটি পরিয়ে দেবার কল্পনায়। সুরের হিল্লোলে ভরে রইল তার অনেকগুলি দিন। তারপর আবারও যথানিয়মে এলো কল্পনার অপূর্ণতাজনিত নিঃসঙ্গতার নৈঃশব্দ্য। কিছুদিন পরে খবরের কাগজে সে অপূর্ব সুন্দরী নৃত্যশিল্পী 'মিস ইণ্ডিয়া' ইন্দ্রাণী রহমানের ছবি দেখল। তাঁর পায়ের ছন্দে ছন্দে তার সারারাত কেটে গেল। কান ভরে রইল বিয়ের গানের সুরে। তারপর খবর এল ইন্দ্রাণী ইউরোপে চলে গেছেন। আবার অনস্তিত্বতার শূন্যতায় ভরে উঠল তার দিন। একদিন জয়পুর ভবনের আর্ট গ্যালারিতে দেওয়ালে ঝোলানো রঙিন ছবির জগতে নিজেকেই যেন আবিষ্কার করলো বাকসি সেখানে একটি বিশেষ ছবির সামনে দাঁড়িয়ে। মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ল সে। তত্ত্বাবধায়ক জানালো ছবির নারীটি হলেন গ্যালারির অন্যসব ছবির শিল্পী অমৃতা শেরগিল। ঠিক আগের তিনবারের মতো এবারও সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল—রঙের পৃথিবী আর সানাইয়ের সুর তাকে আবিষ্ট করে দিতে শুরু করল—আচমকাই কবরের শীতলতা গ্রাস করল বাকসিকে যখন সে জানল শেরগিল অল্পবয়সেই মারা গেছেন।

এবার বাকসির মনে হয় যে তার টুকরো হয়ে যাওয়া দেহ থেকে আত্মাটা কেউ যেন শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছে। তার এত দেরি করে জন্মানো নিয়ে সে আক্ষেপে ফেটে পড়ে।—বিপর্যস্ত বাকসি এরপর মাস্টার্স ডিগ্রী পেয়ে যায় এবং আত্মদর্শনও হয় যে, নিজের কবি হবার আকাঙ্ক্ষায় যেমন কবিতার প্রতীক হিসেবে অমৃতা প্রীতমকে নিজের করে পেতে চেয়েছিল, ঠিক তেমনভাবেই অন্তর্লীন সুরবোধ ও নৃত্যশিল্পের প্রতি মুগ্ধতা অথবা রঙের বর্ণালির আকর্ষণের কারণেই লতা মঙ্গেশকর কি ইন্দ্রাণী রহমান কি অমৃতা শেরগিল-কেও কল্পনায় নিজের অস্তিত্ব এবং চেতনার সঙ্গে একাত্ম করতে চেয়েছিল, চেয়েছিল মানস ও জীবনসঙ্গী হিসেবে।—আজ সবকটা নৌকা পুড়িয়ে নদীর তীরে বসে- থাকা মাঝির মতো নিজেকে ভাবতে থাকে সে; নিজের ব্যর্থতা ও অস্তিত্বের অর্থহীনতায় সে ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বাড়ি থেকে এরপর ফিরে যাবার অনুরোধ ভরা চিঠি আসে। হেরে যাওয়া বাকসি চাকরি থেকে পদত্যাগ করে ফিরে গিয়ে বাবা-মা ও জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করে আবার যোগ দেয় ক্ষেতখামারের কাজে, বাবা-মায়ের পছন্দের মেয়ের সঙ্গেই একদিন বিয়েও হয়ে যায় তার। বিয়ের রাতে কনের ঘোমটা খুলতে পারিবারিক রীতি অনুসারে পাঁচ টুকরো সোনা তার হাতে দিলেন তার মা। চারটি বেছে নিয়ে পঞ্চ মটি মাকে সে ফিরিয়ে দিল। তারপর অবগুণ্ঠন খুলে জীবনের বাস্তবকে চাক্ষুষ দেখে, কনের হাতে বাকসি তার স্বপ্নের চার কনের প্রতীক স্বরূপ তুলে দিল বাকি চারটি সোনার টুকরো ।

২.২ ◻ গল্পের অন্তর্নিহিত জীবনসত্য

বাস্তবের কাছে তার এই অনিবার্য আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে লেখিকা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন মধ্যবিত্ত মানুষের মনের অন্তরালে সদাক্রিয়াশীল আকাঙ্ক্ষার আর অপারগতার আত্মবিভাজনকে। তাই যে বাকসি নিজের শূন্যতার ও একাকীত্বের বোধে জর্জরিত হয়ে নিজেকে ধ্বংসস্তূপ বলে অনুভব করে; সেই হতাশাগ্রস্ত মানুষটিই সামান্য ইন্ধনে

কল্পনার রোম্যান্টিকতায় ভেসে যায়। এই একই দ্বি-ধা লক্ষ্য করা যায় যখন স্বেচ্ছায় মাটির স্পর্শ ত্যাগ করতে জুতো মোজা পরে 'বাবু'-সাজা বাকসি ফিরে পেতে চায় সেই ভেজা জমিরই স্পর্শ—আর এইসব বিপরীত-মনস্কতায় গ্রস্ত হয়ে নিজের সমস্ত অস্তিত্বটিকে শূন্যে-ঝোলা ত্রিশঙ্কুর মতো বলে অনুভব করতে থাকে।

এরপর ঠিক মধ্যবিত্ত-সুলভ অনিবার্যতায় সেও পরিস্থিতির কাছে নতিস্বীকার করে—আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার অপারগতাকে মেনে নিয়ে সে গা ভাসায় সংসারের পরিচিত গড্ডলিকাস্রোতে—ত্রিশঙ্কু অবস্থার হয় অবসান। মোজাবিহীন খালি পা আবার স্পর্শ পায় ভিজে মাটির—মিস্টার বাকসি আবার ফিরে পায় তার আদি-অকৃত্রিম বাকসা সত্তা। কিন্তু যে রোম্যান্টিক কল্পনা, যে অচরিতার্থ স্বপ্ন তাকে 'দুদণ্ডের শান্তি' দিয়েছিল, তাকে সে ভুলতে পারে না—তাই জীবনের চরম বাস্তব, পরম সত্যের কাছে নিজেকে সমর্পণের মুহূর্তে সেই বাস্তবের প্রতিমারূপ অর্থাৎ তার স্ত্রীর হাতে তুলে দেয় চারখানি সোনার টুকরো—যেগুলি যথাক্রমে তার স্বপ্নের সেই চার নারীর প্রতীকস্বরূপ যাঁদের সঙ্গে কল্পনায় সে 'ঘর' বাঁধতে চেয়েছিল। এইভাবে তার সেই উপর্যুপরি অনিরসিত-থাকা আকাঙ্ক্ষার ডালি সে আক্ষরিক অর্থেই বিসর্জন দিল তার বাস্তবের কাছে। কিন্তু মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা তো মরেও মরে না—বস্তুত তাকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকতে চায় স্বপ্নভাঙা আপোষপ্রবণ মানুষগুলি। তাই শেষ তথা পঞ্চম খণ্ডটিকে সে সমর্পণ করে না তার 'বাস্তবের' হাতে। বাকি চার 'স্বর্ণ'-কন্যার কল্পনা ও তাদের স্মৃতি তার জীবন থেকে হারিয়ে গেলেও, অবিনশ্বর অথচ অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, উদ্বৃত্ত পঞ্চম খণ্ডটি সে ফিরিয়ে দেয় মায়ের হাতে। কারণ সে জানে রোম্যান্টিক কল্পনাপ্রসূত আকাঙ্ক্ষা ও আশা তার কোনোদিনই পূরণ হবে না। আর এইভাবে সত্যের কাছে অনিবার্য সমর্পণের ফলে স্বপ্নভঙ্গের বাস্তবতা এবং তা-সত্ত্বেও অলীক স্বপ্নকল্পনা—দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মানস-অবস্থানকে সে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আবারও মধ্যবিত্ত সুলভ দ্বি-ধা কেই প্রতিষ্ঠিত করে। বাস্তবের 'কনে'-কে 'দেখা' হলেও, তার মানসী 'কনে'-কে 'দেখা' আর কখনোই হবে না—পঞ্চম স্বর্ণখণ্ডটিকে সরিয়ে রেখে সেই নির্মম সত্যটিকেই যেন সে ব্যক্ত করতে চাইল নিজেরই কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে চাইল যে সুর, ছন্দ, কাব্য, বর্ণ—এই সবকিছুর সঙ্গে মিশে ছিল তার মনের যে সৃষ্টিশীল সত্তাটি, যার ভূমাতৃপ্তির প্রয়োজনেই সে গায়িকা, নৃত্যশিল্পী, কবি বা চিত্রশিল্পী—বিখ্যাত সব নারীদের সঙ্গে প্রণয়কল্পনায় মোহিত হয়েছিল—আজ সৃষ্টিকামী সেই সূক্ষ্মসত্তাটিকে সে বিসর্জন দিল বাস্তবের হাতে—কারণ সেই গদ্যের রাজ্যে আকাশকুসুম চয়নে-চয়নে গড়ে-তোলা সৃষ্টিকলার যে কোনোদিনই ঠাঁই হয় না! কিন্তু পঞ্চম-স্বর্ণ-খণ্ডটির 'সোনালি' রঙ সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি হারিয়ে যাওয়া 'সোনালি' কল্পনার আভাসও প্রতিবিম্বিত করল। তাই স্মৃতিসুখ, স্বপ্নভঙ্গ এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা-সবকিছুরই সম্মিলিত প্রতীক হয়ে উঠেছে ওই পঞ্চম স্বর্ণখণ্ডটি। আর এই সম্মিলিত অনুভব আসলে বাকসা থেকে মিস্টার বাকসি হয়ে, আবারও বাকসাতেই প্রত্যাবৃত-মানুষটির জীবনবৃত্ত—যা এই গল্পে অন্যান্য রূপকের সংকেতে প্রীতম ব্যঞ্জিত করেছেন।।

কফন

(হিন্দী)

প্রেমচন্দ

১.১ ▢ কাহিনি

ঝুপড়ির দরজায় বাপ-বেটা দুজনে নিভে-যাওয়া আগুনটার সামনে চুপচাপ বসে। ওদিকে ঘরের ভেতরে ছেলের জোয়ান বউ বুধিয়া প্রসববেদনায় আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। থেকে থেকে ওর মুখ দিয়ে এমন কলজে-কাঁপানো আওয়াজ আসছে যে, ওরা দুজন বুকে পাথর চেপে কোনোমতে তা সহ্য করছে। শীতের রাত, প্রকৃতি নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে। সমস্ত গ্রামখানা অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে।

ঘিসু বলে—মনে হচ্ছে বাঁচবে না। সারাটা দিন দৌড়ঝাঁপ করেই কাটল। যা না, গিয়ে একবারটি দেখে আয় না।

মাধব খেপে গিয়ে বলে—মরবেই যদি তো তাড়াতাড়ি মরে না কেন? দেখে করবটা কী?

—পরাণে তোর একটুও দরদ নাই রে! সারাটা বছর যার সঙ্গে সুখশান্তিতে ঘর করলি, তার সঙ্গেই অমন বেইমানি!

—তা আমি যে ওর ছটফটানি আর হাত-পা ছোঁড়া চোখে দেখতে পারছি না।

চামারবাড়ি। সারা গাঁয়ে ওদের বদনাম। ঘিসু একদিন কাজে যায় তো তিনদিন ঘরে বসে থাকে। মাধবটা এত ফাঁকিবাজ যে আধঘণ্টা কাজ করে তো একঘণ্টা বসে বসে ছিলিম টানে। তাই ওরা কোথাও মজুরি পায় না। ঘরে যদি একমুঠো খাবার থাকে তো ব্যস ওরা যেন কাজ না করার শপথ নেয়। দু-চারটে উপোস দেবার পর ঘিসু গাছে উঠে কাঠকুটো ভেঙে আনে আর মাধব হাটে গিয়ে সেগুলোকে বেচে আসে। তারপর যতক্ষণ সে পয়সা হাতে থাকে দুজনে টো টো করে বেড়ায়। আবার যখন উপোস করার হাল হয়, তখন হয় আবার কাঠকুটো কুড়িয়ে আনে কিংবা জনমজুরির খোঁজে বের হয়। গাঁয়ে কাজের কমতি নেই। চাষাভুসোর গাঁ, খেটে-খাওয়া মানুষের হাজার রকমের কাজ। তবু ওদের দুজনকে লোকে কেবল তখনি ডাকে যখন দুজনের মজুরি দিয়ে একজনের কাজটুকুতেই সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না। এ দুজন যদি সাধুসন্নেসি হত, তবে সন্তোষ এবং ধৈর্যের জন্য কোনো সংযম নিয়মেরই আবশ্যক হত না, কারণ এসব তো ছিল ওদের স্বভাবজাত। ছন্নছাড়া অদ্ভুত জীবন। ঘরে দু-চারখানা মাটির বাসন ছাড়া সম্পত্তি বলতে আর কিচ্ছু নেই। ছেঁড়া কাপড়ে নিজেদের নগ্নতাকে ঢেকে জীবন কাটায়। সংসারের সবরকম ভাবনাচিন্তা থেকে মুক্ত। ঋণে আকণ্ঠ ডুবে আছে, গালাগালি খায়, মারধোরও খায়, তবু কোনো দুঃখ নেই। এতই গরিব যে ঋণ পরিশোধের আশা লেশমাত্র নেই জেনেও সবাই ওদের কিছু না কিছু ধার দেয়। মটর বা আলুর সময় অন্যের খেত থেকে মটর কিংবা আলু তুলে নিয়ে এসে সেগুলোকে ভেজে বা পুড়িয়ে খেয়ে নেয়;কিংবা পাঁচ-দশ গাছা আখ ভেঙে এনে রাতের বেলা বসে বসে চোষে। এই রকম আকাশবৃত্তিতেই ঘিসু ষাট-ষাটটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে;আর মাধব বাপের বেটার মতো তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। বরং বলা চলে বাপের নামকে আরও উজ্জ্বল করে চলেছে। এই এখন দুজনে আগুনের সামনে বসে যে আলুগুলোকে পোড়াচ্ছে তাও কারও না কারও

খেত থেকে তুলে আনা। ঘিসুর বউটা তো অনেক দিন আগেই দেহরক্ষা করেছে। মাধবের বিয়ে হয়েছে এই গত বছর। যেদিন থেকে এই মেয়েটা এদের ঘরে এল সেদিন থেকে এই পরিবারে একটা শৃঙ্খলা এসেছে। গম পিষেই হোক বা ঘাস তুলেই হোক সেরটাক আটার জোগাড় সে ঠিক করে নিত আর এই বেহায়া দুটোকে পিণ্ডি গেলাত। মেয়েটা ঘরে আসার পর এরা দুজন যে শুধু আরও আলসে, আরও আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তাই নয়, বরং বলা চলে ওদের গুমোরও বেড়ে গিয়েছিল। কেউ কাজ করতে ডাকলে বিনা দ্বিধায় দুনো মজুরি হেঁকে বসত। সেই মেয়েটি আজ প্রসববেদনায় মরে যাচ্ছে আর এরা দুজনে বোধ করি অপেক্ষা করে আছে যে, ও চোখ বুজলে আরাম করে ঘুমুতে পারবে।

ঘিসু আলু বের করে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, গিয়ে দেখ্ তো কী অবস্থা বেচারির। পেত্নির নজর লেগেছে, তাছাড়া আর কী? ওঝাও তো এখন একটা টাকা চাইবে!

মাধবের ভয় ওঘরে ঢুকলে ঘিসু আলুগুলোর বেশির ভাগটা সাবাড় করে দেবে। বলে—ওর কাছে যেতে আমার ভয় করছে।

—ভয় কীসের রে, আমি তো এখানে রয়েছিই!

—তাহলে তুই গিয়ে দ্যাখ্ না।

—আমার বউ যখন মারা গিয়েছিল, আমি তিন দিন ওর কাছ থেকে নড়িনি। আর তাছাড়া আমাকে দেখলে ও লজ্জা পাবে না? কোনোদিন যার মুখ দেখিনি, আজ ওর উদলা গা দেখব! ওর তো এখন গা-গতরের হুঁশটুশও নেই। আমাকে দেখে ফেললে ভালো করে হাত-পাও যে ছুঁড়তে পারবে না।

—আমি ভাবছি যদি বাচ্চাটাচ্চা হয়ে পড়ে তাহলে কী হবে? শুঁঠ, গুড়, তেল কিছুই তো ঘরে নেই।

—সব কিছু এসে যাবে। ভগবান দিক তো! যারা এখন একটা পয়সা দিচ্ছে না, তারাই কালকে যেচে এসে টাকা দেবে। আমার ন-ন-টা ছেলে হয়েছে, ঘরে তো কোনোদিন কানাকড়িও ছিল না; তবু ভগবান কোনো না কোনো মতে কাজ তো চালিয়ে দিয়েছেন।

যে সমাজে দিনরাত খেটে যাওয়া মানুষগুলোর হাল ওদের চাইতে বেশি কিছু ভালো নয়, যেখানে চাষিদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যারা মুনাফা লোটে তারাই চাষিদের চেয়ে অনেক বেশি সংগতিপন্ন, সে সমাজে এ ধরনের মনোবৃত্তির সৃষ্টি হওয়াটা কিছু একটা অবাক হবার মতো কথা নয়। বরং বলব ঘিসু চাষিদের চাইতে ঢের বেশি বুদ্ধিমান তাই সে নির্বোধ চাষিদের দলে না ভিড়ে আড্ডাবাজদের জঘন্য আড্ডায় গিয়ে জুটেছিল। তবে হ্যাঁ, ওর মধ্যে এই ক্ষমতা ছিল না যে আড্ডাবাজদের নিয়মনীতি ঠিকঠাক পালন করে। তাই ওর আড্ডাখানার আর সবাই যেখানে গাঁয়ের মাতব্বর কিংবা মোড়ল হয়ে বসেছে, সেখানে সারা গাঁ ওর নিন্দে করে। তবু এটুকু সান্ত্বনা ওর আছে যে, ওর হাঁড়ির হাল খারাপ হলেও অন্তত পক্ষে ওকে ওসব চাষিদের মতো হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় না। ওর সরলতা এবং অসহায়তা থেকে অন্যরা অনুচিত মুনাফা তো লুটতে পারছে না।

দুজনে আলু বের করে গরম গরম খেয়ে চলে। কাল থেকে পেটে কিচ্ছু পড়েনি। তাই আলু ঠান্ডা হবার তর সইছে না। বারকয়েক দুজনেরই জিভ পুড়ে যায়। খোসা ছাড়ালে আলুর ওপরটা তো খুব বেশি গরম থাকে না, কিন্তু দাঁতের নীচে পড়ামাত্রই ভেতরটা জিভ, গলা আর টাকরা পুড়িয়ে দেয়। ওই অঙ্গারটাকে তখন মুখে রাখার চাইতে অনেক বেশি ভালো সেটাকে ভেতরে পাচার করে দেওয়া। সেখানে ওটাকে ঠান্ডা করার মত যথেষ্ট বস্তু

রয়েছে। তাই দুজনে কপকপ গিলে ফেলছে। যদিও তা করতে গিয়ে ওদের চোখে জল এসে পড়ছে।

খেতে খেতে জমিদারের বিয়েতে বরযাত্রী যাবার কথা ঘিসুর মনে পড়ে যায়। বছর কুড়ি আগে সে ওই বরযাত্রী গিয়েছিল। ওই ভোজ খেয়ে যে তৃপ্তি সে পেয়েছিল তা তার জীবনে একটা মনে রাখার মতো ঘটনা, আর আজও সে স্মৃতি তার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বলে—ওই ভোজের কথা ভুলতে পারি না। তারপর সারা জীবনে অমন খাবার আর কখনও পেট পুরে খাইনি। মেয়ের বাড়ির লোকেরা সবাইকে পেটভরে পুরি খাইয়েছিল, সববাইকে! ছোটোবড়ো সবাই পুরি খেয়েছিল, একেবারে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা! চাটনি, রায়তা, তিন রকমের শুকনো তরকারি, একটা ঝোল, দই, মিষ্টি। কী বলব, ওই ভোজে সেদিন কী আস্বাদ পেয়েছিলাম! কোনো নিষেধ মানা ছিল না। যে জিনিস যত খুশি চেয়ে নাও, যত চাই খাও। সবাই অ্যাত্ত অ্যাত্ত খেয়েছিল যে, কেউ জল পর্যন্ত খেতে পারেনি। হলে হবে কী, পাতে পাতে যারা খাবার দিচ্ছিল তারা গরম গরম গোল গোল সুগন্ধি কচুরি দিয়েই চলছিল। যত মানা করি যে আর চাই না, পাতের উপর হাত চাপা দিয়ে রাখি, তবু ওরা দিয়ে যাচ্ছিল তো যাচ্ছিলই। তারপর সবাই যখন আঁচিয়ে এল, তখন পান এলাচও পেল। কিন্তু আমার তখন পান খাবার হুঁশ কোথায়? দাঁড়িয়ে থাকতেই পারছিলাম না। চটাপট গিয়ে আমার কম্বল পেতে শুয়ে পড়েছিলাম। এত দিলদরিয়া ছিল ওরা।

মাধব মনে মনে জিনিসগুলোর স্বাদ কল্পনা করতে করতে বলে—আজকাল কেউ তো আর আমাদের অমন ভোজ করায় না।

—আজকাল আর খাওয়াবে কে, খাওয়াবেই বা কী? ওই জমানাই ছিল আলাদা। এখন তো সবাই পয়সা বাঁচানোর ধান্দাতেই আছে। বিয়েসাদিতে খরচ করে না, কিরিয়া-করমে খরচ করে না। বলি গরিবগুলানের পয়সা লুটে লুটে রাখবি কোথায়? লুটবার বেলায় ক্ষ্যামা নেই, শুধু খরচের বেলাতেই যত হিসেব।

—তুমি খানবিশেক পুরি খেয়েছিলে বোধ হয়?

—বিশখানার বেশিই খেয়েছিলাম।

—আমি হলে পঞ্চাশখানা সেঁটে ফেলতাম।

—খানপঞ্চাশের কম আমিও খাইনি। তাগড়া জোয়ান ছিলাম। তুই তো আমার আদ্দেকও নোস।

আলু খাওয়া হয়ে গেলে দুজনেই জল খেয়ে ওখানেই আগুনের সামনে কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে পেটে পা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে। যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা দুটো বড়ো বড়ো অজগর।

ওদিকে বুধিয়া তখনও সমানে ককিয়ে চলেছে।

দুই

সকালে ঘরে ঢুকে মাধব দেখে বউটা তার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ওর মুখের ওপর মাছি ভনভন করছে। পাথরের মতো স্থির নিশ্চল দুটি চোখ ওপরদিকে চেয়ে রয়েছে। সারা শরীর ধুলোয় মাখামাখি। ওর পেটে বাচ্চাটা মরে গেছে।

মাধব ছুটতে ছুটতে ঘিসুর কাছে যায়। তারপর দুজনে জোরে জোরে হাহাকার করতে করতে বুক চাপড়াতে থাকে। পাড়াপড়শিরা কান্নাকাটি শুনে ছুটতে ছুটতে আসে আর চিরাচরিত রীতি অনুসারে এই হতভাগ্য দুজনকে সান্ত্বনা দেয়।

কিন্তু বেশি কান্নাকাটির সময় নেই। শবাচ্ছাদনের নতুন কাপড় আর কাঠের ভাবনা ভাবতে হবে। এদিকে ঘরে তো পয়সা ঢনঢন, যেমন চিলের বাসায় মাংস।

বাপ ব্যাটা দুজনে কাঁদতে কাঁদতে গাঁয়ের জমিদারের কাছে যায়। উনি এই দুজনের মুখই দেখতে পারেন না। বারকয়েক এ দুজনকে নিজের হাতে পিটুনি দিয়েছেন, চুরি করেছে বলে কিংবা কথা দিয়ে ঠিকমতো কাজে আসেনি বলে। জিজ্ঞেস করেন—কী হয়েছে রে ঘিসুয়া, কাঁদছিস কেন? আজকাল তো তোর টিকিটি দেখা যায় না। মনে হচ্ছে যেন এ গাঁয়ে থাকার তোর ইচ্ছে নেই।

ঘিসু মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে জলভরা চোখে বলল—কত্তামশাই গো! বড়ো বিপদে পড়েছি। মাধবের বউটা কাল রাতে মারা গেছে। সারাটা রাত ছটফট করেছে, কত্তা। আমরা দুজন ওর শিয়রে বসে ছিলাম। ওষুধবিষুদ যদ্দুর পেরেছি, সব করেছি। তবুও বউটা আমাদের দাগা দিয়ে গেল কত্তা। একখানা রুটি বানিয়ে যে খাওয়াবে এমন কেউ আর রইল না। কত্তাবাবু! সব্বোনাশ হয়ে গেছে। সম্সারটা ছারখার হয়ে গেল, হুজুর। হুজুরের গোলাম আমরা। এ বিপদে হুজুর আপনি ছাড়া কে ওর ঘাটের দায় উদ্ধার করবে? আমাদের হাতে যা কিছু দু-চার পয়সা ছিল, সব ওষুদে আর পথ্যিতে শেষ হয়ে গেছে। হুজুর যদি দয়া করেন তাহলেই ওকে খাটে তুলতে পারব। আপনি ছাড়া আর কার দোরে গিয়ে হাত পাতব হুজুর?

জমিদারবাবু দয়ালু। তবে ঘিসুকে দয়া করার মানে তো কালো কম্বলে রঙ লাগানো। ইচ্ছে হল বলে দেন—ভাগ্, দুর হ সামনে থেকে। এমনি তো ডেকে পাঠালেও আসিস না। আজ গরজ পড়েছে, তাই এসে খোশামোদ করছিস। হারামজাদা, বদমাস কোথাকার! কিন্তু রাগ করার বা সাজা দেবার সময় এটা নয়। মনে মনে গজগজ করতে করতে দুটো টাকা বের করে ছুঁড়ে দেন। সান্ত্বনার একটি কথাও মুখ দিয়ে বের হয় না। ওর দিকে ফিরেও তাকান না, যেন ঘাড় থেকে আপদ দূর করেন।

জমিদারমশাই যখন দুটাকা দিয়েছেন, তখন গাঁয়ের বেনে মহাজনেরা না করে কী করে! ঘিসু জমিদারের নামের ঢাক পেটাতেও ওস্তাদ। ওরা কেউ দেয় দু আনা, কেউ চার আনা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘিসুর হাতে টাকা পাঁচেকের মতো পুঁজি জোগাড় হয়ে যায়।

এছাড়া কেউ গমটম দেয়, কেউ বা কাঠ। তারপর দুপুরবেলা ঘিসু আর মাধব বাজার থেকে কফনের জন্য নতুন কাপড় আনতে যায়। এদিকে অন্যরা বাঁশ-টাশ কাটতে শুরু করে।

গাঁয়ের কোমলমনা মেয়েরা এসে এসে মৃতাকে দেখে যায় আর বেচারির অসহায় অবস্থা দেখে দুফোঁটা চোখের জল ফেলে চলে যায়। বাজারে এসে ঘিসু বলে—ওকে জ্বালানোর মতো কাঠ তো জোগাড় হয়ে গেছে, তাই না রে মাধব?

মাধব বলে—হ্যাঁ, কাঠ তো অনেক হয়েছে, এখন কফন হলেই হয়।

—তাহলে চল সস্তা দেখে একখানা কফন কিনে নেই।

—হ্যাঁ, তাছাড়া আর কী? মড়া তুলতে তুলতে রাত হয়ে যাবে। রাতের বেলায় কফন অত কে দেখতে যাচ্ছে?

—কেমনতর যে বাজে রেওয়াজ সব, বেঁচে থাকতে গা ঢাকার জন্য একখানা ছেঁড়া তেনাও যে পায়নি ...... তার জন্য নতুন কফন চাই।

—কফনটা তো মড়ার সঙ্গে পুড়েই যায়।

—তা নয়তো কি থেকে যায় নাকি? এই টাকা পাঁচটা আগে পেলে বউটাকে একটু ওষুদ-পথ্যি দিতে পারতাম।

দুজনেই দুজনের মনের কথাটি টের পাচ্ছে, বাজারে এখানে ওখানে ঘুরছে আর ঘুরছে। কখনও এ কাপড়ের দোকানে, কখনও ও দোকানে। নানা রকমের কাপড়—রেশমি কাপড়, সুতি কাপড় সব দেখে কিন্তু কোনোটাই পছন্দ হয় না। এই করতে করতে সন্ধ্যা নামে। তখন দুজনেই না জানি কোন এক দৈবী প্রেরণাবশে একটি পানশালার দরজায় এসে দাঁড়ায়। তারপর যেন কোনো পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনামতো ভেতরে ঢুকে পড়ে। ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ দুজনে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর গদির সামনে গিয়ে ঘিসু বলে—সাহুজি, একটা বোতল আমাদেরকেও দিন।

এরপর কিছু চাট আসে, মাছ ভাজা আসে, আর ওরা দুজনে বারান্দায় বসে নিশ্চিন্ত মনে মদ গিলে চলে।

কয়েক ভাঁড় তড়বড় করে গেলবার পর দুজনেরই নেশার আমেজ আসে। ঘিসু বলে—কফন দিলে হতটা কী? শেষ অব্দি পুড়েই তো যেত। বউয়ের সঙ্গে তো আর যেত না।

মাধব আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন সব দেবতাকে তার নিষ্পাপ হবার সাক্ষী মেনে বলে—দুনিয়ার দস্তুরই যে এই, নইলে লোকে বামুনঠাকুরদের হাজার হাজার টাকাই বা দেয় কেন? কে দেখছে, পরলোকে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না।

—বড়োলোকদের হাতে পয়সা আছে, ইচ্ছে হলে ওড়াক গে। আমাদের কাছে উড়িয়ে দেবার মতন আছেটা কী?

—কিন্তু ওদের সবাইকে কী বলবি? ওরা জিজ্ঞেস করবে না কফন কই?

—ঘিসু হাসে—আরে ধ্যাৎ, বলব, টাকা ট্যাঁক থেকে কোথায় যে খসে পড়ে গেছে, অনেক খুঁজেছি, পাইনি। ওরা বিশ্বাস করবে না ঠিকই, তবু ওরাই আবার টাকা দেবে।

মাধবও হেসে ফেলে। এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বলে—আহা! বড়ো ভালো ছিল গো বেচারি। মরলও খুব খাইয়ে-দাইয়ে।

আধ বোতলের ওপর শেষ হয়ে যায়। ঘিসু দু-সের পুরি আনিয়ে নেয়। সঙ্গে চাটনি, আচার, মেটের কারি। শুঁড়িখানার সামনেই দোকান। মাধব ছুটে গিয়ে দুটো ঠোঙায় করে সব জিনিস নিয়ে আসে। পুরো দেড়টি টাকা আরও খরচ হয়ে যায়। হাতে শুধু আর কটা পয়সা বাকি থাকে।

দুজনে এখন এমন মেজাজে বসে পুরি খাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন বনের বাঘ বনে বসে তার শিকার সাবাড় করছে। না আছে জবাবদিহি করার ভয়, না আছে বদনামের ভাবনা। এসব ভাবনাচিন্তাকে ওরা অনেক আগেই জয় করে নিয়েছে।

ঘিসু দার্শনিকের মতো বলে—এই যে আমাদের আত্মা খুশি হচ্ছে, এতে কি বউয়ের পুন্নি হবে না?

মাধব ভক্তিতে মাথা নুইয়ে সায় দেয়—খুব হবে, আলবাত হবে। ভগবান, তুমি অন্তর্যামী। ওকে সগ্গে নিয়ে যাও। আমরা দুজনে মন খুলে আশীর্বাদ করছি। আজ যে খাওয়াটা খেলাম অমনটা সারাজীবনে কোনদিন কপালে জোটেনি।

খানিকক্ষণ বাদে মাধবের মনে একটা সন্দেহ জাগে। বলে—আচ্ছা বাবা, আমরাও তো একদিন ওখানে যাব।

ঘিসু এই সোজা সহজ প্রশ্নটার কোনো জবাব দেয় না। পরলোকের কথা ভেবে এই আনন্দটাকে মাটি করতে সে চায় না।

—যদি ও ওখানে আমাদের জিগ্‌গেস করে তোমরা আমাকে কফন দাওনি কেন, তাহলে কী বলবি?

—বলব, তোর মুণ্ডু।

—জিগ্‌গেস তো ঠিকই করবে।

—তোকে কে বলেছে যে ও কফন পাবে না? তুই কি আমাকে অমন গাধা ঠাউরেছিস? ষাটটা বছর কি দুনিয়াতে ঘোড়ার ঘাস কেটে আসছি। বউ কফন পাবে আর খুব ভালো কফন পাবে।

মাধবের বিশ্বাস হয় না। বলে—দেবেটা কে? পয়সা তো তুই খেয়ে ফেলেছিস। ও তো আমাকেই জিগ্‌গেস করবে। ওর সিঁথেয় সিঁদুর যে আমিই পরিয়েছি।

ঘিসু গরম হয়ে বলে—আমি বলছি ও কফন পাবে। তোর পেত্যয় হচ্ছে না কেন?

—দেবেটা কে, বলছিস না কেন?

—ওই লোকগুলানই দেবে যারা এবার দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, এর পরের বারের টাকাটা আর আমাদের হাতে আসবে না।

যেমন যেমন অন্ধকার বেড়ে চলে, আকাশের তারাগুলোর দীপ্তি বাড়ে, পানশালার রঙ্গতামাশাও তেমনি বাড়তে থাকে। কেউ গান গায়, কেউ ডিগবাজি খায়, কেউ বা তার সাথীর গলা জড়িয়ে ধরে। কেউ তার ইয়ারের মুখে মদের ভাঁড় তুলে দেয়।

এখানকার পরিবেশে মাদকতা, হাওয়াতে নেশা। কত লোক তো এখানে এসে এক ঢোক খেয়েই মাতাল হয়ে পড়ে। মদের থেকেও ওদের বেশি নেশা ধরায় এখানকার হাওয়া। জীবনের বাধাবিপত্তি ওদের এখানে টেনে আনে। কিছু সময়ের জন্য ওরা একথা ভুলে থাকে যে, ওরা বেঁচে আছে, না মরে আছে। নাকি বেঁচেও নেই, মরেও নেই।

বাপ ব্যাটা দুজন এখনও মউজ করে করে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে। সবার নজর ওদের দুজনের ওপর। কী ভাগ্য দুজনের! পুরো একটা বোতল ওদের মাঝখানে।

পেট ভরে খেয়ে মাধব বেঁচে-যাওয়া পুরির ঠোঙাটা নিয়ে গিয়ে একটা ভিখিরিকে দিয়ে দেয়। ভিখিরিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে ক্ষুধাতুর চোখে তাকিয়ে দেখছিল। দেবার গৌরব, আনন্দ আর উল্লাস মাধব জীবনে এই প্রথম অনুভব করে।

ঘিসু বলে—নে রে, যা ভালো করে খা আর আশীববাদ কর্। যার দৌলতে খাওয়া সে তো মরে গেছে। তবু তোর আশীববাদ ওর কাছে পৌছুবে। মন খুলে পরান খুলে আশীববাদ কর্, বড়ো কষ্টের রোজগারের পয়সা রে।

মাধব আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—ও ঠিক বৈকুণ্ঠে যাবে গো বাবা, ও বৈকুণ্ঠের রানি হবে।

ঘিসু উঠে দাঁড়িয়ে যেন উল্লাসের তরঙ্গে সাঁতরাতে সাঁতরাতে বলে, হ্যাঁ বাবা, বৈকুণ্ঠেই যাবে বই কী। কাউকে কষ্ট দেয় নি, দুখ্খু দেয়নি। মরতে না মরতে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাধটা পুরিয়ে দিয়ে গেছে।

ও যদি বৈকুণ্ঠে না যাবে তো কি ওই ধুমসো ধুমসো লোকগুলো যাবে যারা গরিবগুলোকে দুহাতে লুটছে আর নিজেদের পাপ ধুয়ে ফেলতে গঙ্গায় গিয়ে চান করছে, আর মন্দিরে পুজো দিচ্ছে?

শ্রদ্ধালুভাবের এই অনুভূতিটি তাড়াতাড়ি বদলে যায়। অস্থিরতাই নেশার বৈশিষ্ট্য।

এরপর দুঃখ আর হতাশা মনে ভর করে।

মাধব বলে—বাবা, বেচারি কিন্তু জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে। মরল, তাও কত যন্ত্রনা সয়ে।

বলে চোখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করে দেয়। ভেউভেউ করে কেঁদে ওঠে।

ঘিসু সান্ত্বনা দেয়—কাঁদছিস কেন বাবা, আনন্দ কর। বউ এই মায়া থেকে ছুটি পেয়ে গেছে। এই জঞ্জাল থেকে মুক্তি পেয়েছে। বড়ো ভাগ্যিমানি ছিল রে, তাইতে এত তাড়াতাড়ি মায়ামমতা কাটিয়ে চলে গেছে। তারপর দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে গান গাইতে শুরু করে দেয়—

'ঠগিনী, কেঁয়ো নৈনা ঝমকায়ে। ঠগিনি!'

সব মাতাল এদের দুজনকে দেখছে। এরা দুজনে মাতাল হয়ে গান গেয়ে চলে। তারপর দুজনে নাচতে শুরু করে দেয়। লাফ দেয়, ঝাঁপ দেয়। পড়েও যায়। উঠে হেলেদুলে চলে। কতরকম ভাবভঙ্গি করে অভিনয় করে। তারপর শেষ পর্যন্ত নেশায় চুরচুর হয়ে ওখানেই টলে পড়ে যায়।

অনুবাদ : ননী শূর

❐

২.১ ❐ কাহিনির পরিপ্রেক্ষিত

হিন্দী সাহিত্যের পুরোধা স্রষ্টা প্রেমচন্দের সর্বাপেক্ষা পরিচিত ও সেরা গল্পগুলির অন্যতম 'কফন'। মাটির কাছাকাছি থাকা সর্বহারাদের প্রতি আন্তরিক দরদ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি এই আপাত নিষ্ঠুর অথচ মর্মান্তিক গল্পটি।

কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু গর্ভবতী অন্ত্যজ-চামার যুবতী বুধিয়া। তার আসন্ন প্রসবের যন্ত্রণা এবং তারই অনিবার্য পরিণতিতে অর্থের অভাবে বিনা চিকিৎসায় তার অসহায় মৃত্যুর প্রেক্ষিতে, তার স্বভাব-অলস এবং কর্মবিমুখ দিনমজুর স্বামী মাধব ও শ্বশুর ঘিসুর হতদরিদ্র জীবনের দুয়েকটি দিনের চালচিত্র উঠে এসেছে এই গল্পে।

২.২ ❐ কাহিনি-সংশ্লেষ ও নিবিড় পাঠ

কাহিনির গোড়াতেই প্রসববেদনায় কাতর বুধিয়ার আর্তনাদ শুনে ঘিসু মন্তব্য করে যে, মেয়েটি আর বাঁচবে না। ছেলেকে একবার ভেতরে গিয়ে দেখে আসতে বলাতে সে খেপে গিয়ে বলে মৃত্যু যদি অনিবার্য, তাহলে বউটা তাড়াতাড়ি মরলেই ভালো—সে খামোখা দেখতে গিয়ে তো আর পরিণতি বদল করতে পারবে না! আসলে ভেতরে মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে তার দেখতে যাবার অনীহার মূল কারণ হল দুদিনের উপবাসের পরে জোটা গরম গরম পোড়া আলুর ভাগ কম পড়ে যাওয়ার ভয়। সে ভেতরে গেলে পাছে তার বাবা সব আলুগুলো সাবাড় করে দেয়—এই ভয়ে স্ত্রীর আর্তনাদেও সে ওঠে না। বস্তুত এই আচরণটির সুবাদেই এরপর দীর্ঘ বর্ণনার মাধ্যমে কখনো চলমান

বর্তমান, কখনো ফ্ল্যাশব্যাক—এভাবে এই দুই 'গুণবান' পিতাপুত্রের জীবন—ব্যক্তিগত ও কর্মগত—কাহিনিতে উঠে আসে। জানা যায় কুঁড়েমি, চুরি, ফাঁকিবাজি, বেইমানি, নিলর্জ্জতা, স্বার্থপরতা—এই নানাবিধ 'গুণের' সমাহার এরা। সামাজিক বিচারে অন্ত্যজ চামার বর্গভুক্ত এই দুই দিনমজুর পেটে টান না পড়লে কাজ করে না। আবার একদিন কাজ করে তো তিনদিন ঘরে বসে থাকে। এমনকি কাজে আধঘন্টা পরিশ্রম হলে একঘন্টা বসে বসে ছিলিম টানে। ঘরে একমুঠো খাবার কি দুটো পয়সা থাকা অবধি এরা গতর নাড়ে না। কখনো বা কুঁড়েমির চোটে দু-একবার উপোসও করে নেয়। তারপর নেহাৎ কষ্ট হলে কাঠকুটো ভেঙে বেচে দু-পয়সা এনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। গাঁয়ে কাজের কম্‌তি নেই তাই ওদের কাজের অভাব হয় না—কিন্তু দুজনের মজুরি দিয়ে একজনের কাজেই সন্তুষ্ট হতে হবে—এমন নিরুপায় দশা না হলে কেউ ওদের ডাকে না। অবশ্য ওরা নির্বিকার—প্রায় সন্ন্যাসীদের মতোই পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে উদাসীন—ছেঁড়া কানি, দুয়েকটা ভাঙাচোরা মাটির বাসন, আকণ্ঠ দেনা এবং লোকের অবিরাম গালাগাল, এমনকি মারধোরেও কোনো পরিবর্তন, এমনকি সামান্য চাঞ্চল্যও আসে না ওদের এই ছন্নছাড়া, ভাবনাচিন্তা মুক্ত জীবনে। যে-কোনো অবস্থাতেই ভাবনামুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট থাকার এক অদ্ভুত নির্বেদ-মন দুজনেই তৈরি করতে পেরেছে। পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের দাসত্বকরা মানুষদের লজ্জার কারণ হতে পারে যেন এরা—আর এই সূত্রেই এদের নির্বিকার আচরণে অসন্তুষ্ট, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় ভদ্রলোকেরা। অবশ্য তথাকথিত ভদ্রসমাজের রীতিনীতিকে গ্রাহ্যই করে না এই বাপ-ব্যাটা। এবং শুধু এটুকুই নয়, এমন হাঘরে অবস্থায় থেকেও ওরা আনন্দিত হয় এইটা ভেবে যে চাষিদের চেয়ে ওরা বেশি বুদ্ধিমান কারণ খেতে না পেলেও অন্তত ওদের মতো 'হাড়ভাঙা খাটুনি' তো খাটতে হয় না! এদের জীবনদর্শনে খেটে প্রাণপাত করে মালিকদের মুনাফাবৃদ্ধি করার থেকে পেটে কিল্ মেরে আড্ডা দেওয়াটা বেশি বাঞ্ছিত। আসলে ঘিসুর তো মাধবসহ নটি ছেলে হয়েছে—এবং ঘরে এক পয়সা না থাকা সত্ত্বেও কোনো মতে চলে গেছে 'ভগবানের কৃপায়'। তাই টাকা না থাকাটা তার এবং তারই শিক্ষায় শিক্ষিত (!) ছেলে মাধবের কাছে সমস্যাই নয়, যেমন নয় প্রসবযন্ত্রণায় কাতরানো বউটির কষ্টও—কারণ প্রসুতির তো যন্ত্রণা হবেই!

তাই তারা পোড়া আলু খেয়ে চলে। ঠাণ্ডা হবার অবকাশ দেয় না। অঙ্গারের মতো খণ্ডগুলি কপকপ করে গিলে পরম চরিতার্থতা লাভ করে দুজনেই। চোখে জল এসে যায়—গরমে, হয়তো বা আনন্দেও।

যন্ত্রণার কাতরানির 'আবহসঙ্গীতের' মাঝে বাপ জমিদারবাড়িতে-খাওয়া কুড়িবছর আগেকার মহাভোজের স্মৃতিরোমন্থন করে। অমন ভোজ আজকাল আর কেউ খাওয়ায় না ভেবে ছেলে ভারি দুঃখ পায়, ঘিসু দর্শনবাণী আওড়ায় ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে, বলে যে বড়োলোকেরা গরীবদের পয়সা লুটে নেয়। আর সবসময় সেই লুট করা পয়সা বাঁচানোর ধান্দা করে—তাই তাদের মতো গরীবরা তাদের প্রাপ্য মহাভোজ থেকেও বঞ্চিত হয়। এমন ভোজে কে ক'টা পুরি 'সাঁটিয়ে ফেলতে পারে' তার তুলনামূলক হিশেব কষতে কষতে বাপছেলে আগুনের পাশে ভরা পেটে, তৃপ্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের কুণ্ডলীকৃত শরীর দুটিকে লেখক উপমিত করেছেন দুটি বড়ো বড়ো অজগরের সঙ্গে। আর করবেন নাই-বা-কেন! কপকপ করে গিলে খাবার জৈবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর কোনো মানুষ সুলভ আচরণ তাদের মধ্যে তো সত্যিই দেখা যায় নি—তাই তো পাশের ঘরে যন্ত্রণাকাতর মেয়েটির করুণ আর্তনাদেও তার স্বামী-শ্বশুরের কোনো হেলদোল নেই।

ভরা পেটের ওমে ঘুমিয়ে তৃপ্ত মাধব পরদিন সকালে ঘরে ঢুকে মৃত স্ত্রী বুধিয়াকে দেখতে পায়। হতভাগ্য মেয়েটির পেটের বাচ্চাটিও মৃত—মুখের ওপর মাছি ভন্‌ভন্ করছে। অতঃপর খিদে পেলে খাওয়াটাই যেমন

স্বাভাবিক, প্রসবের সময় যন্ত্রণা হওয়াটাই যেমন স্বাভাবিক—ঠিক তেমনই জাগতিক স্বাভাবিক নিয়মে মৃতব্যক্তির জন্য বুক চাপড়ে কাঁদতে শুরু করে দুজনে। চিরাচরিত রীতি মেনেই এসব হয়; যেমনভাবে তারা জানে যে বুধিয়ার মৃত্যু হয়েছে চিরাচরিত ভাবে পেত্নির নজর লেগে— আর তাইতো চিকিৎসা বলে কিছু যে করতে হতো—এমনটা তারা ভাবেইনি। বরং 'পরানে দরদ' আছে বলেই ছেলে চেয়েছে বুধিয়ার মৃত্যু তাড়াতাড়ি হোক। 'পেত্নিগ্রস্ত' বলেই তো স্ত্রীর কাছে যেতে তার ভয় লেগেছে—তাছাড়া সে তো জানেই ও মারা যাবে—তাই সত্যিই দেখারই বা কি আছে। 'পরমদরদী' বলেই তো তার বাবা ঘিসু চিরাচরিত প্রথায় বিনাচিকিৎসায় মৃত তার স্ত্রীর দেহের পাশ থেকে তিনদিন নড়েনি। আর দুজনেরই দরদী মনের অভিপ্রকাশ ওই বুক চাপড়ানো আকুল কান্না।

কিন্তু কান্নাকাটির বিলাস চলবে না। জিয়ন্তে ছেঁড়া কানিমাত্র অঙ্গে উঠলেও, মৃতদেহকে নতুন কাপড়ে সজ্জিত করে বিদায় দিতে হবে—কাঠের চিতায় জ্বালিয়ে—এও তো চিরাভ্যস্ত প্রথাই বটে। তাই বাপছেলে জমিদারের কাছে গিয়ে পয়সা চায় বাড়ির বউকে 'সম্মানের' (!) সঙ্গে শেষ বিদায় জানাতে। তারা সারারাত ধরে কতো সেবাযত্ন করেছে—ওষুধপথ্যিতে তাদের শেষসম্বল দুচার পয়সাও যে নিঃশেষ হয়ে গেছে—তাও জানাতে ভোলে না। বউটি মারা যাওয়াতে তাদের দুটো রুটি বানিয়ে দেবার কেউ রইল না আর—সেই দুঃখে তারা বিপর্যস্ত—সংসারটাও ছারখার এই মর্মান্তিক আঘাতে—এ অবস্থায় তাদের শেষ দায়িত্ব পালনে জমিদারবাবুই সহায়—এইভাবে সমস্ত পরিস্থিতিটাই নিপুণভাবে গড়ে তুললো দুজনে।

অলস ও চোর বলে একদা যাদের নিজের হাতে পিটুনি দিয়েছেন, আজ এই অবস্থায় তাদের সাজা দেবার কিংবা রাগ করবার কথা ভাবলেন না দয়ালু মানুষটি। তাই দুটো টাকা দিয়ে আপদ বিদায় করলেন, তবে সান্ত্বনার কোনো কথা বলতে পারলেন না, কারণ এদের আদত স্বভাব সম্পর্কে তিনি ভালোরকম, ওয়াকিবহাল ছিলেন। জমিদারের কৃপায় অন্যান্য অবস্থাপন্ন মানুষদের দাক্ষিণ্যও জুটতে থাকে—এবং প্রায় গোটা-পাঁচেক টাকা জোগাড় হয়ে যায় সৎকারের জন্যে। জোগাড় হয় গম, কাঠ-ও। আর গ্রামের মেয়েরা এসে বুধনির এই মর্মান্তিক পরিণতিতে চোখের জল ফেলে—যথার্থই বেদনাপ্রসূত সেই অভিব্যক্তি, সেই সহানুভূতি, যা বেচারি মেয়েটি জীবদ্দশায়, এমনকী মরে গিয়েও পায়নি তার সবচেয়ে নিকটজনদের থেকে।

কফন কিনতে কড়কড়ে পাঁচটি টাকা নিয়ে বাজারে আসে ঘিসু ও মাধব। দুজনের বিচারেই সাব্যস্ত হয় সস্তার কাপড় কেনা—যুক্তি অকাট্য—রাতের বেলায় কে আর কফনের ভালোমন্দ বিচার করে যাবে। তবে দুজনেই বিরক্ত হয়, এটা ভেবে যে, পয়সা দিয়ে কেনা কাপড়টা মড়ার সঙ্গেই পুড়ে যায়—অর্থাৎ কিনা পয়সার অপচয়। হঠাৎ করে মনে পড়ে মৃতা বউটির কথা—তারা ভাবে ওই টাকাগুলো আগে পেলে বউটাকে ওষুধপথ্যি দেওয়া যেত। আসলে ঘিসু ও মাধবের এমনই 'সুখ্যাতি' যে, বিশ্বাস করে তাদের কেউ টাকা দেয় না, এমনকী চিকিৎসার জন্যেও। তবে মৃত্যু তো আর সাজানো যায় না—তাই বুধনির মৃতদেহ ঘিসুদের লুপ্ত-বিশ্বাসযোগ্যতার সাময়িক প্রমাণ হিশেবে গৃহীত হয়—যার মূল্য ধার্য হয় পাঁচটাকা। আর পাঠকরাও অন্তত একবারের জন্যে ঘিসুদের আচরণে 'মানুষ'-সুলভতা লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হতে পারেন হয়ত বা!

কিন্তু এটা কাহিনির মধ্যপর্যায় মাত্র। বাড়ির বউয়ের মৃত্যুযন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে যারা পোড়া আলু খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারে, তাদের এহেন ভাবান্তর কতদূর স্থায়ী সেটার নিরীক্ষা কাহিনিতে উৎসাহ জাগিয়ে রাখে।

বাপছেলে কড়কড়ে পাঁচ-পাঁচটি টাকা হাতে নিয়ে বাজারে ঘুরতে থাকে—কোনো কাপড়ই তাদের পছন্দ হয় না। কাপড় কেনার বাধ্যতায় তবু তারা ঘুরতে থাকে—ক্রমে সন্ধ্যে হয়। তারপর যেন অলক্ষ্য এক প্রণোদনায় দুজনেই পৌঁছে যায় পানশালার দোরগোড়ায়। প্রায় যেন পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনে দুজনে ঢুকেও পড়ে। ক্ষণিকের অপ্রতিভততা কাটিয়ে একটি বোতল এবং চাট, মাছভাজা ইত্যাদি নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে পড়ে বারান্দায়। নিশ্চিন্ত নেশার আমেজ কুকর্মের সাফাই জুগিয়ে দেয় মদ্যপ প্রাণীদুটিকে—তারা বলে পয়সাটা দিয়ে কফন কেনার চেয়ে মদ খাওয়াই ভালো কারণ সেই কাপড় তো আর বউটির সঙ্গে যাবে না—পুড়ে যাবে। এই 'অপচয়ের' থেকে টাকাটার 'যথার্থ সদ্‌ব্যবহার' করাটাকেই তারা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে। নিজেদের কুকাজের জন্য যথেষ্ট সাফাই তৈরি করে নেওয়া এই প্রাণীদুটি এরপর উদরপূর্তির জন্যে আনিয়ে নেয় পুরি, মেটের কারি, চাটনি, আচার—প্রায় সমস্ত টাকাই এভাবে খরচ হয়ে যায়। নির্ভাবনায়, নির্লজ্জতায় তারা খেয়ে চলে, কারণ বদনামের ভয় কি লোকলজ্জা নামক পার্থিব অনুভূতিগুলিকে জয় করে তারা তো কবেই নির্বেদ-মন অর্জন করে ফেলেছে। তাছাড়া তারা তো এটাও মনে করছে যে, জীবনে প্রথমবার এমন মহাভোজ খেয়ে তাদের আত্মার পরিতৃপ্তি হলে, যে বউটির 'পয়ে' (ভাগ্যিস মেয়েটা মরেছিল, তাই না গ্রামের লোকেরা বিশ্বাস করে পাঁচটা টাকা দিল!) এমনটি হওয়া সম্ভব হল, তারও 'পুন্নি হবে'—স্বামী, শ্বশুরকে খাইয়েদাইয়ে রাখত সে সারাজীবন, মরেও তার ব্যাঘাত হলো না, বরং উল্টে দিনদরিদ্র ঘরের 'নুন-পান্তা'-র পরিবর্তে মহাভোজের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল সে। 'মৃতা' মেয়েটির এমন মহিমায় (!) মাধব আপ্লুত হয়ে তার স্বর্গবাস কামনা করে মন খুলে দুহাতে আশীর্বাদ করতে থাকে। স্বামী হিশেবে এমন সংবেদনশীলতা সত্যিই অভূতপূর্ব!

কিন্তু ঘিসু অনেক পোড়খাওয়া—তার আপাত নির্বেদ ভাবের অন্তরালে একটা দুর্বুদ্ধিভরা পাকা মাথা কাজ করে। তাই তার তুলনায় অপরিপক্ক মাধব যখন জানতে চায় যে পরপারে গিয়ে মৃতা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে সে যখন তাকে কফন না দেওয়া নিয়ে অনুযোগ করবে তখন সে কোন্ সাফাই দেবে ঘিসু বলে সেই অনুযোগের অবকাশই থাকবে না—কারণ বুধনি কফন পাবেই। বিস্মিত মাধবকে আশ্বস্ত করে সে হেসে বলে যারা আগে টাকা দিয়েছিল, আবারও তারাই টাকা দেবে কারণ বিনা কফনে মৃতদেহ সৎকার যে করা যায়না সামাজিক ও ধর্মীয় কোনো নিয়মেই। তাই ট্যাক থেকে টাকা খসে হারিয়ে যাওয়ার মতো অতি-চেনা অনৃতভাষণেরই দোহাই দেবার কথা ভেবে রাখে ঘিসু—নিশ্চিন্তে, নির্বিকারভাবে। যদিও সে জানে দ্বিতীয়বার টাকাটা আর তাদের হাতে দেওয়া হবে না—কিন্তু তাতে কিছু এসে যাবে না কারণ কফনটা দেওয়া গেলেই সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে।

৩.১ ❐ গল্পের অন্তর্নিহিত আর্থ-সামাজিক সত্য

আসলে যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এইসব অন্ত্যেবাসী মানুষগুলি বসবাস করে, সেখানে ধর্মসংস্কার ও সামাজিক অনুশাসন মানুষের জীবন ও কাজের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে। তাই পশুবৎ দুটি মিথ্যেবাদী, নির্লজ্জ প্রাণী ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেও পার পেয়ে যায়। প্রশ্ন জাগে, ঘিসু-মাধবের এহেন স্বভাবের জন্য দায়ী শুধুই কি তাদের নিদারুণ দারিদ্র্য, না সেই অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থা যা প্রাণধারণের ন্যূনতম উপকরণ জোগাতে না পারলেও,

মানুষকে নেশা করার কারণ এবং অপরাধের সুযোগ করে দেয়, হয়ত বা অজান্তেই? হয়ত বা এই ব্যবস্থাই পশুর মতো করে তুলেছে ঘিসু-মাধবকে তাই বাড়ির বউয়ের মৃত্যুযন্ত্রণা, তার মৃতদেহ, এমনকী সৎকারের প্রাপ্য সম্মান ; কোনো কিছুই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়—তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শুধুই তাদের খিদেটাই।

তাদের জৈবিক প্রয়োজনের তুচ্ছতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকে তাদের অকিঞ্চিৎকর জীবন—এবং গল্পও আটকে থাকে শুঁড়িখানাতেই—সেখানকার হাওয়া মদের চেয়েও মাতাল করে, সাময়িকভাবে ভুলিয়ে দেয় জীবনের সব বাধাবিপত্তি—সব অনিরসিত আকাঙ্ক্ষা, যেগুলির তাড়নায় তারা ছুটে যায় এই শুঁড়িখানায়। মাদকের নেশায় তারা ভুলে যায় বেঁচে আছে না মরে আছে, নাকি বাঁচা-মরার হিশেবনিকেশের বাইরে এক অস্তিত্বহীনতায় পৌঁছে যায় তারা যার কোনো ব্যাখ্যা কিংবা সংজ্ঞা নেই। সেই 'বেঁচে মরে থাকার' নাকি 'মরে বেঁচে থাকার' অসম্ভাব্যতায় দুজনে মদ খেয়ে চলে, ভরাপেটের সুখে জীবনে প্রথমবার খাবারের উদ্বৃত্ত অংশ ভিখিরিকে দান করে আত্মশ্লাঘা এবং গৌরব বোধ করে, উল্লাসে তরঙ্গে ভেসে জীবনদর্শন আওড়ায়—এমনকী মৃতা বুধনীর যন্ত্রণার কথা ভেবে সত্যি সত্যিই চোখের জল ফেলে হাহুতাশ করে! মাধব ঘিসুর সান্ত্বনায় স্বস্তি পায় এই ভেবে যে, সংসার নামক জঞ্জাল থেকে ভাগ্যবতী মেয়েটি অবশেষে মুক্তি পেয়ে গেছে।

এইভাবে এই দুই বাপছেলের আচরণে একটু মানবিক স্পর্শ পেয়ে হয়তো প্রথমবার কোথাও সামান্য সহানুভূতিও জাগে আমাদের মনে এদের প্রতি—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সৃজিত এই গল্পে পারিপার্শ্বিক অবস্থার শিকার হয়ে-যাওয়া ঘিসু-মাধবের প্রতি প্রেমচন্দের আন্তরিক দরদ লক্ষিত হয় এই পর্বে।

৩.২ □ কাহিনি-নামের প্রতীকী তাৎপর্য

কিন্তু এই কফন তো জীবনের নির্মম পরিণতিরই প্রতীক। তাই শেষাংশে আবার হারিয়ে যায় ওই মানবিক স্পর্শ—তাদেরই বেআক্কেলেপনায় মেয়েটির মৃত্যু আসলে মেয়েটির মুক্তিরই নামান্তর—এইটা ভেবে বাপছেলে নেশার ঘোরে গান গেয়ে নাচতে শুরু করে। আনন্দের বাঁধ ভেঙে যায় নেশায় আর এই স্বস্তিতে যে, যে প্রকারেই হোক কফন জোগাড় হবেই—বুধনী পাবে তার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু যেটা অনুক্ত থাকল—তা হলো এই যে কফন শুধু মৃতা বুধনীই পরবে না—জীবনের নির্মম পরিহাসে ভাগ্য যেন কফন পরিয়ে দিয়েছে ওদেরকেও—অন্তত আলংকারিকভাবে—কারণ শরীরে বেঁচে থাকলেও—সত্তায়, অনুভূতিতে এমনকী মানবিক বিচারেও তারাও আসলে 'মৃত'-শুধু কফনটা চোখে দেখা যাচ্ছে না—এই যা!

দিনের বেলার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে

(তামিল)

জয়কান্তন

১.১ ❒ কাহিনি

তখন ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। যুদ্ধ তখনও চলছে— শেষ হয় নি। কিন্তু অম্মাচি গ্রামে ফিরে এসেছে। ফিরতে সে চায় নি, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে নাকি আর সৈন্যবাহিনীতে কাজ করবার উপযুক্ত নয়। সে এখন সেনাজীবনের চিবিয়ে-ফেলা ছিবড়ে মাত্র।

অম্মাচি জানে যে দেশে ফিরে গেলে কেউ তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে না, আদর-অভ্যর্থনা করার মতো কোনো আত্মীয় তার নেই। কিন্তু অন্য কোনো পথের সন্ধান না পেয়ে, যে গ্রামকে সে ঘৃণাভরেই ছেড়ে গিয়েছিল, সেই নগণ্য পল্লীতেই তাকে ফিরে আসতে হল।

অম্মাচি সেনাজীবনকে বড় ভালোবাসে। ওর কাছে যুদ্ধের কোলাহল যেন বিয়ের বাজনা, আর যুদ্ধে যাওয়া যেন শ্বশুরবাড়ী যাওয়া। ওখানে কত বিদেশী মানুষের সংস্পর্শে আসে, কত নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়। দেশে যেমন উঁচুজাতের লোক তাকে দেখলেই বলে 'সরে দাঁড়া', ওখানে কেউ তা বলে না। গ্রামের বহিরেও যে একটা বিশাল জগৎ পড়ে আছে, সেই জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় সামরিক জীবন। অম্মাচি যে সেই জীবনকে ভালবাসবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

সমাজের একেবারে নীচু তলায় যাদের বাস, অম্মাচি তাদেরই একজন। নিজের সমাজের হীনতা, ছোট জাত হওয়ার ক্ষুদ্রতা সব কিছুকে ধিক্কার দিয়ে সে যখন প্রথম মহাযুদ্ধে যায়, তখন তার বয়স মাত্র আঠারো। সেই বয়সেই সাগরপারে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল অম্মাচি।

যুদ্ধ থেমে গেলে আবার তাকে ফিরে আসতে হয় পুরোনো জীবনে। ফিরে এলেও সে কত কথা জেনে এসেছে। পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরেছে, কত কী দেখেছে, শুনেছে। সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা সে যখন বলে, পাড়ার লোকগুলো অবাক হয়ে সেই বিস্ময়কর 'ভৌতিক' গল্প শোনে বটে, কিন্তু আড়ালে ঠোঁট উলটে নিজেরা একথাও বলাবলি করে পরিহাস করে— সব মিথ্যা বানানো গল্প, সব ধাপ্পা।

এইভাবে অম্মাচি কুড়ি-বাইশ বছর গ্রামেই কাটাল। পাড়ার লোকের সঙ্গে ছাড়াছাড়িও নেই, আবার খুব মাখামাখিও নেই। এমন সময়ে আবার একটি সুবর্ণ সুযোগের মতো এসে তাকে যেন অযাচিতভাবে ডেকে পাঠাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। তবু সে আর একবার ভাবী সেনাজীবনের আনন্দে বিভোর হয়ে নিজের গ্রাম্য বস্তিকে সেলাম ঠুকে মিলিটারী মেজাজে গম্ভীর মুখে রওনা হ'য়ে গেল।

অম্মাচির কাজ মেশিনগান চালানো। বুকের উপর শক্ত করে চেপে ধরে যখন সে গুলীবর্ষণ করে চলেছে, শত্রুপক্ষের বোমায় গুরুতর আঘাত পায় অম্মাচি। মিলিটারী হাসপাতালে পড়ে থাকল কয়েক মাস। তারপরে ডাক্তার ঘোষণা করে দিল— সে এখন সামরিক কাজের অনুপযুক্ত।

সত্যিই অম্মাচি এখন আর অ্যাটেনশনেও ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে না। দু-হাতে মেশিনগান ধরে বুকে

লাগিয়ে গুলী ছোঁড়ার সময়ে যেভাবে শরীর ও হাত কেঁপে কেঁপে ওঠে, অম্মাচি এখন খালি হাতে উঠে দাঁড়ালেই সেইভাবে তার সারাটা শরীর কাঁপতে থাকে।

একদিন মিলিটারী মেজাজে গুরুগম্ভীর পদক্ষেপে গ্রাম ত্যাগ করে গিয়েছিল যে অম্মাচি সে আজ ফিরে আসছে অন্য রূপে— শরীরটা নুয়ে পড়েছে, একটু একটু কাঁপছে, মাথাটাও অল্প অল্প করে নড়ছে। সে জানে— গাঁয়ে তাকে সেলাম দিয়ে অভ্যর্থনা করতে কেউ আসবে না। তবু সে এসেছে। না এসে উপায় নেই।

সেই অখ্যাত ক্ষুদ্র গ্রামের রেল স্টেশনে কেবল প্যাসেঞ্জার গাড়ীই দাঁড়ায়। তাও আবার দিনের প্যাসেঞ্জার গাড়ী। কিন্তু নানাকারণে কখনো-সখনো রাত্রি এসে সেই দিনের প্যাসেঞ্জার গাড়ীর নাগাল ধরে ফেলে। এমন ব্যতিক্রমের দিনে, রাতেও সেখানে গাড়ী দাঁড়ায়।

এমনি এক ব্যতিক্রমের দিনে— কাল রাতে— উত্তর-থেকে-আসা সেই দিনের প্যাসেঞ্জার গাড়ী কেবল একটিমাত্র যাত্রী অম্মাচিকে নামিয়ে দিয়ে সেই রেলস্টেশনের যৎসামান্য আলোটুকুও কেড়ে নিয়ে চলে গেল। বিপুল জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ অম্মাচি অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল।

কিছুক্ষণ পরে ক্যানভাসের বোঝাই-থলেটা কাঁধের উপর ফেলে, সম্পূর্ণ অপরিচিত গ্রামে ঘুরে বেড়াবার মতো, অম্মাচি তার জন্মপল্লীর চার-পাঁচটা রাস্তা দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল। তারপরে গ্রামের বাইরে এসে, গ্রাম থেকে আলাদা-থাকা তার নিজের সমাজের বস্তিটার দিকে একবার দূর থেকে চেয়ে দেখল। তারপরে শূন্য মনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একসময় তার খেয়াল হল যে সে তাদের বস্তির দিকে যেতে যেতে একেবারে সীমানায় এসে পড়েছে— এই তো রাস্তার পাশে পাশে প্রবাহিত ছোট্ট খালটির উপর কবেকার তৈরি বাঁধ। ক্যানভাসের থলেটা নামিয়ে রেখে সে বাঁধের উপর একটু বসল। ভাবতে লাগল— এইটুকু পথ হেঁটে গিয়ে বস্তির মধ্যেকার বাড়ীতে কার সঙ্গে সে দেখা করতে পারে?

অম্মাচির পায়ের তলা দিয়ে ছল ছল করে জল ছুঁয়ে যাচ্ছে। মাথার উপর ঝিঁঝি পোকার একটানা শব্দ। রাস্তার দুধারে অন্ধকারে কালো কালো গাছের উপর অসংখ্য জোনাকি পোকার আলোর খেলা। কিছুদূরে বস্তি দেখা যাচ্ছে, দু-একটা আলোর রেখা এবং কুঁড়ে ঘরের উপর ধোঁয়া। শিশুদের কান্না এবং কোনো এক বৃদ্ধার বিলাপও একটু একটু শোনা যাচ্ছে।

অম্মাচির হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। এই বাঁধের কাঠের উপর সে কতবার এসে বসেছে। ছলছল করে ধাবমান এই নালার জলে মা যখন তার ঘাসের ঝুড়ি ফেলে ভালো করে, ধুয়ে ধুয়ে নিত, তখন কোমরে একটু নেংটি পরে অতি ছোট ছেলে অম্মাচি হাতে এক টুকরো আখ নিয়ে মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকত— সেই সমস্ত দিনের কথা মনে আসছে তার। তার মায়েরও সেদিন এই আশা ছিল যে তার ছেলে বড় একটা বিয়ে করে আর পাঁচজনের মতো চাষবাস করে অথবা গরুবাছুর চরিয়ে বেঁচে থাকবে। সেই সমস্ত আশাভরসায় ছাই দিয়েই যেন অম্মাচি প্রথম মহাযুদ্ধে চলে যায়। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার আগে সে জানতেই পারেনি যে তার মা আর ইহলোকে নেই। মায়ের জন্য সে চোখের জলও ফেলেনি.....

অম্মাচির কাছে মৃত্যু ব্যাপারটা বড় কিছু নয়; সে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতিয়ে বসেছে মৃত্যুর সঙ্গে। জীবনের দুঃসহ দুঃখকষ্টের কথা ভেবে তার মনে হচ্ছে কেন আর বেঁচে থেকে বৃথা জীবনের ভার বয়ে বয়ে চলা। যুদ্ধে সে মারা গেলে কত ভাল হত। এখন আর তার কে আছে? কার জন্য সে বেঁচে থাকবে? তার ট্যাঁকে এখনও কয়েকশ

টাকা রয়েছে। এই টাকাগুলি দিয়ে সে কী বা করবে? এখন তার একমাত্র চিন্তা, পঞ্চাশ বছর না হতেই এই যে তার শরীরের বার্ধক্য এবং জীবনের এই যে স্নেহ-ভালোবাসাহীন শূন্যতা—এ সব ভোগ করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

এমন সময়ে চাকায় — পেরেকে ঠোকাঠুকির 'কিরীচ্ কিরীচ্' এবং উঁচু-নীচু জায়গায় ওঠানামার তালের শব্দ 'কটক্ কটক্' শুনে বোঝা গেল স্টেশনের দিক থেকে দূরে একটা গরুর গাড়ী আসছে। গাড়ী যখন নিকটে এল, তখন তার মধ্য থেকে একটি মেয়ের কণ্ঠে শোনা গেল— 'এই! চুপ করো.....ওই দ্যাখো কে একজন বসে আছে ওখানে।' অম্মাচিকে লক্ষ্য ক'রে চাপাকণ্ঠে বলা মেয়েটির সতর্কবাণী থেকে গাড়ীর মধ্যে কিছু একটা যৌবনসুলভ লীলাদৃশ্য অনুমান করে অম্মাচি একটা নকল কাশির সাহায্যে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল।

গাড়োয়ান হাঁক দিল— 'বাঁধের উপর কে বসে আছেন?'

অম্মাচি উত্তর দিল— 'ভিন গাঁয়ের লোক.....মভুবঙ্গরৈ যাচ্ছি।'

গাড়ী পার হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হতেই সেই মেয়েটির কলকল হাসি গাড়ীর অদ্ভুত আওয়াজকে অতিক্রম করে অম্মাচির কানে এসে পৌঁছল। তাদের কথাবার্তার ধরন থেকে বোঝা গেল যে তারা দুজনেই শুধু ভালোবাসার মত্ততায় নয়, খানিকটা তাড়ির নেশাতেও আচ্ছন্ন। অম্মাচি আপন মনে বলল— 'হুঁ', বয়সের ধর্ম আর কি!' আর একটা সূক্ষ্ম ভাবনা— সুতোর মতোই সূক্ষ্ম— তার মনের মধ্যে খেলে গেল— 'জীবনে কী পেয়েছি আমি? এদিক ওদিক ঘুরেছি, কত কী সব খুঁজেছি, সব বৃথা হয়ে গেল।'

মাত্র কিছুক্ষণ আগে পার-হয়ে-যাওয়া গরুর গাড়ীর মধ্যেকার যে যৌবনের কলকলধ্বনি, তা যেন অম্মাচির পার হয়ে যাওয়া অতীতকাল তাকে দেখেই হাসছে বলে মনে হল তার। 'হ্যাঁ! বয়সের ধর্ম....সব ফুরিয়ে গেছে। ....আমারও ত ছিল .... আঠারো বছর বয়স, আঠারো থেকে কুড়ি, কুড়ি থেকে পঁচিশ, তিরিশ, চল্লিশ .... তখন ত গ্রাহ্যই করিনি আমি .... ছুটেছি ত ছুটেছি .... সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে কী সুখ তা তখন বুঝিনি .... কেবল ছুটেছি .... সমাজ না হয় ছোটজাত বলে আমার আলাদা করে দিয়েছে, ঘৃণা করেছে, কিন্তু ভগবানের করুণায় বয়স ও যৌবন, সকলের মতো, আমিও তো পেয়েছিলাম। সকলকে সমভাবে দেওয়া সেই বয়স ও যৌবনকে পা দিয়ে আঘাত করে পার হ'য়ে কী দ্রুতবেগে আমি ছুটেছি। যখন ছুটছিলাম, যৌবনও যে আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে ছুটে যাচ্ছিল একথা কি তখন জানতাম? আমার এই ছুটোছুটির জন্য দায়ী ছিল ওই যৌবনেরই তেজ। ছুটে ছুটে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, দেখি— সব শেষ হয়ে গেছে। ... কী লাভ হল এই ছুটোছুটিতে?' এইভাবে অম্মাচি মনে মনে বিলাপ করতে লাগল।

—সত্যিই তো, মানুষ যখন কিছু হারিয়ে ফেলে কিন্তু 'হারিয়ে ফেলেছি' বলে কোনো চেতনা তার থাকে না, বরং 'হারানো জিনিসটা আছে, এই তো আমার কাছেই আছে' এই চিন্তায় সে মগ্ন থাকে, তখন হারানোর বেদনা সে অনায়াসে বহন করে চলে। কিন্তু সম্পূর্ণ হারাবার পরে যদি সে কেবল এই চিন্তায় ডুবে থাকে 'আমি হারিয়েছি, আমি হারিয়েছি', তবে সেই হারানো জিনিসটি যতই সামান্য হোক না, তা হারাবার বেদনা খুব বড় হয়ে ওঠে। সেই হারাবার বেদনাই মানুষকে বলে দেয় কোন জিনিসটি কত বড়, কত প্রিয়।...

রাত অনেক হলেও বস্তির মধ্যে ঢোকার ইচ্ছা না থাকাতে অম্মাচি সেই বাঁধের উপরেই বসে রইল। এখনও বস্তি থেকে মানুষের গলা, কুকুরের শব্দ এক নাগাড়ে শোনা যাচ্ছে।

বস্তির দিক থেকে একটা পাগড়ি-বাঁধা লোক মুখে চুরুট ধরিয়ে, বাতাসে তার গন্ধ ছড়িয়ে, অন্ধকার পথে

ভয় তাড়াবার জন্য উচ্চ কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে আসছে। বাঁধের উপর একটা চেহারা চোখে পড়া মাত্রই লোকটি ভীত কণ্ঠে বলে উঠল — 'কে ওখানে?' গান থেমে যাওয়ার মতো লোকটিও হঠাৎ থেমে গেল।

অস্মাচি উঠে দাঁড়িয়ে মাটির উপর পায়ের বুটটা দিয়ে শব্দ করে বলল— 'মানুষই বসে আছি। ভয় পেও না।'

পাগড়ি বাঁধা লোকটি অস্মাচিকে চিনতে পারবে বলে কাছে এসে মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল — 'কে গো?' সেই মুহূর্তে হঠাৎ অস্মাচির মনে পড়ে গেল তার এক দূর সম্পর্কের বোন কাসাম্বুর কথা। কাসাম্বুর স্বামী জটে ক্ষ্যাপার নাম বলে অস্মাচি জানাল যে সে বাইরে থেকে তাকে খুঁজতে এসেছে।

'জটে ক্ষ্যাপা? সে তো রেলে 'পোটার' হয়ে মাদ্রাজ চলে গেছে। বৌ-কেও সঙ্গে নিয়েছে। জানো না বুঝি?' লোকটির কথা শুনে অস্মাচি একটু নিরাশ হল। জিজ্ঞাসা করল— 'মাদ্রাজের কোথায় থাকে ওরা?'

'এয়সপুর (এগ্‌মোর) টিশনেই নাকি কুলির কাজ করে জটে ক্ষ্যাপা। গেলেই দেখা হবে।' বলে পাগড়ি-বাঁধা লোকটি চলে গেল।

অস্মাচি অনেকক্ষণ বস্তিটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ক্যানভাস থলেটা কাঁধে ফেলে পুনরায় রেল স্টেশনের দিকে অগ্রসর হল।

স্নেহ-মমতা-ভালবাসা দেওয়ার ও নেওয়ার মতো লোক অস্মাচির কেউ নেই এ সংসারে। কিন্তু এই মুহূর্তেই তার মনের মধ্যে একটা বিশেষ ভাবনা দানা বাঁধতে লাগল— আছে, তারও একটা বন্ধন আছে, ওই কাসাম্বু, ওই জটে ক্ষ্যাপা আর তাদের ছেলেমেয়েরা। এর পরেই অস্মাচির দুর্বল পদক্ষেপে জোর দেখা দিল।

পরদিন সেই প্যাসেঞ্জার গাড়ী সকালের দিকে কয়েক ঘণ্টা লেট করেও দিনের বেলাতেই এসে পৌঁছল। গাড়ীতে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অস্মাচি উৎসুক চোখে দেখতে লাগল তার গ্রামখানাকে, গ্রামের পাশে ওই বস্তিকে, আর বস্তির কাছে ওই বাঁধটাকে— যে বাঁধের নীচ দিয়ে এখনও জল চলে ছল ছল করে।

এদিকে তাদেরই বস্তি থেকে ছুটে আসা কতগুলি নেংটি পরা ছোটি ছোটি ছেলে এবং ঘাগরা পরা ছোট ছোট মেয়ে তালশাঁস, কাঁকুড়, পান ইত্যাদি রেলযাত্রীদের কাছে বেচবে বলে দাম হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে। অস্মাচি সেই ছেলে-মেয়েগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে একটু মৃদু হাসি হেসে ভাবল— ওদের কাছ থেকে যা হোক কিছু কিনলে ভাল হয়। আমার পকেট থেকে মুঠো-ভর্তি খুচরো পয়সা তুলতে তুলতে সে যখন একটি মেয়েকে ডাক দিল, তখন রেলগাড়ীও বাঁশি বাজিয়ে চলতে শুরু করে। অস্মাচি কিছু কেনার আশা ছেড়ে দিয়ে মুঠো ভর্তি খুচরো পয়সা সেই ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে প্ল্যাটফরমের উপর ছড়িয়ে দেয়। পরম উৎসাহে পয়সা কুড়িয়ে তারা যখন মাথা তুলল, গাড়ী তখন চলতে শুরু করেছে। ছেলে-মেয়েগুলির দিকে চেয়ে অস্মাচি শিশুর মতো আনন্দে হাসতে লাগল। ওরাও এই হাসির উত্তরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে মিলিটারী পোশাক পরা লোকটিকে সেলাম জানাল। যেন জন্মভূমির কাছ থকে বিদায় গ্রহণ করছে এমনিভাবে কম্পমান মস্তকে হাত তুলে সেলাম দিতে গিয়ে অস্মাচির চোখের পাতা ভারী হয়ে এল।

গাড়ীতে ভীড় নেই। অস্মাচির মাথার উপরকার বাংকে পায়ে কাবলী জুতো এবং কোমরে ধুতির উপর সবুজ রং-এর সিঙ্গাপুরী বেল্ট-পরা একটা বখাটে ছোঁড়া শুয়ে শুয়ে বিড়ি খাচ্ছে। অস্মাচির মুখোমুখি বেঞ্চিতে একজন রমণী হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে, তার কোলে ঘুমুচ্ছে একটি শিশুকন্যা।

একটু নিরীক্ষণ করে তাকালেই মহিলার চেহারা থেকে বোঝা যায়, সে একজন যুবতী ব্রাহ্মণ বিধবা। বহুদিন

ক্ষয় রোগে ভুগে ভুগে ঝাঁঝরা শরীর অস্থিচর্মসার হয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছে মাত্র। গলার গর্তে ধুক ধুক করে ক্ষীণ প্রাণটুকু স্পন্দিত হচ্ছে। আর, তারই কোলে শুয়ে থাকা সেই সুন্দর শিশুকন্যার ঈষৎ বোঁজা হাসিমাখা মুখখানা দেখলে মনে হয় যেন মৃতগাছকে আঁকড়ে ধরে বেড়ে ওঠা একটি সবুজ রং-এর চারায় মুক্তরচিত একটি ফুল।

গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে এলে টিকিট চেকার উঠে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ধূমপান করে সিগারেটটি ফেলে দিয়ে ধীরে সুস্থে এসে অম্মাচির কাছে বসেন। কিছুক্ষণ বসে কী যেন একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকে টিকিট চেকার পরবর্তী স্টেশন এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে অম্মাচির উপরের বাংকে শোয়া সেই বখাটে ছোঁড়ার দিকে টিকিটের জন্য হাত বাড়াল। অম্মাচিও তার কোটের পকেট থেকে টিকিটখানা এগিয়ে দিল। টিকিট দুখানির পিছনের দিকে সই করে সেই নিদ্রিত ব্রাহ্মণ বিধবাকে জাগাবার জন্য হাতের পেন্‌সিলটা দিয়ে বেঞ্চির উপর কয়েকবার ঠক ঠক করল টিকিট চেকার।

সেই বিধবা রমণী তার শরীরে ও মনে কতরকম দুঃখকষ্ট ও মর্মপীড়া ভোগ করছে কে জানে? নিষ্প্রাণ চোখ দুটি মেলে এক মুহূর্ত সে তাকাল মাত্র, পরে যেন আপনা থেকে চোখ দুটি বুঁজে গেল। তার ফ্যাকাসে ঠোঁটের উপর দাঁতের কামড় বসিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে রমণীটি কান্নার সুরে অস্ফুট কণ্ঠে একবার বলে উঠল— 'হে ভগবান!' মনে হল কোনো মর্মান্তিক যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

সমবেদনার সুরে অম্মাচি বলল— 'আম্মা...চেকার সাহেব টিকিট চাইছে দেখুন'। মাথা তুলে বসতে না পেরে সেই হেলান দেওয়া অবস্থাতেই বিধবা চোখ খুলে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল— 'টিকিট ?'

টিকিট নেই? তাহলে পরের স্টেশনেই নেমে যান, আম্মা' কথাটি একটু রুক্ষভাবে বলে দিয়ে টিকিট চেকার অন্য দিকে ফিরে বাইরে একবার উঁকি মেরে চেয়ে দেখল।

পরের স্টেশন এগিয়ে আসছে। রমণীটি খুব জোর করে উঠে বসবার চেষ্টা করতে থাকলে কোলে নিদ্রিত দু-বছরের শিশু উঠে বসে চোখ দুটি ডলতে ডলতে বোধ করি ক্ষুধায় এবং কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় কাঁদতে থাকে। অম্মাচি জিজ্ঞাসা করল— 'আপনি কতদূর যাবেন, আম্মা?' বিধবা করুণ ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল— 'মাদ্রাজে, বাবু'।

'স্যার, মাদ্রাজের জন্য একখানা টিকিট কেটে দিন, আমি টাকা দিচ্ছি।'—এই কথা বলতে বলতে অম্মাচি তার কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করল। টিকিট চেকার একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে একটু মৃদু হাসি দিয়ে অম্মাচির উদারতাকে অভিনন্দন জানিয়ে, দাঁড়ানো অবস্থায় একখানা পা তুলে বেঞ্চির উপর রেখে হাঁটুর উপর নোটবুকটা ধরে রসিদ লিখে দিল।

বিধবা রমণী কৃতজ্ঞচিত্তে তার কাঠির মতো শীর্ণ আঙুলগুলি যুক্ত করে প্রার্থনার ভঙ্গীতে অম্মাচির দিকে তাকিয়ে বলল— 'বাবু গো, আপনার ছেলেমেয়েদের অনেক পরমায়ু হোক।' এই আশীর্বাদবাক্যে অম্মাচি এক মুহূর্তে হেঁট মুখে নিজের মনে একটু হাসল মাত্র।

টিকিট চেকার এক দরজা দিয়ে নেমে যেতেই অন্য দরজা দিয়ে বিনাটিকিটের যাত্রী এক ভিখারী ও তার সঙ্গিনী কামরার মধ্যে উঠে এল।

বেঞ্চিতে প্রচুর জায়গা থাকা সত্ত্বেও হাতে টিকিট নেই বলে তাদের বেঞ্চিতে বসা উচিত নয় ভেবে সেই ভিক্ষুক দম্পতি কামরার এক কোণে হাঁটু ভাঁজ করে উবু হয়ে বসল। ভিখারী হাতের লাঠিখানা নীচে রেখে দিয়ে

কোঁচড়ে রাখা চীনেবাদাম থেকে অর্ধেকটা স্ত্রীর হাতে দিল। তারপর দুজনে মিলে কুটুর-কুটুর করে সেই চীনেবাদাম খুঁটে খুঁটে খেতে আরম্ভ করল।

সেই ছোট স্টেশন থেকে ছেড়ে বেশ খানিকক্ষণ চলার পরে রেলগাড়ী একটা দীর্ঘ সুতীক্ষ্ম শব্দ তুলে একটা বড় জংশন স্টেশনে এসে অনেকক্ষণের জন্য দাঁড়াল, অচৈতন্যের মতো পড়ে-থাকা বিধবার কোলে শায়িত শিশুটি চোখ খুলে বাইরে তাকাল। জানালার সামনেই বিস্কুট-ভর্তি থালা নিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখে শিশু মায়ের গাল টেনে টেনে 'মা-মা' বলে ডেকে ডেকে বাইরে হাত দেখিয়ে কাঁদতে থাকল।

অম্মাচির ইচ্ছা হল শিশুকে কিছু কিনে দেয়। কিন্তু ওদের বংশ এবং নিজের জন্মের কথা চিন্তা করে ইতস্তত চোখে শিশুর দিকে তাকিয়ে সে একটু হাসির ভাব দেখাল। শিশু তার মুখের দিকে তাকিয়ে উচ্চ কণ্ঠে কাঁদতে লাগল— 'মা, অপ্পিচ্চি....!' এতক্ষণ বিধবার খানিকটা চেতনা ফিরে এলে সে চোখ খুলল।

অম্মাচি নম্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—'আম্মা, ও কাঁদছে, আমি খাবার কিছু কিনে দেব? আপত্তি নেই তো?' বিধবা অশ্রুপূর্ণ চোখেই তার সম্মতি জানাল।

অম্মাচি গাড়ী থেকে নেমে প্ল্যাটফরমে স্টলের কাছে একটা বনরুটি এবং এক কাপ দুধ কিনল। কিনে নিয়ে ফিরে আসার সময়ে হঠাৎ কী যেন মনে পড়ার মতো আর একটা বনরুটি এবং আর এক কাপ দুধ চাইল। কাগজে মোড়া বনরুটি দুখানা কোটের পকেটে রেখে কম্পিত হাতে দুধের পাত্র দুটি নিয়ে আস্তে আস্তে কামরার দিকে এগোতে লাগল।

যারা দেখছে, তাদের কাছে মনে হতে পারে— 'অসমর্থ শরীর নিয়ে লোকটি এত কষ্ট কেন স্বীকার করছে?' কিন্তু অম্মাচি জানে— পরের জন্য কষ্ট স্বীকার করায় কত সুখ।

কামরার মধ্যে এসে, যে দুটো বাটিতে দুধ ভর্তি কাপ উলটো করে রাখা হয়েছে সেই বাটি দুটি বেঞ্চির উপর রেখে অম্মাচি হাসিমুখে শিশুর কাছে একটা বনরুটি বাড়িয়ে দিল। মহা-উৎসাহে ঝাঁপ দিয়ে শিশু দু হাত দিয়ে ধরে রুটিতে কামড় দিল।

চোখ খুলে বিধবাও একবার অম্মাচির দিকে তাকালে সে একটা বন্ সসঙ্কোচে শিশুর মায়ের দিকে এগিয়ে দিল। রমণী মাথা নেড়ে জানাল— 'না'।

'এই দুধটুকু অন্তত খেয়ে নিন মা, আপনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন'— এই বলে অম্মাচি বাটির মধ্যে থেকে কাপ তুলে ধীরে ধীরে দুধটা জুড়িয়ে তার কাছে দিল।

রমণীও কম্পিত হস্তে দুধটা নিয়ে, যে তৃষ্ণা কখনও মেটে না যেন সেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একনিশ্বাসে চক চক করে খেয়ে ফেলল। তার খাওয়ার সময়ে অম্মাচি বাটি থেকে আরও দুধ একটু একটু করে তার কাপে ঢেলে দিচ্ছিল। বুঝতে পেরেছিল এই বিধবার মধ্যে এখন যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি তা সর্বগ্রাসী। শিশুর জন্য কিনে আনা দুধটাও শিশুর মাকে দিলে সে তার অর্ধেকটা নিঃশেষ করে 'ব্যাস' বলে অবসন্ন হ'য়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

শিশু যাতে তার মাকে বিরক্ত না করে, অম্মাচি তাই শিশুকে নিজের কাছে এনে বনরুটি ছিঁড়ে দুধে ভিজিয়ে খাইয়ে দিল। খুব আপনার জন মনে করে শিশু তার কোলে চড়ে বসে খেল। পরে শিশুকে কোলে করে নিয়ে স্টল থেকে এককাপ দুধ শিশুকে খাওয়াল এবং নিজে খেয়ে নিল এককাপ চা। যেন অনেক দিনের পরিচয়— এইভাবে শিশু তার সঙ্গে হেসে হেসে খেলা করে। অম্মাচি শিশুর জন্য এমন একটা খেলার পুতুল কিনে দেয় যা টিপ দিলে

'কিরিচ কিরিচ' শব্দ ক'রে ওঠে। পুতুলটাকে পেয়ে—শিশু মহা আনন্দে হৈ চৈ করে হাসে। অম্মাচিও জগৎসংসার ভুলে গিয়ে—শিশুর সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে আছে, এমন সময়ে গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা বাজল। শিশুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে কামরায় উঠল অম্মাচি, তার উৎসাহ দেখে মনে হয় আবার বুঝি যৌবন ফিরে এসেছে।

জংশনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে —প্যাসেঞ্জার গাড়ী অবশেষে ধীরে ধীরে রওনা হল। শিশুকে দেখে মায়ের মুখে একটু হাসির আভা দেখা দিয়েছে। ওর ক্ষিধে পেয়েছিল, পেটভরে খেয়েছে, দুর্বলতা আর নেই, একটু সবল হয়েছে, খেলার পুতুল পেয়ে খুব খুশী, ওই অচেনা নতুন লোকটির কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, আবার কখনও তার চিবুক ধ'রে টানে এবং হেসে হেসে খেলা করে তার মেয়ে— সেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে মা একটু হাসল।

হাসিটি লক্ষ্য করে অম্মাচি তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলার সাহস পেল— 'মাদ্রাজে কোথায় যাবেন, মা?'

বিধবা তার উত্তর দেওয়ার আগে গভীর দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, শীর্ণ আঙ্গুলগুলি দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলল। পরে ক্ষীণকণ্ঠে বলল— 'মাদ্রাজে চেনা লোক আছে...আমার এক সই....অনেকদিন আগে একবার দেশে আসে, তখন বলেছিল যে তারা 'নুঙ্গুমপাক্কম'-এ থাকে। ঠিকানা ঠিক মতো জানিনা। অতবড় শহরে গিয়ে কোথায় খোঁজ করব ভাবছিলাম। কিন্তু এখন ত মনে হচ্ছে গিয়ে পৌঁছতেই পারব না।' কথা বলতে বলতে গলা রুদ্ধ হয়ে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

অম্মাচি তাকে সাহস দিয়ে বলল— 'ও কথা বলছেন কেন মা? আপনি যেখানে যেতে চান, আপনাকে নিয়ে গিয়ে আমি পৌঁছে দেব।'

মনে মনে অম্মাচির প্রশংসা করে, বিধবা রমণীর মন শিশুর দিকে চেয়ে করুণার বিগলিত হল— এই শিশুকে সে দুঃখকষ্টে পূর্ণ সংসারের মধ্যে একা ফেলে দিয়ে যাচ্ছে।

রমণী হঠাৎ অম্মাচির উদ্দেশে বলল— 'বাবু, আপনি কে? ভগবানই আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে আপনিই আমার অবলম্বন, আপনার জন, সহোদর ভাই সবই আপনি....।'

কথাগুলি শুনে অম্মাচির দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

শিশুর মন তখন আর মায়ের কথা ভাবছে না। সেই পুতুলটা অম্মাচির কাছে এনে টিপে ধরল। কৃত্রিম ভয়ে অম্মাচি তার মাথাটা দ্রুত সরিয়ে নিয়ে, শব্দটা যেন অসহনীয় এই ভাব দেখিয়ে দুই কানে আঙ্গুল দিচ্ছে দেখে শিশু খুব মজা পেয়ে হেসে উঠল। মায়ের দৃষ্টি শিশুর সঙ্গে খেলার মত্ত অম্মাচিকে খুব মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

অম্মাচি বুঝতে পারল যে এই শিশুর মা তার কাছে কিছু একটা বলে শান্তি লাভ অথবা কিছু একটা জিজ্ঞাসা করে সান্ত্বনা লাভের জন্য খুব আকুল হয়ে উঠেছে। তাই সে গভীর সমবেদনায় তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অম্মাচিকে আজ পর্যন্ত কেউ তো স্নেহ ভালবাসা দেখায় নি। তাই শিশু তার কোলের উপর বসে, জামা ধরে টানাটানি করে তার হৃদয়কে অতি সহজেই বশ করে ফেলেছে।

হঠাৎ শিশুর মা পুনরায় অম্মাচিকে বলল— 'বাবু, আমার কেউ নেই, কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই।' এই বলেই সে হেঁচকি দিয়ে কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ ধরে অশ্রুধারা-বিগলিত ক্রন্দনের পরে নাক-মুখ মুছে নিয়ে ভাঙা গলায় বলল— 'গেল বছর— শিশু জন্মানোর এক বছরের মধ্যে ওর বাবাকে খেয়েছে।' এই বলে সে বিলাপ করতে থাকলে অম্মাচি শিশুকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলল— 'শিশুকে কেন দোষ দিচ্ছেন, মা?' বিধবা

বিড়বিড় করে বলতে লাগল— 'সত্যিই ত, এই শিশু কী করবে? তাঁর শরীরটাই ছিল নড়বড়ে। বিয়ের সময়েই তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চাশের উপর। আমার বাবা গরীব ছিলেন বলে বরদক্ষিণার কোনো ব্যবস্থা করতে না পেরে আমাকে তৃতীয় পক্ষেই দিলেন। বিয়ের পরের বছর আমার বাবাও চলে যান। আমার স্বামীও আমাকে খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু ভগবানের সইল না। অন্ধ বিধাতা!'

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে আবার শুরু করল— 'তাঁর ছিল হোটেলে কাজ। ক্ষয় রোগ দেখা দিলে পরে কেউ আর কাজে রাখতে পারবে না বলে দিল। একে একে চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছি। একটি একটি করে বড় করে করে তাদের বিদায় দিয়েছি। সবশেষে এইটি। এও যদি না থাকে, তবে কোথাও গিয়ে নদী-পুকুরে ঝাঁপ দেব। সয়না বাবু। এই রোগের যাতনাও সওয়া যায় না। একটু একটু করে যন্ত্রণা পেয়ে পেয়ে মরার চেয়ে একটা আঘাতেই যদি যেতে পারি! এই মেয়েটাই হয়েছে আমার গলগ্রহ। স্বামীর কাছ থেকে কী সম্পত্তি পেয়েছি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন — এই গলার কাঁটা মেয়েটা আর এই রোগের যাতনা।' রমণী আর কথা বলতে না পেরে শ্বাস নেওয়ার কষ্টে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

প্যাসেঞ্জার গাড়ী যখন শব্দ করতে করতে এক নাগাড়ে ছুটেই চলেছে, তখন সেই কামরার মধ্যে একটা নিস্তব্ধ শান্তি। রমণী ধীরে ধীরে চোখ বুঁজল। গাড়ীর গতি অনুযায়ী চোখ বুঝে হেলান-দেওয়া রমণীর মাথাও শিথিলভাবে ডাইনে-বাঁয়ে নড়ছে দেখে মুহূর্তের জন্য অম্মাচি আঁৎকে উঠল— 'উনি কি তাহলে—?'

ভাগ্য ভাল, বিধবা তখনই চোখ খুলল—শরীর ও মনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে— দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে মুখটা বিকৃত করে একটা তিক্ত হাসির সঙ্গে চোখ মেলে তাকাল। বলল— 'মেয়ে জন্ম না হওয়াই ভাল। মেয়ে হয়ে জন্মালেও গরীবের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মাতে নেই।' —এই বলে, পরমুহূর্তে কী একটা ভেবে পূর্বের কথাটা অস্বীকারের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলল— 'গরীব হয়ে জন্মালেই বা কী? আপনার কী জাত, কোন্ বংশ কিছুই জানি না। কিন্তু আপনাদের সমাজে যারা গরীবের মেয়ে, তারাও তাদের মতো করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে। কী বলেন? গরীবের ঘরে মেয়ে হয়েই যদি জন্মাতে হয়, তবে আমাদের বামুন জাতের মধ্যে যেন না জন্মায়। তার চেয়ে ঢের ভাল বস্তিতে জন্ম নেওয়া...'। কথাগুলো শুনে অম্মাচির মনে পড়ল কাল রাতের ঘটনা। অন্ধকারে গরুর গাড়ীতে করে যাচ্ছিল যে বস্তির মেয়েটি তার উচ্ছল হাসি যেন আর একবার অম্মাচির কানে ধ্বনিত হল।

'আমি কী পাপ করেছি যে মেয়ে হয়ে জন্মে আবার একটা মেয়েকে জন্ম দিয়েছি! আমার জীবন ত শেষ হয়ে এল, কিন্তু মেয়েটার অদৃষ্টে কী দুর্গতি আছে জানি না।' শিশুর মায়ের কথা শুনে অম্মাচি তার কোলের উপর শোওয়া শিশুর নরম চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল— 'আপনি যে যুগে বেঁচে আছেন, আপনার মেয়েও কি সেই যুগেই থাকবে? তার বেঁচে থাকার কাল আলাদা।'

'কালের কথা বললেই হল, বাবু? মানুষ মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার করে, তার জন্য আর কালাকাল কী? আমি গাঁয়ের মেয়ে। শহরে আসার পরে বেশ বুঝতে পেরেছি— জাত, আচার, ছোঁয়াছুঁয়ি সবই অর্থহীন। কিন্তু কে সাহস করে এসব বিসর্জন দেবে বলুন। আপনি কে, কী আপনার জাত— কিছুই জানি না। আপনি দেখলেন একজন মেয়েছেলে অসুস্থ অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। দয়া করে দুধ কিনে এনে দিলেন, আমিও খেলাম। সমাজের পাঁচজনের মধ্যে আমি এ কাজ করতে পারি কি? করব কি? সেখানে নীচু জাতকে 'সরে যা, সরে যা' বলে আমার মর্যাদা রক্ষা করতে হয়। কারণ কী? 'ওই পাঁচজন মানুষ কী বলবে?' — এই হল কারণ। ওই পাঁচজন মানুষের

ভয় সকলেরই আছে। এই ভয় ছাড়া আর কী কারণ হতে পারে? আমার মতো এই অনাদৃত উপেক্ষিত অবস্থায় পড়লে ওই পাঁচজনের চারজন মানুষ আমারই মতো আচরণ করত। তা না হলে দেখুন, আচার ও জাতকে মানুষ যদি সত্যি সত্যি বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে দেখত, হৃদয় দিয়ে বোধার চেষ্টা করত, তাহলে তা নিরুদ্দেশ হত অনেক কাল আগে। কিন্তু প্রতিটি মানুষ জাতপাঁতকে মিথ্যা বলে জেনেও যে ওগুলিকে আঁকড়ে আছে, সেই প্রবঞ্চনার ভিত্তিতে ওরা আজও বেঁচে আছে এবং আমার মতো গরীব মেয়েদের সর্বনাশ করছে।'

রমণী যে এত অসুস্থ হয়েও এতক্ষণ ধরে এক নাগাড়ে কথা বলতে পারল, তার কারণ মনে হয় কিছুক্ষণ আগে তাকে বেশ খানিকটা গরম দুধ খাওয়ানো হয়েছিল। তাছাড়া, ইতিমধ্যে সন্ধ্যাবেলার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কিন্তু এতক্ষণ কথা বলার ফলে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তবু তার মনে হল অম্মাচির কাছে তার আসল কথাটাই বলা হয়নি। বেশ তাড়াতাড়ি করে সে একটু মাথা তুলে বসল।

'আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন— তুমি যে এতসব বলছ, তুমি কি জাতের বাধা কিছু কাটিয়ে উঠতে পেরেছ? না, এখনও পারি নি। এ পর্যন্ত আমার জাতের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করিনি। কিন্তু এখন আমি করব। ...আমি যে শাস্তি পেয়ে গেলাম, আমার মেয়ের কপালে যেন সেই শাস্তি না ঘটে। হ্যাঁ, আমি তাই করতে যাচ্ছি।' যেন একটা কঠিন সংকল্প নিয়ে কারো উপর প্রতিহিংসা নেওয়ার ভঙ্গীতে ঠোঁট কেটে কেটে মাথা নাড়তে থাকল রমণী।

ইতিমধ্যে রেলগাড়ী ছোট ছোট স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'কড়কড় কড়কড়' শব্দ ক'রে ছুটে চলেছে।

বিধবা রমণী হঠাৎ এক সময়ে বুকটা চেপে ধরে ওয়াক করে বমি করে ফেলল। ঘণ্টাদুয়েক আগে যে দুধটা খাওয়ানো হয়েছিল তার সবটাই অজীর্ণ হয়ে বেরিয়ে এল। অম্মাচি তাড়াতাড়ি শিশুকে কোল থেকে বেঞ্চির উপর বসিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রোগিনীর মাথাটাকে শক্ত করে ধরে রাখল। কোণে উপবিষ্ট বৃদ্ধা ভিক্ষুক রমণী ছুটে এল। তার হাতে একটা টিনের মগ চোখে পড়তে অম্মাচি তাকে জল নিয়ে আসতে বলল। বাথরুম থেকে এল এনে ভিক্ষুক রমণী বিধবার মুখ ধুয়ে মুছে দিয়ে দু-ঢোক জল খাওয়াবার চেষ্টা করল। মুখের দুপাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল জলটা। কেবল জল নয়, জলের সঙ্গে রক্তের রেখাও দেখা যাচ্ছে। মুখ থেকে, নাক থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠল— 'আইয়ো! রক্ত!' অম্মাচি তার উপরের কোট দিয়ে রক্ত মুছে বিধবাকে বেঞ্চির উপর— আস্তে আস্তে কাৎ করে শুইয়ে দিল। রোগিণীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। পিঠের দিকটা যে এখনও একটু গরম আছে সেটা তাকে বেঞ্চিতে শোয়াবার সময়ে অম্মাচি টের পেয়েছে। শিশুকে তার মায়ের কাছে বসিয়ে দিলে শিশু মায়ের বুকে মুখ নামিয়ে অম্মাচির দিকে তাকিয়ে হাসল।

রোগিণী অম্মাচির দিকে হাত বাড়ালে সে বেঞ্চির কাছে উবুহাঁটু হয়ে বসল। বিধবা শক্ত করে তার হাত চেপে ধ'রে গুপ্ত কথা বলার মতো চাপা কণ্ঠে বলল— 'আপনি যেই হোন, আমার কাছে দেবতার সমান। পরের স্টেশনে আমার এই দেহটাকে নামিয়ে দেবেন। দেবেন তো?' দুটো মহাযুদ্ধে যে অম্মাচি কতবার কত রকমের মৃত্যু চোখে দেখেছে, সেও এই সামান্য রোগিণীর আসন্ন মৃত্যুর আভাসে চোখের জল রাখতে না পেরে মুখ ঢাকল।

'সাহায্য না চাইতেই আপনি সাহায্য করছেন.....অনেকক্ষণ ধরে আমি যে কথাটা বলব বলব ভেবেছি, সেই কথাটা শুনুন....এই শিশুকে, আমার এই মেয়েটাকে —দু'-চোখ-বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল— 'আমার এই মেয়েটাকে আপনার সন্তানের মতো বড় করবেন। আমার বিশ্বাস হয়েছে ও ভালোভাবেই বেঁচে থাকবে। আমার

সন্তানকে আপনার ছেলেমেয়েদের মতোই লালন-পালন করবেন তো বাবু?' অম্মাচির হাতটাকে আরও জোরে চেপে ধরে উৎফুল্ল মুখে সেই জননী প্রশ্ন করল।

অম্মাচি দুটি হাত জোর করে তাকে নমস্কার করল। এখনও তার মণিবন্ধ রোগিনীর মুঠোর মধ্যে শক্ত ভাবে ধরা।

জননীর মুখের হাসিটুকু মেলাবার আগেই চোখ দুটি বুঁজে এলো। তারপরে ধীরে ধীরে মুখ খুলে যাওয়ার সময়ে যখন তার ঠোঁটের উপর— একটা মাছি এসে বসল, কেবল তখনই অম্মাচি বুঝতে পারল এই রমণীর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। অম্মাচি উঠে কিছুক্ষণ হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

কী একটা ছোট স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াতেই ভিক্ষুকরমণী কান্না জুড়ে দিতে সেই কামরায় খুব ভীড় জমে গেল। ভীড় সরিয়ে একজন রেলকর্মচারী এসে প্রবেশ করলেন।

তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে সেই নগণ্য রেল স্টেশনে উত্তরগামী দিনের প্যাসেঞ্জার গাড়ীর জন্য শিশুকে কোলে নিয়ে অম্মাচি অপেক্ষা করছে। নিজের মায়ের জন্য যে সব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করবার সুযোগ হয় নি, কাল অন্য এক জননীর জন্য সেই সমস্ত কর্তব্য পালন করে, জীবনে এক দুর্লভ সম্পদের মতো নতুন পাওয়া সেই শিশুকে সারা রাত বুকে করে ওই রেল স্টেশনে অপেক্ষা করছি অম্মাচি।

আজ ঠিক সময়মতোই প্যাসেঞ্জার গাড়ী পৌঁছল। অম্মাচির মাথা কাঁপছে, শরীরটাও কাঁপছে। একসঙ্গে শিশু ও ক্যানভাসের ভারী বোঝাটা নিয়ে ঢুকতে না পেরে প্রথমে সে জানালার মধ্য দিয়ে একজন মহিলার হাতে শিশুকে গলিয়ে দিয়ে পরে থলেটা নিয়ে উঠল।

গাড়ীর লোকজন সকলেই একবার শিশুকে, একবার বৃদ্ধ অম্মাচিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তারা হয়ত ভাবছিল— 'এই বুড়োটির সঙ্গে এমন সুন্দর একটি শিশু? সম্পর্কটা কী?'

যে মহিলা জানালা দিয়ে শিশুকে তুলে নিয়েছিল সে প্রশ্ন করল— 'মেয়েটি কে— কন্যা না নাতনী?'

যে অম্মাচির ছেলেপিলে হয়নি কোনোদিন, যে বিয়ের মুখই দেখল না, কিছুই না ভেবেচিন্তে সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল— 'নাতনী।'

শিশুর গালে ধীরে ধীরে আদর করতে করতে সেই মহিলা পুনরায় প্রশ্ন করল নাম কী শিশুর?'

প্যাসেঞ্জার গাড়ী তখন ছাড়বার মুখে তীক্ষ্ণ 'কৃ-উ-উ....' ধ্বনি করে উঠল। অম্মাচি ভাবল—তাইতো, শিশুর নামটা তো জিজ্ঞাসা করা হয়নি। গাড়ীর শব্দ থেমে যাওয়ার পরে— অম্মাচি নিজের রাখা নামটা বলে দিল— 'পাপ্পাত্তি'।*

'পাপ্পাত্তি। বেশ লাগসই নাম তো!'

[* পাপ্পা = শিশু। 'ত্তি' < স্ত্রী = স্ত্রীলিঙ্গসূচক প্রত্যয়। সুতরাং পাপ্পাত্তি = খুকী। পার্প্পান্ = ব্রাহ্মণ। মুখের ভাষায় 'পার্প্পান' > পাপ্পান্। সুতরাং 'পাপ্পান্ + ত্তি' = পাপ্পাত্তি = ব্রাহ্মণকন্যা।]

অনুবাদ : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

২.১ ▢ কাহিনি-সংশ্লেষ, নিবিড় পাঠ ও তত্ত্বোপলব্ধি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের থেকে অবসৃত এক সৈনিকের একদিনের রেল ভ্রমণের গল্প এটি। সেনাবাহিনীর মেশিনগানার অস্মাচিকে অবসৃত হতে হয়েছে তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কর্তৃপক্ষের মতে সে নাকি আর সৈন্যবাহিনীতে কাজ করবার উপযুক্ত নয়। নিজের সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ ''সেনা জীবনের চিবিয়ে-ফেলা ছিবড়ে মাত্র''। অবলীলায় যে-সেনাবাহিনী তাকে প্রায় নিরস্তিত্ব করে দিল একদা সেখানেই নিজের জীবনের অর্থ সে খুঁজতে এসেছিল কাজের মধ্যে। আসলে অস্মাচি সমাজ-সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপটিতে অবস্থিত — তথাকথিত 'নীচু' জাতের সদস্য, যাদের জীবনটা ক্ষুদ্রতা, অবহেলা ও অপমানে ভরা। এই অবমাননাকর জীবন থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে — নিজের অস্তিত্বের সম্মানজনক পরিচয় পেতে সে যোগ দেয় সেনাবাহিনীতে ; কারণ সেখানে উঁচুজাতের কোনো লোক ''সরে দাঁড়া'' বলবে না। ঘৃণায় ব্রাত্য করে রেখে দেবে না। তাই সেনাজীবনকেই সে আসল জীবন বলে গণ্য করেছিল। বড়ো ভালোবাসার এই জগৎ, তা তার কাছে যুদ্ধের কোলাহল যেন বিয়ের বাজনা, যুদ্ধে যাওয়া যেন নিজের শ্বশুরালয়ে যাবার মতো মধুর ব্যাপার; মাত্র আঠারো বছর বয়সেই এই জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। তারপর দীর্ঘদিন ধরে এই জীবনটাতেই সে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছিল যে ফেলে-আসা গ্রামের জীবনটাকে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। অথচ যখন এক মুহূর্তে সেই সামরিক জীবন থেকে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল তখন এই অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত এই পরিবর্তনে সে যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ শুধু উপজীবিকা হারিয়ে জীবনসংস্থানে বাধা পড়া নয়, যেন সমগ্র অস্তিত্বটিকেই হারিয়ে ফেলা — এ তার আত্মসঙ্কটের নামান্তর। কিন্তু সে নিরুপায়, যে গ্রামকে সে ঘৃণাভরে ছেড়ে গিয়েছিল সেখানেই তাকে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। তার কোনো আত্মীয়স্বজনও নেই — তাই কোনো পিছুটানও নেই। কিন্তু যে লোকটা একদিন মেশিনগানে গুলীবর্ষণ করে শত্রুসংহার করেছে, শত্রুর বোমার আঘাতে সে এতটা ভয়ানক আহত হয় যে দু-পায়ে উঠে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, সারা শরীর কাঁপতে থাকে — তাই স্নেহমমতার স্পর্শমাত্র পাবে না জেনেও তাকে গ্রামেই ফিরে আসতে হয় — কারণ তার যে আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।

একথা ঠিকই যে সে এর আগেও গ্রামে ফিরেছে কিন্তু সেই প্রত্যাবর্তনগুলি সাময়িক দুটি যুদ্ধ-মধ্যবর্তীকালীন বিরতিতে। যুদ্ধ-প্রত্যাবর্ত সৈনিকের একটা বিশেষ গুরুত্ব থাকে যে-কোনো সমাজেই। ফলত, যখন ওই সব সময়ে সে ফিরে এসে তার পেশালব্ধ জ্ঞান ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলত তখন লোকে অবাক বিস্ময়ে শুনত। একদা যে ছেলেটি ব্রাত্য, ঘৃণ্য ছিল নীচু জাত বলে, এই মনোযোগ তো এক ধরণের স্বীকৃতিই বটে তার জন্যে। তবে যারা গল্প শুনত তারা যথারীতি খানিকটা হয়ত বা হিংসায় পিছনে ফুট কেটে বলতো 'সব ধাপ্পা'। যে যাই হোক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেনানী অস্মাচি বেশ পরিণত বয়সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও যখন গেল, তখন তার জীবনের, অস্তিত্বের একমাত্র অবলম্বন ছিল সৈনিকের পরিচয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন সে ফিরে এল বা আসতে বাধ্য হল তার গ্রামে, সেই প্রত্যাবর্তন আগেরটির থেকে আলাদা বলে পরিগণ্য হল তার নিজের কাছে — কেননা এবারে যে ফিরে এসেছে সে যুদ্ধ প্রত্যাগত বীর সৈনিক রূপে নয় ; বরঞ্চ অসুস্থতার দায়ে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে বরখাস্ত-হওয়া এক বাতিল মানুষ হিসেবেই — যার কাছে গ্রামে থাকাটা আর সাময়িক হবে না— তা অনিবার্য ও চিরকালীন হয়ত। সামরিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে অস্মাচি যখন ট্রেন থেকে তার গ্রামে নামলো তখন তার পার্থিব সম্পদ বলতে শুধু একটা ক্যানভাস, ব্যাগ, কয়েকশো টাকা আর বেঁচে থাকার উপাদান—নিঃসঙ্গ শূন্যতা।

উদ্দেশ্যহীনভাবে গ্রামের নানা রাস্তা ঘুরে বেরিয়ে সে এসে বসল বাঁধের ওপর। স্বজনবিহীন পল্লীটি তার কাছে অপরিচিত গ্রামের মতোই মনে হল। অদূরে তার জন্মস্থান যে বস্তিটি, দেখা যাচ্ছিল। যে অতীত জীবনকে সে, ঘৃণাভরে ভুলে যেতে চেয়েছিল — আজ এই সর্বরিক্ত অবস্থায় সেইটিই ফিরে এল স্মৃতিতে। মনে পড়ল তার মায়ের কথা, যে মাকে ফেলে সে চলে গিয়েছিল মহাযুদ্ধে। ফিরে এসে আর দেখতে পায়নি কারণ তার অজ্ঞাতসারেই তিনি মারা যান। চোখের জলও পড়েনি তার।

আসলে দীর্ঘসময় ধরে যুদ্ধে থাকতে থাকতে মৃত্যুর সঙ্গে তার সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় যে মৃত্যুর জন্য শোক করতে হয় — এই সামাজিক বোধটাই যেন তার চলে গিয়েছিল। মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত ভীতিও তার আর ছিল না। তাই আজ জীবনের এই দুঃসহ অবস্থায় পৌঁছে সে একান্ত কামনা করছে নিজের মৃত্যুর। যুদ্ধকে যে লোকটা ভালোবেসেছে নিজের মৃত্যু যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ের মাঝে হওয়াটাই হয়ত তার কাছে পরম কাম্য ছিল। কিন্তু তা তো হয়নি — উপরন্তু আজ এই কষ্ট করে বেঁচে থাকাও তার কাছে নিরর্থক বলে প্রতীত হচ্ছে — কারণ তার এমন কেউ আপনজন নেই যার জন্যে সে বেঁচে থাকার কারণ খুঁজে পাবে। শরীরের বার্ধক্য ও স্নেহহীন জীবনের শূন্যতা ভোগ করার চেয়ে মাত্র পঞ্চাশ বছরেই মৃত্যুকে শ্রেয় বলে মনে করছে। পাশ দিয়ে চলে-যাওয়া একটি গরুর গাড়িতে এক অল্পবয়সী যুগলের খানিকটা প্রগলভ যৌবন-উচ্ছ্বাস দেখে এই প্রথম নিজের জীবনের সঠিক ব্যর্থতা সম্পর্কে সে সচেতন ও হতাশ হয়ে গেল। তখনই গরুর গাড়ির থেকে ভেসে আসা যৌবনোচ্ছল কলধ্বনি শুনে তার মনে হল যেন তার হারিয়ে-যাওয়া যৌবন তার এই অপচয়িত প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দাঁড়ানো নষ্ট জীবনটিকে দেখে হাসছে। এতদিনে সে অনুভব করল নীচু জাত হিসেবে পাওয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা থেকে দূরে পালাতে সে ক্রমাগত ছুটে চলেছিল — কখন তার বয়স আঠারো থেকে বেড়ে পঞ্চাশ হয়ে গেছে, কখন তার যৌবন তার সঙ্গেই ছুটে ছুটে নিঃশেষ হয়ে গেছে — সে বুঝতেই পারেনি। যে অবিরাম গতিতে যে জীবনের পরম-আকাঙ্ক্ষিত চেহারা বলে মনে করত আজ সেই ছুটে চলার পরিণতি যে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়ে গেছে! এমনকী পূরণ হয় নি জীবনের ন্যূনতম চাহিদাও। সেই সর্বাত্মক ব্যর্থতার বোধ তাকে শারীরিক, মানসিক দু-অর্থেই ক্লান্ত করে তুললো।

গ্রামের একটি লোককে সে তার এক দূরসম্পর্কের বোনের কথা জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে তার ছেলেমেয়ে ও স্বামীসহ সে মাদ্রাজে চলে গেছে। স্বজনহীন এই পৃথিবীতে অন্তত কোথাও তারও কোনো বন্ধন আছে এই আশার কথায় তার দুর্বল পায়ে জোর এল। যে পরিবারকে সে একদা পায়ে দলে চলে গেছিল আজ তাদেরকেই ফিরে পেতে সে আকুল হয়ে উঠল। পরের দিন ট্রেনে চড়ে চিরদিনের মতো গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার সময় সে উৎসুক চোখে শেষবারের মতো জন্মভূমিকে দেখে নিচ্ছিল। বস্তি থেকে ছুটে-আসা নেংটি পরা দরিদ্র ছেলেমেয়েদের দেখে সে তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে মনস্থ করল — যেন মাতৃভূমির প্রতি ঋণশোধ করবে সে। গাড়ি চলতে শুরু করেছিল তাই সে অগত্যা পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দেয়। হতদরিদ্র শিশুগুলির পয়সা কুড়োনোর উৎসাহ থেকে পরমতৃপ্তিতে অম্লান হাসতে লাগল। মিলিটারি পোশাক পরা 'অচেনা' লোকটির বদান্যতায় আপ্লুত শিশুগুলি তাকে স্যালুট করে সম্মান জানাল। সামরিক জীবন থেকে বরখাস্ত প্রাক্তন সৈনিকটির চোখ এবারে জলে ভরে এল। জন্মভূমির থেকে শেষ বিদায় নেবার কালে এমন অভাবিত বিদায়-সম্বর্ধনা তার জুটবে এমনটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। যে জন্মস্থানকে সে অস্বীকার করেছে, আজ সে-ই তাকে মর্যাদা দিয়ে, জীবনের এত ব্যর্থতার মধ্যেও পরিতৃপ্তির সুযোগ করে দিয়ে আবার তাকে যেন ঋণে জড়ালো।

নতুন করে জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে অস্মাচি। সহযাত্রী হিসেবে সে এক বখাটে ছোঁড়া ও এক শিশুসহ এক যুবতী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যাকে। ক্ষয়রোগগ্রস্ত অস্থিচর্মসার অসুস্থ মেয়েটিকে দেখে বোঝা যায় তার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। তার কোলের শিশু কন্যাটি ভারি সুন্দর একটি ফুল যেনঃ

টিকিট চেকার ট্রেনে উঠে টিকিট চাইলে প্রায় নিঃসাড় হয়ে পড়ে-থাকা মেয়েটির কান্নার আওয়াজ শোনে অস্মাচি। মেয়েটির শয্যাশায়ী অবস্থা দেখেও চেকার তাকে বলে টিকিট না থাকলে নেমে যেতে। বাচ্চাটি এই গণ্ডগোলে জেগে কাঁদতে শুরু করে। এই ডামাডোলের পরিস্থিতিতে অস্মাচি মেয়েটির গন্তব্য জেনে নিয়ে মাদ্রাজের টিকিট কেটে দিয়ে তাকে বিপদ থেকে বাঁচায়। এই করুণায় কৃতজ্ঞ হয়ে মেয়েটির তার ছেলেমেয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করলে অস্মাচি মনে-মনে না হেসে পারে না।

ট্রেনটি জংশনে দাঁড়ালে ক্ষুধার্ত শিশুকন্যাটি প্রায় অচৈতন্য মাকে ফেরিওয়ালার বিস্কুটের থালা দেখিয়ে কাঁদতে থাকে। পকেটে বেশ কিছু টাকা থাকায় অস্মাচির ইচ্ছে করে কিনে দিতে, কিন্তু নিজের জাত ও শিশুটির ব্রাহ্মণ বংশে জন্মের সামাজিক ব্যবধানটি এতই বেশি যে সে ইতস্তত করে — সমাজের ঘৃণা তো সে কম ভোগ করে নি! শিশুর মা মেয়ের কান্নায় কোনোমতে চোখ মেলে তাকালে অস্মাচি কুণ্ঠাভরে শিশুটিকে খাবার কিনে দেবার অনুমতি চাইলে, সহযাত্রীর পুনরাবৃত্ত করুণায় কৃতজ্ঞ চিত্তে মেয়েটি সম্মতি জানায়। দু-কাপ দুধ আর দুটো বন্‌রুটি কিনে অস্মাচি বাচ্চাটির হাতে একটি রুটি দিলে সে আনন্দে মেতে ওঠে। নিজের জন্মগত কুণ্ঠাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে করতে অসুস্থ মেয়েটিকে আবার ও "মা" সম্বোধন করে দুধটুকু খেয়ে নিতে অনুরোধ করে। মেয়েটি যেন সর্বগ্রাসী এক তৃষ্ণায় সবটাই প্রায় খেয়ে নেয়। তার এই মর্মান্তিক অবস্থা দেখে অস্মাচি এবারে শিশুটিকে নিজের কাছে এনে খাওয়াতে থাকে। বিধবা ব্রাহ্মণ মেয়েটি যে আর পাঁচটা লোকর মতো তার জাত নিয়ে সচেতন নয় সেটা বুঝতে পেরেই হয়তো সঙ্কোচ কাটিয়ে অস্মাচি মানবিক কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়। তারপর চলন্ত ট্রেনের দীর্ঘ অবসরে জগৎ সংসার ভুলে সে শিশুটির সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠে। তার অসুস্থ, অশক্ত দেহে যেন নতুন করে যৌবন এসেছে বলে মনে হয়— আসলে এ তার শরীরের নয়, মনের পুনর্জীবন যেন বা সারাজীবন যে স্নেহ-ভালোবাসা সে কারুর থেকে পায় না — আজ একটি দু-বছরের শিশু তার কোলে বসে, জামা টেনে, পুতুল খেলে যেন সেই অভাবটিই পূরণ করতে চলেছে!

মেয়েটিকে অস্মাচি আশ্বাস দেয় সে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। এত বড়ো পৃথিবীতে একবার নিঃসঙ্গ লোকটিই তার অবলম্বন, যেন সহোদর ভাই, আপনার জন — এমন স্বীকৃতিও পেয়ে যায় মৃত্যুপথযাত্রী মেয়েটির। নীচু জাতের অস্মাচি ব্রাহ্মণকন্যার দেওয়া এই স্বীকৃতিতে অভিভূত হয়ে গেল। শেষ বেলায় জীবনের সব কথা এই 'অচেনা' আপনার জনটিকে বলে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল মেয়েটি। তারপর অবিরল কান্নার মাঝে জানাল তার জীবনের নির্মম কাহিনি: অতিদরিদ্র ঘরের কন্যাটির বাবা বরপণের ব্যবস্থা করতে না-পারায় পঞ্চাশোর্ধ এক বৃদ্ধের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিতে বাধ্য হন। তৃতীয় পক্ষের হলেও বয়স্ক স্বামী কচি স্ত্রীকে ভালোই বাসতেন। কিন্তু তাঁর যক্ষ্মা রোগ হল। ফলে হোটেলের চাকরিটিও গেল। এরই মাঝে তাদের পর পর চারটি সন্তান হয়েছে। তিনটি বড় হয়ে মারা গেছে। এই শিশুটির জন্মের এক বছরের মাথায় তার স্বামীও মারা যান। কপর্দকশূন্য স্বামীর কাছ থেকে মেয়েটি ততোদিনে অর্জন করেছে যক্ষ্মারোগ এবং নিঃস্ব ও দুঃসহ ভবিষ্যৎ যেখানে তার গলার কাঁটা হয়ে রয়েছে এই দু-বছরের শিশুটি।

অতিকষ্টে শ্বাস টানতে টানতে মুখটা বিকৃত করে তিক্ত একটি হাসি দিয়ে মেয়েটি এবারে মর্মান্তিক অথচ মৌলিক এক সত্য বলে অম্মাচিকে। জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ সে অনুভব করতে পেরেছে মেয়ে হয়ে জন্মানো। কী বিড়ম্বনা, বিশেষত্ব গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মানো! যারা ব্রাহ্মণ নয়, কিন্তু গরীব এবং মেয়েমানুষ তারা অন্তত তার থেকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে কারণ, জাতপাত, আচার-বিচার, ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি অর্থহীন কুসংস্কারের বলি হতে হয় না তাদের। বস্তিতে-জন্মানো তথাকথিত নীচুজাতের মানুষদের জীবনসংগ্রাম অনেক কঠিন, কঠোর ও চিরন্তন বলেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের মতো প্রতিনিয়ত ধর্মবাতিক (নাকি বিলাসিতা!) মেনে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না— হয়ত পেটের ভাত রোজগারের তাগিদে সে সময়ও তারা পায় না। মেয়েটি বলে, সে ব্রাহ্মণকন্যা বলেই অর্থহীন ঠেকলেও সেগুলি বিসর্জন দিতে পারে না। তাই নীচুজাত কাউকে দেখলে তাকেও মর্যাদা রক্ষার্থে 'সরে যা' বলতে হয়। নইলে পাঁচজন মানুষ (পড়ুন সমাজ) কি বলবে? সমাজকে অগ্রাহ্য করার সাহস ব্রাহ্মণকন্যাদের থাকে না। কিন্তু আজ যখন অজানা, অচেনা, যার জাতের পরিচয় তার চেহারায় নেই (স্মার্তবা, দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণেরা কপালে তিলকের রকমফেরে জাতের অভিজ্ঞান আঁকেন), তেমনই এক মানুষ তার দুর্দশায় তাকে শুশ্রূষা করছেন তখন সে আর ওই মেকি মর্যাদা রক্ষা করতে চাইল না। কারণ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সে বুঝেছে বুদ্ধি দিয়ে, মানবিক অনুভূতি দিয়ে মানুষ জাতপাতকে বিচার করলে, ঢের আগে এইসব কুসংস্কার বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু মেয়েটির মতো দুঃসহ পরিণতিতে উপনীত না হলে, সমস্ত পৃথিবীর অনাদর ও ঘৃণ্য সব বিধিনিয়মসৃষ্টিকারী সমাজের উপেক্ষা ও অমানবিকতা না পেলে কেউই সাহস অর্জন করতে পারে না — যেমন এর আগে পারেনি এই মেয়েটিও। তাই প্রতিটি উচ্চজাতের মানুষ নিজেদের প্রবঞ্চনা করছে আর সেই সঙ্গে সর্বনাশ করছে অসহায় মেয়েদেরও সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার-বিচারের দোহাই দিয়ে।

সে স্বীকার করে, এতদিন সে জাতপাতের কুসংস্কারের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারেনি ঠিকই ; আর তারই ফাঁদে একটু একটু করে এগিয়েও গেছে নির্মম পরিণতির দিকে। কিন্তু নিভে যাবার আগে ঝল্‌সে-ওঠা প্রদীপের মতোই সে বলে নিজে ব্রাহ্মণকন্যা হয়ে যে শাস্তি সে পেয়েছে জীবনভোর, তা আর সে নিজের মেয়েকে পেতে দেবে না। আরো একটি মেয়েকে এই পৃথিবীতে আনার ও অত্যাচারিত হবার জন্যে রেখে যাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করবে। আসন্ন মৃত্যুকে ক্ষণেকের জন্যে ভুলে গিয়ে সে এক কঠিন সংকল্পে স্থির হয় — যেন এতদিনের সমাজকৃত অপরাধের প্রতিহিংসা নিতে সে বদ্ধপরিকর।

ছুটে চলে ট্রেন — কিন্তু তার জীবনের গতি শেষ হয়ে আসে — রক্তবমি করতে করতে সে এবারে শেষ আর্জি জানিয়ে যায় অম্মাচিকে — বলে তার মৃত্যুর পরে যেন অম্মাচিই তার সৎকারের ব্যবস্থা করে দেয়। যে মানুষের পেশাই ছিল মানুষ মারা, আজ কিন্তু এই মেয়েটির মৃত্যুর আসন্নতায় তার চোখে জল চলে আসে। মেশিনগান চালানো হাত দুটি মুখ ঢাকে নিরুপায় বেদনায়।

মেয়েটি আরো বলে সে অম্মাচিকে তার শিশুটির সঙ্গে খেলা করতে দেখেছে অনেকক্ষণ ধরে। তার বিশ্বাস জন্মেছে যে মানুষ সাহায্য না চাইতেও সাহায্য করে সে তো ভগবানতুল্য— তাই তার হাতেই নিজের দু-বছরের ফুলের মতো সুন্দর, নিষ্পাপ শিশুটিকে তুলে দিতে চায় — কারণ তার বিশ্বাস তাকে আস্থা জুগিয়েছে এই 'অচেনা' আপনজনটিই পারবে তার মেয়েকে সুন্দর ও গ্লানিমুক্ত জীবন দিতে।

দু-হাত জোড় করে অম্মাচি এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে — হাসিমুখ এবারে মেয়েটি চোখ বোঁজে — আর

খোলে না। পরমশান্তিতে চলে যায় জীবন ছেড়ে। চরিতার্থ হয় তার প্রতিহিংসাও — যে সমাজ, যে উঁচুজাতের গণ্ডী তাকে বাঁচার অধিকার দেয়নি আজ সেই সমাজও জাতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নিরে ব্রাহ্মণরক্তের উত্তরাধিকারীটিকে সঁপে দিয়ে যায় নীচু জাতের একটি মানুষকে, যাকে মেয়েটির নিজের সমাজ 'সরে যা' বলে অচ্ছুৎরূপে ঘৃণা করে দেখতেই অভ্যস্ত।

সৈনিকজীবন থেকে অপসারিত অম্মাচি ট্রেনে চড়ে নতুন জীবনের সন্ধান যে অন্তহীন যাত্রায় বেরিয়েছিল, তৃতীয়দিনেই সেই যাত্রা সমাপ্ত হল এক অভাবিতপূর্ব গন্তব্যের সামনে। প্যাসেঞ্জার গাড়ীর চলমানতায় আর তাকে তাল মেলাতে হবে না অনির্দেশ্যতার সঙ্গে। যে ট্রেনটি দিনের গাড়ী হলেও দেরী করে সবসময়েই পৌঁছোয় রাতে, আজ সেটি মধ্যাহ্নেই পৌঁছোলো অম্মাচির কাঙ্ক্ষিত 'স্টেশনে'। এখন আর সময় বয়ে গিয়ে দেরী হবে না পৌঁছতে জীবনের প্রাপ্তির দোরগোড়ায়। দুর্লভ সম্পদের মতো শিশুটিকে বুকে নিয়ে মেয়েটির অন্ত্যেষ্টি করে অম্মাচি। জন্মদাত্রী মায়ের প্রতি যে কর্তব্য সে করতে পারেনি, সেই অপূর্ণ কর্তব্য সে সমাধা করে আরেক জননীর জন্যে যাকে সে 'মা' বলেই ডেকেছিল।

তারপর নতুন করে জীবনে প্রথমবার সংসার পাততে সে আরেকবার ট্রেনে চড়ে, তবে এবারে সে জানে কোথায় নামতে হবে। জীবনের দুটি মাত্র অবলম্বন — সেই ক্যানভাসের ব্যাগ আর শিশু কন্যাটিকে নিয়ে সে রওনা হয় নতুন জীবনের পথে। মানুষ-মারা সৈনিকটির হাতেই একটি দু-বছরের জীবনের ভার সঁপে গেছে মৃতা মেয়েটি। আর তার দৃষ্টিতেই যেন আলোকিত হয়েছে এই সত্যটি — জাত, ধর্ম, কর্ম নয়—মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তার মানবিকতায়।

দু-দুটি মহাযুদ্ধের যোদ্ধা অম্মাচিরও পরিচয় স্থির হয়ে যায় — ট্রেনের সহযাত্রীরা শিশুটি তার মেয়ে না নাতনী জানতে চাইলে চিরকুমার অম্মাচি নির্দ্বিধায় বলে "নাতনী"। তারপর তারা শিশুটির নাম জানতে চাইলে তার মনে পড়ে শিশুটির নামটা সে জিজ্ঞেসই করেনি। কিন্তু তাতে আর কিছু যায় আসে না। তার মতো আজ শিশুটিরও তো নবজন্ম হলো — এক নতুন জীবনে, নতুন পরিচয়ে। তাই অম্মাচি নিজের দেওয়া নামটি জানায় সহযাত্রীদের — বলে শিশুটির নাম "পাপ্পাত্তি" অর্থাৎ তাদের ভাষায় যার অর্থ ব্রাহ্মণকন্যা। সহযাত্রিণী বলেন "বেশ লাগসই নামতো!" নিঃসন্দেহেই কারণ কারণ 'অন্ত্যজ দাদুর' ব্রাহ্মণ নাতনীর এর চেয়ে যথার্থ নামকরণ তো আর হতেই পারে না।

সারাজীবন ধরে যে-সমাজের কাছে সে ব্রাত্য' ঘৃণিত রূপে গণ্য হয়েছিল আজ সেই সমাজের এক নারীর থেকেই সে লাভ করল জীবনের পরম প্রাপ্তি, পূর্ণতা ও সার্থকতা। অম্মাচির জীবনে এই পরিপূর্ণতা দানের মধ্যে দিয়েই প্রতিবিম্বিত হলো লেখকের সমাজ দর্শনটিও, অম্মাচি যার মাধ্যম এই গল্পে।।

মরীচিকা

(তেলেগু)

আচন্ট শারদা দেবী

১.১ ◻ কাহিনি

পাহাড়ের মাঝ বরাবর পাথরগুলোর ওপর আছড়ে পড়ে জল নীচের দিকে গড়িয়ে চলেছে। পাহাড়টা বেশ উঁচু। এই ঝর্নার কাছে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকালে সবুজ গাছে-ভরা পাহাড়টা বড় সুন্দর দেখায়। মনে হয় যেন আকাশটাকেই ছেয়ে আছে। চুড়োটা দৃষ্টিসীমার বাইরে। সন্দেহ হয় ওখানে কেউ কোনোদিন পৌঁছোতে পারবে কিনা।

প্রতিদিন নীলা এই ঝর্নার ধারে এসে জলে পা ডুবিয়ে বসে। মাঝে মাঝে জলের ছিটে এসে তার গায়ে মাথায় পড়ে। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে নীলার দেহ রোমাঞ্চিত হয়। আনন্দে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ঝর্নার ধারা পাহাড়ের এক চুড়ো থেকে নেমে এই পাথর অবধি সরু নালার মতো বয়ে আসে। পাথরে ধাক্কা খেয়ে নীচে আছড়ে পড়ে। মাঝে মাঝে নীলা ওপরের পাথরের কাছে গিয়ে বসে। এখান থেকেই জলের তোড় সরু হয়ে বয়ে চলেছে; কখনও কখনও এই পাথরের ওপর নীলা ঘুমিয়ে পড়ে। কখনও বা পাহাড়ের চুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে ওখানে যদি উঠতে পারতো, যদি কখনও পৌঁছোতে পারতো তা হলে কেমন মজা হতো। কিন্তু একলা ওঠার সাহস ওর নেই। শুধু মনে একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। তার মনের এ বাসনা হয়তো কোনোদিন পূর্ণ হবে না। লোকে বলে ঐ পাহাড়ের মাথায় কোনো সাধু আছে। নীলা কোনোদিন তাকে দেখে নি, সাধুও কোনোদিন নীচে নামে নি। চুড়োয় আজ অবধি কেউই পৌঁছতে পারে নি।

রোজ রাতে পাহাড়ের চুড়ায় যেন একটা প্রদীপ জ্বলে। অনেক রাত অবধি সেটা টিম্‌টিম্ করে জ্বলে। লোকে বোধহয় তাই বলে, ওখানে কোনো সাধু থাকে।

ঐ পাহাড়ের কোনো উপত্যকায় নীলার কুঁড়ে। নীলা আর নীলার দিদিমা। এ ছাড়া তৃতীয় প্রাণী নেই। পাহাড়ের ওধারে দূরে একটা ছোট্ট গ্রাম। নীলার দিদিমা আগে ওখানেই থাকতো; নীলার মা তখন বেঁচে ছিলো। দিদিমা মাঝে মাঝে বলেন, 'মা!' তোর মা যখন তোর বয়সী ছিলো তখন আমরা ঐখানেই থাকতাম। তোর মা রোজ এই ঝর্নার ধারে আসতো, গরু-বাছুর নিয়ে এইখানেই ঘুরে বেড়াতো। একদিন এইখানে এক আগন্তুকের সঙ্গে ওর আলাপ হয়। তার চিন্তা ওকে এমন পেয়ে বসলো যে আর-সবকিছু ও ভুলে গেলো। আগন্তুক কথা দিয়েছিলো সে আবার আসবে, কিন্তু আর ফেরে নি। তুই জন্মাবার পরই তোর মা অসুখে মারা গেলো। ঐ সামনের আম গাছটার তলায় ওর শেষ কাজ করি। তোর মা প্রায়ই বলতো, আমি যেন সবসময় ঐ ঝর্নার কাছে থাকি। ঐ আম গাছটা আমিই লাগিয়েছিলাম। ওটার দিকে তাকালেই তোর মাকে দেখতে পাই। ওতে মুকুল ধরলে তোর মায়ের হাসিটা মনে পড়ে। যেই গ্রাম ছাড়লাম, এখানে এসেই থাকতে লাগলাম।' মার কথা ছবির মতো নীলার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আম গাছটার দিকে তাকিয়ে সেও যেন মাকে দেখতে পায়।

দিদিমার সম্পত্তি বলতে দুটো মোষ আর কয়েকটা ছাগল। তাদের দেখাশোনা করা তার কাজ। তাদের

খাওয়ানোর ব্যাপারটা খুব একটা ঝামেলার কিছু নয়। ছাগল-মোষ পাহাড়েই চরে বেড়ায়, সন্ধ্যে হলেই ঘরে ফিরে আসে। এদের জন্যে চিন্তাভাবনার কিছু নেই। সে নিজেও মনের আনন্দে কখনও ঝর্নার ধারে, কখনও বা গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গী বলতে গাছের ফলফুল আর পশুপক্ষী। পাতার মর্মরধ্বনি আর পাখীদের কলকাকলি সে শোনে। যখন এক ঝাঁক পাখী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যায়, এক ডাল থেকে অন্য ডালে উড়ে বেড়ায়, নীলা তখন অন্য জগৎ দেখতে পায়। এরা কখনও দলে, কখনও বা একা উড়ে বেড়ায়। সব সময় কোনো-না-কোনো নতুন জিনিস, কিছু-না-কিছু আশ্চর্য জিনিস নীলা ওদের মধ্যে দেখতে পায়। কিচির-মিচিরের তো অভাব নেই। নীলার কখনও একা মনে হয় না।

পাহাড়ের গায়ে একটু উঁচুতে আরো দুটো কুঁড়ে আছে। একটায় কোকিলা আর গণপতি থাকে, অন্যটা খালি। কখনও কোনো পরদেশী পাহাড় দেখতে এলে তাকে ঐখানে থাকতে দেওয়া হয়। গণপতি তাদের পাহাড় দেখায়, কোকিলা ওদের রেঁধে খাওয়ায়। কোকিলা দিদিমার সঙ্গী। দুপুরবেলায় দুজনে গল্প করে। নীচের কুঁড়ে থেকে দিদিমা চেঁচিয়ে কিছু বলে আর কোকিলা ওপর থেকে জবাব দেয়। বেশির ভাগই জন্তুদের বিষয় কিংবা মেঘের বিষয়। কখনও বা ঝরাপাতা নিয়ে ওদের আলোচনা হয়। মাঝে মধ্যে দুজনে মিলে পাশের গাঁয়ে যায়। গাঁয়েতে গিয়ে ওখানকার লোকেদের খবরাখবর নিয়ে জিনিসপত্তর কিনে ফেরে। পাহাড়ের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে পাশের দিকে তাকালে একটা উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। দুদিকে সবুজ গাছে ভরা উঁচু উঁচু পাহাড়। মাঝখানে সরু সরু পথ শাদা সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে। এই রাস্তা সমতল জায়গায় এসে শেষ হয়েছে। দূর থেকে গাড়ী নিয়ে যারা আসে তারা ঐখানেই এসে থামে। ওখান থেকে যারা ওপরে যেতে চায় তারা পাহাড়ি পথে পায়ে হেঁটে যায়।

একদিন দুপুরবেলায় ঝর্নার ধারে ঘাসের ওপর নীলা ঘুমোচ্ছিলো। ঘুম ভাঙলে দেখে বিকেল হয়ে এসেছে। সূর্যের রক্তিম আভা জলে ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের ডালের মধ্যে দিয়েও হালকা রোদের আভা এসে পড়েছে। নীলা আলিস্যি ভেঙে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এদিক-ওদিক তাকায়। দেখে ঝর্নার ওপারে কে বসে। ঘাস নিয়ে খেলা করছে আর নীলার দিকে আড়চোখে দেখছে। নীলা চমকে ওঠে। কে জানে লোকটাকে, নতুন মুখ, আগে কখনও দেখে নি। না জানি কতক্ষণ বসে আছে। হতে পারে সে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন থেকেই ও ওখানে বসে আছে। লজ্জায় সে কুঁকড়ে যায়। ঘুমমাখা মলিন মুখখানা সে লুকিয়ে ফেলতে চায়। আঁচলটাও বড় নয়। লোকটাকে দেখতে ফর্সা; বেশ সুন্দর। পরনের কাপড় বেলফুলের মতো শাদা ধব্‌ধবে। নীলার চেহারা ফ্যাকাসে মেরে যায়।

এই পাহাড়ী এলাকায় এই রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোক বড় একটা দেখা যায় না, এই রকম ধবধবে কাচা কাপড়ও কেউ পরে না। নীলার মনে হয় লোকটি যেন কোনো দেবলোক থেকে এসেছে। সে খুব আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। জলের ধারে দুটো শাদা কাঠবেড়ালী এদিক ওদিক করছিলো। গাছের ডাল থেকে শাদা পাখিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে গেলো। নীলার সম্বিত ফিরে আসে, বাস্তবে সে ফিরে এলো। পাহাড় থেকে নেমে সে কুঁড়ের দিকে ছুট দিলো। দিদিমাকে গিয়ে বললো, 'এক নতুন লোক এখানে এসেছে।' দিদিমা বলেন, 'হ্যাঁ, আমি জানি, দুপুরে এসেছে। ওপরকার কুঁড়েতে থাকে।' কোকিলা বললো, 'ও কালকেও এখানে থাকবে।' নীলার চোখে মুখে আনন্দ ফুটে ওঠে। কাল সারাদিন ও তার সঙ্গে থাকতে পারবে। দিনভোর তাকে দেখতে পাবে। তার সঙ্গে কথা বলবে। যে ক'টা ছোট পাহাড় নীলা ভালবাসতো তা ওকে দেখাবে। ঐ পাহাড়ে যত গাছ আছে সবকটার নামই নীলা জানে কিন্তু ঐ লোকটা জানে না। নীলা যখন বলতে শুরু করবে ঐ লোকটা তখন আশ্চর্য হয়ে শুনবে। এমনিতে গাছপালা,

পাখী, ঝিল ছাড়া নীলাকে সঙ্গ দেবার আর কেউ ছিলো না। তাই আজ সেই পুরুষের কল্পনাতেই সে মহাখুশী হয়ে ওঠে। ওকে দেখেই নীলার এত ভালো লাগে যেন মনে হয় ঐ লোকটার সঙ্গে তার জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। আসছে কাল ওর সঙ্গ পাবে এই আশা নিয়ে সে আজ ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর হতেই নীলা ঝর্নার ধারে গিয়ে বসে। মুখ-হাত-পা ধুয়ে নেয়। জলহাত দিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিল। এই প্রথম তার নিজের রূপ তার মনে সন্দেহ জাগায়। জলে ঝুঁকে পড়ে নিজের ছায়া দেখে। দেখে হতাশ হলো। মোটেই সুন্দর সে নয়। কালো চেহারা, চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। অবিন্যস্ত চুলগুলো অনেক করে সামলাবার চেষ্টা করে, কিন্তু বাগ মানে না; উসকো-খুসকো হয়েই থাকে। নিজের রূপ সম্বন্ধে এতদিন ও মোটেই সজাগ ছিলো না। নিজের রূপ আজ নিজেরই ভালো লাগে না। দৌড়ে বাড়ী ফিরে যায়। বাক্সের সবচেয়ে নীচে রাখা রঙীন শাড়ীটা পরে নেয়। শাড়ী পরে খানিকটা নিজেকে মনে ধরে। শাড়ীটা তার পছন্দ, কালোর ওপর লাল রঙের ছিট্।

একটু বেলা হলে যুবকটি ঝর্নার ধারে এলো। দুহাতে তার শাদা ফুলের তোড়া। মনে হয় পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে জড়ো করেছে। নীলা তার দিকে চেয়ে হেসে ফেলে। যুবকটিও হাসে। মনে হয় বহুকালের চেনা। নীলাই প্রথমে কথা পাড়ে, 'কি, পাহাড় দেখতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।' নীলা আবার বলে, 'আমার নাম নীলা। আমরা এখানেই থাকি। আমি এই পাহাড়ের সব অলিগলি চিনি। আমি আপনাকে রাস্তা দেখাতে পারি।' ছেলেটি বিশেষ কিন্তু উৎসাহ দেখায় না। নির্লিপ্তের মতো বলে, 'কাল আমি অনেক কিছু দেখেছি। গণপতি আমার সঙ্গে ছিলো।' জলের ধারে ঘাসের ওপর ছেলেটি পা ছড়িয়ে বসে পড়লো। হাতের ফুলগুলো নিয়ে খেলা করতে থাকে, একবার একটা একটা করে আলাদা করে, আবার তাদের সব কটাকে জড়ো করে।

নীলা ছেলেটির পাশেই বসেছে। তার মনে অনেক প্রশ্নই উঁকি-ঝুঁকি মারে। যুবকটিকে সে অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে চায়। দোনামোনা করে জিজ্ঞেস করে ফেলে।

'মৈত্রেয়ী।' নামটা বড় অদ্ভুত লাগে। মনে মনে 'মৈত্রেয়ী' 'মৈত্রেয়ী' বলে নামটা মুখস্থ করে নেয়। নামটা এবার ভালোই লাগে। গ্রাম কোথায়, জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে যুবকটি একটা নাম বলে। নীলা জানেই না এ গ্রাম কোথায়। পাহাড় ছেড়ে সে কোথাও কোনোদিন যায় নি। বাবে, গ্রামটা বোধহয় অনেক দূরে। পাশে তাকালেই উৎরাই-এর আঁকাবাঁকা শাদা পথটা দেখা যায়। ভাবে ঐ পথ দিয়ে গেলে ছেলেটির গাঁয়ে পৌঁছোনো যায়। উৎরাই-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে যুবকটিকে প্রশ্ন করে, 'আপনি এই পথ দিয়েই এসেছেন?' জবাব পায়, 'হ্যাঁ'। আবার প্রশ্ন করে, 'আপনার গাঁ কি এখান থেকে অনেক দূরে?' একটু মুচকি হেসে যুবক উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, একটু দূর তো বটেই।' এরপর কী জিজ্ঞেস করবে নীলা ভেবে পায় না। জলে হাত ডুবিয়ে যুবকটি খেলা করতে থাকে। হাতের ফুলগুলো একটা একটা করে জলে ভাসিয়ে দিতে থাকে। নীলা জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে এক গোছা ফুল তুলে নেয়। ফুলের গোছাটা হাতে নিয়ে নীলা ভাবে এক অমূল্য নিধি ও হাতে পেয়েছে। খুশি হয়ে যুবকটিকে দেখে। যুবকটি খেয়াল করে না। আপন মনে জলে হাত-পা ডুবিয়ে খেলছিলো। আস্তে আস্তে গুনগুনিয়ে গান ধরে। নীলার মনে অদ্ভুত এক কৌতূহল জাগে। গান ও খুব ভালোবাসে। দিদিমার শেখানো গান নিজেই সে একাই গায়। এ ছাড়া আর কোনো গানই সে জানে না। আর সে থাকতে পারে না। যুবকটিকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি বুঝি গান জানেন?' মুচকি হেসে যুবকটি জবাব দেয়, 'গান আমার একেবারে আসে না। আমি গান লিখি, গাই না।' এর কি মানে নীলা

বুঝতে পারে না। ওর গান নীলার শুনতে ইচ্ছে করে। থাকতে না পেরে যুবকটিকে বার বার গান গাইতে অনুরোধ করে। যুবকটি কথা কানে নেয় না, উত্তরও দেয় না। উল্টে গুনগুন করে গান গাওয়াও বন্ধ করে দিলো। নীলা হতাশ হয়। একটু পরেই ছেলেটি প্রশ্ন করে, 'পাহাড়ের চুড়োয় কেউ কি কোনোদিন উঠেছে?' নীলা চনমনিয়ে ওঠে। কৌতূহলভরে বলে, 'না, ওখানে আমি নিজে উঠতে চাই। কিন্তু একলা যেতে ভয় করে। লোকে বলে, ওখানে কোনো এক যোগী থাকে। আসলে ওখানে যোগী থাকে কি না থাকে, সেটা কারুরই জানা নেই।'

এইবার যুবকের মধ্যে কৌতূহল দেখা যায়।

'আমি আজ ঐ মাথায় ঘুরে আসবো,' ঝোঁকের মাথায় যুবকটি বলে ওঠে। নীলাও ওর উৎসাহ দেখে বলে ওঠে, 'আমিও সঙ্গে যাবো।' নীলা মনে মনে কল্পনা করে নেয়, এতো উঁচু পাহাড়ে যুবকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠতে বেশ মজা লাগবে। ছেলেটি কোনো জবাব দিলো না। 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বললো না। ঝর্নার ধার ধরে ওরা উঠতে শুরু করলো। অধীর আগ্রহ নিয়ে নীলা ছায়ার মতো ছেলেটির পিছু পিছু চলতে থাকে। ছেলেটি কিন্তু একটিবারও পেছন ফিরে তাকায় না। ফিরেও দেখে না নীলা সঙ্গে আসছে না কি। তাড়াতাড়ি সে উপরে উঠতে থাকে। নীলা আস্তে আস্তে পেছনে চলে।

ছেলেটির সঙ্গে নীলা তাল রেখে চলতে পারে না। খানিক বাদেই ছেলেটি চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায়। নীলা নিরাশ হয়ে পড়ে। তার দম বন্ধ হয়ে আসে। সে কেঁদে ফেলে। ওখানেই বসে পড়ে। বসে বসে ভাবতে থাকে — 'সে ছেলেটির সঙ্গে ওপরে উঠতে চায় কিন্তু ছেলেটি চায় না। পাহাড়ের চুড়ো দেখার সাধ তার অপূর্ণই রয়ে যাবে।' ভেবে দুঃখ হয়। পাহাড়টা যেন শূন্যতায় ভরে গেছে মনে হয়। হঠাৎ ছেলেটির গানের আওয়াজ ভেসে আসে। নীলা চমকে ওঠে। খুশিতে মন ভরে ওঠে গানের সুর সে শুনতে পায়, কিন্তু কথা স্পষ্ট বুঝতে পারে না। ছেলেটি বোধহয় নিজেই গানটা লিখেছে। বুঝতে চেষ্টা করে এই গানের মানে কী? মন আবার তার উদাসী। একটু পরে পাহাড় থেকে নেমে নীলা বাড়ী ফিরে যায়।

দুপুরবেলা নীলা যুবকটিকে আবার দেখতে পায়। ঝর্নার ধারে তাকে দেখতে পেয়ে নীলা নিজের দুঃখ ভুলে যায়। খুব উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি ওপর অবধি গেছিলেন? যোগীর সঙ্গে দেখা হলো? উনি কি আপনার সঙ্গে কথা বললেন?' সকালের মতোই কোনোরকম আগ্রহ না দেখিয়ে ছেলেটি জবাব দেয়, 'না, ওপর অবধি যাওয়া হয় নি; খানিক দূরে গিয়ে ফিরে এসেছি।' নীলা নিরাশ হয়। সে অন্যমনস্ক হয়ে উৎরাইটার দিকে তাকিয়ে থকে। ওখানকার রাস্তা দেখেই ওর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে।

'আজ চলে যাবেন?' কাতর হয়ে নীলা জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, খানিক বাদেই যাবো।' নীলার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। একবার সে ঐ পথ ধরে গিয়েছিলো। সে অনেক দূর যেতে চেয়েছিলো কিন্তু খানিক দূরেই একটা জলভরা দীঘি দেখতে পায়। রোদে জল চিক্‌চিক্ করতে থাকে। সে জলের কাছ বরাবরই যেতে চেয়েছিলো কিন্তু সাহসে কুলোয় নি। ভয়ে আর দ্বিধায় সে এগুতে পারে নি। আস্তে আস্তে ফিরে এসেছিলো। হঠাৎ তার এই সব কথা মনে পড়ে যায়। সে বলে, 'ঐ পথে খানিক দূরে একটা মস্ত বড় ঝিল আছে, না? তার জল খুব চিক্‌চিক্ করে।' ছেলেটি হেসে ফেলে, বলে, 'ঝিল নেই, কিছুই নেই।' নীলার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। নিজের সন্দেহ প্রকাশ করে বলে, 'একবার আমি ঐ পথে গিয়েছিলাম। দূরে ঝক্‌মক্ করছে জল, আমার ভারি সুন্দর লেগেছিলো। একা ছিলাম বলে কাছে যেতে সাহস হয় নি।' কথা শুনে যুবকটি বলে, 'রোদে

ঐ রকমই মনে হয়। ওটা জল নয়, মরীচিকা; দূর থেকে জল মনে হয়। আমরা যত কাছে এগোই, ওটাও অত দূরে সরে যেতে থাকে।' নীলার মন আবার উদাস হয়ে পড়ে। 'জলে ভরা মনে হয়, কিন্তু আসলে জল নয়।' কথাটা ওর মনে ধরে না। মুষড়ে-পড়া জীবন মনে হয়।

খানিক বাদেই গণপতি এসে হাজির। হাতে একটা থলে। ছেলেটিকে লক্ষ্য করে বলে, 'সন্ধ্যে হবার আগেই আপনাকে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আসুন, আপনাকে আমি খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে আসি।' বলেই গণপতি টিবি থেকে নীচের দিকে নামতে থাকে। ছেলেটি আলিস্যি ভেঙে উঠে দাঁড়ালো। নীলার দিকে তাকিয়ে মুচকি একটু হেসে গণপতির পিছু পিছু চলতে সুরু করলো। নীলা ওখানেই দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকে। মনটা ওর খাঁ-খাঁ করে ওঠে। ছেলেটি যত দূরে চলে যায় নীলার মন ততই উদাস হয়ে পড়ে। ছেলেটি কিন্তু একবারও পেছন ফিরে তাকালো না। নীলা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। খানিকবাদে ছেলেটি হারিয়ে যায়। অজান্তেই নীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মাথা নীচু করে নেয়। সন্ধ্যে অবধি সে ওখানেই বসে থাকে। আলো-আঁধারে পাহাড়টা ভয়ঙ্কর মনে হয়। ছেলেটির গাওয়া সকালের গানটি তার কানে বাজতে থাকে। গানের কথাগুলো মনে পড়ে যায়; মানে কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারে না। শব্দহীন গান, জলহীন ঝিল আর প্রেমহীন মন— সব মিলিয়ে ওকে আরো উদাস করে তোলে। হয়তো ছেলেটি আর ফিরবে না। কিন্তু নীলা ওকে কোনোদিনই ভুলতে পারেবে না। তাই নীলার বেদনাও কোনোদিন যাবে না। ক্ষণিকের এই অতিথির জন্যে এ মায়া, এ মমতা কেন? নিজের মনের এই ব্যথা সে ব্যক্ত করতে পারে না। অন্ধকারে আর বসে থাকতে পারে না। ঘরে ফিরে যায়।

দিদিমা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাচ্ছিলেন। নীলা তার কাছে গিয়ে বসলো। উদাস মনে দিদিমার দিকে তাকিয়ে থাকে। শুধু মনে হয়— কিছুদিন পরে সেও দিদিমা হবে, চুল শাদা হয়ে যাবে। গালের চামড়া কুঁচকে যাবে। হাত কাঁপবে। তখনও কি তার চোখের সামনে ভাসতে থাকবে? ভয় পেয়ে যায়। দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মনের ব্যথা আর সে চেপে রাখতে পারে না। এই ব্যথা তার মনের কোণে বোধহয় অনেকদিন থেকেই লুকিয়ে ছিলো। মনের এই অব্যক্ত বেদনা আজ বাইরে বেরিয়ে এসেছে। দিদিমা আদর করে তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করেন, 'হ্যাঁ রে, কি হয়েছে রে?' দিদিমার অন্তরের মায়া-মমতা নীলার দেহমনকে স্পর্শ করে। নীলা সামলে নেয়। আব্দার করে দিদিমাকে বলে, 'দিদিমা! তুমি মার জন্যে ঐ আমগাছটা লাগিয়েছিলে না। আমি যখন থাকবো না তখন তুমি ঐ পাহাড়ে একটা শাদা ফুলের গাছ পুঁতে দিও। তাতে সব সময় শাদা ফুল ফুটে থাকবে। যতদিন ধরে ফুল ফুটবে ততদিন ধরে আমি ওখানে থাকবো।' দিদিমার বুক হা-হা করে ওঠে। ভাবতে থাকেন, 'আমি কি চিরটাকাল এই ভাবেই থাকবো?' কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

নীলা চোখ মুছে ফেলে। দিদিমা খেতে ডাকেন। নীলা বলে, 'না'। দিদিমার দুটো হাত নিজের গলায় জড়িয়ে নেয়। তার চোখে ঘুম ভেঙে আসে। একনিমেষেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে উঠে সে আম গাছের তলায় গিয়ে বসলে। গাছের ডালে একটা টিয়া বসে শিস দিচ্ছিলো। প্রেমভারে নীলার মাথা নুয়ে পড়ে।

অনুবাদ : ইন্দ্রাণী সরকার

গুটিকয়েক মাত্র চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে গল্পটি — কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র নীলা, তার বৃদ্ধা দিদিমা, তাদের গ্রামে বেড়াতে-আসা যুবক মৈত্রেয়ী এবং একটা মস্ত ঝিল যার কথা নীলার মুখে শোনা যায়, যদিও কাহিনিতে দৃশ্যত সেটি অনুপস্থিত। পাহাড়িয়া এক প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে গল্পটি বিন্যাস হয়েছে। গোড়াতেই লেখক এক অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন — উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে ঝর্নার জল আছড়ে পড়ছে নীচের পাথরে। পাহাড়টির কোলে কোলে সবুজ গাছ ভরে রয়েছে — দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে আকাশটাই সবুজ রঙে রঞ্জিত হয়ে রয়েছে। চূড়োটা দৃষ্টির বাইরে — মানুষের আয়ত্তের সীমার বাইরে অবস্থিত যেন। অগম্যতার এই সংকেতটি এরপর নানান্‌ভাবে গল্পে ফিরে আসবে জীবনের এক পরমসত্যকে উপস্থাপিত করতে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে।

পাহাড়ী ঝর্নার ঠাণ্ডা জলে নীলা প্রতিদিন পা ডুবিয়ে বসে। জলের শীতল স্পর্শে সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। নীলা যেন এই প্রকৃতিরই সন্তান — পাহাড়ের সব নালার মতো ঝর্না, পাথুরে-পথ সে চষে বেড়ায়; কখনো বা ঘুম পেলে পাথরের কোলেই শয্যা পাতে। কিন্তু মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়োর দিকে তাকালে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে — সেখানে সে যে কোনোভাবেই উঠতে পারে না — একলা যাবার সাহসও তো নেই। তবু আশা ছাড়ে না সে। মনে ভাবে কোনো একদিন বাসনাপূরণ হবেই তার। আশাতেই তো বাঁচে মানুষ।

সে আরো শুনেছে পাহাড়ের মাথায় নাকি কোনো এক সাধু থাকেন, যাঁকে কেউ দেখেনি কারণ তিনি নীচে নামেন না — আর অন্য কেউ পাহাড়ের চূড়োয় চড়তে পারেনি। তবে রোজ রাতে পাহাড়ের চূড়োয় নাকি একটা আলো দেখা যায় — তাইতেই লোকে মনে করে হয়তো বা সাধুই প্রদীপ জ্বেলেছেন।

অগম্য চূড়োয় অনেক নীচে পাহাড়ের একটি উপত্যকায় নীলা তার বৃদ্ধা দিদিমার সঙ্গে থাকে। পাহাড়ের অন্য পাশে একটি গ্রামে আগে তারা থাকত — যখন নীলার মা বেঁচে ছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে তারই ইচ্ছানুসারে দিদিমা চলে আসেন এই ঝর্নার পারে। আসলে ঝর্নার ধারে যে আমগাছটা রয়েছে, সেটি দিদিমাই অনেককাল আগে পুঁতেছিলেন, আর তার তলাতেই মেয়ের শেষকৃত্যও করেছিলেন তিনি। নীলার মা তার জন্মের পরেই মারা গিয়েছিল। তার বাবার হদিশও মেলেনি — আসলে যে ছিল বহিরাগত এক আগন্তুক। নীলার জন্মের আগেই সে চলে গেছিল — কথা দিয়েছিল ফিরে আসবে — যেকথা সে রাখেনি। তারপর একদিন নীলার মা-ও মারা যায় অসুখে। সে বলে গিয়েছিল তার মা যেন ছোট্টো শিশুটিকে নিয়ে ওই ঝর্নার কাছে থাকেন — যে ঝর্নার ধারেই তার জীবনের পরমপ্রাপ্তি — ওই আগন্তুকের প্রণয় এবং চরম পরিণতিও — অর্থাৎ শেষকৃত্য। দিদিমা মৃতা মেয়ের অনুরোধকে সম্মান জানাতে ওই ঝর্নার ধারে নিজের হাতে পোঁতা আমগাছটির কাছেই ঘর বাঁধেন গ্রাম ছেড়ে। যে গাছের তলায় নিজের হাতে মেয়ের শেষ কাজ করেছেন — সে মাটিতে মিশে-যাওয়া মেয়ের অস্তিত্ব যেন গাছটির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে — তাই গাছে মুকুল ধরলে তিনি সেই মঞ্জরীতে উদ্ভাসিত হতে দেখেন যেন মেয়েরই হাসিমুখ। যা নেই তাই যেন মূর্তিমন্ত হয়ে ওঠে মায়ের আবেগে। আর জন্মের পরেই মা-কে হারানো মেয়ে এই নীলা — যার স্মৃতিতেও মা কোথাও নেই — সেও দিদিমার মতোই ওই গাছের দিকে তাকিয়ে যেন দেখতে পায় হারিয়ে যাওয়া মাকে। এ যেন তার মাকে দেখতে চাওয়ার এক অনিরসিত আকাঙ্ক্ষারই ফলশ্রুতি।

বাস্তবজীবনটা খুবই গদ্যময় — দিদিমার দুটো মোষ আর কয়েকটা ছাগল চরানো নীলার কাজ। কাজটা কঠিন নয় তাই পশুদের উপত্যকায় ছেড়ে দিয়ে সেও মনের আনন্দে ঝর্নার ধারে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াত — যেমনটি তার মা-ও করত। প্রকৃতির সন্তান এই মেয়েটি পশুপাখি, গাছের ফুলফল, পাতার শব্দ, পাখিদের গানে

খুঁজে পায় বন্ধুত্বের স্বাদ। বস্তুত তখন সে যেন চলে যায় সম্পূর্ণ অন্য একটি জগতে যেখানে তার নিজেকে একটুও একা মনে হয় না — প্রকৃতিই যেন তার সব কিছু নিয়ে ভরে রাখে নীলাকে।

নীলা, দিদিমা আর প্রকৃতি ছাড়া আর যে কয়েকজন এই গল্পে রয়েছে, তাদেরই মধ্যে আছে গণপতি ও কোকিলা — স্বামী-স্ত্রী, যারা পাহাড়ের গায়ে অনেক উঁচুতে এক কুঁড়ে ঘরে থাকে। কোকিলা দিদিমার বন্ধু। দুপুরবেলার অবসরে দুজনে গল্প করে কখনো জন্তুদের নিয়ে কখনো বা মেঘের বিষয়ে — এমনকি গাছের ঝরাপাতাও সেই আলোচনার বিষয়বস্তু হয় কখনো কখনো। কোনো কোনোদিন দুজনে গ্রামে গিয়ে জিনিসপত্র কিনে ফিরে আসে নিজেদের কুঁড়েতে।

গণপতি-কোকিলার কুঁড়ের পাশেই পাহাড়ি উচ্চতায় রয়েছে আরো একটি খালি কুঁড়ে ঘর। কোনো 'আগন্তুক' এলে সেখানেই সে থাকে — কোকিলার রান্না খায়। আর গণপতি তখন টুরিস্ট গাইড হয়ে তাকে পাহাড় দেখায়। সব পরদেশি আগন্তুকরাই আসে সবুজ গাছে ভরা উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলা সরু শাদা পথটি ধরে যা সমতলে এসে শেষ হয়ে যায়।

রোজকার মতোই নীলা সেদিনও দুপুরবেলা ঝর্নার ধারে আম গাছের ছায়ায় ঘুমোচ্ছিল। বিকেল নাগাদ তার ঘুম ভাঙে। তখন গোধূলির কনে-দেখা আলোয় জল, গাছ, প্রান্তর ভরে উঠছে। সেই রক্তিম পটভূমিতে নীলা হঠাৎ দেখে অদূরে ঘাস নিয়ে খেলছে এক পরদেশী আগন্তুক — আর আড়চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে কনে-দেখা আলোয় রাঙা নীলার দিকে। হয়ত এই ভাবেই দীর্ঘক্ষণ সে তাকিয়ে থেকেছে নীলার ঘুমন্ত মুখখানির পানে। অচেনা সুপুরুষ মানুষটির এই দৃষ্টির সামনে লজ্জায় কুঁকড়ে যায় নীলা। পরণের খাটো শাড়িটার আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

দুর্গম পাহাড়ি উপত্যকায় বেলফুলের মতো ধব্‌ধবে সাদা কাপড় পরা লোকটিকে ভারি বেমানান লাগে, কারণ এই এলাকায় কেউ তেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে না। মানুষটির শুভ্র বসন ও গায়ের ফর্সা রঙ দেখে নীলা ভাবে সে যেন দেবলোক থেকে এসেছে — যা নীলার অচেনা, অধরা।

গাছ থেকে একটি পাখী উড়ে যেতে বিবশ অবস্থা থেকে সম্বিত ফেরে নীলার। দিদিমাকে গিয়ে আগন্তুকের কথা বলে জানতে পারে সে কোকিলাদের প্রতিবেশী হয়েছে। আগামীকালও থাকবে।

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নীলার মন। গাছের পাখী, ঝিলের জল আর বনের পশু সহ এই মূক প্রকৃতিই এতদিন ছিল তার সঙ্গী। কিন্তু এই প্রথম কোনো রক্তমাংসের কথা-বলা মানুষ তাকে সঙ্গ দিতে এসেছে সুদূর থেকে — এমন কল্পনাতেই সে খুশিতে মাতোয়ারা হয়। আসলে তার আপাত-পরিপূর্ণতার আড়ালে কোথাও যে অবচেতন এক নিঃসঙ্গতা লুকিয়ে ছিল, সেটিই যেন উপরিতলে উঠে এল এই আগন্তুকের সঙ্গকামনায়। নীলার কল্পনা তাকে এমনও ভাবালো যেন ওই লোকটির সনে তার জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। আগামীকাল সেই মানুষটিরই দিনভর সঙ্গ পাবে এই আশা নিয়েই রাতে ঘুমিয়ে পড়ে নীলা।

ভোর হয় — মুখ হাত পা ধুয়ে, জল দিয়ে অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিক করে নেয় নীলা। প্রকৃতির কোলে ঘুরে বেড়ানো জাগতিক বা বলা ভালো শহুরে সচেতনতা-বর্জিত এই পাহাড়িয়া কন্যা এই প্রথম নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করল। জলে পড়ে-থাকা ছায়ায় দেখে কোটরে ঢোকা চোখ, কালো চেহারার অসুন্দর এক মেয়ের ছবি। যেন

দীর্ঘদিনের অমনোযোগ মুহূর্তে শুধরে নিতে সে দৌড়ে বাড়ি ফিরে বাক্সের নীচে রাখা সবচেয়ে ভালো রঙিন শাড়ি পরে খানিকটা স্বস্তিবোধ করে। স্বাভাবিক অবিন্যস্ততার সে সহজতা তার অভিজ্ঞতা ছিল, আজ কোথায় যেন সেই পরিচয়টিতে চিড় ধরল। আসলে নিজের অবচেতনের একাকীত্বের দ্বারা চালিত হয়ে অজানাকে জানার আকুলতা — কোথায় যেন তাকে চেনাজানা বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতটি ভুলিয়ে নিয়ে গেল এক কল্পনার জগতে যা হয়ত আসলে নিরস্তিত্ব।

আবার দেখা হলো যুবকটির সঙ্গে — দেবসদৃশ শুভ্রবসন মানুষটির হাতে শাদা ফুলের তোড়া — পবিত্রতা ও সহজতার ইঙ্গিতবাহী যেন এই রঙ। নীলার সঙ্গে হাসি বিনিময়ের পরে সে জানায় তার নাম 'মৈত্রেয়ী' — বাস অনেকদূরের একটি গ্রামে, যা নীলার কাছে অচেনা। নীলা ভাবে চিরপরিচিত সেই শাদা আঁকাবাঁকা পাহাড়ি সরু পথটি ধরেই ছেলেটির গাঁয়ে পৌঁছানো যাবে। নীলার পাহাড় দেখানোর উৎসাহভরা প্রস্তাবের নির্লিপ্ত উত্তরে সে জানায় গতকাল গণপতির সঙ্গে ঘুরে তার সব দেখা হয়ে গেছে। জলে হাত ডুবিয়ে কুড়িয়ে আনা শাদা ফুলের তোড়া থেকে একটি একটি করে ফুল সে জলে ভাসিয়ে দিতে থাকে। পরিত্যক্ত ফুলগুলি নীলা কুড়িয়ে নিয়ে ভাবে যেন এক অমূল্যনিধি পেয়েছে। যুবকটির গুনগুনিয়ে গান ধরে। নীলাও দিদিমার শেখানো গান গেয়ে ওঠে। কিন্তু এরপরও কোথায় যেন দুজনের মাঝে থেকে যায় এক দূরতিক্রম্য ব্যবধান — ভৌগোলিক প্রত্যক্ষতায় না হলেও অন্তত পরোক্ষে — হয়ত অপরিচয়ের গণ্ডী অতিক্রম করতে যুবকটির অনাগ্রহের কারণেই। এই অনাগ্রহের ভাবটি দেখা যায় তাদের কথোপকথনেও — ছেলেটি শুধুই নীলার প্রশ্নের উত্তর দেয় — নিজে কোনো বাক্যালাপ শুরু করেনা। এমনকী মেয়েটির বারংবার অনুরোধেও গান আর গায়না। নীলার কাছে সে যেন অনায়ত্তই হয়ে থাকতে চায়। এর আগে নীলার এক প্রশ্নের উত্তরে সে জানিয়েছিল সে গান লেখে। ফলত তার কবিসুলভ খামখেয়ালি ও উদাসী মনোভাবটি খানিকটা আন্দাজ করা যাচ্ছে নিঃসন্দেহেই। তার তরফে শুধু একটিই জিজ্ঞাসা ছিল — পাহাড়ের সেই চূড়োটিতে কোনোদিন কেউ উঠেছে কিনা। কেউ যেতে পারে নি এবং এক যোগী থাকার সম্ভাবনাও আছে জেনে এইবার যুবকটি কৌতূহলী হয়ে ওঠে — বলে সে যাবে ওই আপাত-অগম্য লক্ষ্যের দিকে। নীলাও সঙ্গে যেতে চায় — আসলে ওই অধরাকে ছোঁওয়া তো তারও লক্ষ্য — কিন্তু সে একা যেতে চায় না, হয়ত বা পারবেও না। তাই সে যুবকটির সঙ্গী হতে চায় এই অচেনা, অজানা পথে।

ঝর্নার ধার দিয়ে তারা উঠতে শুরু করে — যথাক্রমে ছেলেটি ও তারপর তার ছায়ার মতো নীলা পিছু পিছু। ছেলেটি ফিরে তাকায় না — অতি দ্রুত সে উঠতে থাকে — একসময় হারিয়ে যায় নীলার চোখের সামনে থেকে। দমবন্ধ হয়ে আসে নীলার — মনে হয় এত কাছে বলে যাকে মনে হয়েছিল — সে যেন মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল তার চোখের সামনে থেকে। নীলা কেঁদে ফেলে — ছেলেটির সঙ্গে পথচলার আশা আর পাহাড় চুড়ো দেখার সাধ— দুই-ই অপূর্ণ থেকে যায় তার। জীবনের পরমকামনা যা, তার অপ্রাপ্তিতে নিরাশায় ভরে যায় তার মন। সারা পাহাড়টাই যেন শূন্য বলে মনে হয় তার — পাহাড় থেকে নেমে সে বাড়ি ফিরে যায় একা।

দিন গড়িয়ে দুপুর হয়। ঠিক মরীচিকার মতেই আবারও ঝর্নার ধারে ছেলেটি দৃশ্যমান হয়। আবারও নীলা তার খানিক আগের হতাশা ভুলে যায়। অধীর আগ্রহে সে জেনে নিয়ে চায় যুবকটি পাহাড়ের মাথায় পৌঁছোতে পেরেছে কিনা, সেই যোগী যাঁর অস্তিত্ব কল্পনা করে সবাই — তাঁর সঙ্গে দেখা ও কথা হয়েছে কিনা। তার কাছে যা অগম্য, অনায়ত্ত, তার ভারি আপনজন বলে অনুভূত হওয়া এই মানুষটির যদি যা আয়ত্তে এসে থাকে, তাহলেই

যেন তার বুকটি ভরে ওঠে — যুবকের সাফল্য যেন তারই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা।

কিন্তু আবারও সে হতাশ হয় — যুবকটি জানায় সেও পৌঁছোতে পারেনি চূড়ায়। আসলে চূড়াটি হল মানুষের অনিয়মিত, অলীক কামনার প্রতীক, যাকে পাবার আশাই করা যায় শুধু কিন্তু সত্যি সত্যি পাওয়া যায় না। কারণ আশাকে ধরে ফেললেই জীবনে বেঁচে থাকার আর যে কোনো প্রণোদনা থাকে না। কেউ কেউ সেই আশাপূরণের খুব কাছে যেতে পারেন যেমন পেরেছিল যুবক — কিন্তু সাধারণ মানুষ শুধু দূর থেকেই আশাকে লালন করতে পারে মনে মনে — ধরতে যাবার দুঃসাহস তাদের হয়না — যেমন হয়নি নীলারও।

নীলার হতাশা ও উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে যায় যখন যুবকটির সেই সরু শাদা যাতায়াতের পথটির দিকে তাকিয়ে থাকে। এই পথ আগন্তুকদের যেমন নিয়েও আসে নীলাদের কাছে, তেমনই আবার ওই একই পথ ধরে তারা হারিয়েও যায় চিরদিনের মতো, যেমন একদিন গিয়েছিল নীলার জন্মদাতা — যার কোনো নাম বা পরিচয় নীলা জানে না — সেও ছিল মৈত্রেয়ীর মতেই এক ক্ষণিকের অতিথি পরদেশী আগন্তুক। ক্ষণিকের পাওয়া অমূল্য নিধিকে হারাবার আশঙ্কায় নীলার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় — সে জানতে পারে আর খানিক বাদেই যুবকটি বিদায় নেবে। এ যে অবশ্যম্ভাবী তা হয়ত নীলা জানতো, কারণ আগন্তুকরা তো ঘর বাঁধার জন্য আসে না — তারা গণপতির পাশে পরিত্যক্ত কুঁড়েতে ক্ষণস্থায়ী হয় মাত্র। হয়ত তারা শহুরে, তাই বিশাল পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকার বন্য সরল সৌন্দর্য হয়ত তাদের আকৃষ্ট করে — যেমন করে এখানকার প্রকৃতির সন্তান সরলাবালারাও।

ঠিক এই সময়েই নীলার মনে পড়ে যায় টলটলে জলে ভরা একটা বিশাল দীঘির কথা যেটিকে সে দেখতে পেয়েছিল ওই শাদা পথটি ধরে গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে খানিকদূর যাবার সময়ে। নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডিটুকুরমধ্যে — ওই আমগাছের তলায়, ঝর্নার ধারে, দিদিমা, গণপতি ও কোকিলার সঙ্গে জীবনকাটানো নীলাকে লক্ষ্মণরেখার ওপারের বিশাল অজানা পৃথিবী হাতছানি দিয়ে ডেকেছে — কিন্তু তার সাহসে কুলোয়নি রেখা পার করতে — তাই যাওয়া হয়নি পাহাড় চুড়োয় — যেমন যাওয়া হয়নি রোদে চিক্ চিক্ জলভরা বিশাল ওই দীঘিটির কাছেও। তার জীবনের সংজ্ঞা এতই সহজ এতই সামান্য যে সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো লক্ষ্যের কামনা সে করলেও কখনোই সেটিকে ছুঁতে পারার ক্ষমতা তার কোনোদিনই হবে না। সাধ আর সাধ্যের মেলবন্ধন যে কখনোই হয় না সাধারণ জীবনে। তাই দেবতুল্য যুবকটির নিরাসক্ত দূরত্বে অবস্থান যেন কখনো ছুঁতে না-পারা পাহাড়ের চূড়ো কিংবা দীঘির জলের সঙ্গে একাকার হয়ে সেই চরম সত্যটিকেই প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এর পর সে জানতে পারে তার সাধ্যবস্তুটির অস্তিত্ব যে আদৌ নেই।

যে জলভরা দীঘির বিশালতা ও পূর্ণতায় একাধারে সে ভীত ও আপ্লুত হয়েছে তা আসলে দীঘি নয়, মরীচিকা মাত্র — রোদ পড়লে ঝিক্‌মিকিয়ে মনে হয় জল। পরদেশী যুবক আরো বলে, মানুষ যত কাছে যায় ওই পথ ধরে ততই তা দূরে সরে যেতে থাকে — তাই কোনোদিন কেউ তাকে ছুঁতে পারেনা। যে পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এই দীঘির নাটক-মরীচিকার ক্রম-পশ্চাপসরণ ঘটে, আজ একটু পরে সেই পথ ধরেই হাঁটতে হাঁটতে দূরে, আরো দূরে চলে যাবে এই আগন্তুক — তাকে আর কোনোদিন ছুঁতে পারবে না নীলা। এবারে সেই জলে ভরা অথচ আসলে জল নয় — এমন নিরস্তিত্ব দীঘিটিকে তার মনে হয় যেন মুষড়ে-পড়া জীবন।

গণপতি এসে পড়ে — নীলার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে যুবক রওনা হয় গন্তব্যের দিকে — একবারের জন্যেও ফিরে তাকায় — খানিক বাদে হারিয়ে যায় সে চোখের সামনে থেকে।

এতদিনকার চেনা পাহাড়টা হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর শূন্য বলে মনে হয় নীলার। ছেলেটির গুনগুন গানের শব্দহীন স্মৃতি, ঝিলটির জলহীন মরীচিকার অস্তিত্বহীনতা তাকে সচেতন করে দেয় জীবনের চরম সত্যের সম্পর্কে — তা হলো মৈত্রেয়ীর প্রেমহীন মন যা তাকে আর কোনোদিন ফেরাবে না এই পাহাড়ে ঝর্নার ধারে, নীলার আঙিনায়। কিন্তু নীলা আর তাকে কোনোদিন ভুলতে পারবেনা। আসলে মা মরা, পিতৃস্বীকৃতিবর্জিত হতভাগ্য মেয়েটির সর্বরিক্ত জীবনে কিছুই তো ছিল না। তাই ছোটো থেকে সে একটির পর একটি মরীচিকাকে অবলম্বন করে বাঁচার প্রণোদনা খুঁজতে চেয়েছে — কখনো আম গাছের পাতার নাচনে মৃতা মাকে দেখতে পেয়ে কখনো অগম্য পাহাড়চূড়োয় পৌঁছে কারুর না-দেখা সাধুবাবাকে প্রণাম করতে চাওয়ার বাসনায়, আবার কখনো বা কোনোদিনও ছুঁতে না-পারা জলহীন মরীচিকার মতো দীঘিটিতে পৌঁছোতে চেয়ে। কিন্তু তার কোনোটিই তো সম্ভব নয় — মা, সাধুবাবা এবং দীঘি তিনটিই যে নিরস্তিত্ব।

তাই অস্তিত্বময় হয়ে এসেছিল সেই মৈত্রেয়ী নামের আগন্তুক যুবকটি, যাকে চাইলে ছুঁতে পারা যেত, যাকে সত্যিই দেখা যায় দু'চোখ ভরে, যার কাছে পৌঁছোনোর পথ পাওয়াও হয়ত অসম্ভব নয় — সেই পরদেশীকে ঘিরে সে যেন নতুন করে খুঁজেছিল বাঁচবার লক্ষ্য। কিন্তু সেও যখন আজ ওই মরীচিকাগুলোর মতোই মিলিয়ে গেল পথের প্রান্তে, চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল নীলার সবচেয়ে আপনজন মা ও বাবার মতোই — তখন সত্যিসত্যিই তার জীবনের অবলম্বন যে আর কিছুই রইল না। 'আশার ছলনে ভুলি' যে রঙিন কল্পনা সে সৃজন করেছিল আজ তাও মিলিয়ে গেল ওই মরীচিকার মতোই। পাহাড়িয়া গ্রাম্য মেয়ের জীবনে শুভ্রবসন শহুরে কবিরা যে মরীচিকাই হয়ে থাকে, এই নির্মম সামাজিক সত্যটিই যেন প্রতিষ্ঠিত হল এইভাবে।

জীবনের শেষ আশাটুকুও হারিয়ে ফেলে নীলা একবুক বেদনা নিয়ে ফিরে যায় দিদিমার কাছে। বৃদ্ধা নারীর লোলচর্মদেহ, সাদা চুল, জরাগ্রস্ত শরীরে নিজের ভবিষ্যতের কল্পনায় সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। একাকীত্ব, জন্ম থেকে কিছু না-পাওয়ার যন্ত্রণা এবং ধূসর ভবিষ্যতের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে বেরিয়ে আসে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে। এতদিনে যেন সে অনুধাবন করতে পারে নিজের জীবনের সম্পূর্ণ ছবিটিকে — তাই দিদিমাকে বলে সে যখন আর থাকবে না, তখন তার মায়ের মতো তার স্মৃতিতেও তিনি যেন একটা গাছ পুঁতে দেন পাহাড়ে। তবে সেটি মুকুলিত আম্রবৃক্ষ নয় — শাদা ফুলের গাছ। সে গাছে যতদিন শাদা ফুল ফুটে থাকবে ততদিন সেও যেন অস্তিত্বময় হয়ে থাকবে প্রকৃতির এই সম্ভারের মধ্যে দিয়ে। শাদারঙের মাধ্যমে তার নির্মল ও রিক্তজীবনের ছবি যেন ব্যঞ্জিত হবে; তেমনিই আগন্তুকের শাদা পোষাক, শুভ্রবর্ণ ও তার হাতের শাদাফুলও, যা নীলা কুড়িয়ে নিয়েছিল, যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে নীলার কুসুমিত অস্তিত্বের রঙের সঙ্গে। বাস্তবে যা ঘটেনি — ওই শাদা ফুলের প্রচ্ছদে তাই যেন হবে — শুভ্রবর্ণের সমানতায় নীলা মিলিত হবে তার ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে — এ তার শেষ কামনাও।

গল্পের শেষে নীলা তার মায়ের স্মৃতি-বিজড়িত আমগাছটির তলায় গিয়ে বসে — প্রেমভারে মাথা নত হয়ে আসে তার। এ যেন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি — অনেকদিন আগে এভাবে সমস্ত বাহ্যিক জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে প্রেমের প্রতীক্ষায় নীলার মা এই আমগাছতলাতেই জীবন থেকে বিদায় নিয়েছিল। আর আজ অনেকবছর পরে তারই মেয়েও প্রেমের প্রতীক্ষাতেই সেই গাছের তলায় অবস্থান করে — মায়ের মতো একদিন প্রকৃতির বুকে লীন হয়ে যাবার জন্য। তবে তার মার জীবনে আগন্তুক একটি প্রবাহিত অনুসূত্র দিয়ে গেছিল — নীলা নামক শিশুটির জন্মের মাধ্যমে — কিন্তু নীলার আগন্তুক কোনো অনুসূত্র রেখে যায় নি — সত্যি সত্যিই মরীচিকার হাতছানিতে বিভোর

করে হয়ত নিজের অজান্তেই নীলাকে ফেলে গেছে জীবনের প্রান্তে। নীলার মা বেঁচে আছেন মা ও সন্তানের স্মৃতিতে। কিন্তু মাতৃহারা নীলা, সন্তানহীনা নীলা দিদিমার প্রয়াণের পরে কোথাওই যে বেঁচে থাকবে না — এমনকী স্মৃতিতেও নয়, কারণ শাদাফুলের গাছে যে তার অস্তিত্ব—সেই কল্পনাটিও তো হারিয়ে যাবে দিদিমার মধ্যেই।

সারাজীবন ধরে মরীচিকাকে অবলম্বন করে বাঁচতে -চাওয়া মেয়েটি এইভাবেই মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার যে আকাঙ্ক্ষা করেছে তাও যে আসলে মরীচিকাই — তাই যেন মূর্তিমন্ত হয়ে নীলার জীবনের মর্মন্তুদ চালচিত্রটিকে আরো করুণ করে তোলে শেষ পর্বে।।

দেয়াল

(মালয়ালম)

ভি. এম. বশীর

১.১ ◻ কাহিনি

কেউ কি শুনেছেন এই ছোট্ট প্রেমের গল্পটা? এর নাম 'দেয়াল'। অবশ্য আমি এটার নাম দিতে পারতুম 'নারীর গন্ধ'। কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম 'দেয়াল'ই নাম দেবো গল্পটার। শুনুন মন দিয়ে। ঘটনাগুলো ঘটেছিলো বেশ-কিছুকাল আগে। যাকে আমরা সাধারণত বলি অতীত। অতীতের তীরগুলো পেরিয়ে মনে রাখবেন আমি আছি এই তীরটায়। নিঃসঙ্গ এক হৃদয়। এই হৃদয় থেকেই উৎসারিত হবে এক করুণ গান, আর আপনারা শুনবেন।

উঁচু-উঁচু সব পাথরের দেয়াল, মনে হয় যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। সেন্ট্রাল জেল (আর আমাকে) ঘিরে তারা দাঁড়িয়ে আছে। এই দেয়ালগুলোর মধ্যে আছে অনেক দালান-কোঠা। এই দালান-কোঠার মধ্যে আছে অনেক মানুষ। খুব-একটা শোরগোল নেই। বেশির ভাগ কয়েদীই ঘরবন্দী। কারু-কারু ফাঁসির হুকুম হয়েছে— কাল ভোরবেলায় তাদের ফাঁসি দেয়া হবে। অন্যদের জেলের মেয়াদ ফুরিয়েছে, তাদের মুক্তি দিয়ে দেয়া হবে কাল। সবসত্ত্বেও, তবু একটা শান্ত ভাব হাওয়ায়।

আমি হাঁটছিলুম। চওড়া কোনো রাস্তা নয়। আমার বামে আর ডানদিকে দীর্ঘ সব উঁচু-উঁচু দেয়াল। আমার সামনেই হাঁটছে ওয়ার্ডার। আমার গায়ে কয়েদীর উর্দি পরিয়ে একটা নম্বর বসিয়ে দেবার পর মাত্র কয়েক মিনিট সময় কেটে গিয়েছে। শাদা টুপির গায়ে কালো কালো ডোরা, শাদা শার্ট, শাদা ধুতি। শোবার জন্য একটা মোটা কাপড়ের সুজনি, গা ঢাকা দেবার জন্য কালো-একটা কম্বল, খাবার জন্য থালাবাসন— প্রত্যেকের গায়ে একটা করে নম্বর বসানো। আমি তো আর নতুন নই। আগেও আমাকে একবার নম্বরে পরিণত করা হয়েছিলো। সংখ্যার ওপর একটা বই পড়েছিলুম একবার, সেটা আমার মনে পড়ে গেলো। আমার নম্বরটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম একবার, তারপর সংখ্যাগুলো যোগ করে দিলুম। নয়। নয় সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্র কী বলে? কী হবে আমার, এই জেলখানায়?

ওয়ার্ডার ঘ্যানঘ্যান করলে : 'আরেকটু জোরে হাঁটতে পারো না?' আমার ইচ্ছে করলো হেসে উঠি। হাসবার কোনো সুযোগ পেলে আমি ছাড়ি না। হাসি তো ভগবানেরই বিশেষ উপহার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'এত যে তাড়া বলি যাচ্ছো কোথায়? এই বিশাল বিশ্বটাকে পেরিয়ে যাবে বুঝি?'

সে কোনো উত্তর দিলে না। সে শুধু হাঁটতেই থাকলো। আমি বললাম, 'আমাকে ঐ গর্তটায় ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেবার পর তোমায় বুঝি মস্ত একটা ব্যবসার সামাল দিতে হবে?'

বিষয়টা একটু সিরিয়াসই। পঞ্চাশ মাইল দূরের একটা মফস্বল শহরে পুলিশের হাজতে ছিলুম আমি। বারো মাস হবে, কিংবা চৌদ্দ। ওরা আমার মামলাটা তুললেই না। শুধু হাজতে পুরে রেখে দিলে। পুলিশের দারোগার পরামর্শে আমি তারপর বেজায় চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিলুম। অনশন শুরু করে দিয়েছিলুম। অর্থাৎ সত্যাগ্রহ — হাঙ্গার স্ট্রাইক! মামলাটা এবার আদালতে উঠলো। সরকারিভাবে এবার সাজা দেয়ালুম নিজেকে। হাজতে তো আমি বলতে গেলে একজন ঘরের লোকই ছিলুম। আমার ডান হাতের তর্জনী থেকে কব্জি অব্দি পিটুনির চোটে মণ্ড হয়ে

যেতো। কে-এক রিজার্ভ পুলিশ কনস্টেবল এই কথাই জানিয়েছিলো আমার মা-বাবাকে। বাস্তবিক অবশ্য কোনো পুলিশের লোকই এ-কথা বলেনি, বলেছিলেন এক ম্যাজিস্ট্রেট, দণ্ডমুণ্ডের যিনি কর্তা। কি দেমাক এই পুলিশের লোকগুলোর! সেটা ঘটেছিলো আমাকে গ্রেফতার করতে এসে পুলিশ যখন আমার বাড়ি চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিলো। আমি তখন সেখানে ছিলুম না। কিন্তু শেষটায় তারা পাকড়ালে আমাকে। কেউ আমাকে মেরে পাট করে দেয়নি। পুলিশদের মধ্যে বেশ কিছু লোকই আমার ভক্ত হয়ে যায়। আমার সেখানে প্রায় হেড-কনস্টেবলের মতোই খাতির আর প্রতিপত্তি ছিলো। হাজতে থাকার সময় আমি গোটাকয় রহস্যগল্পই লিখে ফেলি — পুলিশ যার নায়ক। দারোগাসাহেব আমাকে পেনসিল আর কাগজ জোগাতেন। তাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়েই আসছি এখন। সঙ্গে ছিলো দুজন কনস্টেবল। বন্দুকধারী। তাদের পকেটে ছিলো হাতকড়া। এই দুজনই আমাকে সেন্ট্রাল জেলের হাতে সঁপে দিয়ে যায়। যে সিরিয়াস ব্যাপারটার কথা পেড়েছি, সে কিন্তু এসব সাতকাহন নয়। ঐ কনস্টেবল দুজন দু-প্যাকেট বিড়ি, একটা দেশলাই আর একটা নতুন ব্লেড কিনে এনে দেয় আমাকে। ওয়ার্ডার আমার পকেট হাৎড়ে সব বার করে নেয় আর বেশ মোলায়েম ভাবেই জানায়: 'জেলখানার মধ্যে এসব জিনিশের কোনো অনুমতি নেই।' সে তার মাথার ঐ মহান দেখতে টুপিটা খুলে নিয়ে জিনিশগুলো সব ভেতরে রাখলে, টুপিটা ফের চড়িয়ে দিলে মাথায়, তারপর আমায় নিয়ে জুড়ে দিলে এই কুচকাওয়াজ। ভঙ্গিটা এমন যেন সিরিয়াস কিছুই ঘটেনি। তা, হাঁটুক না সে, হতচ্ছাড়া বেইমান!

রেজর ব্লেডটা কেন ছিলো, জানেন? উঁহু আপনারা যা ভাবছেন, সেজন্য নয়। সেটা জরুরি ছিলো দেশলাইয়ের কাঠিকে দু-ফালি করবার জন্যে। আমি এমন-সব মহা-মহাশিল্পী দেখেছি যাঁরা একটা কাঠিকে ছ-ফালি করতে পারতেন। ব্লেড অবশ্য আরো অনেক কাজে লাগে। জেলখানায় একটা দেশলাইয়ের বাক্স জোটানো মোটেই কোনো সহজ কাজ নয়। তার জন্যে পয়সা লাগে। জেলখানায় কারু পয়সা থাকে না। কিন্তু ব্লেড কাজে লাগে 'চাক্কি' বানাতে। 'চাক্কি' কাকে বলে জানেন তো? না, আপনারা আর কী করে জানবেন? বসুন, বলছি।

জেলের কর্তারা আপনাকে শোবার জন্য দেন সেটা একটা সুজনি। তার সুতোগুলো জমান, দু-আঙুল সমান পুরু। লম্বায় সেগুলো হাতের চেটোমাফিক হওয়া চাই। এবার গেরো বাঁধুন একটা— দু-ইঞ্চি মতো ফাঁক গেরোটায়। বেরিয়ে-থাকা সুতো এবার জ্বালিয়ে দিন। প্রতিভাবান শিল্পীরা এই পোড়া অংশগুলো ছোট্ট একটা চামড়ায় দু-তিন পাল্লায় ভাঁজ করে ফেলতে পারে। আমাদের মতো যারা হতভাগা সব অপেশাদার, তারা সেটাকে পুরু কাঁঠাল পাতাতেও বেঁধে রাখতে পারে। এবার আমাদের চাই ছোট্ট এক টুকরো লোহা। সে আবার কোথায় পাওয়া যাবে? হুঁ-হুঁ! শুধু কি লোহার টুকরো, অন্য যাবতীয় বস্তুই জেলখানায় পাওয়া যায়। অবশ্য হাতে যদি কারু পয়সা থাকে। যদি লোহার পাত থাকে অথবা ব্লেড্ সিমেন্ট বা গ্রানাইটে ঘষে ঘষে ফুলকি ওঠানো যায়। যদি সে ফুলকি আমাদের উদ্ভাবনটার পোড়া প্রান্তটাকে ছোঁয় তাহলে তো আগুনের কোনো অভাবই নেই। ব্লেডটাকে আবার একটা কাঠের টুকরোয় গেঁথে রাখা চাই যাতে একদিনের ফলাই শুধু বেরিয়ে থাকে : একেই বলে 'চাক্কি'। আর এই সবই এখন কিনা পড়ে আছে ওয়ার্ডারের টুপির তলায়!

আমি বললুম: 'পুলিশরা কখনো খারাপ লোক নয়।'

ওয়ার্ডার কি তবে শুনতে পায়নি? সে হেঁটেই চলেছে, চুপচাপ। ও জিনিসগুলো সব সে বিক্রি করে দেবে।

নচ্ছারটা এর মধ্যেই এত টাকা কামিয়েছে যে ছেলেপুলেই শুধু নয়, তাদেরও ছেলেপুলেকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

আমি জিগেস করলুম: 'তোমার ছেলেপুলে কজন ওয়ার্ডারসাহেব?'

সে তার দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো যেন, বললে: 'ছয় ; পাঁচ মেয়ে আর এক ছেলে।'

আমি জিগেস করলুম : 'ছেলেমেয়েরা আর তাদের মা— তাদের সকলেরই কুশল তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' ওয়ার্ডার বললে, 'তাড়াতাড়ি চলো।'

এত তাড়ার পেছনকার রহস্য খুবই স্বচ্ছ!

আমি জিগেস করলুম : 'কী হবে বেচারিদের, যদি তুমি মারা যাও?'

ওয়ার্ডার বললে : 'ভগবান তাদের দেখবেন!'

আমি বললাম : 'তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।'

ওয়ার্ডার শুধোলে : 'ও কথা বললে কেন?'

আমি বললুম : 'দৈব অভিপ্রায় সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলেই। ....আচ্ছা, বলছি কেমন করে আমার দিব্যজ্ঞান লাভ হলো। আর্ধেক সন্ন্যাসীই ছিলুম আমি। সারা ভারতবর্ষে এমন-কোনো মন্দির নেই যেখানে আমি যাইনি। এমন কোনো পবিত্র নদী নেই যার জলে আমি ডুব দিইনি। পাহাড়ের চুড়োয়, উপত্যকায়-সমভূমিতে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে সমুদ্রের তীরে—'

'তো?'

'ভগবান তোমাকে এমনি-এমনি ছেড়ে দেবেন বলে ভেবো না।'

'আমি তো কোনো দোষ করিনি।'

আমি জিগেস করলুম : 'তাহলে প্রকাশ্য দিবালোকে আজকের এই ডাকাতির ব্যাপারটা কী?'

ওয়ার্ডার তাজ্জব হয়ে গেলো। শুধোলে : 'দিনে ডাকাতি ? সে আবার কী ?'

আমি বললুম : ওয়ার্ডার তো মারা গেলো। তার আত্মা গেলো ঈশ্বরের জমকালো সন্নিধানে। ঈশ্বর জিগেস করলেন — আরে ছোটো-মন ওয়ার্ডার! ...বেচারা বশীরের ঐ ব্লেড, দেশলাইয়ের বাক্স আর দু-প্যাকেট বিড়ি তুই কী করেছিলিস?'

আচমকা ওয়ার্ডার থমকে গেলো। আমি এগিয়ে গেলুম, হেঁকে বললুম : 'আরে, এসো-এসো! আমাকে খাঁচায় পুরে দিয়ে কেটে পড়তে চাও না?'

ওয়ার্ডার থমকেই দাঁড়িয়ে রইলো। টুঁ শব্দও করলে না সে। হাসিতে তার সারা শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। মাথা থেকে টুপিটা সে খুলে ফেললে। আমার সব সম্পত্তি সে আমাকে ফিরিয়ে দিলে।

'ভালো ওয়ার্ডার, সদাশয় ওয়ার্ডার,' আমি বললুম। 'আজ সকালে দারোগাসাহেব বলছিলেন গান্ধিজি নাকি মৃত্যুশয্যায়। তুমি এ-সম্বন্ধে কিছু শুনেছো, ওয়ার্ডারসাহেব'?

'উনি অনশন ভঙ্গ করে লেবুর রস খেয়েছেন।'

অতি উত্তম। মোহনদাস গান্ধি দীর্ঘজীবী হোন!

একের পর এক লোহার দরজা পেরিয়ে আমরা হেঁটে চললুম।

আমি জিগেশস করলুম : 'এখন এখানে কতজন রাজনৈতিক বন্দী আছে?'

'তুমি যেখানে যাচ্ছো, সেখানে সবশুদ্ধ সতেরোজন আছে।'

হুঁ-হুঁ, তাই। তুমি তাহলে আমাকে একটা স্পেশ্যাল জায়গায় নিয়ে যাচ্ছো? সরকারবাহাদুর তাহলে এই দীনাতিদীনকে বেশ সমীহই করছেন। ভালো।

আর হাঁটতে-হাঁটতেই, হঠাৎ জগতের সবচেয়ে নেশাধরানো গন্ধ এসে পৌঁছুলো নাকে।

মেয়ের গন্ধ।

আমি বেজায় নাড়া খেয়ে গেলুম। আমার শরীরের সব কটা অণু-পরমাণু সজীব আর সজাগ হয়ে উঠলো। আমার নাকের বাঁশি বিস্ফারিত হলো। সারা জগৎটাকে আমি শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরে টেনে নিলুম।

কোথায় এই রমণী?

চারপাশে ফিরে তাকালুম। কেউ নেই। কোথাও কিছু না।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা শুনতে পেলুম জগতের সবচেয়ে সুন্দর ধ্বনি।

মেয়েগলার খিলখিল হাসি!

শব্দ আর গন্ধ কি একসঙ্গে মিলে এসে পৌঁছুলো তবে? না কি একটা থেকেই আরেকটাকে আমি কল্পনা করে নিয়েছি?

সৃষ্টির এই চমৎকার জীব — স্ত্রীরত্ন — তার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

যে হাসি শুনেছি, সেটা খুবই সত্যি, বাস্তব। যে গন্ধ আমার ভেতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, সেও সত্যি।

সাবানের গন্ধের কথা বলছি না আমি। কিংবা এও বলছি না মেয়েরা যে সব ভেষজ বা ফুলের তেল মাখে। পাউডার আর ঘামের গন্ধে মাখামাখি কোনো ঝিমধরা গন্ধও নয়। সত্যি-সত্যি, নেহাৎই স্ত্রীগন্ধ !

কোত্থেকে এলো এই গন্ধ? ......আর ঐ খিলখিল হাসি?

আবারও সেই গন্ধের কথা ভাবলুম আমি ... কেমন আচ্ছন্ন লাগছে নিজেকে, ঝিম ধরে যাচ্ছে সব। আবার আমার নাকের পটা ফুলে উঠলো। যেন উৎকণ্ঠায় আমার হৃৎপিণ্ডটাই ফেটে যাবে।

আমি জিগেস করলুম : 'ঐ হাসি এলো কোত্থেকে?'

ওয়ার্ডার ঠাট্টা করলে : 'তুমি বিয়ে করোনি?'

আমি বললুম : 'না....কিন্তু তার সঙ্গে আমার প্রশ্নের সম্বন্ধ কী?'

কেন যে এ সব কথা শোনো তুমি!

সেন্ট্রাল জেলে....ফাঁসির কাঠের ধারে কাছে....কেউ হঠাৎ শুনতে পেলে মেয়েগলার খিল-খিল হাসি। না, আমাকে শিগগিরই বিয়ে করে ফেলতে হবে! শুধু তখনই আমি জিগেস করতে পারবো কোত্থেকে এলো ঐ হাসি! কী চমৎকার যুক্তি!

ওয়ার্ডার হেসে ফেললে। বললে : 'হাসিটা এলো জেনানা ফাটক থেকে। তুমি তার পাশের জেলেই থাকবে। ক-দিনের মেয়াদ তোমার?'

'দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস ও হাজার টাকা জরিমানা। জরিমানা না দিলে আরো ছ-মাস সশ্রম।'

'তোমার আর জেনানা ফাটকের মধ্যে কেবল একটা দেয়াল থাকবে।'

দেয়াল....জেনানা ফাটক।

আমরা হেঁটে চললুম। সুজনি আর কম্বলটা বুকের কাছে ধরে আছি আমি।

ওয়ার্ডার একটা লোহার খিল লাগানো দরজা খুলে দিলে — আমরা ঢুকে পড়লুম বিশেষভাবে দেয়াল দিয়ে ঘেরা এক চত্বরে। অনেক গাছ, বেশির ভাগই কাঁঠাল। কয়েকটা ছোটো-ছোটো কুঁড়ে। পুবদিকে মুখ করে দাঁড়ালে, দূরে দু-পাশে চোখে পড়বে দুটি উঁচু দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে ডান দিকে আছে বিশাল, মুক্ত জগৎ। বাঁদিকে দেয়ালের ওপাশে আছে ... জেনানা ফাটক।

কুঁড়ে বাড়িগুলো-সব নিচু দেয়ালে ঘেরা একেকটা তালাবদ্ধ কুঠুরি।

সেখানকার ওয়ার্ডার আমাকে তার জিম্মায় নিলে। যে ওয়ার্ডার আমাকে নিয়ে এসেছিলো তাকে আমি বিদায় জানালুম। সেও বিদায় জানিয়ে ফিরে গেলো।

নতুন ওয়ার্ডার আমাকে একটু কুঁড়েয় নিয়ে গেলো। তার লোহার দরজাটা সে খুলে দিলে। একরত্তি একটা কুঠুরি। কুঠুরির বাইরে, একটু দূরে, পায়খানা। দরজার কাছে একটা জলের কল। কল খুলে আমি মুখ-হাত-পা ধুয়ে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেলুম। তারপর একটা কুঁজোয় জল ভরে, ভগবানের নাম নিয়ে ভেতরে ঢুকলুম, ডান পা আগে।

ওয়ার্ডার লোহার দরজা আটকে মস্ত একটা তালা লাগিয়ে দিলে।

আমি বললুম : 'এই অতিথি কিন্তু এখনো কিছু খায়নি।'

ওয়ার্ডার বলল : আজকের হিশেবের আওতায় তুমি পড়োনি। কাল থেকে তুমি খাবার পাবে।'

আমি বললুম : তাহলে আমাকে বাইরে যেতে দাও। আমি না হয় কালকের হিশেবের আওতাতে আসবো।'

ওয়ার্ডার জিগেস করলে : 'তোমার অপরাধটা ছিলো কী?'

'লেখা....রাজদ্রোহ।'

মনে হলো বোমকে গিয়েই ওয়ার্ডার বললে : 'রাজদ্রোহ!....ঈশ্বর আমাদের রক্ষে করুন।'

লোহার দরজার ওপরেই জোরালো একটি বিজলি বাতি জ্বলে উঠলো। ওয়ার্ডার প্রস্থান করলে।

মোটা সুজনিটা আমি পেতে দিলুম। বাসনকোসনগুলো রাখলুম এক কোণায়। আমি এবং হাজতের ভেতরটা — উভয়েই আলোয় ঝলমল করছি। আমি আজকের হিশেবের আওতায় পড়ি না। অতএব আজ রাত্তিরে আমাকে উপোস করতে হবে। কী করে একটু খাবার জোগাড় করা যায়, তার সুলুকসন্ধান আমা জানা আছে। লোহার দরজাটা নাড়িয়ে, ওয়ার্ডারের নাম ধরে চেঁচিয়ে, হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয়া উচিত আমার। তাহলে ওয়ার্ডার, সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং অন্যদের টনক নড়বে। আর তখুনি খাবার জুটবে। আমি অবশ্য তার বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত নিলুম। সাহিত্যের জন্যে আমার কিঞ্চিৎ আত্মত্যাগ করাও উচিত বৈকি। দেশের জন্যে বেধড়ক মার খেয়েছি আমি — বিস্তর। অনুগ্রহ করে বন্দুকের বাঁট দিয়ে বুকের পাঁজরে ঘা দেয়া হয়েছে আমার, আর আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছি, আস্তে। আমাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে রাস্তা দিয়ে। এবং আমি বেশ কয়েক দফাই মেয়াদ খেটেছি জেলে।

এবারকার এই জেলের মেয়াদ তো সাহিত্যেরই মহিমায়। এই চিন্তা আমার মধ্যে কিঞ্চিৎ গর্বের সঞ্চার করলে। আমি ঢকঢক করে একটু জল খেয়ে নিলুম।

ব্লেড দিয়ে দেশলাইকাঠি দু-ফালি করতে আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। বাদশার মতো একটা আস্ত কাঠি জ্বালিয়ে

নিয়ে বিড়ি ধরালুম আমি। পাঁচ-ছ'টা টান মেরে বিড়িটা আমি ঘষে নেবালুম। উহু, অমিতব্যয় কোনো কাজের কথা নয়।

বসে পড়ে কানখাড়া করে শোনবার চেষ্টা করলুম আমি। মেয়েগলার হাসি কানে এলো না আর। মেয়ের গায়ের গন্ধও নাকে এলো না। কেন? আমি তো জেনানা ফাটকের পাশেই বসে আছি।

ঐ গন্ধ — সে কি তবে ছিলো আমার কল্পনাতেই শুধু? একদা.... কত যুগ-যুগান্তর আগে .... যখন আমি ছিলুম আদম, আর ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলুম নন্দনকাননে, নাকে এসেছিলো হবার (ইভ) গায়ের গন্ধ ! ... হয়তো আমার আত্মার স্মরণকোষে আমি কোথাও জমিয়ে রেখেছিলুম সেই অভিজ্ঞতা। ....যেমন দ্যাখে মরীচিকা, এক ক্লান্ত অবসন্ন তৃষ্ণাতুর পথিক....মরীচিকার মতোই তা মিলিয়ে গেলো—নাকের পাটা বিস্ফারিত....হৃৎপিণ্ড চুরমার।

কোথায় সেই মধুর স্বর? কোথায়, কোথায় সেই ঝিমধরানো সুগন্ধ ?

বাইরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলুন আমি। আলোর মধ্যে দিয়ে কিছুই চোখে পড়লো না। অন্ধকার ঢেকে রেখেছে জগৎ। কিন্তু সে অন্ধকার কিছুতেই স্পষ্ট করে চোখে পড়ে না।

একটা জিনিশ শুধু বুঝতে পেরেছি আমি। এ যাবৎ আমি কখনোই অন্ধকারকে দেখিনি। সেই যে রাত নেমে আসে, হরণ করে হৃদয় আর লুকিয়ে রাখে সবকিছু! সেই সব তারা, লক্ষ-কোটি, মিটমিট-জ্বলা! জ্যোৎস্নায় চকচক করে-ওঠা রাত!

তুমি...আর তুমি....আর তুমি...আজও যে তোমাদের কাউকে আমি চোখে দেখিনি।

উঁহু এটা মিথ্যে কথা। আমি তাদের দেখেছি। আমি তাদের সবাইকেই দেখেছি। কিন্তু তখন খেয়াল করে দেখিনি। রাত, তারার আলো—কেই বা সিরিয়াসভাবে নেয় তাদের সৌন্দর্য?

ভাবতে গিয়ে, সুন্দর একটা রাতের কথা মনে পড়লো আমার। ছোট্ট একটা গ্রাম। তার ওপরে হাজার হাজার মাইল পড়ে আছে মরুভূমি। সময় ছিলো এই রকমই, সূর্য ডুবে যাবার পরক্ষণ। আমি মরুভূমিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। বোধহয় মাইলখানেক হেঁটেছিলুম আমি....যেন শাদা রেশম ছড়িয়ে আছে চারপাশে। আমি ঠিক পৃথিবীর মাঝখানটায়, কেন্দ্রে. আমার ঠিক ওপরেই পূর্ণিমাচাদ, এত নিচু যে হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যাবে।

নীল এক আকাশ, যেন ধোবার পর অমলিন।

পূর্ণিমাচাদ আর তারারা।

তারারা....দপদপ করে জ্বলছে, উজ্জ্বল, দীপ্তিময়। লক্ষ তারা...লক্ষ কোটি তারা ...অগুণতি তারা।

স্তব্ধ এক বিশ্ব...কিন্তু...তবু...কিছু একটা যেন আছে...কিছু একটা কোনো ঐশ্বরিক নীরব সংগীত— সংরাগের এক অফুরান সুর। আর সবকিছু যেন তারই মধ্যে ডুবে আছে। বিস্ময়ে আমি থমকে গিয়েছিলুম, বিস্ময়ে আর উল্লাসে। আমার সেই বিস্ময় আর সেই উল্লাস চোখের জলে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। আমি কেঁদে উঠেছিলুম। অসহায়ভাবে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটেছিলুম আমি।

'জগতের মধ্যেকার আরো-যতসব জগতের যে তুমি স্রষ্টা। আমাকে বাঁচাও। আমি নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারছি না একে। তোমার এই বিপুল মহিমা...এই নিখিল আশ্চর্য...তাকে আমি ধরে রাখবো কী করে, যে আমি নেহাৎই এক ছোট্ট সজীব প্রাণী। আমি দুর্বল, শক্তিহীন, আমাকে বাঁচাও।'

আমার পরিবেশ সম্বন্ধে আমি সচকিত হয়ে উঠলুম শুধু তখুনি, যখন ওয়ার্ডার এসে হাজির হয়ে পরদিন সকালে তালাটা খুলে সে যখন দরজাটায় নাড়া দিলে কয়েকবার।

'প্রণাম বিশ্বচরাচর!' আমি উঠে পড়লুম, পোড়া বিড়িটা জ্বালিয়ে নিয়ে দারুণ কেতায় প্রাতঃকালীন ক্রিয়াকর্ম সারতে বেরিয়ে গেলুম।

আমি দাঁত মাজলুম নিজের হাত দিয়ে। কলের তলায় দাঁড়িয়ে সারলুম স্নান, গায়ে চড়ালুম জেলের উর্দি, যে বাসনগুলোয় করে ওরা খাবার দিয়েছিলো সেগুলো মাজলুম, নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়লুম। এদের সবাই নেতা। যতক্ষণে সকলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলো, ততক্ষণে এসে হাজির মস্ত এক ফ্যানভাত অর্থাৎ কাঞ্জির হাঁড়ি। প্রচুর চাটনি সহযোগে সেই গলানো কাঞ্জি পান করা হলো। আসলে আমি যা খেয়েছিলুম তা হলো কাঞ্জো। এই কাঞ্জো প্রস্তুতপ্রণালীটা ব্যাখ্যা করা যাক: প্রথমে কাঞ্জির জলটুকু ঢকঢক করে গিলে নিতে হয়। তারপর যত প্রাণ চায় চাটনি দিয়ে সাঁটতে হয় বাকি ভাতটুকু। তারপরে কিন্তু আপনাকে হাতমুখ ও বাসনকোসন খুব ভালো করে ধুতে হবে। তারপরে কয়েকঢোঁক জল। আহা, জীবন ধন্য! এই পরম পরিতৃপ্তি উপার্জন করে নেবার পর, একটা দেশলাইয়ের কাঠি দু-ফালি করে নিয়ে আমি একটা বিড়ি ধরালুম। কয়েক টান দিয়ে বিড়িটা নিভিয়ে দিয়ে, আমি বেরোলুম জগৎদর্শনে; তার মানে, পুরো জেলখানাটা ঘুরে দেখতে। আমার চাই কিছু চা-পাতা ও চিনি। জেলের মধ্যেও আমার কিন্তু চা চাই। কালো চা-ও সই — তাতেও চলবে। নেতাদের কারু কাছেই না-আছে চা পাতা, না-বা-চিনি। একজন মহান নেতা এক বোতল ইনো'স ফ্রুটসল্ট লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেটা নইলে তাঁর প্রাতঃকৃত্যই সম্ভব হয় না। আরেকজন নামজাদা নেতার গোপন রহস্য হলো তাঁর কাছে কার্ল মার্ক্স-এর 'ক্যাপিটাল'-এর একটা খণ্ড ছিলো। আরেকজন নেতার কাছে ছিলো দু-প্যাকেট তাস। আমাকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি আমাকে ব্রিজ নামক চমকপ্রদ খেলাটি শিখিয়ে দেবেন।

আমি নেতৃসংসর্গ থেকে নিজেকে মুক্তি দিলুম।

একমাস পরে আমি প্রায় নবাবজাদার কেতায় 'ডিলুক্স' জীবন যাপন করতে শুরু করে দিলুম।

আমার খাঁচাটার সামনেই আছে দুটো ইট। কাছেই পড়ে আছে শুকনো কাঁঠাল গাছের ডালপালার একটা বাণ্ডিল। তার পাশেই আছে একটা বাটি। এ সবই চা বানাবার সরঞ্জাম। চা পাতা আর চিনি আছে দুটো মোড়কে, বিছানার তলায় ছোট্ট ছোট্ট বালিশের মতো। তারপরে আছে 'চাক্কির' একটি 'শোভন' সংস্করণ। যত বিড়ি। লেখার কাগজ। পেনসিল। একটা লম্বা ছুরি। অতীব মহানুভবতার সঙ্গেই এই ছুরিটা দিয়েছিলেন জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট....তিনি শুনেছিলেন যে আমি নাকি মালির কাজে ওস্তাদ, কলম বানাতে, চারা রুইতে পারি। তিনি আমাকে বলেছিলেন কাজ শেষ হয়ে যাবার পরেই যেন তৎক্ষণাৎ ওয়ার্ডারের হাতে সেটা সমর্পণ করি। আমি তা ভুলে গিয়েছিলুম। আমার হাজতের সামনেই চৌকো একটা বর্গক্ষেত্র সাফ করে নিয়েছি আমি। চারধারে আছে গোলাপঝাড়, ফুল ফুটে আছে, চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে তাদের মিষ্টি গন্ধ। আর খাবার সময় আমি পাই মাছভাজা, ডিম, মেটে আর একটা বিশেষ চাটনি। এই সচ্ছলতার শুরু হয় সেই মহাশয়ের আগমনে, যিনি সকালে আমার কাঞ্জি নিয়ে আসেন। তিনি হচ্ছেন খোদ একজন 'লালটুপি'। তার মানে হলো তিনি কোনো মানবকে হত্যা করেছেন। তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়নি। সাজা হয়েছে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। বেশ ফরসা নাদুস-নুদুস মানুষটি, গোলগাল মুখ, চোখে হাসি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি একটু ব্যায়াম করে নিই। আমার গোলাপবাগের সামনে একটা ঢ্যাঙা ছিমছাম

কাঁঠাল গাছ। তার সবচেয়ে নিচের ডালটা হবে আকারে আমার উরুর মতো। সেটাকেই বার হিশেবে ব্যবহার করে আমি কতগুলো কসরৎ করে নিই। যতক্ষণে ব্যায়াম-ট্যায়াম সেরে স্নান করে নিই, তখন তিনি (হাসি-চোখের সেই লালটুপি) উদিত হবেন দুটি ঢাকা-বাটিতে করে আমার 'কাঞ্জো' আর চাটনি নিয়ে। 'কাঞ্জি' বলে কোনো পদার্থই নেই। এ হলো ভাত। কিন্তু সত্যি কি ভাত ? ভাতের সঙ্গে একটু 'কাঞ্জির জল'। যখন তিনি প্রথমবার আমার জন্যে 'কাঞ্জি' ঢেলে দিয়েছিলেন, তিনি ফিসফিস করে আমার কানে কানে বলেছিলেন: 'হাসপাতালের চাপরাশির সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। সে আপনাকে চা দেবে।'

সেখানেই গেলুম। দেখতেও পেলুম তাকে। কালো, একহারা চেহারা, বাহারে একখানা গোঁফ আছে, সুন্দর ঝকঝকে সাদা দাঁত, মুখে ভারি সুন্দর হাসি। আমারই এক পুরোনো ইয়ার। তার গাঁয়েও থেকেছি আমি। একটা ডাকাতির মামলায় সে ফেঁসে গিয়েছিলো, ডাকাতি আর খুনজখম। তাছাড়া, দুজন খুনও হয়েছিলো। সেও একজন 'লালটুপি'। যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। সদ্ব্যবহারের দরুণ — তার ওপর শিক্ষিত — সে হাসপাতালের চাপরাশি হয়েছে। চা, চিনি, মেটে, রুটি, দুধ, বিড়ি ইত্যাদি-ইত্যাদি পেতে এর পর আমার আর কোনো মুশকিলই হলো না। ভাবতে গেলে আমার গোলাপবাগটাই তো সরাসরি অন্য জায়গা থেকে এনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে; শেকড়, মাটি, সার সবসমেত হাসপাতালের পেছনের জমি থেকে এনে তৈরি-অবস্থায় বসানো। নেতারা যখন আমার বাগান দেখলেন, তখন তাঁরাও বায়না ধরলেন, তাঁদেরও অমন বাগান চাই। আমি তাঁদের প্রত্যেকের জন্য খুদে-খুদে বাগান তৈরি করে দিয়েছিলুম। নেতারা সবাই বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ওয়ার্ডারদের মারফৎ। চিঠি যায়, চিঠি আসে। এই সবেরই জন্যে চাই পয়সা। রাতের বেলায় দেয়ালের ওপর দিয়ে পাচার হয়ে আসে ছোটো বড়ো ঠোঙা, ধপ করে মাটিতে পড়ে ভেতরে। কলাভাজা, কলার মেঠাই, লেবুর আচার ইত্যাদি। মাঝে-মাঝে ওসব ঠোঙা কুড়োবার সময় আমিও দলে ভিড়ে যাই। একবার এক নেতা আমায় খানিকটা লেবুর আচার উপহার দিয়েছিলেন। আহা, কী স্বাদ, কী তার — কী দুর্লভ ভোগ! আর আমার হাতে সেটা তুলে দেবার সময় তাঁর মুখের সেই ভাব! আমার মনে হয়েছিলো আমি যদি এ বিষয়ে কোনো মহাকাব্যও রচনা করে বসি, তবু এই ঋণ কখনো শোধ হবে না।

আমি তাই এইভাবে আমার সহবন্দী আর আমার গুণমুগ্ধ সেই লালটুপিদের সঙ্গে দিব্যি শান্তি আর সম্প্রীতির সঙ্গেই দিন কাটাচ্ছিলুম। কোনো অভাবই নেই আমার, কিছুর না। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাই জেনানা ফটকের দিকে। সেই বিশাল শয়তানের হাতে গড়া দেয়াল! আমার মনে পড়ে যায় যে খিলখিল হাসির সুর আমি শুনেছিলুম, সে গন্ধ টেনে নিয়েছিলুম বুক ভরে। বাগানের কাছের কাঁঠাল গাছটায় আমি উঠে পড়ি। সে শুধু তখনই, যখন নেতারা সাঙ্গ করেছেন মধ্যাহ্নভোজ এবং দিবানিদ্রা লাগাচ্ছেন। আমি সোজা গাছের মগডালটায় উঠে দাঁড়ায়। দেয়ালের ওপাশে খোলামেলা জগৎ, স্বাধীন। দূরে হয়তো নারী-পুরুষ হাঁটছে হাত ধরাধরি করে আমার অস্তিত্বের কথাই তারা জানে না।

ওহে ইয়ারবন্ধুরা, একবার তাকাও না এদিক পানে। .... আমি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি। ... এই দিকে একবার ফিরে দেখুন না, কৃপা করে।

কিছুক্ষণ পর আমি গাছটা থেকে নেমে আসি। জেলখানার দেয়ালঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে সব পুরুষই নিশ্চয়ই একই কথা বলবে। জেলের সব পুরুষই নিশ্চয়ই আমি যা ভাবি, সে কথাই ভাবে। আমাদের যত নিঃসঙ্গ রাত

আমাদের নিঃসঙ্গতার মতো আমাদের যত ভাবনা....এটা একদিক থেকে ভালোই যে আপনি আমাদের মনের অতটা গভীরে কখনো চলে যান না। আমার এই গোলাপবাগে হঠাৎ-হঠাৎ আমি দাঁড়িয়ে পড়ি নিথর। চারপাশে ফুলগুলো গন্ধ ঝরাচ্ছে। এই তো সৌন্দর্য! এই তো মাধুর্য! অথচ তবু কী নেই। কী?

না। এসব ভাবনা মোটেই ভালো কথা না। আমি হেঁটে বেড়াই। কত দেয়াল। কত দরজা। সবখানেই কোনো না কোনো ওয়ার্ডার। ওয়ার্ডারদের চোখ এড়িয়ে জেলখানার মধ্যে কিছুই করার জো নেই। একটা আবার উঁচু মিনারও আছে, যেখান থেকে তারা নিচের সবকিছুই দেখতে পায়।

ঐ প্রহরীমিনারের চারপাশেই আমি ঘুরে বেড়াই। কী-একটা দেখে কিছুতেই আর হাসি চাপতে পারি না। চমৎকার দৃশ্য — শেকলে বাঁধা এক মস্ত হাতি। না....একটা লোক। কালো টুপি। ফর্সা লম্বা চওড়া এক যুবক। ঝকঝকে চোখ। মাথাটা শূন্যে সগর্বে, একটু পেছনে হেলে সে বেশ কষ্টে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার ঘাড় থেকে পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে দুটি শেকল, তার দু-পায়ে তারা জড়ানো। ঐ শেকলবেড়ির জন্যেই তাকে পেছনে বেঁকে যেতে হচ্ছে। এমন-কোনো কয়েদী, যে জেল থেকে পালাতে চেয়েছিলো! আমি তার কাছে গিয়েই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম...সে যে আমারই স্কুলের এক সহপাঠী!

দুজনে দুজনের দিকে তাকাতেই চোখোচোখি হয়ে গেলো। হেসে ফেললুম আমরা, কত কী বলাবলি করলুম। আবারও হেসে ফেললুম দুজনে! সে নাকি গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে।

আমি জিগেস করলুম: 'তুই কাউকে দিয়ে খবর পাঠাতে পারতিস না?'

'ধর, যদি লোকে জেনে যায় তোকে আমাকে চেনা আছে....তাতে তোর মানে ঘা লাগবে না?'

'চেনা আছে? বলিস কীরে হতভাগা। বলবি যে আমি তোর বন্ধু।'

আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমো খাই। যেন এই জেলের সব কয়েদীর গালেই আমি চুমো খেয়েছি। চুম্বনের খবরটি সারা জেলে রটে গেলো। পুরো জেলখানাই রোমাঞ্চিত।

এই শেকলবেড়ি-পরা মানুষটা, ঝকঝকে চোখের মানুষটা, এই জেলখানারই জ্যান্ত শহিদ।

সে জেলে ঢুকেছিলো চোর হিসেবে, মেয়াদ ছিলো দেড় বছর। বিড়ি, গুড় আর সুঁটকি মাছের দিব্যি একটা কারবার ফেঁদে বসেছিলো সে। ছ-মাস যাবার পর জেলখানায় একটা খুবই ছোট্ট ঘটনা ঘটে যায়। এক ওয়ার্ডার এক ফেরেব্বাজি বাধিয়ে বসে...যা কি না কোনো ওয়ার্ডারই আগে কখনো করেনি। কৃপা করে মনন দিয়ে শুনুন এটা। ধরুন, এই ওয়ার্ডারের আমরা নাম দিলুম 'ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডার'। এই ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডারের ফেরেব্বাজিটা আমার সহপাঠীর পছন্দ হয়নি। জেলের মধ্যে যত ব্যবসাই চলে সব ওয়ার্ডারই তার কিছু না কিছু বখরা পায়। জেলের কয়েদীদের অনেককেই জেলচত্বর থেকে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে রাস্তা সারাবার জন্যে খোয়া ভাঙবার কাজ দেয়া হয়েছিলো। সেইখানেই চলতো পাইকিরি ব্যবসা। আর এই ভাবে সহপাঠী হয়ে উঠেছিলো বড়ো ব্যবসাদার। নেংটির ভেতর দিয়ে অনেক জিনিশই ঢুকে যায় জেলের চৌহদ্দিতে। ফটক একবার তল্লাশি হয়। ধুতি খুলে নিজেকে খোলাখুলি দেখাতে হয়। আধমিনিট, ব্যাস, তুমি সাফ! টুপি, শার্ট, ধুতি আর গামছা — জেল কর্তৃপক্ষই দেয় সে সব। সে-সব ও তন্নতন্ন করে হাৎড়ে দেখা হয়। কিছুই পাওয়া যায় না। নেংটি, ইজের — এ সবের কাহন জেলে কেউ কখনো শোনেইনি। সম্ভবত তাকে মনুষ্যশরীরের অংশ হিসেবেই গণ্য করা হয়। অন্তত গল্প তো তাই বলে। কিন্তু সেটা এখানে জরুরি বিষয় নয়। আমি বলছিলুম ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডার আর তার ফেরেব্বাজির কথা। আমার

সহপাঠী দুটো চমৎকার বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় কষায় ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডারের মুখে — গাল, কান, সবশুদ্ধ ....খবরটা হুড়মুড় করে সারা জেলখানায় ছড়িয়ে পড়ে। শুধু পুরুষদের জেলেই তা নয়, জেনানা ফাটকেও। সকলেই পুলকিত, রোমাঞ্চিত ...আমার সহপাঠীকে খুঁটির গায়ে বেঁধে গুণে গুণে বারো ঘা চাবুক মারা হয়। তার ঘা তো শুকিয়ে গেলো। আবারও সে হাঁটতে চলতে শুরু করলে। স্বভাবতই সে চেয়েছিলো তাকে পাথর ভাঙতে বাইরে নিয়ে যাওয়া হোক। কিন্তু ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডার ছিলো তার বিপক্ষে।

'তুমি আমাকে চেনো না। তুমি জানো না যে আমি কোত্থেকে এসেছি। বেশ, তবে এই নাও!' এই মুখবন্ধ ক'রে আমার সহপাঠী ওয়ার্ডারের ঘাড়ে দুটো রদ্দা কষিয়ে দেয়। তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ হিসেবে, নাভির ওপর সোজা একটা বেদম ঘা।

তাতে অবশ্য কোনোই দোষ ছিল না। এমনকী জেলের বাইরেও ফেরেব্বাদ ওয়ার্ডারকে তার ফেরেব্বাজির জন্যে অনুরূপ পুরস্কার পেতে হয়েছে। তার কুকর্মের পরিসীমা তো এইই শুধু। কিন্তু তবু আমার সহপাঠীকে আবার বাঁধা হলো খুঁটির গায়ে, চাবুক মারা হলো চব্বিশবার। সে ঘাগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে সামলেছিলো। জ্ঞানও সে হারায়নি। তার মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হলো : ছ বছর।

জেলের মধ্যে ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডার হয়ে গেলো একঘরে। কয়েদীদের কাছে সে হলো দাগি লোক। তাদের সবার চেখে সে দেখতে পেলে জিঘাংসা। ওয়ার্ডার ইস্তফা দিলে কাজে, ইনিয়ে-বিনিয়ে বললে যে তার নিজের কিছু জরুরি কাজ আছে, তাতে মন দিতে হবে।

কতই তো শোনা যায় যে একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। জেলখানায় অন্তত কয়েদীরা সবাই ঐক্যবদ্ধ। যদিও তাকে বাইরে পাথরকুচি ভাঙতে নিয়ে যাওয়া হয় না তবু জেলের মধ্যকার সব কাজকারবারই চালাতো আমার সহপাঠী।

তো, এই ভাবেই আমি বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিলুম। খাঁচার মধ্যেই সব দরকারি জিনিস পাই। বেশিরভাগ লোকেই তা জানতো। মাঝে-মাঝে অ্যাসিসট্যান্ট জেলার আসতো আমার হাজতে। সুন্দর দেখতে, হাসিখুশি এক তরুণ, পরনে খাকি শার্ট প্যান্ট আর শোলার টুপি। কয়েদীরা তাকে বলতো জেলার-ভাই। সে কিন্তু হাজতের দশা দেখবার জন্য আমার ঘরে আসতো না। আসতো আড্ডা দিতে। তার একটা ছোট্ট অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিলো। তার নাম জোকার। আমরা তার ট্রেনিং, ব্যায়াম, পথ্য এ সব নিয়ে আলোচনা করতুম। আমি তাকে বলতুম নানাবিধ সারমেয়-কাহিনি। জেলার-ভাই সে সব খুব মন দিয়ে শুনতো। তার জন্যে কালো চা বানাতুম আমি। বেশির ভাগ লোকেই জানতো আমার কাছে চিনি আর চা-পাতা আছে। মাঝে-মাঝে কোনো ফাঁসির আসামী ভোর পাঁচটায় ফাঁসিতে যাবার আগে রাত্তিরে তো চা চাইতে পারে। ওয়ার্ডার আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলে দিতো। আমি উঠে কালো-চা বানিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দিতুম। তাতে জানিয়ে দিতুম সাহসী হতে। বলতুম যে মাত্র দু ভাবেই মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া যায়। কান্নাকাটি করতে করতে অথবা হাসিমুখে। কাঁদো-হাসো, যা-ই করো না কেন, মরণ কে ঠেকায়। সেইজন্যেই বরং হাসিমুখে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াই ভালো।

সে সব রাতে আমি জেগেই থাকতুম। ঘুমুতে যেতুম, সে ভোর পাঁচটার পর। ঢুলতে শুরু করেছি, অমনি কোনো রাজনৈতিক নেতা এসে আমাকে জাগিয়ে দিতো। আমাকে উত্যক্ত করার উদ্দেশ্য থেকে নয়। তারা কী করে জানবে যে মৃত্যুর ওপর প্রহরায় আমি জাগরীতে কাটিয়েছি রাত।

হাসিঠাট্টা তর্কবিতর্কও হতো সেখান। যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা ছোট্ট শহর। তর্কাতর্কি, শোরগোল, হাসি, হৈ হৈ ব্যাপার। মাঝে মাঝে জেলার-ভাইয়ের সঙ্গে আসতেন জেলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট। তাঁরা কথা বলতেন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে। আমার বাগানে আসতেন। আমার পছন্দ গাছপালা ঝোপঝাড়। প্রতিটি গাছ। প্রতিটি ঝোপ আমি ভালোবাসি। আমি যে কী বলি, তা শুধু যে গাছপালা ঝোপঝাড়ই বুঝতে পারে, এও আমি অনুভব করেছি সময়-সময়। জেল সুপারিনটেণ্ডেন্ট-এরও সেই একই অনুভূতি হতো। আমরা কথা বলতুম গাছপালা উদ্ভিদ লতা এইসব বিষয়ে। কেমন করে তদারক করতে হয় তাদের, কী সার দিতে হয়। এইসব আলোচনা করতে করতে আমরা পায়চারি করতুম। তাঁর কোয়ার্টারে সুপারিনটেণ্ডেন্ট ছ-টা মস্ত টবে গোলাপগাছ ফলিয়েছেন। আমিই তাঁকে সেগুলো উপহার দিয়েছিলুম। লালটুপিদের মধ্যেও কেউ কেউ সুপারিনটেণ্ডেন্ট এর সঙ্গে আমার এই মাখামাখি ভালো চোখে দ্যাখনি। ওঁর অনুগ্রহ ছাড়াই কি কেউ এখানে ভালোভাবে বাঁচতে পারে না? তবে কেন কেউ ওঁর সঙ্গে হেসে কথা বলবে, ভাব করবে? উনিই কি সংখ্যা বাড়িয়ে খুঁটিতে বেঁধে দু-ডজন চাবুক কষাতে বলেননি? জেলার ভাই ওঁর চেয়ে ঢের ঢের ভালো লোক!

দেখলেন তো, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়? কোনো না কোনো দলে যোগ না দিয়ে কোনো উপায় নেই। নিরপেক্ষ থাকা, মানুষের মতো সব্বাইকে ভালোবাসা, আদৌ সম্ভব নয়।

আমি সাধারণত বেশির ভাগ সময়টাই কাটাই আমার খাঁচার মধ্যে। কিংবা হয়তো কোথাও দাঁড়িয়ে আমার গাছপালা ঝোপঝাড়ের সঙ্গে গল্প করি। জেলার-ভাই এসে আমায় একদিন বললে যে রাজনৈতিক বন্দীদের নাকি ছেড়ে দেয়া হবে!

সব্বাই খুব খুশি। হাসি, শোরগোল, শিসের শব্দ। জেলার-ভাই সকলের কাপড়চোপড় এনে দিলে। কাপড়চোপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করা হলো, আলাদা-আলাদা, মোড়কে বেঁধে ফেলা হলো। সকলের চুল ছাঁটা হলো, দাড়ি কামানো হলো নিখুঁত মসৃণ। সকলের সঙ্গে আমিও চুল ছাঁটলুম, অর্থাৎ যে ক-গাছা চুল ছিলো, তাও।

সবাই যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছি।

আমি আমার জেলের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। বললুম যে আমি তাদের কাছে চিঠি লিখবো। সকলকে কথা দিলুম যে আমার বইগুলোও পাঠিয়ে দেবো।

যাবার জন্যে, তাই, আমরা অপেক্ষা করছিলুম।

মুক্তিনামাগুলো এলো।

আমাদের ছেড়ে দেয়া হবে!

সব্বাইকে, শুধু একজন বাদে...এই দীন লেখকটির মুক্তির কোনো হুকুমনামা আসেনি। নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে কোথাও! জেলার-ভাই ছুটে গেলো জেল সুপারিনটেণ্ডেন্ট-এর কাছে। তাঁকে দিয়ে আমার জন্যই বিশেষভাবে টেলিফোন করানো হলো। না, কোনোই ভুল হয়নি। আমাকে ছাড়া হবে না। বেশ। হয়তো আমি যথোচিত দেশপ্রেমের বাই থেকে সেরে উঠিনি।

রাজনৈতিক নেতারা বিদায় নিলেন। ইনো'স ফ্রুটসল্ট, কার্লমার্ক্স-এর 'ক্যাপিটাল', দু'প্যাকেট তাস, একটা ছোট্ট শিশিভর্তি লেবুর আচার, কলাভাজার একটা মস্ত কৌটো, এক ঠোঙা কলার পিঠে, কাঁচা তামাকের গুঁড়ো, পান, সুপুরি, লেবু— এই সবকিছুরই একমাত্র অবশিষ্ট উত্তরাধিকারী হয়ে উঠলুম আমি।

রাজনৈতিক নেতারা হাসিমুখে বিদায় নিলেন। সব কেমন চুপচাপ হয়ে গেলো। যেন সেই পরিত্যক্ত শহরটায় আমিই আছি, একা, একমাত্র। সব ভেড়াকে যখন চলাতে নিয়ে যাওয়া হয়,, সবচেয়ে নাদুসনুদুসটাকে আটকে রাখা হয়, দড়িতে বেঁধে। কেন? নিশ্চয়ই কশাইয়ের ছুরির জন্য। অনিবার্য সর্বনাশের একটা পূর্ববোধ হলো আমার। আমি হাসতে পারি না। প্রাণে কোনো সুখ নেই। কেমন নিঃসাড় আর মনমরা লাগে সারাক্ষণ। আলো, আঁধার — কিছুই যেন আমার মনকে আর ছোঁয় না। জেলার-ভাইকে আমি কার্ল মার্ক্স-এর 'ক্যাপিটাল' গছিয়ে দিলুম। ব্যবস্থা করলুম কলার পিঠেগুলো যাতে হাসপাতালে ইয়ারবন্ধুদের মধ্যে বিলি করে দেয়া হয়। ঐ তাসের প্যাকেট দুটো বিশেষভাবে উপহার দিলুম আমার সহপাঠীটিকে। আমার যে চেলাটি 'কাঞ্জি' এনে দেয়, তাকে দিয়ে দিলুম পান-সুপুরি। সকলকে বিলিয়ে দিলুম কলাভাজা। তবুও আধকৌটো কলাভাজা রয়ে গেলো লেবুর আচারের শিশি আর ইনো'স ফ্রুট সল্ট -এর সঙ্গে আমারই কাছে, হাজতে। দু'দিন পরে ইনো'স ফ্রুট সল্টের শিশিটা জেলখানায় দেয়ালের ওপারে ছুঁড়ে ফেললুম। আমি বেঁচেই রইলুম।

তবে, বলেছিই তো, হৃদয়টা যেন মরেই গিয়েছে বলে মনে হচ্ছিলো। কী হতে যাচ্ছে, আমার? অন্যদের আমরা দিব্যি পরামর্শ দিতে পারি। বলতে পারি : কোনোকিছুর মুখোমুখি হতে সাহস হারিও না। হাসি আর কান্না দুই-ই আছে যখন, অতএব সহাস্যেই মুখোমুখি হওয়া ভালো বাস্তবের।

হায় খোদা, আমি যে হাসতেও পারছি না। অতীব ক্ষুদ্র, তুচ্ছ নগণ্য এক মানুষ আমি। অতি বেচারি ছোট্ট প্রাণী। আমাকে বাঁচাও। কী করি আমি এখন?

পালাবো। আমি পালাবো বলেই ঠিক করলুম। বাইরের জগৎ আর আমার মধ্যে আছে শুধু দুটি দেয়াল। একটার তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে অন্যটা বেয়ে উঠে পালাতে হবে আমায়। রাত্তিরে তো ওয়ার্ডার ঘুমোবে।

আসুক না এক দুর্যোগের রাত, ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত।

আমার পালাবার পরিকল্পনাটা ছিলো এইরকম : আমার হাজত ঘরের দেয়াল খুব পুরু নয়। তার তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার সাজ-সরঞ্জাম আমার আছে। এইভাবে আমি হাজত থেকে বেরিয়ে যাবো। তারপর থাকবে শুধু জেলখানার উঁচু দেয়ালটা। সেটা ইটে গাঁথা। ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে আছে চুনসুরকির পলেস্তারা। চাই শুধু দশ-বারোটা বড়ো বড়ো গজাল। গ্র্যানাইট পাথরের টুকরো কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে বাড়ি মেরে গজালগুলো গুঁজতে হবে দেয়ালে। আর এই ভাবেই গিয়ে পৌঁছুবো দেয়ালের ওপরটায়। তারপরে আমার কম্বল, সুজনি, গামছা আর ধুতি পাকিয়ে-পাকিয়ে একটা দড়ি বানাবো, গজালের গায়ে শক্ত করে বাঁধবো সে দড়ি, তারপর বেয়ে বেয়ে নেমে যাবে, নিচে— স্বাধীনতায়। পরিকল্পনাটা নিরেট। শুধু চাই গজাল। জেলখানার এক কোণায় পায়খানার ব্যবহার করার জন্য অগুণতি বালতি আর মগ পড়ে আছে—জং-ধরা, মরচে-পড়া। বালতির গোল হাতলগুলো পড়ে আছে স্তূপাকার, সবগুলোরই দশা বেশ ভালো। সেগুলো সব আমি কুড়িয়ে আনলুম, তারপর সোজা করে নিলুম। এগুলোই আমার গজাল। সবশুদ্ধু গোটা তিরিশ হবে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম।

আসুক ঐ দুর্যোগের রাত। ঐ ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত।

এলো একটা দিন।

কয়েকজন লালটুপি ইয়ারবক্সি আর চেলা এসে হাজির এক ওয়ার্ডরকে সঙ্গে নিয়ে। জেনানা ফটকের দেয়ালের পাশে তারা একটা সবজি বাগান করতে চায়। আমি কি যাবো?

না। আমার আরো কোনো কিছুতে কোনো আগ্রহ নেই। জীবন থেকে সব তাপ-উত্তাপ সব আলো উধাও হয়ে গেছে। তোমরা তোমাদের পথ দ্যাখো। আর তাছাড়া, কেই বা চায় শাকসবজি? আমি শুধু অপেক্ষা করে আছি ঝড়বৃষ্টির এক তুমুল দুর্যোগের রাতের জন্য। আমাকে বিরক্ত কোরো না।

কিন্তু তারা নাছোড়। কেন তুমি পীর-ফকিরের মতো দূরে দূরে থাকবে, উদাসীন?

গেলুম। সাহায্য করলুম তাদের। বাগান বসানো হলো। এক বন্ধু হঠাৎ আমাকে একটা জিনিশ দেখাল। লালচে রঙের দেয়ালটার তলা পাঁপড়ের মতো দেখতে চুনশুরকির এক গোল পলেস্তারা, তাপ্পি।

অতীতে কখনো এটা বেশ একটা সম্ভ্রম-জাগানো গর্তই ছিলো। বহু, বহু প্রেমিকহাতের কঠিন পরিশ্রমেরই ফল ছিলো এটা — অগুণতি ঘণ্টাপ্রহর দিন-মাসের খাটুনির ফল।

আরে ব্বাস। আর সেইভাবেই এটা থেকে গিয়েছে। কত যে দিন, মাস, বৎসর — সে দাঁড়িয়ে আছে এইমতো। জেলখানার মধ্যেই কিনা থেকে গিয়েছে ভদ্র, বাধ্য, বশম্বদ।

এই গর্ত দিয়ে জেনানা ফাটক আর মরদ হাজত পরস্পরের মুখ-দেখাদেখি ইত্যাদি করতে পারে....

এরই মধ্য দিয়ে স্ত্রীলোকের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে পুরুষদের জেলখানায়। আর পুরুষদের গন্ধ গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে জেনানা ফাটকে।

এটা খুব একটা দারুণ-সুরক্ষিত কোনো গোপন কথাও নয়। কেউ দ্যাখেনি, কেউ শোনেও নি। অতএব ব্যাপারটা নজর এড়িয়ে গেছে। এই জায়গাতেই একটু উঁচু মঞ্চ বানিয়ে নৈতিকতা আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতাও দিতে পারে কেউ।

কিন্তু, অহো, সব সদ্গুণভূষিত মহান আত্মা। আমরা মানুষ। অনেক দুর্বলতা আছে আমাদের। আমাদের প্রতি একটু দয়া দেখান। কিঞ্চিৎ ঐশ্বরিক ক্ষমার চক্ষে আমাদের দেখুন।

তারা ক্ষমার চক্ষেই দেখলে এটাকে। সব্বাই।

কিন্তু ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডার সেখানে তার ব্যবসার একটা সুবর্ণ সুযোগ দেখতে পেলে। গর্তের মধ্য দিয়ে একেকবার তাকাবার জন্য সে ছোট্ট একটা মাশুল ধরে দিলে। জন প্রতি এক আনা (ছ-পয়সা)।

এখানে তো ধনী-গরিব— দুইই আছে। গরিবরা তাহলে করবে কী?

আমার সহপাঠী বললে: 'এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না ওয়ার্ডার।'

—'তাহলে আমি গর্তের মুখটা বুজিয়ে দেবো।'

ফেরেব্বাজ ওয়ার্ডার ভয় দেখালে। শুধু তাই নয়, সে কিনা সত্যি-সত্যি সিমেন্ট দিয়ে গর্তের মুখটা বুজিয়ে দিলে। স্ত্রী-পুরুষের রক্ত দিয়ে ও সিমেন্ট মাখা হয়নি। কিন্তু তবু আমি ঝুঁকে ঐ সিমেন্টের গন্ধ শুঁকলুম। স্ত্রীলোকের গন্ধ ছড়াচ্ছে কি ওখান থেকে?

এইভাবেই আমার সহপাঠী পেলে সাড়ে চার বছর উপরি-মেয়াদ আর ছত্রিশ ঘা চাবুক। আমরা সোৎসাহে তৈরি করলুম সবজিবাগান, কিন্তু আমার দিকে জেলখানাটা ফাঁকাই থাকে। শুধু আমি আর এক ঢুলুঢুলু ওয়ার্ডার।

সকালবেলায় তিনজন আসে সবজিবাগানে জল দিতে। সঙ্গে থাকে এক বিশেষ পাহারা। আমি শুধু হেঁটে বেড়াই। যেন আমি কোনো বিশাল শহরের ধ্বংসস্তূপে ফাঁকা রাস্তাগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটছি। কোনো রং নেই কোথাও। সর্বত্র স্তব্ধতা। হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ-হঠাৎ আমি নেমে পড়ি। স্তব্ধতা কি আরো ঘন হয়ে জমাট বাঁধবে,

আরো ভারি হয়ে যাবে? আমি শিস দিয়ে উঠি। আমি গাছপালা লতা-পাতার সঙ্গে কথা বলি। বেশ-কিছু কাঠবেড়ালি আছে সেখানে। একটাকে পাকড়াতে হবে বলে ঠিক করলুম। তাড়া করে যাই কোনোটাকে, গাছ বেয়ে সে উঠে যায়। আমি তখন তাকে নামাবার জন্য ঢিল ছুঁড়তে থাকি।

আর এইভাবেই একদিন যখন শিস দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি জেনানা ফটকের দেয়ালের কাছে — বেহেস্তের সুর হঠাৎ। পৃথিবীর সবচেয়ে সুরেলা গলাটি ! দেয়ালের ওপাশ থেকে প্রশ্ন এলো: 'কে শিস দিচ্ছে ওখানে?'

পুরুষদের জেলখানা থেকে নয়। আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত। আমি ডানদিকে তাকালুম। বামদিকে তাকালুম, তারপর বললুম : 'আমি'।

একটু জোরে কথা বলতে হয়। মেয়েটি যে দেয়ালের অন্য পাশে। আমি এর মধ্যে আছি।

মেয়েটি জিগেস করলে : 'তোমার নাম কী ?'

আমি তাকে বললুম যে আমি মুসলমান, যে আমার নাম বশীর, যে আমি একজন লেখক। আমার অপরাধের প্রকৃতিটাও আমি বর্ণনা করলুম, মেয়াদ কতদিন সেটাও বললুম। সেও তার পালা এলে তার সম্বন্ধে সব খুঁটিনাটি বললে।

সে হিন্দু আর ভারি সুন্দর নাম তার — নারায়ণী।

তার বয়স, সুবাঞ্ছিত বাইশ।

সে জানে পড়তে-লিখতে, একটু লেখাপড়া শিখেছিলো। চোদ্দ বৎসর মেয়াদ পেয়েছে সে। এখানে আছে এক বছর হলো।

আমি বললুম : 'নারায়ণী, দুজনেই আমরা একই সময়ে জেলে এসেছি।'

—'তাই বুঝি ?' কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর নারায়ণী জিগেস করলে: 'তুমি আমাকে একটা গোলাপচারা দেবে?'

আমি জিগেস করলুম : 'নারায়ণী, তুমি কেমন করে জানলে এখানে গোলাপ গাছ আছে?'

নারায়ণী বললে : 'বা, এটা বুঝি জেল নয়? সব্বাই জানে। এখানে কোনো গোপন কথা নেই— তুমি আমাকে দেবে গোলাপচারা?'

শুনলেন কী বলছে এ মেয়ে? কোনো গোপন কথা নেই! অথচ কী আমি জানি জেনানা ফটক সম্বন্ধে ? কী আমি জানি সেখানকার মেয়েদের সম্বন্ধে ?

নারায়ণী আবারও জিগেস করলে : 'তুমি আমাকে একটা গোলাপচারা দেবে না?'

'নারায়ণী!' এত জোরে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম যে হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি উপড়ে বেরিয়ে এলো : 'পৃথিবী নামে যে বাগানটা আছে, তাতে যতো গোলাপ গাছ গজায়, তার সব ক'টাই আমি নারায়ণীকে দিয়ে দেবো।'

নারায়ণী হেসে উঠলো খিলখিল। যেন টুংটাং বেজে উঠলো হাজারটা সোনার ঘণ্টা। আমার হৃৎপিণ্ডটা হাজার টুকরো হয়ে ছিটকে ছড়িয়ে পড়লো!

'একটাই যথেষ্ট। মাত্র একটা। পাবো তো?'

শুনলেন কথাটা? দেবো না একটা? এ-নারায়ণীকে নিয়ে আমি করবো কী? ওকে নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়, আচ্ছন্ন করে দিতে হয় চুমোয়-চুমোয়। তাছাড়া আর কী?

'নারায়ণী!' আমি চেঁচিয়ে উঠলুম : 'ওখানেই থাকো। আমি এক্ষুনি একটা নিয়ে আসছি। শুনতে পেয়েছো আমাকে ?'

নারায়ণী বললে : 'শুনেছি— তোমাকে।'

আমি ছুটলুম। কাঠবেড়ালিরা আমাকে দেখেই হুড়মুড় করে উঠে পড়লো গাছে।

আমি বললুম: 'ওরে হতচ্ছাড়ারা, গাছে গিয়ে উঠছিস কেন? নেমে আয়, এখানে খেলা কর।'

আমি ছুটে গেলুম গোলাপবাগিচায়। আশ্চর্য! ফুলগুলো রৌদ্রে স্নান করে চমৎকার ফুটে আছে নতুন পাওয়া হাসি সমেত।

সবচেয়ে বড়ো যে ঝাড়, সবচেয়ে সুন্দর যে ঝাড় সেটাকেই আমি তুলে নিলুম। এমনভাবে খুঁজে ওঠালুম যাতে শেকড়ের গায়ে মাটি থাকে, তারপর একটা চটের টুকরোয় মাটি আর শেকড় ভালো করে বাঁধলুম। বেঁধে দিলুম পাতা আর ডালগুলোও। ছুটে ফিরে এলুম দেয়ালের কাছে।

'নারায়ণী!' আমি হাঁক দিলুম। কেউ কোনো সাড়া দিলে না। তবে কি ও চলে গেছে?

'নারায়ণী!' আবারও হাঁক দিলুম আমি। অমনি আবার খিলখিল হাসি। তারপর : 'হ্যাঁ। বলো।'

আমি জিগেস করলুম : 'কোথায় ছিলে তুমি, যখন তোমায় ডাকলুম।'

'এখানেই ছিলুম।'

'তবে?'

'আমি না-বলা কথার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিলুম।'

'ওরে দুষ্টু মেয়ে!'

সে হেসে উঠলো, খিলখিল। সে জিগেস করলে : 'এনেছো? গোলাপগাছ?'

আমি চুপ করে রইলুম। কারণ আমি তখন চুমো খেতে ব্যস্ত। প্রত্যেকটা গোলাপ আর কুঁড়ি আর পাতাকে আমি চুমো খাচ্ছিলুম।

নারায়ণী আমার নাম ধরে ডাকল।

আমি চুপ।

শুধু চুমো খাচ্ছি। চুমো খাচ্ছি সব কটা ডাল, সব কাঁটাকে। নারায়ণী আবার আমাকে ডাক দিলে উৎকণ্ঠায়।

আমি সাড়া দিলুম।

তখন নারায়ণী একটু বিরক্ত সুরে বললে : 'অন্তত যদি তুমি এমন ভালোবেসে ভগবানকে ডাকতে!'

আমি বললুম : 'যদি আমি ভগবানকে ডাকতুম!'

তার গলার সুরে এবার অভিমান : 'আমি বলেছি, যদি ভগবানকে এমন ভালোবেসে ডাকতে !'

—'যদি আমি এমন ভালোবেসে ভগবানকে ডাকতুম?'

সে বললে : 'তাহলে ভগবানও আমার সামনে আবির্ভূত হতেন!'

আমি বললুম : 'আমি বুঝি তোমার কাছে দেখা দিইনি?'

—কেন তুমি সাড়া দাওনি, যখন তোমাকে ডাকলুম?'

—'আমি চুমু খেতে ব্যস্ত ছিলুম।'

—'কাকে ? দেয়ালকে ?'

—'না?'

—'কাকে তবে?'

—'সব ফুল, সব ডাল, সব পাতাকে।'

—'হায় ভগবান, আমার কান্না পাচ্ছে।'

—'নারায়ণী!'

—'বলো।'

—'তলার গেরোটা খুলো না কিন্তু। জমিতে একটা গর্ত খুঁড়ে ভগবানের নাম নিয়ে এটাকে রুয়ে দিয়ো। তারপর গর্তটা মাটি দিয়ে বুঁজিয়ে জল দিয়ো। বুঝলে?'

—'বুঝেছি।'

আমি বললুম : 'তাহলে এই সে এলো।'

দড়ি বাঁধা ডালপালা পাকড়ে, হাত ঘুরিয়ে সেটাকে আমি ছুঁড়ে দিলুম দেয়ালের ওপর দিয়ে।

— 'পেয়েছো?

—'ওঃ, ভগবান!' নারায়ণীর গলার সুরে এত খুশি যেন সে একটা আস্ত রাজ্য জয় করে ফেলেছে : 'পেয়েছি!'

—'যে গেরোটা দিয়ে ডালগুলো বাঁধা, সেটা কিন্তু খুলে দিতে হবে।'

—নিশ্চয়ই দেবো', সে বললে। 'ফুলগুলো তুলে আমি রেখে দেবো আমার কাছে।'

—'কোথায় রাখবে? খোঁপায় গুঁজবে বুঝি?'

—'না।'

—'তাহলে কোথায়?'

—আমার বুকে...ব্লাউজের ভেতর!'

ফুলগুলো সব আমার চুমুতে ভরা। আমি দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালুম। হাত বুলিয়ে আদর করলুম দেয়ালকে।

নারায়ণী বললে: 'রোসো, এটাকে রুয়ে জল দিয়ে নেই। তুমি কিন্তু সবসময় দেয়ালের ওপর তাকাবে। যখনই আসবো, তখনই আমি একটা শুকনো ডাল তুলে ধরবো। ডালটা দেখলে তুমি আসবে তো?'

আমি বললুম : 'আসবো।'

চাপা কান্নার একটা দমক যেন শুনতে পেলুম : 'ওঃ ভগবান!'

—'কী হলো, নারায়ণী?'

নারায়ণী বললে : 'আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে!'

আমি জিজ্ঞেস করলুম : 'কেন?'

নারায়ণী ধরা গলায় বললে : 'আমি — আমি জানি না।'

আমি বললুম : 'নারায়ণী, যাও, গাছটা রুয়ে এসো।'

—'আমি একটা শুকনো ডাল তুলে ধরবো।'

আমি বললুম : 'আমি তার জন্য চোখ খোলা রাখবো!'

—'আসবে তো, দেখবামাত্র?'

—ঠিক আসবো।'

আমার হাজতে ফিরে এলুম আমি। সব কী নোংরা, আর এলোমেলো। আমি তোষক ঝাড়লুম, অনেকদিন পর ঠিক করে পাতলুম বিছানা। আমার খাঁচাটার মধ্যেও শৃঙ্খলা আর পরিচ্ছন্নতা ফিরিয়ে আনলুম খানিকটা। তারপর বসে বসে তাকিয়ে রইলুম দেওয়ালের ওপরটায়, আকাশে। কই, কোনো শুকনো ডাল তো উঠে এলো না। আল্লাহ্, তবে কি নারায়ণী আমাকে ভুলে গেলো নাকি?

শুকনো ডাল তবে উঠে আসবে না আকাশে! তাই আমি ভেবেছিলুম— ওঃ, সে কী দৃশ্য!

একটা শুকনো ডাল আস্তে আস্তে মাথা তুললো আকাশে! আমি নিথর বসে আছি। আবার উঠে এলো ডাল। আমি নড়লুম না। আবারও উঠে এলো ডালটি। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে এলো যেন, আমি ছুটলুম ঊর্ধ্বশ্বাসে, লাফিয়ে এসে দাঁড়ালুম দেয়ালের কাছে। প্রাণের ভয়ে কত যে কাঠবেড়ালি হুড়োহুড়ি করে উঠে গেলো গাছে আর প্রতিবাদের সুরে কিচিরমিচির করে উঠলো!

আমি ডাক দিলুম : 'নারায়ণী।'

দেয়ালের ওপাশে সব চুপচাপ? আমি আবারও ডাক দিলুম। শেষটায় সে রাগীসুরে বললে : 'কী? কী চাও?'

—'ও।'

নারায়ণী বললো : 'যাও! চলে যাও। ডালটা ধরে থেকে-থেকে হাত দুটো কাঁধ থেকে খসেই পড়বে বুঝি!'

—'আমি ডলে ডলে আবার সাড় ফিরিয়ে আনবো তাদের।'

—এই যে একটা হাত। দাও, ডলে ডলে সাড় ফিরিয়ে দাও। আমি দেয়ালের গায়ে রেখেছি হাতটা।'

—'আমি দেয়ালটা ডলে দিচ্ছি। আমি তাকে চুমুও খাচ্ছি।'

—'আমি আমার বুক দিয়ে ছুঁয়ে রেখেছি দেয়াল। আমি চুমু খাচ্ছি ইটগুলোতে।' আমি জিগেস করলুম, 'নারায়ণী, ওখানে তোমরা কতজন মেয়ে আছো?'

নারায়ণী হেসে উঠলো। বললো : শুধু আমি।'

—'ওরে দুষ্টু মিথ্যেবাদী। বলো না, সত্যি করে। কতজন তোমরা?

—'অনেক। সব্বাই বুড়ি, থুরথুরি!'

—'কতজন?'

—'সাতাশি জন।'

—কতজন সুন্দরী আর যুবতী? কতজন বুড়ি?

নারায়ণী বললে : 'ছিয়াশিজন থুরথুরি — একজনাই রূপসী।'

আমি হার মানলুম। জিগেস করলুম : 'তোমাদের জেলে গোলাপগাছ নেই'

—'না।' নারায়ণী বললে : 'কিচ্ছু নেই এখানে...আমি....তুমি শুনছো তো?'

আমি বললুম : 'শুনেছি!'

—'কালকে...আমি কাল বাজরার গুঁড়ো ঝলশাবো। একটা ঠোঙায় পুরে দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দেবো তোমাকে। গুড় দিয়ে তোমাকে তা খেতে হবে কিন্তু। খাবে তো তুমি?'

—'খাবো।'

—'না!' নারায়ণী সব ঠিক জানে : 'তুমি নিশ্চয়ই তা ছুঁড়ে ফেলে দেবে।'

—'দেবো বুঝি ?' আমি বললুম : 'আমি একটা কণাও নষ্ট করবো না।'

নারায়ণী বললে : 'কেমন দেখতে তোমার মুখ?'

—'ফরসা, একটু লম্বাটে, কদমছাঁট মাথায়, টাক পড়ে যাচ্ছে।'

—'চোখ দুটো?'

আমি বললুম : 'খুদে-খুদে হাতির চোখের মতো।'

নারায়ণী বললে : 'আমারগুলো — আমারগুলো আয়ত-সব হাতির চোখের মতো। আর তোমার বুক ?'

—'চওড়া, সমতল।'

—'আমার স্তনগুলোও চওড়া। আর তোমার কোমর?'

—'আমার কোমর সরু।'

—'তুমি জানো আমার কোমর দেখতে কেমন.... না, তুমি বুঝতেই পারবে না।'

আমি বললুম : 'একটা পিপের মত চওড়া—'

নারায়ণী একটা আধচাপা চীৎকার করে উঠলো। বললে ঃ তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে?'

—'নারায়ণী?'

—'উঁ?'

—'রং কি তোমার?'

—'কোথাকার?'

—'তোমার সুন্দর মুখের রং।'

—'ফরশা ধবধবে।'

আমি ডেকে উঠলুম : 'নারায়ণী!'

—'উঁ?'

—'মেয়েদের গন্ধ !...আমি সে গন্ধ পেয়েছি।'

—'এখন! ওঃ, ভগবান!'

আমি বললুম : 'এখন না। সেই প্রথম যখন জেলে ঢুকলুম আর এদিকে এলুম।'

—'কোত্থেকে এলো ঐ গন্ধ ? সে কি আমার ?'

—'জানি না তো।'

—'আর পুরুষের গায়ের গন্ধ...তোমার গায়ের গন্ধ কেমন?'

আমি বললুম : 'জানি না তো। নারায়ণী....তোমার গায়ের গন্ধ।'

আমি নাকের বাঁশি ফুলিয়ে জোরে-জোরে শ্বাস নিলুম।

—'পেয়েছো? গন্ধ?'

আমি বললুম : 'না।'

নারায়ণী বললে : 'আমিও যে পাচ্ছি না।' এই বিকট দেয়ালটা!'

আমি বললুম : 'নারায়ণী! দেয়ালটার গায়ে একসময়ে একটা গর্ত ছিলো। তুমি সেটা দেখেছো?'

নারায়ণী বললে : 'সিমেন্ট দিয়ে কোথায় সেটা বুঁজিয়ে দেয়া হয়েছে দেখেছি, সেটাকে আমি ছুঁয়ে দেখেছি। আমি এখানে আসার আগেই ওটা বুঁজিয়ে দেয়।'

আমি বললুম : 'আমি সেখানটা শুঁকে দেখেছি।'

নারায়ণী বললে : 'যে ওয়ার্ডার ওটা বুজিয়ে দেয়, তাকে নাকি কোন কয়েদী মেরেছিলো। তাকে নাকি খুঁটিতে বেঁধে চাবকানো হয়। প্রতিটি চাবুকের ঘা সব মেয়েরা এখানে এক-এক করে ব্যথা পেতে পেতে গুণেছে।'

—'খুঁটিতে বেঁধে ওকে ছত্রিশ ঘা চাবুক মারে। পুরুষ কয়েদীরাও ব্যথা পেতে পেতে সব ঘা গুনেছে।'

নারায়ণী বললে : 'কী করুণ!'

আমি বললুম : 'যাকে চাবকেছিলো, সে আমার সহপাঠী। আমরা একই জায়গা থেকে এসেছি।'

—'তাই বুঝি?'

—'সত্যি।'

আর এইভাবেই এলো ঠোঙাটা, শাদা একটা গোল ঠোঙা— ভেতরে বাজরার গুঁড়ো; এলো নুন-মেশানো লঙ্কার গুঁড়োর ঠোঙাও। বিনিময়ে গেলো লেবুর আচার। আর আস্ত এক কৌটো কলাভাজা।

নারায়ণী জিগেস করলে : 'কলাভাজা....আমি কি.... আমি কি সবাইকে একটা করে দিতে পারি!'

আমি বললুম : সব্বাইকে দাও।'

নারায়ণী জিগেশ করলে : 'তুমি কি...তুমি কি...ভালোবাসবে আমাকে...শুধু আমাকে?'

—'কেন তুমি সন্দেহ করছো, নারায়ণী?'

—'এখানে,' নারায়ণী বললেন, 'আরো সুন্দরী সব মেয়ে আছে। আমার তো রূপ নেই বিশেষ!'

আমি বললুম : আমিও রূপবান নই।'

সে বললে : আমি যে তোমাকে দেখতে চাই।'

আমি বললুম : 'আমিও তোমাকে দেখতে চাই চোখে।'

সে বললে : 'ওঃ ভগবান...সারা রাত আমি কেঁদে ভাসাবো।'

বিষম একটা দুর্যোগের রাত এলো, ঝোড়ো হাওয়ার, বৃষ্টির, বজ্রপাতের। আমি বসে রইলুম গরাদদেয়া খাঁচায়, আলোয় চাওয়া। স্ফটিকের মুষলের মতো বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। জলের ফোঁটা পড়ছে রাশিরাশি ঢিলের মতো। খোদার দোয়া। পড়ুক বৃষ্টি। হে ঝড়ের হাওয়া, ঘূর্ণিতুফানের মতো বয়ে যাও। কিন্তু শিকড় উপড়ে আছড়ে ফেলো না কোনো গাছ। হে মেঘ, গর্জন করো, তবে আস্তে, নরম সুরে। তোমার কানে তালা-ধরানো আওয়াজ বেচারি মেয়েদের যে ভয় পাইয়ে দেবে। তাই নরম সুরে, নরম হও।

ফুটে উঠলো দিন। আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম। ধোয়া-মোছা এক পৃথিবী। তারপরেই আমি ভাললুম জেল

থেকে পালানো কোনো ভালো কাজ না। বেরিয়ে যাবার জন্য এত কষ্ট করে তারপর বেরিয়ে গিয়ে কী করবে কেউ?

আরো অনেক হাওয়ার রাত আসবে, বৃষ্টির রাত, বাজফাটা রাত। কিন্তু এ যে অনৈতিক। আমি ইচ্ছে করে ভুলে গেলুম কোথায় আমি রেখেছিলুম ঐ সব বড়ো-বড়ো গজাল। সংক্ষেপে, আমি মনস্থির করে ফেললুম যে জেল থেকে পালানো গর্হিত কাজ, অনৈতিক।

দেয়াল তো রক্তমাংসে বদলে যেতো না। কিনতু তবু আমি ভাবতে লাগলুম তার কোনো আত্মা আছে কিনা এখন। দেয়াল তো তাকিয়ে দেখেছে কতকিছু। কান পেতে শুনেছে কতকিছু।

ভাপানো মাছ, ভাজা মেটে, ডিম, রুটি, আরো কত কী-যে দেয়াল টপকে ওপাশে চলে গেলো।

একদিন ওপরে তাকাতেই দেখি বড়ো এক কাঠবেড়ালি বসে আছে দেয়ালের ওর। আমাকে সে নিরীক্ষণ করছে।

আমি বললুন : 'ভাগ, পাজির পাঝাড়া! লজ্জা করে না তোর?'

নারায়ণী জিগেস করলে : 'কাকে গাল দিচ্ছো অমন?'

আমি বললুম : 'ঐ কাঠবেড়ালিটাকে। হতভাগা দেয়ালের ওপর বসে বসে আমাদের কথায় আড়ি পাতছে।'

—'থাকুক না', বললে নারায়ণী।

—ও এসেছে আমাদের নিয়ে রগড় করতে। আমি তাড়িয়ে দিয়েছি ওকে — ওকে আর ওর দলের সবকটাকে।'

ঢিল ছুঁড়লুম আমি। কাঠবেড়ালি ছুটে পালালো।

নারায়ণী প্রতিবাদ করে বললে : 'দ্যাখো তো....আমার স্তনে এসে একটা ঢিল পড়লো।'

—ব্যথা করছে?'

—কেমন করে দেখা হবে আমাদের?

—আমি তো কোনো উপায় দেখছি না।'

—আমি তোমার কথা ভাববো আজ রাতে আর কাঁদবো।'

আমিও তার কথা ভাবলুম সে রাতে, সারাক্ষণ।

এইভাবে কত যে দিন রাত্রি কেটে গেলো।

—আমি চেষ্টা করবো হাসপাতালে আসতে,' নারায়ণী বললে একদিন, 'সম্ভব হবে ....তুমি কি পারবে হাসপাতালে আসতে ? অন্তত দূর থেকেও তোমাকে যদি দেখতে পাই তো সে অনেক।'

আমি বললুম : 'আমি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবো তোমায়, চুমু খাবো। মুখে, ঘাড়ে, তোমার স্তনে, তোমার তলপেটে।'

সে জিগেশ করলে : 'তুমি আমায় চিনবে কেমন করে?'

আমি বললুম : 'তোমার মুখ দেখলেই আমি চিনতে পারবো।'

নারায়ণী বললে : 'আমার ডান গালে একটা কালো তিল আছে। সেটা তুমি দেখবে তো খুঁজে?'

—'ঐ কালো তিলটায় আমি চুমু খেতে চাই।'

—'আসতে ভুলো না কিন্তু। আমার সঙ্গে অন্য মেয়েরাও থাকবে।'

আমি বললুম : আমি থাকবো একা। আমার মাথায় কোনো টুপি থাকবে না। টাক পড়তে শুরু করেছে আমার। আর আমার হাতে থাকবে একটা গোলাপ।'

—'আমি তোমার জন্য অধীর হয়ে থাকবো।'

—'হাসপাতালের চাপরাশি আমার এক পুরোনো দোস্ত।'

—'ঠিক যা ভেবেছিলুম।'

—'কী করে জানলে তুমি?'

—'অত ডিম মেটে....রুটি....আমি যখন মারা যাবো তুমি আমার কথা ভাববে তো?'

—'তোমার আরো গোলাপচারা চাই? এখানে প্রচুর আছে।'

—'না। তুমি আমাকে যা দিয়েছো তাই দিয়েই আমি গোলাপবাগান বানিয়েছি। আমি মরে গেলে আমার কথা তুমি ভাববে তো?

—'নারায়ণী, প্রেয়সী। মৃত্যুর কথা কিছু বলাই সম্ভব নয়। কে কবে মারা যাবে, কেমন করে — একমাত্র খোদাই তার উত্তর দিতে পারেন। হয়তো আমিই প্রথমে মারা যাবো।'

—'না, আমি। তখন তুমি আমার কথা ভাববে তো?'

—'ভাববো।'

নারায়ণী বললে, 'কেমন করে? ওঃ, ভগবান— কেমন করে তুমি ভাববে আমার কথা? তুমি তো আমাকে চোখেই দ্যাখোনি। তুমি আমাকে স্পর্শও করোনি কোনোদিন। কেমন করে তবে তুমি ভাববে আমাকে?

'—আস্ত জগৎটার সবখানেই তোমার চিহ্ন ছড়ানো!'

নারায়ণী ধরা-গলায় জিগেস করলে : 'এই জগতের সবখানে? কেন তুমি অমন চাটুকারিতা করো?'

আমি বললুম : 'নারায়ণী, এ চাটুকারিতা নয়। এ যে নিরলংকার সত্য...দেয়াল....কত দেয়াল!'

—'আমি ফুল তুলে রাখবো আমার নিজের কাছে!'

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি। অন্য ধারে সব চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে নারায়ণী বললে : 'আমার ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করছে।'

আমি বললুম : 'না, সে তুমি রাতের বেলায় কেঁদো।'

নারায়ণী বললে: 'কাল তোমাকে বলে দেবো কখন হাসপাতালে আমাদের দেখা হবে।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলুম আমরা, উত্তেজনায় ভরপুর। রাত্রি এলো, আলো জ্বালিয়ে দেয়া হলো। ওয়ার্ডার এলো। আলো নিভে গেলো। দরজা খুলে গেলো। আমি বেরিয়ে এলুম। দাঁতমাজা, ব্যায়াম, স্নান— সব তাড়াতাড়ি সেরে ফেললুম আমি। গোগ্রাসে গিললুম খাবার। 'চাক্কি' থেকে বিড়ি জ্বালিয়ে নিলুম। বসে বসে সুখটান দিলুম। জেলার-ভাই আড্ডা দিতে এলো একটু। ঠিক তখন দেয়ালের ওপর নীল আকাশের তলায় উঠে এলো এক শুকনো ডাল।

আমি থেকে গেলুম। যেন কাঁটার ওপর বসে আছি, ছুঁচের ডগায়। অবশেষে। জেলার-ভাই চলে গেলো। আমি ছুটলুম। ঊর্ধ্বশ্বাসে।

—'নারায়ণী।'

—'বলো।'

—'কখন?'

নারায়ণী বললেঃ 'আজ সোমবার। বিয়ুৎবার বেলা এগারোটায় আমি হাসপাতালে থাকবো। ডান গালে কালো তিল। ভুলো না।'

—'আমার মনে থাকবে। আমার হাতে থাকবে এক গোলাপ।'

—'আমারও মনে থাকবে।'

সোম, মঙ্গল, বুধ— আমি দুপুরে খেয়ে নিয়ে ঢুকে পড়লুম ঘুমে। জেগে উঠে স্নান করে নিলুম। বসে আছি, এমন সময় জেলার-ভাই হাসতে হাসতে এসে ঢুকলো আমার গোলাপ বাগানে, তুলে নিলে কয়েকটি গোলাপ, তারপর ঘরের মধ্যে এসে আমার বিছানায় বসে পড়লো।

—'ফুল চাই আপনার?' জেলারভাই আমাকে জিগেস করলে।

আমার হেসে উঠতে ইচ্ছে করলে; বললুম : 'আমিই বাগান, আর আমিই ফুল।'

—'ফল নয় তো?'

—'ফলও।'

তাকিয়ে দেখলুম, দেয়ালের ওপর দিয়ে একটা শুকনো ডাল আকাশে উঠে আসছে।

জেলার-ভাই বললে : 'আমি কিন্তু কোনোদিন আপনাকে আপনার সাধারণ পোশাকে দেখিনি।'

আমি বললুম : 'একটা জোব্বা আর ধুতি।'

জেলারভাই পুঁটলিটা খুলে আমার কাচা আর ইস্ত্রি করা জামাকাপড় বার করে আনলে।

আমি বললুম: 'ও যে ময়লা হয়ে যাবে।'

—পরুন তো! আমি শুধু দেখতে চাই এ পোশাকে আপনাকে কেমন দেখায়!'

আমি বললুম: 'সব যে ময়লা হয়ে যাবে—'

—'হ'লোই বা? আবার কেচে নেয়া যায় না?'

'বেশ।' আমি ধুতি পরে নিলুম। গায়ে চাপালুম জোব্বাটা।

—'কেমন দেখাচ্ছে?' আমি জিগেস করলুম।

—'চমৎকার।' জেলার-ভাই বললে। 'আপনি যেতে পারেন, মিস্টার বশীর। আপনি ছাড়া পেয়েছেন।'

আমি স্তম্ভিত। আমার চোখ দুটো যেন অন্ধ হয়ে গেছে। কান দুটো বধির সারা গায়ে কেমন ঝনঝনে একটা অনুভূতি। মনে হলো কিছুই যেন আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি জিগেস করলুম : 'আমি ছাড়া পেতে যাবো কেন? ....স্বাধীনতা কে চায়?'

জেলার-ভাই হো হো করে হেসে উঠলো। বললে : 'আপনাকে ছেড়ে দেবার হুকুম এসেছে। এই মুহূর্ত থেকে আপনি স্বাধীন। আপনি যেতে পারেন!'

স্বাধীন? স্বাধীন মানুষ? কে চায় স্বাধীনতা?

জেলার-ভাই বললেঃ 'বাড়ি ফিরে যাবার জন্য রাহা খরচ পাবেন আপনি — আপিস থেকে নিয়ে নেবেন। সঙ্গে নেবার কিছু আছে?'

জেলার-ভাই আমার পোশাকটা গুটিয়ে নিলে। তোষকের তলায় কতগুলো গল্প ছিলো, আমি লিখেছিলুম। সেগুলো সে ভাঁজ করে আমার পকেটে গুঁজে দিলে। হাত ধরে সে আমাকে নিয়ে এলো গরাদখানার বাইরে। বাইরে এসে আমি দাঁড়ালুম আমার গোলাপবাগানে। একটা ফুল তুলে নিয়ে হাতে ধরে রইলুম। যেন কোনো একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে আছি।

দেয়ালের ওপর দিয়ে শুকনো একটা ডাল উঠে এলো আকাশে।

জেলার-ভাই আমার গরাদখানার দরজা বন্ধ করে দিলে। নারায়ণী, তোমার জন্য আমার শুভেচ্ছা রইলো।

বাড়িফেরার টাকা পকেটে নিয়ে, আমি জেলখানার বড়ো ফটকটা দিয়ে বেরিয়ে এলুম মস্ত বিশাল স্বাধীন জগতে।

বিশাল জেলফটকটা প্রচণ্ড একটা দড়াম আওয়াজ করে আমার পেছনে বন্ধ হয়ে গেলো।

বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার হাতের গোলাপটার দিকে আমি অনেক, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২.১ □ কাহিনি-সংশ্লেষ—নিবিড় পাঠ ও বিশ্লেষণ এবং তত্ত্ববিচার

বশীরের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনির আত্মকথনের ভঙ্গিতে লেখা এই গল্পটি। লেখক নিজেই বলেছেন এই গল্পটি একটি ছোট্ট প্রেমের গল্প যার নাম হতে পারত "নারীর গন্ধ"। অর্থাৎ নারী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি এবং প্রেম — এই সবকিছুই গল্পের বিষয় — এবং এই প্রেম ছোট্টো অর্থাৎ ক্ষণজীবী। কিন্তু তবু বশীর এই আবেগঘন আত্মকথনটির নাম দিয়েছেন 'দেয়াল' এবং সেটি অনেক বৌদ্ধিক নিরীক্ষার পরে। হৃদয়ের গল্পে মস্তিষ্ক-সঞ্জাত নামকরণের বিড়ম্বনা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন এ গল্প আসলে তাঁরই হৃদয়-উৎসারিত এক করুণ গান যেখানে প্রেম, নারী, শরীরী গন্ধ — সবকিছুই রয়েছে — কিন্তু সবই একটি দেয়ালের প্রতিবন্ধকতার আড়ালে। আর প্রেম নারী, বশীর ও করুণ হৃদয়ের গান — এ সমস্তগুলিই বশীর উপস্থাপিত করেছেন চারদিকে প্রবল উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা এক জেলখানার চৌহদ্দির ভেতরে — যে-পরিবেশে আর যাই থাকুক প্রেম কিংবা হৃদয়ের প্রবেশ নিষেধ, অন্তত আইনি অর্থে তবু ওই আকাশছোঁয়া প্রাচীরের ভেতরে রাজনৈতিক বন্দী বশীরের বেয়াড়া মন আবারও লাগামছাড়া হয়। ইংরেজদের অবাধ্য হয়ে এই কারাবাসে আসা তার। স্বভাবজ অবাধ্যতায় তাই হৃদয়, প্রেম ইত্যাদির আমদানি করে সে নিষিদ্ধ এলাকাতে।

গল্পে প্রেম ছোট্টো হলেও — গল্পটি কিন্তু বেজায় দীর্ঘ। দেয়াল-ঘেরা পরিবেষ্টনীতে গল্পটি সাজানো হলেও মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশব্যাকের মতো করে দেয়ালের বাইরে-কাটানো লেখকের পূর্বজীবন অথবা বর্তমানের বহির্জীবন, যেখানে লেখকের অবস্থান নিষিদ্ধ, — সেই প্রেক্ষিতও রাখা হয়েছে। গল্পের শুরুতেই কয়েদির পোশাকপরা বশীরকে আমরা ওয়ার্ডার সমভিব্যাহারে হাঁটতে দেখি সেন্ট্রাল জেলের আকাশছোঁয়া-দেওয়াল-ঘেরা প্রাঙ্গণের রাস্তা দিয়ে নিজের নির্দিষ্ট কক্ষ, তথা সেলটির দিকে। এখন আর তিনি বিশিষ্ট লেখক বশীর নন, আইনের সাজাপ্রাপ্ত একজন নম্বরধারী কয়েদি মাত্র। তবে তাতে বশীরের খুব একটা অস্বস্তির কারণ ঘটেনি কারণ এর আগেও তাঁকে আরেকবার নম্বরে পরিণত করা হয়েছিল — অর্থাৎ কয়েদের জীবন সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই ওয়াকিবহাল।

পুরো গল্পটি এক অম্লমধুর রসে নিষিক্ত করে বশীর বলে গেছেন নিজের কথা। জেলের দেয়ালের ভেতরে

থেকেও যে তাঁর মনোভাবের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি তারই প্রমাণ রাখতে তিনি আমাদের জানাচ্ছেন যে, যে কোনো অবস্থাতেই হাসির সুযোগ পেলে তিনি ছাড়েন না। আসলে তাঁর মতে হাসি হলো ভগবানের বিশেষ উপহার যা থেকে আইনের কি পুলিশের রক্তচক্ষু ও মানুষকে বঞ্চিত করতে পারে না। হয়ত এই হাসিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন বলেই গারদের গ্লানি বশীরকে স্পর্শ কতে পারে নি। তাই গল্পটি জেলের ভেতরে সজ্জিত হলেও তাতে প্রেম ও নারী মুখ্য উপাদান হয়ে উঠতে পেরেছে একটা পর্যায়ের পর থেকে।

খানিকটা ফ্ল্যাশব্যাকের ভঙ্গীতে বশীর এবারে রাজদ্রোহের তাঁর হাজতবাসের পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করেন — খুবই হাল্কা প্রায় গল্পবলার ঢঙে তিনি আমাদের জানান কিছু পুলিশ তাঁর ভক্ত, (বলা ভালো, লেখার গুণগ্রাহী) থাকলেও — সরকারী হাজতের প্রবল পিটুনির ফলে তাঁর ডানহাতটি তর্জনী থেকে কবজি পর্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেত। এই বর্বরোচিত অত্যাচারের কথা বশীরের বাবা-মাও জেনেছিলেন এক ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে। মোটের ওপর দেয়াল ঘেরা কয়েদখানার জীবন ও পরিবেশ কেমন হয় সে বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল বশীরের। সেই অভিজ্ঞতাই সরস ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন জেলজীবনের নানান অনুষঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার মাধ্যমে। বিশেষ করে জেলের কড়াকড়ির ভেতরেও ওয়ার্ডারের সঙ্গে খাতির থাকলে কেমনভাবে কয়েদিরা নানান বেআইনি সুযোগসুবিধে ভোগ করতে পারে, তার ভারি মজার বিবরণ রয়েছে গল্পে — কখনো ধূমপানের ও চাপানের নেশার প্রসঙ্গে, কখনো বিশেষ ভালো খাবার পাবার ব্যাপারে। অবশ্য এর আগে আমরা জেনেছি এত সমাদর সত্ত্বেও বশীরের আস্তানা হয়েছে 'সলিটারি সেলে' — সেলগুলি বিশেষ বন্দীদের জন্যে তৈরি। তাই জেলখানার প্রধান দেয়ালের ভেতরে আরো একটি প্রাচীরঘেরা অতিসংরক্ষিত জায়গায় এই বিশেষ বন্দীশালাটি বানানো হয়েছে। অর্থাৎ একটি নয় দু-দুটি দেয়ালের আড়ালে বশীরের এই কারাজীবন অতিবাহিত হচ্ছে।

এই রাজদ্রোহী কয়েদিটির জবানীতে একইসঙ্গে যেমন এসেছে সমকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গ — অনশনকারী গান্ধিজির প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর অনশনভঙ্গে আনন্দের অভিপ্রকাশ — তেমনিই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রসঙ্গও এসেছে, যেখানে পরিশীলিত মননশীল এক লেখক দাগী অপরাধীদের বানানো 'চাক্কি' নামে বিশেষ এক ধরণের চক্‌মকি তৈরির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এমনকী অতি কষ্টে জোগাড় করা দেশলাই, বিড়ির প্যাকেট, ব্লেড ইত্যাদি 'মহামূল্যবান' সম্পদগুলি ওয়ার্ডার কেড়ে নিলে কোন ফন্দীতে তা ফেরত পেতে হয়, সে পথও বাতলেছেন নায়ক। আর এই বিপ্রতীপ মানস-অবস্থানের মধ্যেই সর্বময় হয়ে উঠেছে নিঃসঙ্গ পুরুষটির নারীসঙ্গকামনা ও বাসনার প্রগল্‌ভ প্রকাশ। বস্তুত কখনো কখনো বেশ 'প্রাপ্তবয়স্ক' সংলাপেও সজ্জিত হয়েছে গল্পটি।

গোড়াতেই বশীর বলেছেন এই গল্পটির নাম 'নারীর গন্ধ' ও হতে পারত — হ্যাঁ হতেই পারত, কারণ দুটি দেয়ালের আড়ালে আটক এক বন্দী সেই দমবন্ধকরা পরিবেশে যার প্রভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল, তা ওই সংরক্ষিত এলাকার দেয়ালটির বাইরে অবস্থিত মহিলাদের কারাগার থেকে ভেসে-আসা মেয়েদের গন্ধ — যে গন্ধকে সাবান, ভেষজ বা ফুলেল তেল, পাউডার কি ঘামের অনুষঙ্গে নির্ণয় করা যায় না— যা নাকি নেহাতই অথবা বিশেষত 'স্ত্রীগন্ধ'। এই গন্ধের আবেশে বশীরের তালকানা অবস্থা দেখে ওয়ার্ডারের ভারী হাসি পায় — সে জানতে চায় বশীর বিয়ে করেছে কিনা। আরো বলে জেনানা ফাটকের ঠিক পাশেই বশীরের সেলটি। বশীরের একবার মনে হয় তাঁর শিগ্‌গির বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত — পরমুহূর্তেই মনে পড়ে তাঁর আর জেনানা ফাটকের মাঝে রয়েছে একটা দেয়াল।

এতক্ষণে বিশেষভাবে আলাদা দেয়াল দিয়ে ঘেরা চত্বরটিতে প্রবেশ করে দুপাশে তাকিয়ে বশীর দুটি দেয়াল

দেখতে পান। বাঁ পাশের দেয়ালটি জেনানা ফাটকের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ডানপাশে বিশাল উঁচু দেয়ালটির ওপাশে রয়েছে বিশাল, মুক্ত জগৎ; যে জগতের প্রবেশাধিকারে বাধা ওই প্রাচীরটি।

অবশ্য জীবনের সব প্রাপ্তির পথেই বারংবার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর উপর্যুপরি কারাবাস — কারণ সাহিত্যরচনার সূত্রে দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে সইতে হয়েছে অকথ্য অত্যাচার এবং অবশ্যই কয়েক দফা জেলমেয়াদ। তবু কলম ছাড়েননি তিনি। তাই এবারের কারাবাসের কারণে আবার নানান বঞ্চনা এলেও তিনি বলেছেন সাহিত্যের জন্যে আত্মত্যাগ করবেন তিনি — যেমন আগেও করেছেন — বেধড়ক মার খেয়ে পাঁজরে বন্দুকের বাঁটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েও অচল থেকেছেন নিজের বিশ্বাসে।

রসিকতার ভঙ্গিতে এ-সব কথাগুলো বলা হলেও তার মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে থাকা বশীরের দৃঢ় ব্যক্তিত্বটিকে নিঃসন্দেহে চিনে নেওয়া যায় এই গল্পে। যে ব্যক্তিত্বের কারণে গারদে থেকেও নিজেকে তিনি বাদশা বলে ভাবতে পারেন। তবে আলো-ঝলমলে হাজতে বসেও অভুক্ত অবস্থায় তিনি হঠাৎই দার্শনিক ভাবনায় গ্রস্ত হন। কল্পনায় দেখেন নীল আকাশ, পূর্ণিমার চাঁদ, হাজার তারার মেলা — বিশ্বচরাচরের নিশীথ স্তব্ধতার মাঝে শুনতে পান এক 'ঐশ্বরিক নীরব সঙ্গীত' — আর তখনই আন্তরিক পূর্ণতায় তাঁর চোখে জল এসে যায় — জগৎস্রষ্টার বিপুলমহিমায় আপ্লুত বশীর নিজের ক্ষুদ্রতায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন। এই প্রবল মানসিক সংক্ষোভ যেন তাঁকে সাময়িকভাবে সরিয়ে নিয়ে যায় বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত থেকে। সমস্ত কাহিনির ভেতরে এই অংশটিকে কেমন যেন বেমানান বলে মনে হয় — তবু এটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে, এই একটি অংশেই সাহিত্যস্রষ্টার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

বাস্তব আবার আক্ষরিক অর্থেই কড়া নাড়ল — ওয়ার্ডার সেলের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বশীরকে জাগালো। এরপর আবার জেলের অতি চেনা, অতি পার্থিব জগৎ — যেখানে ইনো'স ফ্রুট সল্ট না খেলে এক নামজাদা রাজনৈতিক নেতার প্রাতঃকৃত্য সম্ভব হয় না বলে তিনি লুকিয়ে সেটি সেলে নিয়ে এসেছেন।

বশীর নিজেকে নেতৃসংসর্গ থেকে মুক্তি দিয়ে ওয়ার্ডারের সহযোগিতায় পূর্বে বর্ণিত অতি স্বাচ্ছন্দ্যময় 'ডিলাক্স' জীবনযাপন করতে শুরু করলেন জেলে — যে জীবনে যখন তখন স্বহস্তে প্রস্তুত চা, অজস্র বিড়ি, মহার্ঘ দেশলাই, লেখার কাগজ, পেন, সুস্বাদু আমিষ ভোজ্য—এমনকী আগের জেল থেকে নিয়ে আসা ছুরি দিয়ে তৈরি করা আস্ত গোলাপবাগান — সব রয়েছে বশীরের সেলের সামনেই। এইভাবে রাজদ্রোহী রাজনৈতিক সহবন্দী, ক্রিমিনাল বন্দীদের সঙ্গে সম্প্রীতিমূলক সহাবস্থানে এবং যথেচ্ছ আরামে, পরিপূর্ণতায় দিন কাটার কথা ছিল বশীরের — কারণ তিনি চা, ভালো খাবার, গোলাপবাগের ফুল সবই ভাগ করে নিতেন তাদের সঙ্গে।

কিন্তু বাধ সাধল বাঁপাশের 'শয়তানের হাতে গড়া দেয়াল' যা জেনানা ফাটকের সামনে আকাশসমান উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে অবিবাহিত, নিঃসঙ্গ বশীরকে বঞ্চিত করেছে নারীর সাহচর্য থেকে। তাঁর সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে শুধুই ভেসে আসা নারীর গন্ধ এবং খিলখিলে হাসির সুর যাতে মন ভরে না।

দীর্ঘ দু-বছরের জেলবাসের মেয়াদে নানান অভিজ্ঞতা হয় বশীরের। দেখা মেলে শিকলবাঁধা এক দুর্দান্ত কয়েদির — যে কিনা তার সহপাঠী ছিল — শঠ ওয়ার্ডারের তঞ্চকতার প্রতিবাদ করায় যার আজ এই দশা হয়েছে। আলাপ হয় শিক্ষিত যুবক জেলারের সঙ্গেও — বশীরের সাহিত্যিক পরিচয়ের কারণেই তিনি মাঝে মাঝে পোষা কুকুর নিয়ে আসতেন খানিকটা আড্ডা দিতে — চা খেতেও। মাঝে মাঝে জেল সুপারিনটেন্ডেন্টও আসতেন বশীরের গোলাপ বাগানে — বশীরের উপহার দেওয়া চারায় তাঁর কোয়ার্টার মস্ত গোলাপ ফলেছে।

বশীরের মনে হতো জেলটা যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ক্ষুদ্র শহর, যার বাসিন্দা হিসেবে তিনি নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন — পারছেনও কারণ 'ভগবানের দান' হাসি তাঁকে ত্যাগ করে যায়নি।

শুধু যেদিন কোনো ফাঁসির আসামীর মৃত্যুকালীন শেষ ইচ্ছাপূরণে তাকে কালো চা বানিয়ে খাওয়াতে হতো — সেই রাতটা বশীর ঘুমোতে পারতেন না — হয়ত সহবন্দীদের সঙ্গে একাত্মতার কারণেই স্বজনবিয়োগের আসন্ন বেদনায় তিনি ব্যথিত হতেন। — তাছাড়া, মোটের ওপর দিব্যিই কাটছিল দিনগুলি।

এমন সময় একদিন খবর এল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে। সবাই উল্লাসে জেলের পোশাক ছেড়ে, চুল, দাড়ি ছেঁটে দেয়াল পেরিয়ে বহির্জীবনের খোলা আকাশে নিঃশ্বাস নিতে প্রস্তুত হন। একে একে মুক্তিনামা নিয়ে সব নেতারা বেরিয়ে গেলেন গণ্ডী পেরিয়ে — শুধু ছাড়া পেলেন না বশীর। স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন তাঁর রিলিজের অর্ডার আসেনি। হয়ত তাঁর দেশপ্রেমের বাতিক তখনও কাটেনি — এমনটাই মনে করেছিলেন বিদেশি শাসকরা।

যাইহোক, গণ্ডীঘেরা গারদের একমাত্র অধীশ্বর হলেন বশীর, সঙ্গে সঙ্গে মালিকানা পেয়ে গেলেন নেতাদের ফেলে যাওয়া ইনো'স ফ্রুট সল্ট, তাস, 'ক্যাপিটাল'-এর খণ্ডটি, লেবুর আচার, পান, সুপুরি, তামাক ইত্যাদি সবকিছুরই।

এত 'বিত্ত' পেয়েও বশীরের মুখের সেই হাসি এবারে মিলিয়ে এল। পরিত্যক্ত জনমানবহীন বিশেষ চত্বরটিতে একাকী থাকতে থাকতে তিনি ভাবতে লাগলেন সব ভেড়াকে চরাতে নিয়ে গেলেও সবচেয়ে নাদুসনুদুসটিকে রেখে রেখে হয় কশাইয়ের ছুরির জন্যে। নিজের অনিবার্য ভবিতব্য যেন দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি — তাই নিঃসাড়, মনমরা হয়ে গেলেন — যে হাসি দিয়ে সকলকে বাস্তবের মুখোমুখি হতে বলতেন, আজ নিজে সেই হাসির জন্য চেষ্টা করতে পারলেন না — সাহস হারিয়ে ফেললেন। পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনার মতো ওই সব জিনিসগুলো হয় বিলিয়ে নয় ফেলে দিলেন। তবু বেঁচে রইলেন — হয়ত শুধু শারীরিকভাবেই। নিজের এই অসহায় দশায় আবারও খোদার কথা মনে পড়ল — তাঁর নাম নিয়ে বশীর জেল থেকে পালাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। একটা বৃষ্টি ঝড় বজ্রপাতের দুর্যোগপূর্ণ রাতে এই কাজটি তিনি সম্পন্ন করবেন স্থির করলেন: প্রথমে হাজতের দেয়ালের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে তারপর দ্বিতীয় বড়ো দেয়ালটিতে গজাল পুঁতে তাতে করে টপকে নিজেকে মুক্তি দেবেন। জেলখানায় এক কোণায় পড়ে থাকা জং-ধরা পায়খানার বালতির হাতলগুলি দিয়ে গজাল বানানো হবে আর পরণের ধুতি, গামছা, কম্বল, সুজনি দিয়ে দড়ি বানানো হবে বেয়ে ওপারে নেমে যাবার জন্যে।

লক্ষণীয় তারাভরা নীলাকাশের কাব্যিক দার্শনিক চিন্তায় যে লোকটি মগ্ন হতে পারেন জেলের চার দেওয়ালের বন্দীদশাতেও, আজ অবস্থার পরিবর্তনে সেই লোকটিই পায়খানার বালতির প্রসঙ্গ এনে সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ প্রতিবেশ তৈরি করতে পারেন। আসলে দুটিই তো বাস্তব — প্রথমটি সাহিত্যস্রষ্টা বশীরের, আর দ্বিতীয়টি ভীত, নম্বরওয়ালা কয়েদি বশীরের। আর এই দুই সত্তা মিলেই তো সম্পূর্ণ বশীর।

যাইহোক দুর্যোগের রাতের প্রতীক্ষায় দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছিলেন বশীর। এমন সময় এক ওয়ার্ডার তাঁকে জেনানা ফাটকের দেয়ালের পাশে সবজিবাগান করতে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন সেই দেয়ালের গায়ে চুন-সুরকির তৈরি একটা পলেস্তারার তাপ্পি, যা দিয়ে একটা গর্ত বোঁজানো হয়েছে। গর্তটি তৈরি করেছিলো অনেক প্রেমিক-হাত অশেষ পরিশ্রমে বহুদিনের মেয়াদে। এই গর্ত দিয়েই জেনানা ফাটকের সঙ্গে যোগাযোগ হতো পুরুষ কয়েদিদের। আর এই বোঁজানো গর্ত দিয়েই দুই ফাটকে যথাক্রমে স্ত্রীগন্ধ ও পুরুষগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। সাজাপ্রাপ্ত নিঃসঙ্গ কয়েদিদের মধ্যেও গর্তের মাধ্যমে এই সামান্য সংযোগে কেউ আপত্তি করতো না। আবার এটা কোনো গোপন কথাও ছিল না। এই মানুষি দুর্বলতাকে প্রকারান্তরে ক্ষমার চোখেই দেখা

হত। কিন্তু দেয়ালের প্রতিবন্ধকতা দূর করা গেলেও দুই ফাটকের মধ্যে প্রেমের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াল সেই শয়তান ওয়ার্ডার — ওই গর্ত দিয়ে তাকাবার জন্যে মাশুল ধরে দিল। বশীরের সেই দুর্দান্ত সহপাঠী এতে আপত্তি করায় ওয়ার্ডার গর্তটা বুঁজিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে সেই কয়েদিকে ছত্রিশ ঘা চটাবুক মারা হয়েছিল। প্রেমের জন্য আকাঙক্ষার এই মাশুলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সাড়ে চারবছরের বাড়তি জেলবাস।

ঠিক এখানে থেকেই গল্পের দেয়ালটা আর নিরেট প্রাণহীন বস্তু না থেকে,. একটি চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে — কয়েদিদের হাসি, কান্না, বেদনা, বঞ্চনা, প্রাপ্তি সবকিছুরই সক্রিয় শরিক হয়ে উঠেছে। তাই গর্ত বোঁজানো সত্ত্বেও বশীরের সঙ্গে জেনানা ফাটকের সংযোগ স্থাপিত হয় — একদিন স্তব্ধ চত্বরে শিস দিয়ে ঘুরে বেড়াবার সময় ওপার থেকে শুনতে পান তিনি। সুরেলা এক নারীকণ্ঠ — শিস্ শুনে যে পরিচয় করতে চায় এপারের কয়েদিটির সঙ্গে।

মাঝখানে বিশাল বাধা থাকা সত্ত্বেও পরিচয় বিনিময় হয় — জানা যায় মেয়েটির নাম নারায়ণী এবং যে সুন্দরী, যুবতী এবং কিছুটা শিক্ষিতা — চোদ্দ বছরের মেয়াদে আছে; যার মধ্যে মাত্র একটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। সেও এই মুসলমান, বয়স্ক লেখকটির পরিচয় জানে এবং এবার একটা গোলাপচারার ফরমায়েশ করে। বশীরের বাগানের খবর নারায়ণী জানে দেখে বশীর বিস্মিত হলে, সে জানায় জেলে সবাই সবার খবর রাখে। বশীর মানতে পারেন না কারণ তিনি রয়েছেন দুটো দেয়াল-ঘেরা জনমানবহীন এক প্রান্তরে, যেখানে পৃথিবীর সঙ্গে কোনো সংযোগই নেই। আসলে তাঁর কাছে যুগ্ম দেয়াল হল জীবনের সব পাওয়ার পথে গজিয়ে ওঠা প্রায় অলঙঘ্য এক বাধা। তবু আজ সেই বাধা পেরিয়ে যখন সত্যিই এল এক নারীর আহ্বান, তখন তিনি উদ্বেল হয়ে উঠলেন। মুহূর্তেই শরীরী হয়ে উঠল পুরো গল্পটি। বঞ্চিত মেয়েটি আর নিঃসঙ্গ পুরুষটির মধ্যে এক লহমায় যেন স্থাপিত হল এক বন্ধন — গোলাপের সবচেয়ে বড়ো ঝাড়টি দেওয়াল টপ্‌কে ওপাশে ছুঁড়ে দিলেন বশীর প্রথম প্রণয়-উপহার হিসেবে, তার আগে চুমোয় ভরে দিলেন সব কটি ডাল, পাতা, ফুল এমনকী কাঁটাগুলোকেও? এই সংরাগমাখা প্রচেষ্টার কথা নারায়ণীকেও তিনি জানালেন — উত্তরে সেও বলল ফুলগুলি সে রাখবে নিজের ব্লাউজের ভেতরে। এমন অদৃশ্য সংরাগের সঙ্কেতে দেয়ালটিও যেন বদ্‌লে গেল। দুজনের মাঝে সে আর প্রতিবন্ধক নয় — বরং সেই যেন দূতী হয়ে দুজনের সংযোগ সাধনই করতে লাগল। পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হল আরো অনেক প্রণয়-উপহার — বাজরার ঠোঙা, লঙ্কাগুঁড়োর ঠোঙা, কলাভাজার ঠোঙা, লেবুর আচার ইত্যাদি। তারপর অদর্শনের যাতনায় অস্থির হয়ে নারায়ণী ও বশীর পরস্পরকে শরীরী বর্ণনায় চিনতে চাইল — স্তন, চোখ, কোমর, চোখ ত্বকের রঙ সবই এল সেই ব্যাখ্যানে। তারপর ''অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ'' ভরে নিতে নারায়ণী ও বশীর দেয়ালের সঙ্গে স্থাপন করলেন সখ্য — আর দূতী-দেয়াল কখনো বশীরের চুম্বন, কখনো নারায়ণীর বক্ষস্পর্শ — সবই নিজের শরীরে গ্রহণ করে, বিনিময় করে বস্তুতপক্ষে যেন এবং পরিপূর্ণ করে দুজনকে। সময়গুলো কেটে যায় দ্রুত। বশীরের জগৎ আবার হাসিতে ভরে উঠল — অগোছালো, নোংরা বিছানা নতুন করে পাতা হল। আর প্রতিদিনের মতো বশীর প্রতীক্ষায় থাকেন একটা শুকনো ডালের — যা দেয়ালের ওপার থেকে নারায়ণী তুলে ধরে নিজের আগমন সঙ্কেত হিশেবে। সম্পর্কটা গড়ে উঠল দ্রুত — দেয়ালের প্রতিবন্ধক থেকেও যে নেই — তাই। তারপর এল বহুপ্রতীক্ষিত সেই ঝড়জলের দুর্যোগপূর্ণ রাত। পায়খানার বালতির হাতল দিয়ে বানানো গজাল টপকে পালাবার কথা বশীরের মনেও পড়ল না। বরং অঝোর বৃষ্টিপাত তিনি অনুভব করলেন 'খোদার দোয়া', যার ফলে জীবন আজ তাঁর প্রেমের ধারায় নিষিক্ত। তাই তিনি অনুভব করলেন দেয়াল টপ্‌কে পালানো ভালো কাজ নয়। এও

অনুভব করলেন দেয়ালের কান আছে, আত্মাও আছে, আছে দৃষ্টিও — তাই তো নারায়ণী এত নিকটে বলে অনুভূত হয়।

কিন্তু এই আপাত-বাস্তবে মন ভরে না শেষ অবধি। তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ। জেলের হাসপাতালে বিষ্যুৎবার বেলা এগারোটায় তাদের দেখা করার পরিকল্পনা হল — পরিকল্পনা হল দুজনের দুজনকে চিনতে পারারও — সুন্দরী নারায়ণীর ডান গালের কালো তিল আর বশীরের হাতের গোলাপ হবে সেই পরিচয় সঙ্কেত। এতদিনের আপাত-শরীরী সংরাগের অপূর্ণতাও সেদিনই মিটে যাবে এই কামনাও প্রকাশিত হল সংলাপের মাধ্যমে।

এল বুধবার। দুপুরে খাওয়ার পরে জেলার এলেন গল্প করতে। ওদিকে দেয়ালের ওপার থেকে উঠে এল শুকনো ডাল — প্রতীক্ষায় রয়েছে নারায়ণী। গল্পের মধ্যে জেলার বশীরকে বললেন সাধারণ পোশাকে তাঁকে কেমন লাগে তিনি দেখতে চান। ইস্ত্রি-করা, কাচা ধুতি ও জোব্বা পুঁটলি খুলে বের করে। বশীর সেগুলি পরে নিলে জেলার জানান বশীর ছাড়া পেয়েছেন। অবশেষে মুক্তিনামা এসেছে তাঁর নামে।

সমস্ত স্নায়ু অবশ হয়ে এল, অনুভূতি শূন্য হয়ে গেল বশীরের—সমস্ত অস্তিত্ববোধ — তিনি জানতে চাইলেন কেন তিনি ছাড়া পাচ্ছেন? যেভাবে কিছুদিন আগে বুঝতে পেরেছিলেন দেয়াল টপকে তিনি পালাতে চাননা, সেইভাবে আজও বুঝতে পারছেন এই স্বাধীনতা তিনি আর চাননা। কেনই বা চাইবেন? দেয়াল-ঘেরা বদ্ধতায় তিনি অনেক সুখী — এই পরাধীনতায় রয়েছে প্রেমের স্বাদ, প্রাপ্তির আশ্বাস, আকাঙক্ষার চরিতার্থতার ইঙ্গিত।

কিন্তু একদিন যে আইন তাঁকে পরাধীন করেছিল তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে, আজ সেই আইনই তাঁকে স্বাধীন করে দিল আবারও তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে। আজ তিনি না চাইলেও স্বাধীন তাঁকে হতেই হবে। পেরিয়ে যেতেই হবে দেওয়ালের গণ্ডী।

জেলের পোষাক জেলার নিয়ে নিলেন। সেলে-বসে-লেখা গল্পগুলো বশীরের পকেটে ভরে দিলেন — তারপর তাঁকে হাত ধরে সেলের বাইরে নিয়ে এলেন — জানালেন বাড়ি ফিরে যাবার রাহাখরচও দেওয়া হবে!

বশীর এলেন নিজের হাতে বানানো গোলাপবাগে — যেন স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে তুলে নিলেন একটা গোলাপ। দেওয়ালের ওপারে শুকনো ডালটি আবার উঠে এল। একবার সেদিকে চেয়ে বশীর পা বাড়ালেন জেলারের সঙ্গে। তারপর পকেটে বাড়ি ফেরার টাকাটা নিয়ে দুটো দেওয়াল, জেলের বড়ো ফটক, গোলাপবাগ আর নারায়ণীকে পেছনে ফেলে তিনি বেরিয়ে এলে মস্ত বিশাল স্বাধীন জগৎটিতে — তখন তিনি আর কয়েদি নন — স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত লেখক, যাঁর সঙ্গে ওই জেলহাজতের আর কোনো সংযোগ নেই, থাকতে পারে না। তাই দড়াম করে জেলফটকটা বন্ধ হয়ে গেল। বশীর হাতের গোলাপটির দিকে তাকিয়ে রইলেন — যে প্রণয়-উপহারটি আর কখনো দেয়ালের ওপারে পৌঁছোবেনা। আসলে এতক্ষণে নারায়ণী ও বশীরের অবস্থান বদল হয়ে গেছে। এতদিন বশীর ছিলেন দেয়ালের ভেতরে — তাঁর অবস্থান থেকে নারায়ণীকে মনে হতো দেয়ালের বাইরে অবস্থিত। কিন্তু আজ বশীর চলে এসেছেন দেয়ালের বাইরে — নারায়ণী আজ রয়ে গেল দেয়ালের ভেতরে বশীরের বর্তমান অবস্থান থেকেস দূরে। তাই আজ সামাজিক দৃষ্টিতে বশীর স্বাধীন আর নারায়ণী সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি — যাদের মধ্যে কোনো সংযোগ আর সম্ভব নয় — সমাজের বা আইনের দৃষ্টিতে অনুমোদিতও নয়। একদিন যে দেয়াল তাঁদের দুজনের মিলনের দোসর ছিল, আজ সেই দেয়ালই তাদের চিরবিচ্ছেদের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। এখন আর সে যেন

বন্ধু নয়, নিতান্তই প্রাণহীন ইঁটকাঠের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে আবার। আর এই দেয়াল পেরিয়ে এলেও বশীরের অনুভূতিতে আজও কিন্তু দেয়াল রয়ে গেছে — তাঁর চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা অলঙ্ঘনীয় এক প্রাচীর — মানুষের জীবনের চিরকালীন, নির্মম এক বাস্তব যা ওই শুষ্ক, নিরেট দেয়ালের মতোই এই চরম সত্য। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক অলডাস হাক্সলেও তাঁর 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড' বইতে এই দেয়ালের রূপকটি ব্যবহার করেছেন মানুষের জীবনের অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য অসহায়তার একটি দার্শনিক প্রতীক হিসেবে : জীবনের চলার পথের একটার পর একটা প্রতিবন্ধক রূপে যা আসে, সেগুলো যেন এক-একটা দেয়ালেরই মতো। মানুষ তাকে ভেঙে ফেলে, কিংবা আপনিই তা ভেঙে যায়—কিন্তু অচিরেই আবার দেখা দেয় নতুন আরেকটা দেয়াল। এই দেয়ালভাঙা—এগিয়ে চলা—আবার দেয়ালভাঙা— ফের এগোনো—এই হল জীবন। এই তত্ত্বটিও এখানে, বশীরের এই গল্পে বিশেষভাবেই তুলনার যোগ্য।।

মাছ ও মানুষ

(অসমীয়া)

মহিম বরা

১.১ □ কাহিনি

তিন রাস্তার মোড়ে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে।

ভাঁড়ারঘরের বেড়ার উপরকার আঙটায় ঝুলিয়েরাখা পলোটা হাতে আর খাঁচাখানা পিঠে বেঁধে নিয়ে তিন বছরের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, "বল দেখি বাপধন, বড়ো মাছ পাব কি?"

"হ্যাঁ বলো, খু-উ-ব বলো মাছ পাবি।" বাপধন তার ছোট দুটি হাত সাপটে ধরে দেখায় কত 'বলো' মাছ। বৌ মুচকে হেসে জীবকান্তের দিকে চেয়ে থাকে। হাসিটা যেন বলতে চায় যে শিশুভগবানের মুখ থেকে কথাটা যখন বেরিয়েছে, ফলতে বাধ্য। বৌয়ের মিষ্টি হাসি দেখে পুলকে তার শরীরটা শিউরে উঠে— যেন পলো চেপে ধরে বুকের খাঁচায় বন্দী করে রাখে সেই হাসিটা। আজ চার বছর আগে তার বিয়ের পরের দিনগুলি হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়। কি একটা কথা বলতে গিয়েও জীবকান্ত বলতে না পেরে নিঃশব্দে হেসে ফেলল। ইতিমধ্যে পনেরো বছরে ভাইপো ডম্বরু হাতে একটা ছোট পলো নিয়ে দৌড়ে এসে বলল : "আর দেরি কেন, কাকা? আর সবাই কখন চলে গেছে।"

"চল চল, এক দৌড়ে এগিয়ে যা"—বলে বাকী হাসিটুকু শেষ করে জীবকান্তও পা চালিয়ে চলল।

আজকের শুভ যাত্রাটাই যেন বলে দিয়েছে শুধু হাতে তাকে ফিরে আসতে হবে না। মাঘ বিহুর সংক্রান্তির খাওয়াটা নিছক ভাতেভাত হয়তো হবে না, মনে হচ্ছে।

গাঁয়ের প্রায় চল্লিশ জন লোক—ছেলে, বুড়ো, জোয়ান—মোড়ের মাথায় একত্র হয়ে হরিধবনি করছে শেষ বারের মতো। "কে কে যাবে, চলে এসো"। তারপর সকলে পা চালিয়ে চলতে লাগল, ধানক্ষেতের পর ধানক্ষেত পেরিয়ে যেতে হবে চার মাইল রাস্তা, তারপরে জুটবে সবাই মোষখুঁটি বিলে। প্রায় কুকুর-দৌড় মেরে জীবকান্ত দলের আর সবাইকে ধরে ফেলল।

ধানকাটা শেষ হয়ে গেছে। ফাঁকা ধানক্ষেত ভেঙে চলতে কোনো বাধা নেই। বাদামি রঙের নাড়া থেকে ঝট্‌পট্ উঠে পড়ে কুয়াশারা যেন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত ছুটে চলেছে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে। দেখে মনে হচ্ছে যেন মাছ ধরার জন্যই হাতে আলো নিয়ে গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে সঙ্গে কুকুর দৌড় দৌড়চ্ছে।

হাঁটুপ্রমাণ নাড়াগুলির মাঝ দিয়ে, কখনো বা আলে-আলে, লোকেরা এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেকের পিঠে ঝুলছে তৃণখাঁচা, হাতে পলো আর মনে আশা যে খাঁচাখানা ভরে মাছ অনবে।

এই সকলের মধ্যে জীবকান্ত কেমন যেন একা-একা। পুবের আকাশের মতো তার মনটা যেন থেকে থেকে রাঙিয়ে উঠছে। আর কেমন যেন অকারণেই মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। তার মন বলছে আজকের অভিযানে জয় হবে তারই, সবাইকে আজ সে অবাক করে দেবে।

ঘর থেকে বেরোবার সময় মুখে যে হাসি-হাসিভাবটা নিয়ে জীবকান্ত বেরিয়েছিল, কেমন করে জানি না সে ভাবখানা তখনো যেন তার মুখে লেগে রয়েছে।

জানি ভগবান, আজ তুমি চোখ মেলে চাইবে প্রভু! আজ চার বছর হল সে বৌকে বড়ো ও ভালো একটা মাছ ধরে দেখাতে পারে নি। সবই কুচোমাছ, বড়ো জোর বাটা, আড়, কিংবা দুঠিয়া বরালি। প্রকাণ্ড একটা রুই কিংবা কাতলা যদি একটা ধরা যেত। চার-ছজনা মিলে বয়ে এনে ধপাস করে ফেলত উঠোনে, গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ত মাছটাকে ঘিরে। বৌ তখন করবে কী? তামাকের ছিলিমটা লোকদের হাতে দেবার জন্য একবার ঢুকছে ঘরের ভিতর, একবার এসে দাঁড়াচ্ছে ঘরের বাইরে। মুখের হাসি চাপতে না পারায়, ঠোঁটদুটো ছুঁচলো পর্যন্ত করতে পারছে না ছিলিমে ফুঁ দেবার জন্য।

সমস্ত দৃশ্যটাই সে যেন স্পষ্ট চোখের উপর দেখতে পেল।

কী জানি আমি, ভগবানই জানেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে গ্রামের লোক গিয়ে মোঘখুঁটি বিলের ধারে গিয়ে পৌঁছল। যেমন দৈর্ঘ্যে তেমনি প্রস্থে প্রকাণ্ড, বিল নয়, একখানা যেন সাগর এই মোঘখুঁটি বিল। এই বিলের একটা কোণাতেই লোকে আজ মাছ ধরবে। তা থেকেই যতটুকু পায়। সকলেই একটু জিরিয়ে, কাপড়-চোপড় বদলে নিয়ে, বিড়ি-তামাক টেনে প্রস্তুত হল। কোমর ভালো করে কষে নিল, মাথায় গামছা কিংবা চাদর দিয়ে পাগড়ি বাঁধল। তুণখাঁচা পিঠে ভালো করে বেঁধে নিল। তারপর সবাই নাবল বিলে। মাথায় লম্বা যারা তারা কোমরপ্রমাণ জলে নেবে গেল, অপেক্ষাকৃত খাটো যারা তারা থাকল জল যেখানে একটু কম। ছেলেরা সবাই এনেছে ছোট ছোট পলো, তার ঘেরটা পলোর মতো বড়ো নয়। বেশি জলে এরকম ছোট পলো কাজ দেয় না। তাই তারা থাকল একেবারে পারের কাছে। জলে যারা নাবতে চায় না তাদের কেউ কেউ পারে পারে চলতে লাগল হাতে কোচ ও কেঁকো নিয়ে। উপর থেকেই খুঁচিয়ে ছোট-ছোট মাছ ধরতে চায় তারা।

পলোর প্রথম সারির দলটা সমানে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রথম প্রথম মানুষের পায়ের শব্দে ও পলো পড়ার শব্দে মাছ ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। পালায় অবশ্য পারের দিকেই। সেখান থেকে আবার ফিরে আসে আগের জায়গায়। তখন পলোতে মাছ পড়ে।

মাঝে মাঝে দু-একজন থেমে গিয়ে পলোর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দু-চারটা আড় কিংবা বরালির মতো ছোট-ছোট মাছ ধরছে। কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে আবার পলো উঠিয়ে নিচ্ছে। আগেকার দিনের মতো বিলে বড়ো মাছ বেশি মেলে না।

জীবকান্তের ভাইপো ডম্বরু পারের দিকে পলো গঁজে হঠাৎ গলা ছেড়ে ডাক দিয়ে উঠল, "কাকা শীগ্‌গির আয়—প্রকাণ্ড মাছ!"

"ও, তোর তর সইছে না, তাড়াতাড়ি আসতে হবে বুঝি?" এই বলে ডম্বরুর কাছের থেকে লক্ষ্মী তার নিজের পলো ছেড়ে এসে, ডম্বরুর পলোতে হাত ঢুকিয়ে মাছটা ধরে দিল। বাঁশের কঞ্চি র মতো সরু একটা বরালি মাছ। "হ্যাঁরে, এই বুঝি তোর প্রকাণ্ড মাছ!" সকলে হাসতে লাগল।

ইতিমধ্যে কিন্তু সামনের সারির লোকদের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে শুরু করেছে। বড়ো মাছ উঠবার একটা লক্ষণ থাকে, আজ যেন সে লক্ষণ নজরে পড়ছে না। ছোট-ছোট মাছ সামান্য কিছু পাওয়া যাচ্ছে—এই পর্যন্ত।

একা কেবল জীবকান্তের আশা ও উৎসাহ একটুও হ্রাস পায় নি। সে জানে, তার মন বলছে আজকের দিনটা বৃথা যাবে না। শিশুদেবতা কথা দিয়েছেন, বৌ মিষ্টি করে হেসেছে, সুতরাং বৃথা যাবে না দিনটা।

সামান্য জলে কেউ একজন একটা কোচ দিয়ে খোঁচা দিল। বেশি জলে তার একজন বন্ধু পলো চাপিয়ে চেঁচাল, "কি মারলি রে রুই না কাতলা?"

"ধেৎ, মাছ নয় কুচিয়া—" পার থেকে জবাব এল।

আরেকজন রসিকতা করে বলল, "দে ঝাড়ু দিয়ে খুঁচিয়া।"

"বেশ, বেশ।

বাঁশের কোঁড়ে লাল শাক দিবি

তেলিনীঘাটের পারে নিবি,

দুপুরবেলা দেখব জিগেস করে......"

প্রথমে যে প্রশ্ন করেছিল সে পরিচিত গানটার পাদপূরণ করে গেয়ে দিল।

পরমুহূর্তে একটা ঘটনা ঘটে গেল। নিতান্ত ভাগ্য বলতে হবে যে ঘটনাটা দুর্ঘটনায় পরিণত হল না। জীবকান্তের বাঁ দিকে চারজন লোক পেরিয়ে, সেই সারিটার সমান্তরাল ভাবে মস্ত একটা রুই বা কাতলা ঘাই দিয়ে উঠে জীবকান্তের নাকে লেজের সামান্য ঝাপটা করে জলে পড়ল। আর একটু তীরের গতি নিত যদি মাছটা, তাহলে দুটো মানুষের নাক মুখে ঝাপটা মেরে পৌষ-সংক্রান্তির মজাটুকু টের পাইয়ে দিত নিশ্চয়।

"বাব বা!" দু-একজন চীৎকার করে উঠল, "কী প্রকাণ্ড মাছ রে।" কেউ বলল রুই হবে, কেউ বলল কাতলা।

অঘটন না ঘটায় সকলের উৎসাহ যেন বেড়ে গেল। দু-চারজন চীৎকার করে বলল, "ধর ধর, বড়ো মাছ এল এবার......"

আবার সারিটা এগোতে লাগল। এইবার সন্তর্পণে, আস্তে ধীরে পলো চাপিয়ে চাপিয়ে। কারো বুক অবধি জল, কারো বা গলা অবধি। বড়ো মাছ পড়বে একটু গভীর জলে। সকলেরই বুক টিপ টিপ করতে লেগেছে—সবাই ভাবতে লেগেছে কার পলোতে পড়বে সেই মাছ। পড়েই যদি, কষ্ট দেবার জন্যই পড়বে, কারণ গভীর জলে সেই ভয়ঙ্কর মাছটাকে ধরে রাখে এমন দুঃসাহস কারো হবে না। তার মুড়োটা পলোর মুখের চেয়ে বড়ো হবে নিশ্চয়।

জীবকান্তের মানসিক উত্তেজনা কিন্তু একটা চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। কপালের শিরা ফুলে উঠে টনটন করছে, মুখখানায় একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা।

এই তো সময়, আবার এ সুযোগ আসবে না। তার উদ্দেশ্য সফল হবার এই হল সুযোগ।

ঘপাং করে একটা শব্দ শুনেই সবাই চমকে উঠল। যে যেখানে ছিল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, পলোটা প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরে তার উপর জীবকান্ত বসে পড়েছে। তার পাশে ছিল রত্নেশ্বর, সে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে জীবকান্তকে যাতে সে বেশ শক্ত হয়ে পলোর উপর বসে থাকতে পারে।

"পড়েছে?" সকলের গলা একটা কেঁপে উঠল।

"পড়েছে।" প্রশ্নের জবাব দিল রত্ন। জীবকান্ত উত্তর দিতে চেয়েছিল, কিন্তু গলা থেকে তার স্বর বেরোল না।

কাছাকাছি বুড়ো একজন নিজের পলো ছেড়ে এগিয়ে গেল। জলে প্রায় তিন-তিনবার ডুব দিয়ে উঠে এসে বিস্ফারিত চোখে একবার সকলের দিকে তাকাল। সবাই বুঝল এত বড়ো করে চোখ মেলে তাকানোর অর্থ—মাছটা প্রকাণ্ড। যে-দড়ি দিয়ে বুড়ো নিজের পিঠে তূণখাঁচাটা বেঁধে রেখেছিল, তা থেকে একটা টুকরো দাঁতের কামড়ে ছিঁড়ে নিল। আলাদাভাবে দড়ি কেউ আনে নি। এমনটা হবে কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। দড়িটা ছোট হল, পাটের দড়ি, তায় পুরনো।

সাত-সাতবার ডুব দেবার পরেও মাছের গলায় গড়িটা পরাতে যখন পারল না, বুড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "জীব, এটার আশা ছেড়ে দে। এ যেমন তেমন মাছ নয় রে, এই বিলের ভূত-পাওয়া মাছ। অদ্দিকাল থেকে এখানে আছে।"

সঙ্গীদের মুখ বুড়োর কথা শুনে শুকিয়ে গেল। পলোতে মাছ ধরায় বুড়ো ওস্তাদ। তার মুখের কথা বেদবাক্য। ভূতে-পাওয়া মাছের কথা কে না জানে! সেকালে নাকি কোনো একজনের পলোতে পড়েছিল। রাখতে পারে নি। সেই রাত থেকে লোকটির ভীষণ জ্বর, এক হপ্তার মধ্যে সব শেষ।—জ্বরবিকারে ভুল বকতে গিয়ে কেবল সেই মাছের কথা। মাঝে মাঝে চমক খেয়ে সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ওষুধ-বদ্যি, ওঝা-ঝাড়ফুঁক আর মন্ত্রে-তন্ত্রে কিছুতেই কিছু হল না। এ সব সেকালের কথা।

সবাই এক বাক্যে চেঁচিয়ে উঠল, "ছেড়ে দে জীব, ছেড়ে দে। বেঁচে থাকলে আবার মাছ পাবি।"

জীব, রত্ন এবং আরো দু-চারজন যুবক বয়সী, কিন্তু ভূতটুত মানে না। এ মাছ কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া চলবে না। ধরতেই হবে। রত্ন ও বিজয়কে পলোর ওপর সমানে চাপ দিবার কথা বলে, জীব নিজে নেমে গেল।

লোকেরা ঠিক করল পলো মারতে মারতে এগিয়ে যাবে। বেলা হয়ে যাচ্ছে।

বড়ো মাছ পলোতে পড়লে পলোর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে তার কানকোর ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে পলোর সঙ্গে মাছটাকেও উঠিয়ে আনতে হয়। যদি মাছ তার চেয়েও বড়ো হয় তা হলে তাকে তোলবার একমাত্র উপায় তার কানকোর ভিতর দিয়ে দড়ি ঢুকিয়ে সে দড়ি মাছের মুখ থেকে বের করে, দড়ির দুটো মুখ পলোর কাঠির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া। কিন্তু সেটাই সব চেয়ে শক্ত কাজ। পলো যদি একটু ঢিলে পড়ে তা হলে লাফ মেরে মাছ তো যাবেই, পলোশুদ্ধ মানুষটাকেও টেনে নেবে। এ যেন আঁচলের গিঁটে জীবজন্তু বেঁধে রাখার চেষ্টার মতো।

হাতে দড়িটুকু নিয়ে জীবকান্ত পলোর চারদিকে সাঁতরাতে লাগল।

লোকেরা পলো হাতে এগিয়ে চলেছে। পলো নিয়ে থাকল রত্ন আর বিজয়। ডম্বরু তার ছোট পলো নিয়ে দুরে হেঁটমাথা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, সাঁতার দিতে পারে না বলে তার খুবই মন খারাপ। জীবকান্তের পলো যেখানে, সেই তার পক্ষে অথই গভীর জল।

প্রায় আধঘন্টা পালাক্রমে রত্ন, বিজয় ও জীবকান্ত ডুব দিয়ে চেষ্টা করে চলল মাছটাকে পলোর সঙ্গে বাঁধতে। জীবকান্তের দ্বিতীয়বার ডুব দেবার পর তার অধ্যবসায়ের জয় হল। মাছটাকে দড়ি ঢুকিয়ে পলোর সঙ্গে বেঁধে দিল। দড়িটা ছোট থাকায় পলোর মধ্যেকার একটা কাঠি বেঁকিয়ে প্রায় তিনটা কাঠি একত্র করে দড়ি জড়িয়ে বেঁধে দিল।

এবার পালাবে কোথায় বাছাধন? সেই পৌষ মাসের শীতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছে, এবার তারা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল আবার। জীবকান্ত পলোতে সবে মাত্র হাত দিয়েছে, দুটো হাত

একটু ঢিলে করে ধরা, এমন সময় মাছটা প্রকাণ্ড একখানা ঘাই মেরে, পলোটাকে বঁড়শির ফাতনার মতো টেনে নিয়ে সটান চলে গেল বিলের একেবারে মাঝখানে। জীবকান্তের একটা হাত পলোতে, অন্য হাত সাঁতার কেটে কেটে এগোতে লাগল সে। পিঠে তার সেই দুর্জয় তৃণখাঁচাটা।

কী যে হল বুঝাতে না পেরে প্রথম প্রথম রত্ন ও বিজয় তো স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাকী যত লোক হঠাৎ কী শব্দ শুনে, পলো ফেলে পিছন দিকে ঘুরে তাকাতে তো তাদের চক্ষু স্থির। সবাই তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

"লোকটা মরবে, আজ, সর্বনাশ হল! ওরে ছেড়ে দে রে, ছেড়ে দে।"

চারদিকে লোকেরা সব ছত্রখান হয়ে পড়ল। অনেকে জল ছেড়ে পারে উঠে বিলের কিনারা ধরে দৌড়তে লাগল। এতক্ষণে যেন রত্ন ও বিজয়ের চেতনা ফিরে এল। দুজনেই নিজের নিজের পলো ছেড়ে সাঁতরাতে লাগল। কিন্তু ইতিমধ্যে জীবকান্ত চলে গেছে অনেকখানি দূরে।

সকলে দেখতে লাগল মোষখুঁটি বিলের বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে একটা মানুষ বঁড়শির ফাতনার মতো ঘুরপাক খাচ্ছে ক্রমাগত। মাছ কখন যে কোন দিকে টানছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। একবার যদি আসে পারের দিকে, পরমুহূর্তে দ্বিগুণ গতিতে ছুটে চলে একেবারে মাঝ দরিয়ায়—বহু দূরে।

সাঁতরাতে সাঁতরাতে রত্ন ও বিজয় যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল, কখন কোন দিকে যাবে স্থিরতা নেই। একবার জীবকান্তের কাছাকাছি পৌঁছে, আবার বহু দূর সরে যায়।

পার থেকে ক্রমাগত পরস্পর-বিরোধী চীৎকার উঠছে, "ধর, ধর," "ও রে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।"

জীবকান্ত কিন্তু একপ্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য, মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে যেন পলোর কাছে আত্মসমর্পণ করে ভেসে বেড়াচ্ছে। একবার কেমন করে যেন পিঠের তৃণজালটা খসিয়ে দিল জলে। টানুক মাছ, দেখা যাবে কত টানতে পারে।

জলে জোর মাছের, ডাঙায় মানুষের। বড়ো মাছ বঁড়শিতে লাগলে ছিপের ডোর ঢিলে দিতে হয়, মাছ যত টানতে চায়, টানতে দিতে হয়। জীবকান্ত সেকথা জানে। পলোর ক্ষেত্রে কী করতে হয়, তা সে জানে না। সুতরাং, যাক না মাছ যদ্দুর যেতে চায়, মাছের তো ক্লান্তি আছে।..... একবার সদ্য জ্ঞান ফিরে আসা রুগীর মতো ঘাড়খানা ঘুরিয়ে দেখতে পেল রত্ন ও বিজয় সাঁতার দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ায়, এখন পারের দিকে ফিরে যাচ্ছে। গাঁয়ে জীবকান্তের মতো সাঁতারু আর দ্বিতীয় নেই। রত্ন ও বিজয় দুয়েকটা সাঁতারই জানে, তাও বেশি সময় জলে থাকতে পারে না। পারে দাঁড়িয়ে যারা চিৎকার করছিল তাদের মধ্যে থেকে ডম্বরুর গলাখানা সে স্পষ্টই টের পেল। ঘর থেকে বেরোবার সময় সেই মুহূর্তের কথাটা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। ওর স্ত্রী, ওর ছেলেটি, বৌয়ের মুখের সেই হাসিটুকু। এই সময় চোখের পলকে সব সত্য হতে পারে, আবার সব মিথ্যাও হয়ে যেতে পারে। এ-মাছ যদি সে ঘরে তুলতে না পারে তাহলে তার জীবনই বৃথা। কিন্তু তুলতে যদি না-ই পারবে তবে ভগবান কেন মাছটাকে ঢুকতে দিলেন ওরই পলোতে? আশা দিয়ে প্রভু কি এই ভাবে বঞ্চি ত করবেন। এ-মাছ সে তো একা ভোগ করবে না, গাঁয়ের লোক ডেকে ভোজ দেবে। যদি ধরতে পারে, হে ভগবান, যদি ধরতে পারে। গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে তা হলে একখানা প্রদীপ সে নিশ্চয় ধরে দেবে—মনে মনে জীবকান্ত মানত করে।

আর বাড়ির সকলেরই তো এক পত্তন বড়ো মাছ মুখে দেবার ভীষণ ইচ্ছা। ধানের বদলে কখনো-সখনো মেছুনির কাছ থেকে কয়েকটা পচা বরালি পায়—তাই হল ওদের বড়ো মাছ। বাজারের মাছের যা দাম—বড়ো লোক ছাড়া কিনবে সাধ্য কার? কত দিন ডোবা জঙ্গল ভেঙে বঁড়শি পলো নিয়ে সে বেরিয়েছে। কতদিন বৌ বঁটিখানা

উপরমুখ করে রেখেছে, কিন্তু বড়ো মাছ ঘরে তুলতে পারে নি জীবকান্ত। আজ হাতে পেয়েও কি শ্রীবৎস রাজার সেই বড়ো মাছের মতো—এ-মাছও পালাবে?

কথায় বলে না, সংসারে যত্ন করলেই রত্ন মেলে। ভগবান মাছটা যখন দিয়েছেন মানুষকে এখন তার পৌরুষের সাহায্যে মাছ ঘরে তুলতে হবে। জীবকান্ত ভাবতে লাগল।

একবার হঠাৎ পিছনে ফিরে দেখতে পেল যে লোকেরা বিলের অপর একটি কোণায় মাছ ধরতে লেগেছে। এ-পারে মাত্র দু-তিনজন লোক উপুড় হয়ে শুয়ে, তার কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করছে, খুব সম্ভব রত্ন, বিজয় ও ডম্বরু। বাকি লোক কোনো ফাঁকে দুয়েকটা মাছ ধরতে পারে কিনা চেষ্টা করতে লেগেছে। কখন যে সব চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে গিয়ে সব সুনসান হয়ে গেছে—সে যেন এতক্ষণে টের পেল।

বিলের বিস্তীর্ণ বুকখানা রুপার থালার মতো ঝকমক করছে। পরিষ্কার নীল জলের উপর চক্ চকে রোদ পড়েছে, অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে চোখ যেন ধাঁধিয়ে যায়, ঝিমিয়ে পড়ে। কখন না-জানি বেলা পড়তে লেগেছে, সন্ধ্যে হতে আর কত দেরি? তাহলে অনেকক্ষণ ধরে সে আছে জলের উপর।

হঠাৎ নির্জনতার একটা ভয় জীবকান্তের সারা শরীরে কাঁপুনি ধরাল মাথার তালু থেকে পায়ের তলা অবধি। বাতাস বিলের বুকে ছোট-ছোট ঢেউয়ের কাঁপন তুলল, সেই ঢেউয়ের ছোঁওয়া লেগে তার বুকখানাও ভয়ে শিউরে উঠল যেন। এই যে চারিদিকে থলথল করছে জল, তার উপরে খোলা অকাশখানা যেন পলোর মতো তাকে মারার জন্য চেপে বসে অপেক্ষা করছে। একেই কি বলে মৃত্যু—মৃত্যুর কি এতখানি বিস্তার, মৃত্যু কি এই রকম উদার উন্মুক্ত, এমনি নিঃসঙ্গ মৃত্যু? 'ভূতগ্রস্ত মাছ' কথাটার অর্থ সে যেন এতক্ষণে বুঝতে পারল। সত্যিই তো, মাছটাই তো তার কাল হয়ে তাকে এই মাঝদরিয়ায় টেনে এনেছে। পলোর মুখ দুহাতে ধরে আছে মানুষ, পলোর ভিতরে বাঁধা অ-দেখা মাছ—এই দুয়ের মাঝখানে আর কেউ কি আছে? কেউ যেন বসে আছে দুজনের মাঝখানে, পলোর উপরেই। দুজনের মাঝখানে বসে আছে মহাকাল। মহাকাল দুজনের একজনকে কিংবা দুজনকেই টেনে নিচ্ছে তার নিজের বুকে। কেউ সঙ্গী নেই, দুজনেই একা। তার সারা শরীর যেন পাথরের মতো ঠাণ্ডায়, স্নায়ুমণ্ডলী অবশ হয়ে পড়ল। এখন যদি সে মাছ কিংবা পলোর মায়া ত্যাগও করে, এতখানি জল সাঁতার দিয়ে পারে পৌঁছানো তার পক্ষে অসম্ভব। হাত অবশ হয়ে গেছে, পায়ে সাড় নেই, বুকে একটা ব্যথা যেন বেড় দিয়ে ধরেছে। চোখের সামনে কিছু আর দেখা যাচ্ছে না—যেন ভোরের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে সব কিছু ধূসর। হাতিতে কুমিরে যুদ্ধের সেই আখ্যানটা মনে পড়ে গেল, "গজেন্দ্র শরণ নিলা ত্রাহি হরি বলি।" এই তো মরণ। কে একজন সাধু বাবাজি কবে যেন হাত দেখে বলেছিল জল থেকে জাতকের ভয় হতে পারে। সে কথাটা মনে পড়ে গেল। গলা ছেড়ে কাকে যেন ডাকতে ইচ্ছা হল—কাকেই বা ডাকবে, বাপধনকে? বাপধনের মাকে? আহা, ঠিক এই মুহূর্তে কেউ যদি ওদের মুখ দুটি একবার ওকে দেখিয়ে যেত! বাপধন বড়ো হতে এখন অনেক বছর। কে ওকে খাওয়াব, কে-ই বা পরাবে? কে দেখাশোনা করবে? এ-বছরটা চলে যাবে হয় তো—ভাতে ভাতে। কিন্তু তারপর?

হঠাৎ চৈতন্য ফিরে পাবার মতো সে চমকে উঠল। দেখল মাছটা তাকে অন্য পারের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। ভগবান, তুমি আছ, আছ তুমি! পলোটাতে ছোঁওয়া থেকেই সে অনুভব করল মাছের আগের শক্তি আর নেই, পড়ে এসেছে। একবার যদি পায়ের তলায় মাটি ছুঁতে পারে তা হলে মাছকে রুখতে আর বেগ পেতে হবে না। সমস্ত শরীরটা গরম হয়ে উঠল। কী সব আজেবাজে অলক্ষুণে চিন্তা এতক্ষণ ওকে পেয়ে বসেছিল। মাছ ধরতে

হয় এবং ধরে খেতে হয়, ভগবান তাকে মানুষের খাদ্য করেই সৃষ্টি করেছেন। আগামী কাল বছরকার দিন—ভোগালি বিহুর পৌষ-সংক্রান্তি।....এ কী! হে ভগবান, এ তো দেখছি পারের দিকেই টেনে নিচ্ছে। তার কয়েকটা হাত মাত্র, তার পরেই মাটিতে পা দিতে পারবে।

কিন্তু......

জল থেকে সদ্য তোলা মাছের মতো হঠাৎ তার বুকখানা ধড়ফড় করতে লাগল। যদি—যদি দড়িটা ছিঁড়ে যায়! পুরনো দড়ি, এতক্ষণ টানাহেঁচড়ার পর কি টি কে থাকবে? হে ভগবান, এর চেয়ে যে ঢের ভালো হত গভীর জলে থাকতে যদি মাছটাকে তুমি মুক্তি দিতে। এখন কি তীরে এসে তরী ডুববে? এত কি নিষ্ঠুর হবে তুমি?

জীবকান্ত দেখতে পেল অপর প্রান্তে পলো, তৃণখাঁচা ও আর সব সরঞ্জাম ফেলে লোকেরা পড়িমরি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে যে-পারটায় তার আসবার কথা, সেই দিকে। অবশ্য তাদের এসে পৌছতে অনেক দেরী, কত দূর থেকে ছুটে আসছে তারা!

একবার ভগবানের নাম স্মরণ করে জীবকান্ত পা দিয়ে মাটি ছুঁল। হ্যাঁ, এই তো মাটি, স্পষ্ট অনুভব করছে পায়ের তলায় এবার সে মাটি পেয়েছে। মাছটাও খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। এক গলা জল, এক বুক জল, পেট অবধি জল, কোমর অবধি জল। পলোটা একটু টেনে ধরতেই মাছ স্থির হয়ে গেল। এই মুহূর্তে অসতর্ক হলে সর্বনাশ। মাছ যদি গায়ের জোর করে, কিংবা মানুষ যদি বেশি জোর-জবরদস্তি করতে যায়, তাহলে দড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে কিংবা পলোর কাঠি ভেঙে যেতে পারে। ভগবান তুমি আছে—সংক্রান্তির আগের রাতে নৈবেদ্য দেব তোমায়..... 'লরা তিরোতা গএগ—অঙ্গহি বঙ্গহি'—ছেলে বৌ, আর গাঁয়ের সব লোক ..... আত্মীয়-কুটুম্ব....

কিন্তু মাছ? মাছটা স্থির বসে বসে কী করছে, কী ভাবছে? ....তারও কি তিথি উৎসব আছে?... সে-ও কি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে? 'লরা-তিরোতা-গএগ অঙ্গহি....'। মাছের পথ চেয়ে কি তার ছেলে-বৌ অপেক্ষা করে আছে বাপধনদের মতো?... একটু আগেই তো... সে নিজে গভীর জলে ভাসতে ভাসতে নিজের জীবনের আশা বিসর্জন দিয়ে ভগবানের কথা ভাবছিল। তখন তার কাছাকাছি কেউ তো ছিল না—'লরা-তিরোতা-গএগ'—কেউ না। মহাসাগরের বুকে কেবল দুটি প্রাণী মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, সঙ্গে কেউ ছিল না—না মাছের না মানুষের। দুজনেরই এক নিঃসঙ্গ। তার ডম্বরু, তার গাঁয়ের লোক তো পার থেকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল কেবল। মাছের আপনজন, তারও আপনজন—কেউ কিছু তো করতে পারল না তখন। সকলেই 'চক্ষে শুধু দেখে কাল ধরে কতক্ষণে'। মহাকাল যখন দুজনের চুলের মুঠি ধরেছিল সেই মুহূর্তে তার একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র মিত্র, ভাই বলো, বন্ধু বলো—ছিল পলোতে বাঁধা এই মাছটা, আর মাছেরও একমাত্র মিত্র, ভাই বা বন্ধু ছিল মাছের শত্রুরূপে সে অর্থাৎ মানুষটা। দুয়ের মৃত্যু আসন্ন থাকার সময় পরস্পর পরস্পরের পরম আত্মীয় হয়ে এক সঙ্গে ঘুরেছে ফিরেছে। কথা হলে মাছটাই তো তার পরম আত্মীয়! দুজনে তারা পরম বন্ধু, গলাগলি বন্ধু— !

এই প্রকাণ্ড শক্তিশালী মাছটা এতক্ষণ নিজের দাপটে ছটফট করে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে এসে পড়েছে হাতের মুঠোর মধ্যে। ওদিক থেকে যারা দৌড়ে আসতে লেগেছিল, তারা প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। ডম্বরু দৌড়চ্ছে সবার আগে। এখন সবাই এসে পড়বে তাকে সাহায্য করতে। ... কিন্তু আমরা যে পরস্পরের পরম বন্ধু—বিপৎকালের বন্ধু। ওই যে ওরা এলেই—মানুষ এলেই মাছ..ডম্বরু এসে গেল বলে! আর যে সময় নেই মাছ, আর তো সময় নেই।

ইতিমধ্যে ডম্বরু এসে জলে নেবেছে। সময় নেই মাছ, সময় নেই! টান মারো দড়ির ফাঁসে—লাগও টান। চট্‌পট দড়িতে টান মেরে জীবকান্ত গিঁটটুকু খুলতে লাগল।

পিঠখানা নুইয়ে, গলা অবধি জলে ডুবিয়ে প্রাণপণে ফাঁস খুলতে লাগল জীবকান্ত—এমনভাবে যাতে মাছটা কষ্ট না পায়। ডম্বরু এসে এবার প্রায় ধরে ফেলবে তার পলোটা। অন্যেরাও সব কাছাকাছি এসে পড়েছে।

আর যে সময় নেই মাছ, আর যে সময় নেই মাছ। এই তো সময়...

ফাঁস খোলার সময় মাছের কষ্ট হল।

ঘাউপ করে ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হল। পলোতে হাত ঢুকোতে যাবার মুহূর্তে ডম্বরুর বুকখানা কেঁপে উঠল সেই শব্দে। শেষ শক্তিতে দড়ির ফাঁসটুকু খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আহত মাছটা বাকি দড়িটুকু ছিঁড়ে ফেলল। প্রকাণ্ড মাছটা তিন হাত ঘাই মেরে পড়ল গিয়ে গভীর জলে।

কী প্রকাণ্ড মাছ রে বাবা! খালি পলোটার হাঁমুখের মতো ডম্বরু অবাক হয়ে মুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। কী আশ্চর্য, কাকা এমন মাছটা ছেড়ে দিল।

"পুরনো দড়ি, ছিঁড়ে দিল।" মাছ যেখানে পড়েছে সেখানকার ঢেউগুলো পলোর মতো গোল হয়ে, বৃত্তের পর বৃত্ত সৃষ্টি করল বিলের জলে। এই বৃত্তগুলি দেখতে দেখতে অস্ফুট স্বরে জীবকান্ত বলল, "পুরনো দড়ি, ছিঁড়ে দিল।" ঢেউগুলি পারের দিকে আসতে গিয়ে জীবকান্তের পায়ের উপর মৃদু হয়ে লাগল। যেন কতকগুলি নরম অর্থহীন আধো-আধো ঢেউ ছোট-ছোট মাছের মতো তার পায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

পলোটা ডম্বরুর হাতে দিয়ে জল ভেঙে পারের দিকে এগিয়ে এল জীবকান্ত।

ততক্ষণে পারে যেন সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে।

অনুবাদ : ক্ষিতীশ রায়

২.১ ❒ কাহিনি-সংশ্লেষ—নিবিড় পাঠ

গল্পটি জেলেদের জীবনের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের বর্ণনায় শুরু হলেও লেখক একটি মাছের প্রতীকে একটি মানুষের জীবনসংগ্রাম ও শেষে প্রয়োজনের চেয়ে মানবিক মহত্ত্বে মহনীয় হয়ে ওঠার একটি ব্যতিক্রমী আখ্যান শুনিয়েছেন।

কাহিনিটি মাঘের বিহু সংক্রান্তির দিনটিতে চিত্রিত। সকালবেলাই পরিবারের মুখে বাচ্ছরকার দিনে হাসি ফোটাতে জীবকান্ত ভাইপো ডম্বরুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মাছ ধরতে। তার মনে ভারি আনন্দ—বেরোবার সময় তিন বছরের পুত্র তাকে আশ্বাস দিয়েছে সে খুব বড়ো মাছ পাবে—হাসিমুখে শিশুর অবোধ কথায় সায় দিয়েছে তার স্ত্রীও। আসলে আজ চার বছর ধরে শুধুই কুচো মাছ, বা বাটা, আড়, বরালি গোছের অকুলীন মাছ সে ধরতে পেরেছে। তাই কুলীন মাছ অর্থাৎ প্রকাণ্ড একটা রুই বা কাতলা ধরে বাড়িতে উঠোনে ধপাস করে ফেলে তার স্ত্রীর অপরিসীম আনন্দ আর পড়শিদের বিমুগ্ধ দৃষ্টির দৃশ্যটা দেখার সাধ তার অনেকদিনের। আজ যেন মানসচক্ষে সেই ছবিটাই সে দেখতে পাচ্ছে—কারণ আজ তার অন্তরাত্মা তাকে বিশ্বাস করতে বলেছে, পাবেই পাবে সে বড়ো মাছ।

দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে জেলেদের মাছ ধরার প্রস্তুতির কথা সবিস্তারে বলেছেন এরপর লেখক। বস্তুত পুরো গল্পটিই যেন প্রত্যক্ষদর্শীর চোখ দিয়ে দেখা—প্রতিটি দৃশ্যের অনুভব যেন সরাসরি স্পর্শ করা যায় মুদ্রিত অক্ষরের বিন্যাসে।

লম্বা আকৃতির জেলেরা পোলো আর তৃণখাঁচা নিয়ে চলে গেল মোষখুঁটি বিলের একধারে যেখানে কোমর প্রমাণ জল—তাদের মধ্যে রয়েছে গ্রামের সেরা সাঁতারু জীবকান্ত-ও, তবে বিলটি আকৃতি ও গভীরতায় প্রায় একটি সাগর। তাই অতি দুঃসাহসী ও নিপুণ জেলেরাও কিনারা থেকে খুব বেশি সরে যায় না। প্রায় জনা চল্লিশ জেলের একটি দল তৎপরতার সঙ্গে নানা জায়গা থেকে মাছ ধরতে উদ্যত হয়। কিন্তু খানিক পরেই তারা যেন ঝিমিয়ে পড়ে। অন্যদিনের মতোই আজও যে পলোতে ধরা পড়ে শুধুই কুচো মাছ। বড়ো মাছের ওঠবার কোনো লক্ষণই না দেখে উৎসাহে ভাঁটা পড়ায় অনেকেই ফিরে যায় কিনারায়। কেউ আবার এই সময়েও প্রচলিত ছড়া কেটে পরিবেশটি হাল্‌কা করে দিতে সচেষ্ট। শুধু আশা ছাড়েনি জীবকান্ত—কারণ তার মন বলেছে, সন্তান বলেছে, স্ত্রী আশ্বাস দিয়েছে দিনটা তার বৃথা যাবে না।

এই নিস্তরঙ্গ পরিবেশে হঠাৎ ঘটে একটা কাণ্ড যা কপালগুণে দুর্ঘটনা না হয়ে ঘটনাই হয়। জনাদশেক জেলে, যাদের মধ্যে জীবকান্তও ছিল, সমান্তরাল সারিতে মাছ ধরছিল। একটি প্রকাণ্ড মাছ জীবকান্তের বাঁদিকের চারজনকে ডিঙিয়ে এক প্রচণ্ড ঘাই দিয়ে লাফিয়ে তারই নাকে লেজের ঝাপ্‌টা মেরে ডানদিকের আরো চারটি লোক পেরিয়ে জলে আছাড় খেল। যে মাছ প্রায় দশটি লোকের সমান দূরত্ব এক ঘাইতে পেরোতে পারে তার শক্তি সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের অবকাশই থাকে না। তাই জীবকান্তের ভাগ্য যে লেজের ঝাপ্‌টাটা তেমন জোরালো হয়নি—হলে তার নাকটা ভেঙে যেত নিঃসন্দেহে। অনিবার্য অঘটনটি না ঘটিয়ে এতক্ষণের নিস্তেজ, নিরুৎসাহভাব কেটে পুরো দলটি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে মাছ ধরতে সচেষ্ট হল। সাহসে ভর করে বেশ গভীরে গলা-জলে চলে গেল বড়ো মাছ ধরবার আশায়। তবে সকলেই শঙ্কিত হয়ে রইল, কেননা যার পলোতেই পড়ুক না কেন, গভীর জলে প্রকাণ্ড মাছকে ধরে রাখার দুঃসাহস কারোই হবে না—কারণ মাছ একবার যদি পলো থেকে পালাতে পারে, তাহলে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে পলো ধরে-থাকা জেলেটিকেও।

কিন্তু নাকে লেজের ঝাপ্‌টা খেয়ে জীবকান্তের মনে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কপালের শিরা ফুলে উঠেছে তার। এক অদ্ভুত দৃঢ়তা এসেছে তার মুখের রেখায়—চার বছর ধরে যে আশা সে পোষণ করে এসেছে—আজ যেন তা সফল হবার শ্রেষ্ঠ সুযোগ তার সামনে। লেজের ঝাপ্‌টায় অনিবার্য দুর্ঘটনাটি না ঘটায় সে আরো নিঃসংশয় হয়েছে নিজের সম্ভাব্য সাফল্যের বিষয়ে।

প্রবল এক শব্দে সে প্রাণপণ শক্তিতে পলোটা দিয়ে সেই মাছটিকে চেপে ধরে তার ওপর বসে পড়ে। তার পাশে রত্নাকর জেলে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে যাতে সে পলো থেকে পড়ে না যায়। বড়ো মাছ ধরা পড়েছে বুঝতে পেরে এক বৃদ্ধ ও অতি অভিজ্ঞ জেলে তিন-তিনবার জলে ডুব দিয়ে উঠে এসে বিস্ফারিত চোখে সকলের দিকে তাকায়। তার এই ভঙ্গিমায় সকলে বোঝে অকল্পনীয় আকারের একটি মাছ ধরা পড়েছে। পিঠের তৃণখাঁচাটি থেকে সে দড়ি ছিঁড়ে নেয় জলের তলায় মাছটির গলায় দড়ি পরিয়ে তাকে কাবু করতে। আসলে এই অবস্থার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না, তাই আলাদা মোটা দড়ি আনেনি কোনো জেলেই। ফলে, পুরোনো, ছোটো পাটের দড়ি দিয়েই বাঁধতে হবে মহাশক্তিধর মাছটিকে।

সাতবার ডুব দিয়েও যখন মাছটার গলায় অভিজ্ঞ বুড়ো জেলে দড়ি পরাতে পারল না তখন অবশেষে সে সিদ্ধান্তে এল সে এটি এই মোষখুঁটি বিলে আদ্যিকাল থেকে বিরাজমান কিংবদন্তির ভূতগ্রস্ত মাছ। বস্তুত এই কিংবদন্তিটি গ্রামের সকলেই জানে এবং বিশ্বাসও করে। তার ওপর এই জেলেবুড়ো তাদের সকলের ওস্তাদ—তার

বাক্য গুরুবাক্য—বেদবাক্যের সমান। এই মাছের অলৌকিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষ নিদর্শনও নাকি একবার পাওয়া গিয়েছিল—তবে সেকালে। কোন এক জেলে নাকি একবার তার পলোয় মাছটিকে ধরে ছিল—সেই রাত থেকে তার প্রবল জ্বর আসে তারপর বিকারে মাছের কথা বক্‌তে বক্‌তে সমস্ত চিকিৎসা পণ্ড করে, এমনকী মন্ত্রতন্ত্রও নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়ে সাতদিনের মধ্যে সে মারা যায়। ঘটনাটি হয়ত বা ঘটেছিলো সেকালে, ফলে কোনো প্রত্যক্ষদর্শী ছিলো না ঠিকই, কিন্তু লোকমুখে প্রচারিত হয়ে একাল অবধি প্রবাহিত হয়ে কিংবদন্তির রূপ নিয়েছে।

প্রবল ত্রাসে বুড়ো শুদ্ধু প্রায় সকলেই চেঁচিয়ে উঠে জীবকান্তকে মাছটা ছেড়ে দিতে বলল। কিন্তু একালের যুবকরা, যেমন রত্ন, জীব প্রমুখ অলৌকিকতা, ভূতমাছ ইত্যাদি জল্পনায় বিশ্বাস করে না। তাই সব সতর্কতা অগ্রাহ্য করে তারা কিন্তু মাছটিকে ধরে রাখবার প্রয়াসেই সচেষ্ট হয়।

এবারে রত্ন আর বিজয়কে পলোটা আঁকড়ে থাকতে বলে জীব নিজে জলে নেমে যায় মাছটির গলা দিয়ে দড়ি ঢুকিয়ে পলোর কাঠির সঙ্গে বেঁধে তাকে জব্দ করতে। প্রায় আধঘণ্টার অধ্যাবসায়ের পর জীবের জেদের জয় হয়। মাছটিকে সে বেঁধে ফেলতে পারে পলোর সঙ্গে। এই পৌষের শীতেও তারা সবাই ঘেমে নেয়ে স্নান করে গেছে এই অমানুষিক জয়ে।

অলৌকিক বিশ্বাসের ওপর প্রত্যক্ষ বাস্তবের জয়ে তারা যেই একটু হাঁফ ছেড়েছে অমনি আবার একটা কাণ্ড ঘটে গেল। জীবকান্তের হাতদুটি আল্‌গা হবার সুযোগে মাছটি সর্বশক্তিতে ঘাই মেরে পলোটাকে টানতে টানতে চলে গেল বিলের একেবারে মাঝখানটায়—যেখানে জলের গভীরতা মাপা যায় না। আর নিয়মমতোই তার সঙ্গে টেনে নিয়ে গেল জীবকান্তকেও।

এবারে বিশ্বাস টলে গেল যুবকদেরও। মাঝবিলে প্রকাণ্ড মাছটির সঙ্গে পাল্লা দেবার অর্থ যে সলিল সমাধি সেটা তাদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠল। আশেপাশের সমস্ত লোক পারের দুধার দিয়ে দৌড়োতে লাগল চেঁচাতে চেঁচাতে যাতে অন্তত এবারে জীবকান্ত মাছটির আশা ছেড়ে দেয়। বিজয় আর রত্নাকর পলো ফেলে সাঁতরে এগোতে থাকে বন্ধুকে বাঁচাতে।

কিন্তু বিশাল সমুদ্রের মতো বিলের মাঝখানে প্রবল শক্তিধর মাছটির সঙ্গে পারবে কেন জীবকান্ত? তাই বঁড়শির ফাত্‌নার মতো সে মাছটির প্রবল টানে সে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকে। বন্ধুরাও দিশেহারা হয়ে যায় অবিরত এই ঘূর্ণানে চেষ্টা করেও পৌঁছোতে পারে না মাঝদরিয়ায়। ফিরে আসে কিনারায়।

কিন্তু অক্লান্ত জীব ভেসে চলে, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় মাছটির 'আকর্ষণ'-এর কাছে মানসিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। পিঠে থেকে তূণজালটা খসিয়ে দেহকে অরো ভারমুক্ত করে দুহাতে পলো ধরে লড়তে থাকে অসম লড়াই—মাছে ও মানুষে—জীবে ও 'ভূতে' (হয়ত বা!)। তার অর্ধচেতন মনে শুধু এটুকু বোধ জাগ্রত আছে যে মাছেরও ক্লান্তি আসে। তাই সে ভেসে থাকে কারণ এ মাছ তুলতে না পারলে তার জীবনই বৃথা—ছেলের, স্ত্রীর হাসিমুখ দুটিও মনে পড়ে তার। যদি তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তবে এই মহাকায় মাছটিকে ধরে সে গাঁয়ের সবাইকে ভোজ দেবে—আর চণ্ডীমণ্ডপে প্রদীপ দেবার মানতও করে।—তাই মাছটি তাকে ধরতেই হবে পৌরুষের সাহায্যে।

এতসব অনুভূতির মাঝে জীবকান্ত খেয়ালই করেনি যে বেলা পড়তে শুরু করেছে। সব কাজ ও চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে চারিদিক সুনসান হয়ে গেছে। এবারে ধূধূ আকাশের নীচে প্রকাণ্ড, প্রায় খাঁ-খাঁ বিলটির নির্জনতায় এবং নিজের একাকীত্বে সে ভয় পেয়ে যায়। খোলা আকাশটাকে তার একটা প্রকাণ্ড পলোর মতো মনে হয়। তা যেন

তার ওপর চেপে বসে তাকে মেরে ফেলবে, যেমনভাবে সেও এই মাছটিকে চেপে ধরে মারতে চেয়েছে। তার মনে পড়ল ডাঙায় মানুষের জোর থাকলেও, জলে জোর মাছের। নিজের এই অসহায় অবস্থাটা তার কাছে জলের জীবের হাতে ডাঙার জীবের ধরা পড়ার মতো বলে প্রতীত হতে লাগল। এতদিনকার চেনা ছক উল্টে গিয়ে জেলের হাতে মাছের ধরা পড়ার বদলে সেই যেন মাছের হাতে ধরা পড়েছে। আতঙ্কে সে ভাবতে থাকে এটি 'ভূতগ্রস্ত' মাছ বলেই আজ এমনভাবে চেনা ছবিটা বদলে গেছে। তাই মাছটাই তার কাল হয়ে টেনে এনেছে মাঝদরিয়ায়, তাকে মৃত্যুর মুখে দাঁড় করাতে। জীবকান্তের মনে হয় তার এবং তার তখনো অবধি না দেখা শত্রুর ভাগ্য যেন একই সূত্রে গাঁথা। মহাকাল যেন পলোয় চেপে দুজনের মাঝখানে বসে নিজের বুকে টেনে নিচ্ছে দুজনকেই। জলে দুটি প্রাণী থাকলেও তারা এই প্রেক্ষিতে তারা কেউ কারুর সাহায্যকারী হতে পারে না কারণ তারা যে পরস্পরের শত্রু —তাই দুজনেরই একত্রে থেকেও একা।

ভয়ে, ঠাণ্ডায় জীবের শরীর অবশ হয়ে এল। মাছটাকে ছেড়ে দিলেও যে সে আর সাঁতরে পারে পৌঁছোতে পারবে না তা বুঝতে পেরে বুকে একটা ব্যথা অনুভব করে—ঝাপসা হয়ে আসে চোখের দৃষ্টি। মনে ভাসে পরিবারের কথা। নিজের আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায় তিনবছরের সন্তানের ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের শঙ্কায় সে কাতর হয়ে গেল।

সম্পূর্ণভাবে যখন সে ত্রস্ত হয়ে পড়েছে মৃত্যু-চেতনায়, তখন হঠাৎ যেন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল তার—দেখল অবশেষে ক্লান্ত মাছটি তাকে টেনে নিয়ে চলেছে অন্য পারের দিকে যেখানে বিজয়, রত্নাকর আর ডম্বরু ডাঙার ওপর হয়ে শুয়ে মাছে-মানুষে এই অদ্ভুত লড়াইটি নিরীক্ষণ করছে। এতক্ষণের অবশ ঠাণ্ডা দেহটা আবার নতুন উদ্দীপনায় গরম হয়ে উঠল—কারণ জলে জোর মাছের হলেও, ডাঙায় জোর তো মানুষেরই। ক্ষণেক আগে শঙ্কা-উৎপন্ন অযৌক্তিক চিন্তাগুলিও নিমেষে দূর হয়ে গেল। মনে পড়ল ভগবান মানুষের খাদ্য হিসেবে মাছ সৃষ্টি করেছেন। তাই ভোগালি বিহুতে পৌষ-সংক্রান্তির বিশেষ দিনটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে তার এই সার্থকতায়।

কিন্তু নিজের এ হেন সৌভাগ্যের সম্ভাবনাতেও হঠাৎ সে আশঙ্কিত হয়ে পড়ে—গত চার বছরের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ায় হয়ত শঙ্কাটা ফিরে এল। পুরোনো ছোট্টো পাটের দড়ি যদি এতো টানাহেঁচড়ায় ছিঁড়ে যায় তাহলে তীরে এসে তরী ডুববে।

কিন্তু আর সবাই সে কথা ভাবেনি। তাই প্রায় অসম্ভব কাজটি ঘটিয়ে ফেলে অলৌকিকতার কল্পকাহিনি, 'ভূতগ্রস্ত' মাছের মিথের দফারফা-করে-ফেলা পড়শি জেলে জীবকান্তের সাহায্যে ছুটে আসে সমস্ত মানুষ।

কিন্তু তাদের পৌঁছোতে অনেক দেরি। তাই জীবকান্ত পায়ের তলায় মাটি স্পর্শ করেই ভগবানের স্মরণ নেয়—অর্চনা করে বলে নৈবেদ্য দেবে সে এবং তার পরিবার।

ঠিক এইখানে এসে গল্পটির ব্যতিক্রমী আখ্যানভাগটির সূচনা হয়।

দীর্ঘ সময় ধরে যাকে পরম শত্রু জ্ঞানে লড়াই চালিয়েছে জীবকান্ত, আজ তাকে পরাস্ত করার মুহূর্তে অদ্ভুত এক বোধে আক্রান্ত হল সে। খানিক আগে সে যখন মৃত্যুর সম্ভাবনায় শঙ্কিত ছিল—তখন সে তার জন্য প্রতীক্ষারত পরিবারের কথা ভেবেছে, ভগবানের কথা ভেবেছে। আর এখন মাছটি যখন তারই মতো মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে, তখন সেও কি তার মানুষ শত্রুর মতোই মাছ-ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে—তারই মতো ব্রতের মন্ত্রোচ্চারণে জীবনকামনা করছে, মাছের পথ চেয়ে মাছবউ আর তার বাচ্চারা কি বসে আছে?

নিজের সঙ্গে মাছের এই অদ্ভুত সমীকরণ প্রয়াসের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে খানিক আগে মাছ-মানুষের গহন, গভীর বিলের বুকে একত্রিত অবস্থানের প্রেক্ষিতটি। জীবকান্ত অনুভব করেছিল নিজের সম্পূর্ণ-একাকীত্বের পাশে একমাত্র মাছটিই ছিল তার সঙ্গী—হলেই বা শত্রুরূপে। তার এবং মাছের লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে তাদের দুজনের আপনজনেরাই ছিল অসহায় দর্শকমাত্র—মানুষেরা ডাঙায়, মাছেরা জলে। এখন নিজের বিজয়ের মুহূর্তে জীবন ফিরে পাওয়ার স্বস্তিদায়ক অনুভূতিতে জীবকান্তের মনে হচ্ছে মাছটিকে শত্রু ভাবা, হয়ত ভুল ছিল। দুজনেই যখন মহাকালের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল—যখন এর বা ওর, কিংবা দুজনেরই মৃত্যু ছিল প্রায় অনিবার্য তখন সেই বিপর্যয়ের মুহূর্তে আসন্ন মৃত্যু যেন একই বন্ধনে গ্রন্থিত করেছিল তাদের দুজনকে। আত্মীয়বন্ধন কি ভালোবাসার বন্ধন যাদের সঙ্গে, তারা তো কেউ-ই সাথী হতে পারেনি দুজনেরই। অর্থাৎ সেই মুহূর্তে পলোয় বাঁধা মাছ আর মাছের টানে পলোর সঙ্গে আটকে থাকা মানুষ—দুজনে ছিল পরস্পরের পরম আত্মীয়ের মতো। শত্রুর পরিচয়ে যে সংযোগ সূচিত হয়েছিল গোড়ায়, মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে সেই পরিচয় লুপ্ত হয়ে যেন বন্ধুর পরিচয়টাই বড়ো হয়ে উঠেছিল। কারণ তখন তাদের দুজনেরই শত্রু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বয়ং মৃত্যু তার অনিবার্যতা নিয়ে। মহাকালের নির্দেশিত মৃত্যুর তো আর তাদের পরস্পরের শত্রু হিসেবে পরিচয়ের সুবাদে ভিন্নভিন্ন আচরণ করেনি দুজনেরই সঙ্গে। বরং মহাকাল দুজনের 'চুলের মুঠি' ধরে বুঝিয়ে ছেড়েছিল জীবনের প্রান্তসীমায় শত্রুতার বোধ থাকে না—থাকে শুধু একবুক ভীতি—মাছেরও, মানুষেরও, কারণ মহাকালের বিচারের নিক্তিতে দুজনেই সমান।

ঠিক এই ব্যাখ্যাটি থেকেই লেখক যেন গল্পটির নামকরণের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যঞ্জনা সঞ্জাত করেছেন। বস্তুত জীবনে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মাছ ও মানুষ—কিন্তু মহাকালের অমোঘ ও নিষ্ঠুর আঘাতে তারা দুপক্ষই প্রতিভাত হয় অসহায় ক্ষুদ্র জীবে। তাই মাছের লড়াই আর মানুষের লড়াই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে—কে মানুষ আর কেই বা মাছ—সেই পার্থক্যও যেন ঘুচে গেছে অবস্থাগতিকে। তাই জেলেও মাছকে পরম মিত্র বলে ভাবতে পারছে। আর পারছে বলেই এক লহমায় যেন জীবকান্তের এক মানসিক রূপান্তর ঘটে গেল। এতক্ষণ ধরে মাছটিকে ধরাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তার সাফল্যেরও মাপকাঠি ছিল। কিন্তু এখন তার বিপদের একমাত্র সঙ্গীকে আর 'মানুষের' হাতে তুলে দিতে মন চাইল না। কারণ মাছ তো মানুষের খাদ্য, তাই মানুষ এলেই অর্থাৎ ডম্বরু আর মানুষবন্ধু বিজয়রা এলেই মহাবন্ধুর বিপদ হবে।

প্রাণপণে ফাঁস খুলতে সক্রিয় হল জীবকান্ত। পাটের দড়ির গিঁট খুলে মিত্রকে সে ছেড়ে দেবে—যাতে ফিরে যেতে পারে নিজের লোকেদের কাছে। নাটকীয় ক্লাইম্যাক্সের মতো করে লেখক শেষাংশটি সাজিয়েছেন—একদিক দিয়ে ছুটে আসছে জেলে-মানুষেরা—আর অন্যদিকে এক নিঃস্পন্দ মানুষ তার 'অ-মানুষ' মাছ বন্ধুটিকে মুক্তি দিতে মরিয়া। এখন সে যেন আর জেলে নয়—শুধুই মানুষ; যে চায় না মুক্তির মুহূর্তে বন্ধুটি কষ্ট পাক।

সময় কমে আসে। ভাইপো ডম্বরু পলো হাতে পৌঁছে গেল—কাকা দড়ির ফাঁস খুলে ছেড়ে দিল সকলের পরমকাঙ্খিত মহামৎস্যটিকে। বিস্মিত ভাইপোকে সে পুরোনো হওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে যাবার বিশ্বাস্য গল্পটিই বলল—তারপর জল ভেঙে ফিরে এল ডাঙায়—তার নিজের জগতে, তার আপনজনদের কাছে এক বুক তৃপ্তি নিয়ে।

ততক্ষণে সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে পারে এই অদ্ভুত জেলেটিকে দেখতে। সকালবেলা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তখন জীবকান্ত জানত দিনটা তার জন্যে ভারি শুভ। বিশাল একটা মাছ ধরে আনতে পারলে

গ্রামের সবাই ভেঙে পড়বে তার আশেপাশে। তাই ঘটল—তবে অন্য কারণে। মাছ-বন্ধুকে ছেড়ে দিয়ে পার্থিব লোকসান হলেও, জৈবিক প্রয়োজনের চেয়ে মানসিকতাকে বড়ো করে তোলার পরিতৃপ্তি, সে পেল, তা ওই সামান্য লোকসানের চেয়ে ঢের বেশি। এমন প্রাপ্তি যেদিনটাতে হলো, তা তো সত্যি সত্যিই শুভদিন। সন্তানের আশ্বাস, স্ত্রীর হাসি সব সার্থক হয়ে উঠল তার মনে। আর রইল সারা গ্রামের সঙ্গ—বিস্ময়ে কিংবা শ্রদ্ধায়।

২.২ ❒ সান্তিয়াগো এবং জীবকান্ত

কথাসাঙ্গে এসে প্রখ্যাত আমেরিকান লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সী' উপন্যাসটির প্রসঙ্গ টেনে আনা জরুরি। এই গল্পের সঙ্গে সেটির রয়েছে এক আশ্চর্য মিল। সেখানে সান্তিয়াগো নামে এক ব্যর্থ বুড়ো জেলের সমুদ্রে গিয়ে জলের রাজা একটি অতিকায় মার্লিন মাছ ধরে ফেলার পর তাকে বঁড়শিতে গেঁথে নিয়ে সাতদিন ধরে অসীম আকাশের নীচে দিগন্তবিস্তারী জলে ভেসে বেড়াবার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সেখানেও জীবকান্তের মতোই ঐ বুড়োও মাছটির সঙ্গে সংগ্রাম করেছে মরণপণ করে ; হাল ভেঙে, বৈঠা ভেঙে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েছে সেও। একাকীত্ব কাটাতে সেও কথা বলেছে মাস্তুলে-বসা ছোট্টো পাখিটির সঙ্গে, কখনো পরমশত্রু মাছটির সঙ্গে। আসলে দুজনেই সেখানেও লড়াই করেছিল একই শত্রুর বিরুদ্ধে—যে হল আসন্ন মৃত্যু। তাই যখন কাহিনির শেষে জীবকান্তের মতোই মাছটিকে পরাস্ত করতে পারল সান্তিয়াগো, টেনে আনতে পারল ডাঙায় তখন প্রতিহিংসার ভাবটি তার মনেও আর রইল না।

৩.১ ❒ কাহিনির চূড়ান্ত উপলব্ধি

কিন্তু দুটি কাহিনিতে পার্থক্যও রয়েছে। জীবকান্ত মুক্তি দিয়েছিল তার পরমশত্রুকে। সান্তিয়াগো তা পারেনি। তার ছোঁড়া বর্শার ঘায়ে আহত মাছটির রক্তের গন্ধে পালে পালে হাঙর এসে ছিঁড়ে খেয়েছিল মার্লিনটির শরীর। বুড়ো চেষ্টা করেছিল বৈঠা দিয়ে তাদের প্রতিহত করতে, হেরে গিয়েছিল। ফিরে এসেছিল শুধু মাছের বিশালকায় কঙ্কালটি নিয়ে। তার গল্পটি শেষ হয়েছিল আপাত ব্যর্থতায়। হয়তো সে কাহিনিতে যে কথা বলতে চেয়েছিলেন হেমিংওয়ে, "Man can be destroyed, but he can never be defeated"—এই গল্পেও মানুষের সেই অপরাভবী সত্তাটির বিজয়ই ঘোষিত হয়েছে শেষে। কিন্তু এ গল্পের সমাপ্তিতে মাছটিকে মুক্তি দেবার মাধ্যমে প্রতিহিংসার ওপর, জৈবিক প্রয়োজনের ওপর মানুষের তথা মানবিকতার যে জয় সর্বময় হয়ে থেকেছে, তার আবেদন এর দশ আগে লেখা হেমিংওয়ের গল্পটির থেকে যে অনেকটাই আলাদা সে কথা বলাই বাহুল্য।।

টড়্পা

(ওড়িয়া)

গোপীনাথ মহান্তি

১.১ □ কাহিনি

টড়্পা তার নাম। সব নামের মত সে নামও এক প্রতীক, সেইটুকুই তার সার্থকতা। নইলে শব্দ হিসাবে সে নাম শুনে কিছু বোঝা যেত না।

এও সম্ভব যে ভাষার নিয়মের দিক থেকে সে শব্দেরও কিছু অর্থ আছে;কিন্তু নামের অর্থ মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখে না। তার সম্পর্ক নাম যারা দেয় তাদের সঙ্গে। সেদিক থেকে আলোচনা করলেও এখানে তা কোনো কাজে আসবে না। কারণ টড়্পা লোকটি ওড়িশার বাসিন্দা হলেও তার ভাষা ওড়িয়া নয়, কন্ধ। আর তাদের সমাজে বাপ-মা ইচ্ছেমত নাম দিতেও পারে না। উৎসুক গাঁয়ের লোক সবাই এসে জড়ো হয়। কন্ধ পুরোহিত ফর্দ -করা কতকগুলি নাম বলে যেতে থাকে, পুজো-আর্চা চলতে থাকে। ভুঁয়ে পড়ে থাকে সদ্য বলি-দেওয়া মুরগীর রক্ত, আর আলোচাল, মুরুজ। ধুনোর ধোঁয়া উঠতে থাকে। দেবতার ভর-হওয়া বুড়ী মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে চাল ফেলতে থাকে মাটিতে একটি একটি করে—জলভরা হাঁড়ির ভিতর থেকে তুলে তুলে। যে নাম বলতে বলতে চালটা খাড়া হয়ে দাঁড়াল বলে সে বুড়ীর চোখে ঠাহর হয়, সেই নাম দেওয়া হয়। 'টড়্পা'র আরম্ভটা অনুমান করা যেতে পারে, অর্থ নয়।

সে জন্য আবার হাতড়ে হাতড়ে বেয়ে উঠতে হবে উজানে, কোন নাম-না-জানা অতীতের পানে, যখন তৈরী হয়েছিল নামের এই চিরায়ত মালা। কে করেছিল? কেন?

নিয়মগিরি পর্বতের 'ডংগরিআ' (পাহাড়ী) কন্ধদের শুধোলেই অন্যান্য গবেষণার মত এ গবেষণারও সহজ উত্তর সঙ্গে সঙ্গে মিলে যায়—কে করেছিল? তুমি আমি করেছিলাম নাকি? 'মাহাপুরু' (মহাপ্রভু) করেছিল। সবই তো সে করেছে এই 'ডংগর' (পাহাড়), বন, উপর, নীচ, দিন, রাত—সব। ছেলেমানুষের মত কত শুধোস? জানিস না সে করেছে বলে?

কাজেই বুঝে নিতে হয়—যে 'মাহাপুরু' এই সব সৃষ্টি করেছেন—তার ভিতর আবার এই কোরাপুট জেলার পাঁচ হাজার ফুট উঁচু অবধি চাড়া দিয়ে ওঠা নিয়মগিরি পর্বত আর তার উপরের বাসিন্দা 'ডংগরিআ' কন্ধ, আর তাদের রীতিনীতি ও ভাষা—তিনিই সৃষ্টি করেছেন এই সুন্দর নামটি : টড়্পা, কী উদ্দেশ্যে তা তিনিই জানেন আর তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে এই ব্যক্তিটি পেয়েছে এই নাম।

গড়-গড়, খড়-খড়, দুড়-দাড় পাথরের আওয়াজ, গাছের গায়ে ঠক-ঠক কুড়ুলের চোট আর একটা নিরবিচ্ছিন্ন বিস্মৃতি। ঐ টড়্পার নামের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় কোথায় কোন পঞ্চাশ মাইল লম্বা বিশ মাইল চওড়া মালভূমি, থাকে থাকে পর্বতের বিমান সাজিয়ে তৈরি, গাছ কেটে কেটে নেড়া হয়ে গেছে তার কত ঠাঁই। সারা পর্বত জুড়ে চাষ, নয়তো বাগান। এক পাহাড়ে কলাগাছ তো আর এক পাহাড়ে পা থেকে মাথা অবধি কমলার বাগান, আনারসের

বাগান, কাঁঠালের বাগান—চলেইছে মাইলের পর মাইল। আর কোথাও চাষ করতে করতে মাঠ ধুয়ে গিয়ে দেখা যায় শুধু কালো পাথর, সেখানে একগাছি ঘাসও গজায় না, শেওলা হয় আর শুকোয়। আর কোথাও আজও ভীষণ বন, গাছে লতায় জড়াজড়ি, বাঁশ বন, নানা জাতের গাছের বন। তিন ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ দূরে দূরে কোথাও বা এক একটি গাঁ। সেখানে পাঁচ ঘর কি পনের ঘরের বাস, তারপর আবার জঙ্গল।

টড়পার সঙ্গে তখনও তাদের দেখা হয় নি। বাইরে-থেকে-আসা কর্মীর দল তেমনি ভীষণ বনের মধ্যে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে দিয়ে নেমে নেমে চলেছিল। তখন রাত সাড়ে নটা, আশ্বিনের শেষ। এমনিতেই তো নিয়মগিরিতে রোদের দিনেও শীত। পায়ে হেঁটে পাহাড় বেয়ে নামার তাতে শরীরের ভিতরটা গরম গরম লাগলেও গায়ে ঢাকা দিয়েছিল শীত, তবে তাতে আর কষ্ট হচ্ছিল না, একরকম গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। শীত করার মত তাদের মনে ফাঁকা অবসরও ছিল না। সাতটি মানুষ, আঁধার বনের নিচে দিয়ে দিয়ে সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গের মত পায়ে চলা পথ টিল আর পাথর-ছড়ানো উঁচু-নিচু জমির উপর দিয়ে বেঁকে বেঁকে নেমে গেছে। সেই পথে পা টিপে টিপে নেমে চলেছে একজনের পিছনে আর একজন। পথের ধার ধার দিয়ে ঘন গাছপালার আড়ালে পাতালের মত খাদের ভিতর দিয়ে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে, তার শব্দই শোনা যায় কেবল। সর্বদা ভয়, একটু বেহুঁশিয়ার হলে এই বুঝি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় সেই খাদের ভিতর। সামনের লোকের হাতে একটি মাত্র টর্চলাইট, সাতদিন ধরে নিয়মগিরি গস্তের পর তার ব্যাটারি কমজোর হয়ে গেছে, বুঝে শুনে জ্বালতে হয়। এদিকে সদাই আতঙ্ক—বাঁ দিকের ঢালুর ঘন বনের ভিতর থেকে হঠাৎ কখন বড় বাঘ লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়বে, নয়তো সোজা সামনে এসে হাজির হবে। তাই তারা মাঝে মাঝে কথাবার্তা বললেও মোটের উপর চুপচাপ হয়েই চলেছে। আর মাঝে মাঝে যেখানে বাঁ দিকের বনের মধ্যে এক একটা ফাঁক—যেন নিঃশ্বাস নেবার ফুটো—সেখান দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে তারা দেখে চাঁদনী রাত, পাহাড়ী - নদীর কালো জলে শুয়ে শুয়ে চাঁদ হেসে চলেছে। ওপাশে যেখানে পাহাড়ের উপর চাষ হয়েছে সেখানে বাজরা, 'গান্টিআ' ভুট্টা, শ্যামা ধান, আর মাড়ুয়ার ফসল সব যেন ঘুঁটে একাকার হয়ে গেছে চাঁদের আলোর ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশার মধ্যে। চোখের সামনে ঝোলে কোথায় দিগন্তের শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে-পড়া স্বপ্নের মত ছবি। স্বপ্নমায়া কত পর্বত, কত উপত্যকা, কত খাড়াই-গড়াই সব তা'তে গলে মিশে থাপ খেয়ে যায়। আলো-আঁধার বস্তু-ছায়া-মেশা নানারূপ, চুপচাপ।

একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে তারা সে দৃশ্যের দিকে চেয়ে থাকে। যেন সেই ক্ষণটুকু তারা আপনা ভুলে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হয়। তেমনি নির্জন শুনশান। আবার তেমনি পূর্ণ, তেমনি স্থির, সময়হীন, তেমনি হারাই হারাই।

আর তেমনি থেকে না-থাকার মত—মায়াসৃষ্টি।

তারপরে আবার আঁধারের গুহার ভিতর গড়ানে গর্ত। বনের কন্দরে সরু চলা পথে তারা নেমে যায়। বুক ছম ছম করে। কে জানে কখন ফুরাবে সে পথ। বনের জন্তু-জানোয়ার, আচমকা আছাড়, আর অজানা বিপদের আশঙ্কায় এক এক সময় দম আটকে আসে।

তারা নিয়মগিরি পর্বতের 'ডংগরিআ' কন্ধদের গ্রাম ঘুরে দেখতে এসেছিল, শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে। সবার আগে উন্নয়ন আধিকারিক পরশুরাম। লম্বা, পাতলা, আধাবয়সী প্রবীণ কর্মচারী, পাহাড়-জঙ্গলবাসী মানুষের আর্থিক উন্নয়নের উপায় চিন্তা করে করে বহু মাল অঞ্চল ঘুরেছেন। এসেছেন ভুবনেশ্বর রাজধানী থেকে। তাঁর পিছনে নৃতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ভরত। নানা জাতি নানা শ্রেণীর লোকের সামাজিক অবস্থা তিনি অধ্যয়ন করেছেন। কিছু লেখা ছাপিয়েছেন।

আরো দেখতে জানতে তাঁর খুব আগ্রহ। আকারে খাটো, গোলগাল, উৎসাহী, বয়স চল্লিশ। তাঁর পিছনে স্থানীয় কর্মচারী হরি পাণি, পাহাড়ের নীচে তাঁর উন্নয়নের কাজকর্ম। এবার নিয়মগিরির মালভূমিতেও কাজের পরিকল্পনা হয়েছে, তাই জায়গাটা ঘুরে দেখতে এসেছেন। ত্রিশ বছর বয়সের ছোঁচাপেটা শরীর, কালো মুগনি পাথরের মত। তাঁর পিছনে জঙ্গলগার্ড মধুসূদন, বয়স প্রায় আটান্ন, শীর্ণদেহ, বেঁটে বুড়ো মানুষ। নিয়মগিরি মালভূমিতে তিনি অনেক বছর ঘুরেছেন বলে সেখানে তাঁর সব চেনাজানা, তিনি এসেছেন এই বাবুদের সঙ্গে, তাঁদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার জন্য। তাঁর পিছন পিছন তিনজন চাপরাশী—মকর-অ, নজিরু, রামাইয়া। এমনি সাত জন।

বিষমকটক নামে এক রেল স্টেশনে নেমে নিয়মগিরি পর্বতের মালভূমির উপর উঠে কত গাঁয়ে থেমে থেমে তাঁরা এখন নেমে আসছেন মুনিগুড়া রেল স্টেশনে এসে উঠবেন বলে। সিধে রাস্তায় এই দুই স্টেশনের মধ্যে ব্যবধান পনের মাইল; কিন্তু এক জায়গায় পাহাড়ে ওঠা আর এক জায়গায় নামায় পঁয়তাল্লিশ মাইল। মালভূমিতে সাতদিন কেটেছে তাঁদের। রাস্তা নেই, খাদের খাড়া ধার দিয়ে দিয়ে সরু পথ। ছাতি-ফাটানো চড়াই, দেড় হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু, মাথা ঘুরে-যাওয়া খাড়া উৎরাই, পথে পথে থাকে থাকে পরতের পর পরত পাহাড়ে ওঠা আর নামা। থাকবার জায়গা নেই, 'ডংগরিআ' কন্ধদের আতিথেয়তায় তাদের এইটুকু-টুকু গুহার মত কুঁড়ে ঘরের সঙ্কীর্ণ অন্ধকার বারান্দায় বাস, পানীয় পাহাড়ী নদীর জল, তাতে ভেসে আসে উপরের গাঁয়ের ধুয়ে আসা যত কিছু—কন্ধ গাঁয়ে তিনদিন অন্তর মোষ কাটা হয়, ঝরণায় মাংস ধোয়া হয়, তাতে তার নাড়িভু ড়িও ফেলা হয়। সেখানে ডাক্তারখানা নেই, ডাকঘর নেই। দোকান-বাজার নেই। থানা পুলিস নেই। কোঠাবাড়ী তো দূরের কথা, খাপরেলও নেই। পুকুর-কুয়ো নেই, সভ্যতার নামগন্ধ নেই। কেবল পাহাড় জঙ্গল, পাহাড় জুড়ে নানা জায়গায় ফসল আর ফলের বাগান। আর আদিম অধিবাসী, যাদের নাম ডংগরিআ কন্ধ। তাদের সঙ্গে কিছু ডম্ব জাতির লোক, তারা কালক্রমে পাহাড়ের নীচ থেকে উপরে উঠে এসেছে জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে। কন্ধকে মদ দিয়ে, কিছু কিছু টাকা দিয়ে তার ফলের গাছগুলি বাঁধা নিয়ে নেয়। একবার এক বোতল মদ দিলে বছরকার মত একটা কমলা গাছ কি চারটে কাঁঠাল গাছ, দুটো টাকা দিলে এক বছরের জন্য এক প্রকাণ্ড কলাবাগান, কুড়িটা টাকা দিলে একর খানেকের আনারস বন, ঐ রকম উপায়েই হলুদ, অড়হর, রেড়ি, নানা ফসল। কন্ধ হাতে কোদাল কুপিয়ে কুপিয়ে সারা বছর ধরে ফসল লাগায়। রাত্রে ঠাণ্ডায় হিমে পড়ে থেকে হরিণ শম্বরের উপদ্রব থেকে ফসল আগলায়, তারপর ডম্ব এসে সে ফসল নিয়ে চলে যায়। পাহাড় থেকে বয়ে এনে হাটে বেচে, টাকা কামায়। ডম্ব আর কন্ধ আপন আপন সমাজের প্রথামত চলে। ডম্বের বড় বড় খোলা মেলা ঘর, চওড়া বারান্দা, পরিষ্কার, লেপা-পোঁছা। কারুকার্য করা কাঠের কবাট। নীচেকার লোকেদের মত স্ত্রীপুরুষ পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরে। শার্ট কোট শাড়ী ব্লাউজ, গায়ের কাপড়, সব ব্যবহার করে। খুব সকালে তার ঘরের দুয়ারের সামনের ধুলো ময়লা সাফ করে গোবর জল ছিটোয়, তার ছেলেপিলেরা দু'অক্ষর পড়েও। কখনো কখনো সে সুর করে পুরাণ পাঠ করে রোজগার করে, কেউ কেউ কাপড়ও বোনে। তবে জিনিষপত্র বয়ে হাটে নিয়ে গিয়ে বেচাই তার প্রধান বৃত্তি, স্ত্রীপুরুষ উভয়ে এই কাজে লাগে। এই ব্যবসার মাল জোগাড় করার জন্য আর কয়টি ব্যবসাও কেউ কেউ করে : লুকিয়ে মদ চোলাই করা বা চোরাই মদ বিক্রি করা, মাংসের জন্য গরু মোষ এনে কন্ধকে বেচা। আরো কত ফন্দি-ফিকির বৃত্তি-ব্যবসা জানে তারা, তার মধ্যে সব কিছু বেমালুম খাপ খেয়ে যায়, কেউ কিছু টের পায় না। ডংগরিআ কন্ধ থাকে তার নোংরা ময়লা ধুলোটে চালচলন নিয়ে। পুরুষ পরে কৌপীন, স্ত্রী সেই কৌপীনের ফেরতার উপর বোনা কাজ করে সুন্দর করে। স্ত্রী তার নিজের কোমরে জড়ায় তিন

হাতের একখানি মোটা কাপড়, বাইরে বেরুলে আর একখানি তেমনি কাপড়ে কোমর থেকে গলা অবধি ঢাকে। তার সাধারণ পরিধেয় কুটকুটে ময়লা, মাথার চুল ফুরফুরে রুখখু। পুরুষ নাকেও মাকড়ি পরে, কানে পরে তারের কুণ্ডল, তা থেকে কাঁচের দুল ঝোলে। মাথায় কপালের উপর পর্যন্ত গোল করে কামিয়ে মাঝখানের চুলে কাঁকুই গুঁজে খোঁপা বাঁধে, গলায় রং বেরং-এর কাঁচের মালা পরে, কাঁধে ফেলে টাঙ্গি, কোমরে একবিঘৎ লম্বা একখানি ছুরি ঝোলায়, হাতে নেয় 'ঢামনা' কাঠের সরুমুখো লাঠি, তার উপর দিকে খোদাইয়ের কাজ করা। স্ত্রী পরে হালি হালি রংবেরং-এর কাঁচের মালা, গিলটি-করা কাঁসা পিতলের নানা গহনা। পুরুষের মদের প্রতি বড় আসক্তি। শলপ গাছে রসের ভাঁড় লাগানো থাকে, পেলে গাছে চড়ে পেট ভরে রস খেয়ে নেয়, কিনতে মহুয়ার মদ পেলে সব রোজগার সেখানেই উজাড় করে দেয়, নেশায় মাতে, বেহুঁশ হয়। গাঁয়ে পাল-পার্বণ পুজো লেগেই থাকে। তাতে মোষ কেটে দেবতার কাছে বলি দিয়ে ভোগ দিয়ে বেঁটে নিয়ে মাংস করে খায়, আত্মীয় কুটুম্বকে ভোজ দেয়। সারা বছর ধরে খেটে খেটে এত ফসল ফলিয়ে, এত মূল্যবান আনারস কমলা পাকা কলা হলুদ কাঁঠাল অড়হর রেড়ি নানা ফসল এত বিপুল পরিমাণে ফলিয়েও ডংগরিআ কন্ধ যে গরিব সেই গরিব। বছরে চার মাস বর্ষাকাল, ঘরে শস্যের অভাব হয়। আমের আঁঠির ভিতরকার তেতো শাঁস, শাক, বাঁশের কোঁড়, শলপ কাঠের ধুলো, কত রকম কত রকম করে কখনো বা কিছু শ্যামা ধান বা মাড়ুয়া থাকলে তাই মিশিয়ে সে দিনের পর দিন চালিয়ে নেয়।

তাঁরা দেখে দেখে আসছিলেন সেই চাল-চলন—আধিকারিক পরশুরাম, অধ্যাপক ভরত, কর্মচারী হরি পানি। জঙ্গল-গার্ড মধুসূদনই কেবল যা বুঝতে বলতে পারে ডংগরিআ কন্ধের ভাষা। সেই সুবিধাটুকু নিয়ে কন্ধদের নানা প্রশ্ন করে নানা খবর তাঁরা নোটবুকে টুকেছিলেন। কন্ধের উপকারকল্পে সাতদিন ধরে তাঁরা বহু আলোচনা করেছেন, বহু ভাবনা ভেবেছেন। সেই সাতদিন মনুষ্যজাতি বলতে যেন তাঁদের মনে এসেছে কেবল ডংগরিআ কন্ধ, স্থান বলতে কেবল নিয়মগিরি পর্বতের মালভূমি;এমনি ভাবনার নেশায় তাঁরা গাঁয়ে গাঁয়ে পথে পথে ঘুরে ঘুরে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। এমনি কারণেই সেদিন মুটাগুণি ছেড়ে বেরুতে বেরুতে তাঁদের চারটে বেজে গেল। তাঁদের জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে ভারী পাঁচজন তার ঘন্টাখানেক আগেই রওনা হয়ে গেছে। দেরির জন্য তাঁদের ভাবনা ছিল না, মধুসূদন তাঁদের বলেছিলেন যে মুটাগুণি থেকে মুনিগুড়া পাহাড়ী উৎরাইপথে তিন ক্রোশের কিছু বেশী, যদিও এমনিতে প্রায় পনের মাইল। তারপর যেতে যেতে পথে দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁরা ডংগরিয়া কন্ধের বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন, অধ্যাপক ভরত অনেক ফোটো তুলেছিলেন, আরো তোলেন। দেরি হল।

সমস্যা তো সবাইকার জানা, সমাধান কী? তারই উত্তর খুঁজতে খুঁজতে পথ কেটে যায়। জিজ্ঞাসা করায় জঙ্গল-গার্ড মধুসূদন তার মত ব্যক্ত করলে।

—আজ্ঞে, আমি দেখে দেখে বুড়ো হলুম, এদের যেমন দেখেছিলুম এরা তেমনিই আছে। এমন ভাল বুঝদার লোক দুনিয়ায় আর বোধহয় নেই। অন্যায় বা মিথ্যের ধারে কাছেও যাবে না, যা দেবে বা করবে বলে কথা দেবে তা থেকে এক চুল এদিক ওদিক হবে না। কিন্তু তাকে বদলাতে বললে বদলাবে না। দাঁত মাজবে না, ছুঁচোবে না, লেখাপড়া শিখবে না, মদ ছাড়বে না, আমরা যতই উপদেশ দিই ভাল কথা বলি সে শুনবে না, বলবে—আগে থেকে তো এমন চলন নেই।

হরি পানি নিজের মতের উপর জোর দিয়ে বললেন—আজ্ঞে, সব বদলাবে, এরা আপনা-আপনি বদলাবে। আগে দরকার পাকা সড়ক, নিয়মগিরির অন্ধিসন্ধি যাতে ঘোরা যায়। সড়ক হয়ে এই আঁধার বন খুলে গেলে সভ্যতা

আপনি এসে পড়ে। বাইরে থেকে কেউ এলে তাদের থাকবার জায়গা চাই, খাবার জল চাই, অন্যান্য সুবিধে চাই। এদের মধ্যে কাজ করার জন্য অনেক কর্মী চাই। এ কাজ একেবারে কুড়ি পঁচিশ লক্ষ টাকা নিয়ে শুরু করতে হবে, চাষবাস ফল বাগানের কাজ, ছাগল শুওর মুরগী পোষার কাজ, স্কুল, ডাক্তারখানা, কোনো কিছু ফ্যাক্টরি—সব রকম। এত কথা কী, এইখানে যদি খনি-টনি বেরিয়ে পড়ত তাহলেই তো বসে যেত এক রাউরকেলা, এদের বদলাতে সময় লাগত না।

ভরত বললেন—এদের খালি বদলাবার চেষ্টা করাইতো উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, ভাবতে হবে কী করলে এদের ভাল হয়। শোষণ চলতে-থাকা অবধি যতই এরা রোজগার করুক হাতে কিছুই থাকবে না। যারা শোষণ করেছিল, যারা শোষণ করছে, তাদের কি এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে? তারাও তো এদেশের নাগরিক। কিন্তু শোষণ হয় কেন? সে কি কেবল শোষকের আক্রমণের জন্য, না শোষিতের মধ্যেই নিহিত শোষিত হবার প্রবণতার জন্য? উভয়েই দায়ী। এই যে প্রবণতা আমরা কন্ধের মধ্যে দেখে এলাম তা একদিনে গড়ে ওঠেনি। সে যেভাবে বেড়েছে, মানুষ হয়েছে, যেসব রুচি রীতিনীতি বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছে, জীবনের প্রতি তার যে দৃষ্টিভঙ্গী—এই সব মিলে তাকে এমনি করেছে। সে তার দেবতাদের তুষ্ট করতে, পিতৃপুরুষ আর মরে-হেজে যাওয়া মানুষের আত্মাকে তুষ্ট করতে মহিষ বলি দেবে, ভোজ দেবে, মদ খাওয়াবে, এসব থেকে তাকে নিরস্ত করবে কে? শীতের দিনেও তাকে এই পাহাড়ে থাকতে হয়, কাজ করতে হয়, খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাতে হয়, কাজেই শরীর গরম রাখতে তাকে মদ খেতে হবে। তার ফুর্তি করার অন্য কিছু নেই, তাই মদের ফুর্তিই তার কাছে বড়। মদ-মহিষ-চলা অবধি সে পয়সা ওড়াবে, শোষণকারীকে ডেকে আনবে। শিক্ষিত হলে তার রুচি বদলাত। কিন্তু তার আশঙ্কা তার ছেলে লেখাপড়া শিখলে পাহাড়ে ফলের চাষ কি ফসলের চাষ করবে না। সে আশঙ্কাও অমূলক নয়। কাজেই স্কুল খুললেও সে পড়াশোনা করতে নারাজ। পাহাড় জঙ্গলে চাষ ছাড়া তার অন্য জীবিকা নেই, চাষ না করতে চাইলে তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। মোটের উপরে শিক্ষিত না হলে সংযম ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন না করলে তার অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হবে বলে আমার মনে হয় না। তার জন্য অনেক খরচ, অনেক কর্মী, অনেক ব্যবস্থা তো দরকারই, আরো দরকার অনেক সময়। তার মনকে তৈরি না করে হঠাৎ তার উপরে আমরা পরিবর্তনের বান ডাকিয়ে দিলে ভাল করতে গিয়ে মন্দ হবে, তার জীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

আর পরশুরাম বললেন—তাহলে আমরা কি শুধু হতাশভাবে তাকিয়েই থাকব? কবে লক্ষ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে, বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়া হবে, ডংগরিআ কন্ধের আজ যে ছেলে জন্মাচ্ছে কত না কত বছর পরে সে লেখাপড়া শিখে, নতুন মানুষ হয়ে নতুন সমাজ গড়বে—সে পর্যন্ত আমরা চুপচাপ বসে থাকব? আর সে এমনি অজ্ঞান অশিক্ষা দারিদ্র্য শোষণের মধ্যে না-মানুষ না-জন্তু হয়ে দিন কাটাতে থাকবে? তাহলে তার সম্বন্ধে আমাদের এত শত জেনেই বা লাভ কী? কেবল আমাদের কৌতূহল মেটাব আর সেই জ্ঞান শিকেয় তুলে রাখব, ব্যস্ এই? না, তার চাইতে বরং আমরা কিছু কাজ আরম্ভ করে দিই। সব গ্রাম না হোক কয়েকটি গ্রাম নেওয়া যাক। ঘর ঘর ঘুরে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হোক। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের এতে রাজি করান হোক। তারা যা বিক্রি করবে সরকারকে বিক্রি করুক, যা কিনবে সরকারের কাছ থেকে কিনুক। তার জন্য একটা দুটো দোকান খোলা হোক। তাদের আবশ্যক মত সরকার থেকে তাদের ঋণ দেওয়া হোক, যাতে তারা আর কারও কবলে না পড়ে। তাদের সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য তাদের মধ্যে কর্মিকেন্দ্র খোলা হোক। একটি স্কুল বসানো হোক। ওরা যেই দেখবে

এই নতুন পথে তাদের রোজগার বাড়ছে তখন ক্রমে তাই অবলম্বন করবে। বাইরের শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে আসতে আসতে ক্রমে ওদের রুচি ও স্বভাবও বদলাবে। এরই সঙ্গে সঙ্গে চলুক ওদের আরো ভাল ফলচাষী করে তোলার জন্য তালিম দেওয়ার কাজ, আরো ফলের গাছ লাগানোর কাজ। ক্রমে হাওয়া খেলবে, অন্ধকারের ভিতর একটু আলো পড়বে, আর একটু, তার পর আরো একটু।

অধ্যাপক ভরত বললেন—এতেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যেত তবে তো হতই। কিন্তু তা কি হবে? ওরা পয়সা উপায় করতে শিখবে কিন্তু তা কী করে রাখতে হয়, খরচ করতে হয় তা শিখতে এক যুগ লাগবে। যে এখন ওদের ফসল নিয়ে নিচ্ছে, ঠকিয়ে ভাড়িয়ে হাত করে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিয়ে আসার জন্য পরিশ্রম করছে, আর তা বিক্রি করে পয়সা রোজগারের বুদ্ধি আঁটছে—সে আর ফসল না নিয়ে বরং আরো সহজে কন্ধদের ফসল বিক্রির টাকাটাই মদের হাঁড়ি দিয়ে টেনে নেবে, সে না নিলে তার মতো আর কেউ নেবে। পয়সার লোভ নতুন অনর্থ শেখাবে, ওদের সরলতা সাধুতা যাবে। ক্রমাগত বাইরের লোকের সংস্পর্শে এসে ওরা ফাঁকিবাজি ফন্দিবাজি শিখবে। কারও কোনো প্রভাবের রকমই এই—তার খারাপ গুণগুলিই আগে শিখে নেয় মানুষ। ওরা হয়ে উঠবে সুবিধাবাদী, কর্জ নিয়ে টাকা ডোবাবে, ঋণশোধ এড়াতে নিজের জিনিষ লুকিয়ে-চুরিয়ে পরকে বেচবে, পয়সা থাকলে হাটে কিনবে আর না থাকলে সরকারী দোকানে আসবে, বার বার নতুন শোষণের মধ্যে পড়বে। এমনি সব অবাঞ্ছিত ব্যাপারও তো ঘটতে পারে। যে আজ এমনি অশিক্ষিত থেকে মদের নেশায় ডুবে থেকে নিজের শারীরিক ক্ষুধা মেটানোকেই এতবড় বলে ভাবছে, যার মন নানা অন্ধবিশ্বাসের দরুন ভয় আর সন্দেহে ভরা, সে যে এত সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে তা কি তার উন্নত মনের জন্য না তার চোখ খোলেনি বলে? জেনে বুঝে সত্যাশ্রয়ী হয় জ্ঞানী, যে বোঝে যে ভোগের চাইতে ত্যাগ বড়, যে সংযম শিখেছে, জীবনকে সাধনা বলে জেনেছে, আদর্শকে বুঝে চোখের সামনে স্থির করে রেখেছে। তেমন লোকও কখনো টলি-টলি করে, হোঁচট খায়; কখনো বা আত্মবিশ্বাস হারায়, নিজের ত্যাগ-তপস্যার জন্য অনুতাপ করে। আর এখানে তো সে জ্ঞান কি সংস্কৃতির কিছু দেখি না। নিজের মদ মাংস ফূর্তি ছাড়া আর কিছু নেই। সে সত্যি কথা বলে, মিছে কথা ফেঁদে তা সামলাবার মত বুদ্ধি তার যে নেই তা নয়। কিন্তু তার সঙ্গে আছে তার মনের অনেক অজানা ভয়। যেই সে বুঝতে শিখবে সেও হবে মিথ্যাবাদী, ফন্দিবাজ ঠক, শোষক। তার দুর্দশায় আমার খুবই দুঃখ হয়, কিন্তু তার সে দুর্দশা কেবল তার অন্নবস্ত্রের নয়, তার চেয়ে বেশী, তার মনের। এত দুর্দশায় পড়েও তার সদগুণ আছে, কী উপায় করলে তার এই সদগুণ নষ্ট হবে না অথচ যে গুণ, নেই তা আসবে, মন্দ গুণ মন্দ বুদ্ধি আসবে না, সেই উপায় করতে পারা চাই। কিন্তু যত ভাবছি খালি ভাবছিই, পথ দেখতে পাচ্ছি না।

পরশুরাম বললেন—মনের এই সমস্যা কেবল ডংগরিআ কন্ধের নয়, দুনিয়ার সব মানুষের সমস্যা, কারও বেশী কারও কম। সে সমস্যা দূর হতে পারলে যুদ্ধ হিংসা মিথ্যা স্বার্থ অশান্তি অমঙ্গল সব দূর হয়ে যেত। অনেক ভেবেছেন অনেক জেনেছেন এমন লোকে তার পথ বলে গেছেন, হাজার হাজার বছর ধরে বলে আসছেন, কিছু হচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে কি কিছু করা হবে না? এমনি নিঃসহায় নিরাশ্রয় হয়ে এ বেচারারা পাহাড়ে পড়ে থাকবে, যা রোজগার করবে বারো ভূতে খেতে থাকবে! তাদের আর্থিক উন্নতি করতেই হবে, তাই করতে করতে ক্রমে তাদের মানসিক সামাজিক সব উন্নতি হবে। মনে মনে সেই কাজের মুসাবিদা করছি, সমস্যা এতরকমের যে সেজন্য নানানটা ভাবছি। দেখুন, ভাবুন সবাই। কিছু একটা করতেই হবে। না হলে আমাদেরই ভাই-বোন এরা এখনও পড়ে থাকবে

পশুর মত, এত দুঃখ কষ্ট সইতে থাকবে, দুনিয়ায় আজ কে কী হয়ে বসে আছে, আর এরা যেন সেই কোন শ' শ' বছর আগেকার অতীত যুগের মানুষ এখনো। এদের জন্য কিছু না করে খালি তাত্ত্বিক আলোচনা করতে থাকলে কেটে যাবে আরো কত শ' বছর, এরা এমনিই থাকবে আর নয়তো হঠাৎ এদের উপর এসে পড়বে এমন কোনো উৎকট প্রভাব যার ফলে এরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকতেও পারবে না।

মধুসূদন বললেন—আমি, আজ্ঞে, এদের বড় দুঃখ-দুর্দশা দেখেছি।

হরি পানি বললেন—তাতে আর সন্দেহ কী। দুঃখ বলে দুঃখ! কে-ই বা কিছু করতে পারে—রাস্তা ইত্যাদির সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত? এরা আপনি আমাদের কাছে আসবে, না এত পাহাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে আমরাই এদের কাছে সর্বদা যেতে পারব? আর যে-ই আসুক, সে মানুষ তো। অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ, নানান অসুবিধা আর মানুষের অসাধ্য পরিস্থিতি—এসবের মধ্যে সে কাজ করবে কি? আগে দরকার কাজ করার মত সুবিধা। তা না হওয়া পর্যন্ত মুখেই সবাই হাঁ হাঁ বলব, কাজের বেলা আর একরকম। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে। আজকালকার যুগে কতকগুলি মানুষ এমনি অবস্থায় পড়ে থাকাটা সকলের পক্ষেই একটা কলঙ্ক।

তাঁরা মন খুলে যে যার মনের কথা বলছিলেন, কথা বলতে বলতে আপন চোখের সামনে আপন মনে তার ছবি আঁকছিলেন। তারপরে চুপ করছিলেন। মনে মনে সেই সমস্যা নিয়ে অনেক ভাবছিলেন। আর যখন ভাবছিলেন তখন পথ কেটে যাচ্ছিল, ভয় আর শারীরিক ক্লেশও ভোলা যাচ্ছিল। পরের সুখদুঃখের মধ্যে নিজের মন ডুবিয়ে দিলে নিজের দুশ্চিন্তা যেমন ভোলা যায়, তেমনি। আবার সে ভাবনার ঘোর পাতলা হয়ে এলে তখন মনে পড়ছিল নিজেদের তখনকার অবস্থা, ভয়, ক্লান্তি। ক্রমে সেই চেতনা তাঁদের মনের উপর সওয়ার হচ্ছিল, সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো পিছনে পড়ে যাচ্ছিল।

এমনি সময়ে এক জায়গায় নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে সামনে দেখা গেল একটা ছায়া। নড়ছিল, স্থির হল। পরশুরামের পিছনে দলটি দাঁড়িয়ে পড়ল। পরশুরাম টর্চের আলো ফেললেন। দেখা গেল, একটি লোক। খালি গা, কৌপীন পরা, কাঁধে টাঙ্গি, বয়স কুড়ি কি পঁচিশ হবে। ডংগরিআ কন্ধ।

কে তুমি?—পরশুরাম হাঁকলেন।

—এয়েছিলি নাকি বাবু? যাচ্ছিস? আমি টড়পা।

দলের সবাই তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সে প্রথমেই আবদার করলে—বিড়ি দে একটা। মধুসূদন বিড়ি বার করলেন, পরশুরাম দিলেন দেশলাই। সে বিড়ি ধরাল। তারপর দেশলাইটা মুঠো করে ধরে বললে—এটা আমি নিলাম, আর দেব না।

—আরে দেশলাই নিলে আমাদের অসুবিধে হবে রে—হরি পানি বললেন।

—সে কথা আমি শুনব না। মা-বাবার কাছে না নিলে কার কাছে নেব?

—আচ্ছা নিক, নিক—পরশুরাম বললেন—ভরতবাবুর কাছে বোধহয় আর একটা আছে।

—আছে, ভরত বললেন।

টড়পা খুশী হল। বললে—আসছিলাম, সেই যেখানে চেটালো পাথরের নিচে ঝোরাটা আছে সেইখানে একটু বসে ধোঁয়া খেলাম। তারপরে জানতে পারলাম তোরা সব আসছিস। অপেক্ষা করলাম, তোরা দেরি করলি। বুঝলাম তোরা চলতে পারছিস না। বন তো, পথ ভুলতেও পারিস। এত রাতে তোদের মত লোক এ পথে কখনো

তো দেখিনি। আন্দাজ করলাম বন দেখে তোরা ভয়ে ভয়ে চলেছিস্। ভাবলাম আমি থাকলে তোদের আর ভয় হবে না, পথ ভুলও হবে না।

হরি পানি জিজ্ঞাসা করলেন—এ বনে বাঘ আছে টড় পা? টড়পা হাসল, বলল—শুধোস না কেন, জলে মাছ আছে? আকাশে তারা আছে? বাঘ তো থাকতেই পারে, আছেই। সে যাবে কোথায়?

—কাউকে খেয়েছিল?

—খেয়েছিল? তোর খিদে পেলে তোর খাবার তুই খাবি না? কত লোককে খেয়েছে। সেই যেখানে ঝোরা আছে সেটাই তো তার বাসা।

ভরত বললেন—আর এত রাতে তুই একলা যাচ্ছিস্ তোর ভয় করছে না?

টড়পা বললে—তুই যখন রোট (road) ধরে চলে চলে যাস্ তোর ভয় করে? রোট ধরে যেতে যেতে মোটরচাপা পড়ে মানুষ মরে কি না? আমি দেখেছি তো অমনি। ওট তোদের রোট, এটা আমাদের রোট। আমার কিছু ভয় নেই।

পরশুরাম বললেন—তুই বাপু এই রাতে একলা এই বনে চলেছিস্ কেন? না গেলে চলে না?

—কেমন করে চলবে? টড়পা আশ্চর্য হল যে কেউ এমনটা ভাবতেও পারে। হাসল। বললে—রাতে ফসল আগলাতে তো ডংগর চড়ি, রাতে দরকার হলে তো বনের পথে বেরুই, আর আজ যে দরকার তার চেয়ে বেশী আর কিছু আছে? তুই বল।

—আরে, কাজটা কি?

—কাজ? পালটা প্রশ্ন করাই যেন তার কথা বলার ভঙ্গী। প্রশ্নটা করে সে একটু ভাবলে, বললে—কাজ তো কিছু নেই, রাতে কি জমিতে কোদাল কোপাব না গাছ কাটব না পাথর ভাঙ্গব? কাজ কিছু নেই; এমনি।

মধুসুদন বললেন—বললি যে কী দরকার আছে?

টড়পা হো হো করে হেসে উঠল—দরকার; হাঁ, 'ধাংড়ী বেণ্ট'—বাবু, পেনুবালি গাঁয়ে যাচ্ছি সেজন্য।

মধুসূদন হাসলেন। বাইরে থেকে আসা আর সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। তারপরে মধুসূদন কথাটা বুঝিয়ে দেবার পরে সবাই হাসলেন। তার মর্ম এই—'ধাংড়ী বেণ্ট' বলতে 'কনে শিকার'। এদের প্রথা এই যে এক গাঁয়ের যুবকেরা অন্য গাঁয়ের যুবতীদের সঙ্গে নাচবার জন্য ভিন গাঁয়ে যায়। তাদের সেখানে আদর অভ্যর্থনা করা হয়, একত্র নাচ গান হয়, রাত্রে সেখানে থেকে পিঠে পানা খেয়ে সকালে তারা ফিরে আসে। এই নাচগান মেলামেশার মধ্যে ভবিষ্যতের স্বামী-স্ত্রী বাছাবাছি হয়, ভাব আদর হয়, তার পরিণতি হয় বিবাহে।

—এত হাসচিস বাবু? টড়পা বলল পরশুরামকে—আজ না বুড়ো হয়েছিস্, কোনোদিন ধাংড়া ছিলি না তুই?

—ধাংড়া ছিলাম বই কি, তবে ধাংড়ী বেণ্ট করিনি, আমাদের ও রকম চলে না।

সবাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। উপর আর বাঁ দিক থেকে চাঁদের আলো ছিটিয়ে পড়ছিল। চারিধারে ঝুলছিল নানা চেহারার ছোট বড় ছায়া। চলন্ত জলে ঝনর ঝনর করে আওয়াজ উঠছিল যন্ত্রসঙ্গীতের আলাপের পূর্বাভাষের মত।

টড়পা পরশুরামের মুখের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর বললে—যে দেশে ধাংড়ী বেণ্ট নেই সে দেশের লোক মানুষ না জন্তু?

শুনে নৃতত্ত্ববিদ্ ভরত চমকে উঠলেন। এগিয়ে এসে বললেন—কেন?

টড়্পা বললে—দুজনে কথাবার্তা হাসি-তামাসা নাচগান করে দুজনকার মন জানলে তবে না দু'জনে মিলে ঘর করবে, তা নইলে কেমন করে হবে? তাই বললাম তারা মানুষ নয়, জন্তু। চিনবে না জানবে না, ভালবাসবে না, আবার ঘর করবে। ওই তলদেশের লোকেরা যেমন।—অবজ্ঞায় সে নাক বাঁকালো। নুড়নুড়ে নোলকের মত তার নাকের মাকড়ি তিনটে চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল। মুখে বললে—আমরা অমন নই, আমরা ডংগরিআ।

মধুসূদন বললে—ডংগরিআ, যারা এই নিয়মগিরির রাজা।

—তাইতো, জানিস তো সব।

ভরত শুধালেন—আচ্ছা, এ কি সত্যি যে তোদের ধাংড়ী তোদের কোলে বসে না, তোরা ধাংড়ীর কোলে বসিস?

টড়্পার আগ্রহ বেড়ে উঠল। মাথা ঝাঁকিয়ে সে বললে—সত্যি-সত্যি-সত্যি, ধাংড়ীর কোলে আমরা বসি। বলতে আপত্তি করল না, লজ্জা করল না, বরং উৎসাহ দেখাল। বললে—দে বাবু বিড়ি আর একটা।

ভরত তার মুখে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে দেশলাই ধরিয়ে দিলেন। একদমে প্রায় আধ ইঞ্চি সিগারেট পুড়িয়ে ফেলে সে তাঁর ঘাড় চাপড়ালে, কাঁধ চাপড়ালে। আবার যেন বাহাদুরি দেখানোর মত করে বললে—হ্যাঁ, ধাংড়ীর কোলে আমরা বসি। তুই বসিস নি কি বাবু?

ভরত সবাইকে হাসি সামলাতে ইঙ্গিত করলেন। তবু অনেকখানি হাসি চাপাচুপি সত্ত্বেও ফেটে-পড়ার মত শব্দ হল।

হরি পানি বললেন—আমরা জানি মার কোলে ছেলে বসে।

টড়্পা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে—কিচ্ছু কড়া নেই। বিড়ি থাকে তো দে। অ্যাঁ, মার কোলে ছেলে বসে? ঠিক, ও ধাংড়ী মা নয় কি? বল তুই, তুই আমি কি মা? আমরা যে ছেলে। ধাংড়ী যে মা। আমরা ছোট থাকলে মা'র কোলে বসব। বড় হলে, ধাংড়া হলে যে-ধাংড়ী আমাদেরকে রাজি হবে তার কোলে বসব।

টড়্পা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে—কিচ্ছু কড়া নেই। বিড়ি থাকে তো দে। অ্যাঁ, মার কোলে ছেলে বসে? ঠিক, ও ধাংড়ী মা নয় কি? বল্ তুই, তুই আমি কি মা? আমরা যে ছেলে। ধাংড়ী যে মা। আমরা ছোট থাকলে মার কোলে বসব। বড় হলে, ধাংড়া হলে যে ধাংড়ী রাজি হবে তার কোলে বসব।

হরি পানি বললেন—আর বুড়ো হলে কার কোলে বসবি?

টড়্পা বললে—খুব বুড়ো হয়ে যখন পড়ে যাব তখন আর একটি মার কোলে শোব। সে মাকে তুই জানিস না কি?

হরি পানি বললেন—কে?

—কে? এই বসুমতী, এই 'ধরতনী', সে তো সবাইকার মা, আর কে? সেই মা-টা জন্ম-দেওয়া মার মধ্যে আছে, ধাংড়ীর মধ্যে আছে, সব একটাই।

ভরত পরশুরামকে বললেন—এত কথা আছে?

পরশুরাম বললেন—আশ্চর্য।

সবাই পথ চলতে শুরু করলেন।

পরশুরাম টড়্পাকে বললেন—তাহলে সেই জন্য তুই যাচ্ছিস ধাংড়ীদের সঙ্গে একটু নাচ-গানের জন্য। পাঁচ

ছয় ক্রোশ পাহাড় নেমে এসেছিস, আরো নামবি তিন চার ক্রোশ। তোর দরকার খুব জবর বটে।

টড়্‌পা হাসল, বলল—গেল বুধবারের হাটে কথা দিয়েছিলাম যাব বলে, কথা ভাঙ্গব কেমন করে?

এল খাড়া-উৎরাই, মিশমিশে অন্ধকার বন। টড়্‌পা আগে আগে চলতে লাগল, বলল—ডর করিস্ নে, কোনো ডর নেই, আমার পিছুন পিছুন আয়।

পরশুরাম বললেন—আরে থাম, আমি আগেই যাই, টর্চ ফেলি।

টড়্‌পা বললে—আমার দরকার নেই। জোয়ান লোক, আমার চোখে পথ দেখা যাচ্ছে।

যতই বোঝানো যাক সে কথা শুনলে না, জেদ—সে আগে আগে যাবে। বললে—এ বন, এ পাহাড়, এ যে আমাদের ঘর, তোরা যে আমার অতিথি। আমি তোদের আগ বাড়িয়ে নেব না তোরা আমায় পথ দেখাবি? আমাদের গাঁয়ের মাতব্বর লোকেরা শুনলে কী বলবে? দাউজ, মণ্ডল, লামু, বিশি মাঝি শুনলে কী বলবে? বলবে, টড়্‌পা তুই ছিলি, আমাদের গাঁয়ের নাম ডোবালি?

ভরত বললেন—আরে, জন্তু জানোয়ার থাকতে পারে—

—বনের জন্তু সব আমাদের ভাই। আসবে তো আসুক। তোদের কিছু ডর নেই।

তাঁরা ক্রমশ নীচে নামতে লাগলেন। এল শক্তা নদীর পার ঘাট, হেঁটে পার হওয়া যায়। চওড়া নদী, প্রশস্ত বালির চর। নিচে নেমে নদী পাহাড়ের তলা ঘেঁষে ঘেঁষে বয়ে গেছে।—ওখানে নয়, এই পথে—বলে টড়্‌পা পার হবার জায়গা দেখিয়ে দিলে। বললে—আমার পিছুন পিছুন আয়, নয়তো ওদিকে বেশী জল।

মোটে এক হাঁটু জল, কিন্তু হিম শীতল।

ও পারের বন পাতলা, খোলা। টড়্‌পা বললে—এবার আমি যাব। তোদের আর ভয় নেই। আর একটু গেলে খোলা জায়গা। সেইখানে আমি যাব ডান দিকে, তোদের পথ বাঁ দিকে। আমি গিয়ে উঠব পাহাড়ে, দুই ক্রোশ উঠলে পেনুবালি। তোদের সিধে রাস্তা। বন নেই, খোলা ক্ষেত, তারপর গাঁ, তারপর 'রোটে' যাওয়ার পথ। আচ্ছা আমি যাই।

তাঁরা দাঁড়ালেন। পরশুরাম বিনীতভাবে বললেন—তোকে ধন্যবাদ। ভরত বললেন—তুই আমাদের কত উপকার করলি। এমনি তাঁরা তাকে কৃতজ্ঞতা আর সম্মান জানাচ্ছেন, সে পরশুরামের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বললে—দেতো সিকি একটা, কিছু কিনে খাব।

পরশুরাম ও ভরত হাসলেন। সে আবদার করে বললে—দে দে, আমার বাবার কাছে না নিলে কার কাছে নেব? দে, কিছু কিনে খাব।

পরশুরাম পকেট থেকে দুটো দশ নয়া পয়সা বার করলেন। ভরতের পকেট থেকে বেরুল আর একটা। টড়্‌পার হাতে দেওয়া হল। এক এক করে প্রত্যেকের কাছে এসে বললে—যাচ্ছি? যাচ্ছি? পরশুরামকে বললে—যাচ্ছি বাপ-মা। তারপরে লম্বা লম্বা পা ফেলে আগে আগে চলে গেল। একটু দূর থেকে শোনা গেল তার গান।

তাঁরা এগিয়ে চললেন। তরতরিয়ে পা ফেলে সে কোথায় অন্তর্ধান করেছে।

কিছু দূর গিয়ে দেখলেন রাস্তার ধারে কী পড়ে আছে, চক চক করছে। ভরত নুয়ে পড়লেন দেখতে। ধুলোর উপরে একটি দশ নয়া পয়সা। তার কাছেই তেমনি আর একটা। সবাই থামলেন। সবাই বললেন, টড়্‌পার হাত থেকে পড়ে গেছে।

—পয়সার উপর লোভ নেই, তবে পয়সার জন্য এমন আবদার করছিল কেন?

বুড়ো মধুসূদন তার উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, ওটা ওর দক্ষিণা। মা-বাপ বলে চেয়ে সে হুজুরকে সম্মান দেখিয়েছে কিনা। ডংগরিআ তো অমনিই। এত বুদ্ধি থেকেও যেন ছেলেমানুষটি। যখন যেটা দরকার তখন সেটা চাই, পেলেই হয়ে গেল। পয়সা তো তার চোখে ধুলোবালি।

তাঁরা পিছন পানে চেয়ে দাঁড়ালেন। কুয়াশা ঘেরা জ্যোৎস্না-রাত মুড়ি দিয়ে নিয়মগিরি ঘুমুচ্ছে, লাগছে যেন সত্যি নয়, স্বপ্ন।

আবার পথ চলা। পরশুরাম বললেন—এবার আলোচনা হোক। ডংগরিআ কন্ধের উন্নয়ন হবে কী উপায়ে। আলোচনা চলল।

অনুবাদ ❑ জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার

২.১ ❑ কাহিনি-সংশ্লেষ ও নিবিড় বিশ্লেষণ ; নৃতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার এবং বন্ধ জীবনদর্শন

সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, প্রায়োগিক লোকসংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব, জীবনদর্শন এবং সর্বোপরি নিটোল সাহিত্য-আখ্যান—এই নানান উপাদানের অনুপম সংশ্লেষে গড়ে উঠেছে এই গল্পটি।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র—কন্ধ জাতিভুক্ত যুবক টড়পা যার নিবাস ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের সীমান্তবর্তী কোরাপুট অঞ্চলের নিয়মগিরি পর্বতের গহন জঙ্গলের প্রত্যন্ত গ্রামে। গল্পে তার উপস্থিতি ক্ষণস্থায়ী—কিন্তু এখানে সে আসে ওই আদিম মানুষগুলোর প্রতিভূ হয়ে—যাদের নিয়ে গবেষণা করতে বলে এসেছেন সরকারী উন্নয়ন আধিকারিক ও নৃতত্ত্বের অধ্যাপক। সরকারী কর্মচারী, জঙ্গলের গার্ড ও চাপরাশিরাও এই দলে রয়েছেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে।

বস্তুত এই সরকারী আধিকারিক ও অধ্যাপকের ক্ষেত্রসমীক্ষার সূত্রেই এই গল্পের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা টড়পাকে পাই সশরীরে। কিন্তু কাহিনি শুরুই হয়েছে তার উল্লেখে, বরং বলা ভালো তার নামের অর্থসন্ধানে। এই ব্যাখ্যানের মধ্যে দিয়েই এই গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে লোকসংস্কৃতির উপাদান। টড়পারা যে ডংগরিআ (পাহাড়ি) কন্ধ কোমের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে নামকরণে মা-বাবার কোনো ভূমিকা থাকে না। তাদের সমাজে নামকরণ উৎসবটি হয় সর্বসমক্ষে একটি লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে : কন্ধ পুরোহিত কতগুলি নামের ফর্দ পড়ে যায়—এদিকে পূজার্চনাও চলতে থাকে—বলি দেওয়া হয় মুরগি। তার রক্ত ও সঙ্গে চাল ছড়িয়ে থাকে মাটিতে। ধুলোর ধোঁয়ায় প্রায় আচ্ছন্ন প্রতিবেশে এক দেবতার ভর হওয়া বুড়ী মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে একটি জলভরা হাঁড়ি থেকে আরো চাল তুলে ফেলতে থাকে মাটিতে। এরই-মাঝে কন্ধ পুরোহিতের ফর্দ থেকে পড়ে যাওয়া নামগুলোর মধ্যে যে নামের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে থাকা একটি ভিজে চাল খাড়া হয়ে ওঠে বলে শুধু সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বুড়ী দেখতে পায়—সেইটিই নাম হয়ে যায় সদ্যোজাত শিশুটির। টড়পার নামকরণও এইভাবেই হয়েছিল।

এই প্রারম্ভিক বর্ণনার মধ্যে দিয়ে একই সঙ্গে লৌকিক আচার পালন, জাদুশক্তি, অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাস এবং সর্বোপরি গোষ্ঠীবদ্ধ কৌমজীবনের এক প্রাগৈতিহাসিক কালসুলভ আদিম ছবি ফুটে ওঠে। একালে বাস করেও

আসলে ডংগরিআ কন্ধরা যে 'ভূতকালের মানুষ'ই রয়ে গেছে 'অন্তরে ও বাহিরে' সেইটিই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 'মর্ডান-প্রিমিটিভ'রা সভ্যতার সিঁড়ির নীচের দিকের ধাপে অবস্থিত এক অদ্ভুত জীবনযাপন করে যা ওই সরকারী আধিকারিক কিংবা নৃতত্ত্বের অধ্যাপকের কাছে (যাঁরা আবার এ গল্পে আমাদের মতো তথাকথিত সুসভ্য, আধুনিক মানুষদের প্রতিভূ) অচেনা এবং বিস্ময় উদ্রেককারীও। এদের এই অবস্থানের মাধ্যমেই নৃতত্ত্বের একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে। নৃবিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য হল এই যে পৃথিবীতে আদিকাল থেকে অধুনা অবধি প্রবহমান, বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা সভ্যতার নানান স্তর রয়েছে, যেমন যথাক্রমে আদিম, আদিবাসী, লৌকিক এবং অবশেষে নাগরিক। কালের বিচারে সভ্যতার প্রতিটি স্তর সাংস্কৃতিক উপাদানে ও জীবনচিত্রে অন্যের থেকে আলাদা এবং অবশ্যই ক্রমান্বয়ে উন্নততর। পৃথিবীর সবকটি সভ্যতার সংস্কৃতি বলয়েই এই বিষয়টি লক্ষিত হয়। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীর সব সভ্যতাই একই গতিতে বা একই সময়ে বিবর্তিত হয়নি, তাই কখনো কখনো ঘটে গেছে এক আপাত-কালানৌচিত্যের 'প্রমাদ'। ফলে একই সময়ে বা কালে পৃথিবীর নানান্ প্রান্তে সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত মানুষরা একইসঙ্গে বসবাস করতে পারেন, যেমন এই গল্পে একই সময়বলয়ে একদিকে রয়েছেন উন্নত সভ্যতার নৃতত্ত্ববিদ ভরত ও অন্যদিকে আদিম সভ্যতার টড়্পা।

টড়্পাদের এই আদিম-জীবনের সবকিছুই তাদের মতে সৃষ্টি করেছেন তাদের "মাহাপুরু" (মহাপ্রভু)—পাহাড়, বন, দিন, রাত, জীবন, ভাষা, নিয়ম স.....ব! তাই টড়্পারা নিজেদের নামের অর্থ যেমন খোঁজেনা তেমনিই জীবনের অর্থও খোঁজে না—সবই 'মাহাপুরু'তে সমর্পিত। তাই প্রশ্নাতীত এক নিরুদ্বেগ মন নিয়ে তারা ভারি আনন্দে জীবন কাটায়—যে জীবনে পরিধেয়বস্ত্র কৌপীন, খাবার আধপেটা, দারিদ্র্য অসীম এবং শোষণ বঞ্চনা অকল্পনীয়। তবু কোনো নালিশ নেই তাদের।

কিন্তু তাদের নিয়ে গবেষণা করতে এসেছে যে সুসভ্য মানুষেরা তারা টড়্পাদের মতো সহিষ্ণু হতে পারেনি—তাই তাদের জবানিতে বলা গল্পটিতে বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে ওই দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের মানচিত্র। কোরাপুট জেলায় পাঁচহাজার ফুট উচ্চতার নিয়মগিরি পর্বতের চড়াই-উৎরাইয়ে কোথাও রয়েছে প্রায় পঞ্চাশমাইল লম্বা বিশমাইল চওড়া এক মালভূমি। আবার কোথাও ধাপে ধাপে পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে চাষের জমি কিংবা ফলের বাগান। এক অংশে কলাগাছ তো অন্য অংশে পাহাড়-জোড়া কমলালেবুর কিংবা আনারস অথবা কাঁঠালের বাগান—মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। কোথাও ভুট্টা কি বাজরা চাষের জন্যে জমি তৈরি করতে গিয়ে গাছ কেটে নেড়া করে দেওয়া হয়েছে পর্বতগাত্র। কোথাও বা চাষ হয়ে-যাবার পর পাথরের গা থেকে মাটি ধুয়ে গিয়ে ঘাসহীন, শ্যাওলা-ধরা কালো প্রস্তরের চত্বর দেখা যাচ্ছে। আর এখনও নিয়মগিরির বহু অঞ্চলই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢাকা—ভীষণ ঘনবনে লতায় জড়ানো গাছ, বাঁশবন—সূর্যের আলো ঢোকে না। এই সবের মাঝে তিন-পাঁচ ক্রোশ দূরে দূরে পাঁচ কি পনের ঘরের এক একটি ছোট্ট গ্রাম যার বাসিন্দারা ওই ভীষণ বনের মধ্যে দিয়ে খাড়াই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সংকীর্ণ সুড়ঙ্গের মতো পায়ে পায়ে তৈরি হওয়া এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে যাতায়াত করে। বনের ঘনত্ব এতই বেশি যে গ্রীষ্মকালেও রোদের অভাবে শীতের অনুভূতি হয়। পথের ধার দিয়ে ঝুঁকলে অতলস্পর্শী খাদের ভেতর বয়ে যাওয়া পাহাড়ি ঝর্ণা দেখা যায়—দৃশ্যটি মনোরম হলেও পা ফস্কালে অসতর্ক পথচারীর চকিতে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। পর্বত, উপত্যকা, আলো, আঁধার, কুড়ুলের ঠক্ঠক্ ও গড়গড় শব্দে পাথরের গড়িয়ে পড়ার

আওয়াজ এবং আদিম জগতের বাসিন্দা—সবটা মিলিয়ে এই নিয়মগিরি উপত্যকা যেন স্বপ্নের মতো অচিন এক দেশ।

সেই উপত্যকায় ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য আগত দলটি বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করছিল সাতদিন ধরে। সভ্যতার নামগন্ধ নেই এমন একটি প্রান্তরে তাঁরা যে-জীবনের ছবি দেখেছেন সেটি যেন কোন আদিমকালের। কন্ধদের আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি না থাকলেও সেখানে থাকবার জায়গা নেই। কন্ধরা থাকে পাহাড়ের ভেতর ছোট্টো ছোট্টো গুহার কন্দরে অন্ধকার কুঁড়ের ভেতর। সেখানে ডাক্তারখানা, ডাকঘর, দোকান বাজার, থানা পুলিশ, কোঠাবাড়ি, রেল লাইন কিছু নেই। এমনকী নেই কোনো পুকুর কিংবা কুয়ো। এমন আদিম জঙ্গলে জীবনে যারা বসবাস করে তাদের পানীয় হল পাহাড়ী নদীর জল যাতে মিশে থাকে পাহাড়ের ঊর্ধ্বদেশ থেকে ভেসে আসা যাবতীয় বর্জ্য। তাছাড়া প্রতি তিনদিন অন্তর যে মোষ কাটা হয় কন্ধদের গ্রামে, সেই মাংস ধোওয়া ও নাড়িভুঁড়ি ফেলা হয় নদীর জলে। এহেন অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি—যেখানে সভ্য-জাগতিক কোনো স্বাচ্ছন্দ্য ও নিয়ম সম্পূর্ণ বিরহিত—সেখানে সুখে থাকে 'মাহাপুরু'র সন্তান কন্ধেরা—টঙ্পারা।

তারা যদি এতেই খুশি থাকে—জীবনধারণের জন্য যদি তাদের ন্যূনতম পার্থিব উপকরণেরও তেমন প্রয়োজন না থাকে, তাহলে সমস্যা কোথায়? আসলে সমস্যা তো তাদের নয়, সমস্যা সভ্য জগতের মানুষদের যাদের আধুনিক জীবনের পাশে, বিজ্ঞানের যুগে ওই 'ভূতকালের' মানুষগুলির অবস্থান বড়োই অস্বস্তিকর। তাই একযোগে সরকারী তরফে ও গবেষণার মাধ্যমে তাদের 'উন্নয়নে'র প্রয়াস করা হচ্ছে।

এই প্রয়াসের সূত্রেই নৃতাত্ত্বিক ও লৌকিক উপাদানের পাশে এবারে গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি উপাদান তথা সমাজতত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে।

গবেষণার টিমগুলির নিরীক্ষায় জানা যায় যে, আদিম অধিবাসী কন্ধদের সঙ্গে ডম্ব নামক এক জাতির মানুষজন ইদানীং এসে মিলেছে জীবিকা উপার্জনের তাগিদে। তারা এসেছে পাহাড়ের নীচের সমতল থেকে—কন্ধদের সঙ্গে তাদের বিস্তর ফারাক। তারা অনেক 'সভ্য' এবং জাগতিক বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন। তাই সরল কন্ধদের মদ দিয়ে, সামান্য টাকা দিয়ে তারা নিজেদের ব্যবসায়িক ফায়দা লোটে। কন্ধরা সারাবছর প্রাণপাত করে খেটে যে ফসল ফলায় চাষের ক্ষেতে বা ফলের বাগানে, সেই ফসলের ক্ষেত কি বাগান ডম্বরা মাত্র এক বোতল মদ কিংবা দুটাকার বিনিময়ে, কখনো একরখানেক জমি হলে কুড়িটাকার বিনিময়ে বাঁধা নেয়। ফলে উৎপন্ন ফসলের মালিকানা হয়—তাদের, পাহাড় থেকে সমতলের হাটে বয়ে এনে তা বেচে তারা অনেক অর্থ রোজগার করে—যাদের মেহনতে ফসল ফলে তারা রয়ে যায় একইরকম দারিদ্র্যের পরিকাঠামোয়। তাই ডম্বদের পুরুষ-নারীরা যখন খোলামেলা বড়ো বড়ো পরিষ্কার ঘরে থাকে, শার্টকোট শাড়ীব্লাউজ পরে তাদের ছেলেপিলেরা লেখাপড়াও করে—তখন ওই আদিম ডংগরিআরা নোংরা খাটো কৌপীন পরে ঘুরে বেড়ায়। তাদের জাতির ঐতিহ্য-অনুযায়ী তিনহাতি কাপড়ের সঙ্গে পুরুষ নারী নির্বিশেষে সবাই গলায় রঙ-বেরঙের কাঁচের মালা পরে। মেয়েরা তার সঙ্গে কাঁসা-পিতলের গয়নাতেও নিজেদের ঊর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করে। এদের প্রজাতির ছেলেরা বেশি সৌখিন—তারা তেলহীন রুক্ষ চুলের সামনেটা গোল করে কামিয়ে কাঁকই গুঁজে মাঝের চুলে খোঁপা বাঁধে, কানে দুল, নাকে মাকড়িও ঝোলায়।

আর ডম্বদের কাছ থেকে পাওয়া টাকার প্রায় সবটাই পুরুষরা উড়িয়ে দেয় মদের পেছনে। সারাবছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিপুল পরিমাণ ফসল ফলিয়েও তাই তারা গরিবই থেকে যায়। ভাতের জোগান না হলে যা পায়

তাই খেয়ে দিন কাটায়। তবু বদলায় না একটুও। এও তো ওই পূর্বে উল্লেখিত সভ্যতার সিঁড়ির নীচের দিকের পৈঠায় নির্দিষ্ট অবস্থানের কারণেই। তাই জঙ্গল-গার্ড প্রৌঢ় মধুসূদন বাবুদের জানায় যে এরা আদিমকাল থেকে অধুনা অবধি একই রকম রয়ে গেছে—কোনো পরিবর্তন তাদের হয়নি। তাই আধুনিক যুগের, আধুনিক সভ্যতার সংস্রব-বিবর্জিত এই মানুষগুলো আজও সরল, সত্যবাদী ও একনিষ্ঠ—তারা মিথ্যে বলে না, কথার খেলাপ করে না তথাকথিত বুদ্ধিমান সভ্যমানুষদের মতো। তাদের নিকটতম প্রতিবেশী ডম্বরা যেখানে নানান্ বেআইনি ফন্দীফিকির করে, মদ চোলাই করে কি বন্যপ্রাণী মেরে অবৈধ পথে রোজগার করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে-স্বাচ্ছল্যে থাকে, সেখানে এই সৎ মানুষগুলো জাগতিক বিত্ত ও স্বচ্ছলতার পরিবর্তে আদিমানবের সারল্য ও সততা নিয়েই বাস করে এই অভিসন্ধিমূলক মানবসমাজে যার নাম 'সভ্যতা'!

তারা না ছাড়ে মদ না শেখে লেখাপড়া, না শোনে সভ্যমানুষদের উপদেশ এমনকী শৌচকর্মও করে না তাদের মতো। তাদের এ হেন 'দশা' থেকে উদ্ধারকল্পে যে প্রয়াস চলেছে তারই অঙ্গ এই গবেষণা-টিমটি। তাদের সদস্য সরকারী কর্মচারী হরি পাণি পরম আশায় বলে সব বদ্‌লে যাবে নিয়মগিরির দুর্গম প্রান্তরে যদি পাকাসড়ক নির্মাণ করে তাকে ছুড়ে দেওয়া হয় সমতলের শহরগুলোর সঙ্গে। তাহলে সেই পথ বেয়ে 'সভ্যতা'-র আলো পৌঁছোবে কন্ধদের জীবনে। সে আক্ষেপ করে এই ভেবে যে এখানে রাউরকেল্লার মতো কোনোখান আবিষ্কার হলে নিমেষে মানচিত্রটাই বদলে যেত। স্কুল, ফ্যাকটরি, ডাক্তারখানা, কর্মীদের আবাসন সবকিছু রাতারাতি গড়ে উঠে পাহাড়ের নিজস্ব জীবনকে একেবারে পাল্টে দিতে পারত। তার এই আক্ষেপের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে সমাজতত্ত্বের এক অমোঘ সত্য—যে ঐতিহ্য আদিকাল থেকে চলে-আসা, যে জীবনের মধ্যে প্রোথিত হয়ে রয়েছে অস্তিত্বের শিকড়—প্রবলতর আধুনিকতার প্রকোপে তা ধীরে ধীরে লয়প্রাপ্ত হয়। শিকড়ের কাছে থাকা মানুষগুলি হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পরিবর্তনের সঙ্গে মানাতে না পেরে, অথবা 'জাত' খুইয়ে হয়ে ওঠে ঐতিহ্যের শত্রু। আর এতে তাদের কোনো ফায়দা হয় না কারণ শোষকরা একই থাকে—শুধু বদল হয় শোষণের ধরনটি। তাই নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ভরত সঠিকভাবেই বলেছেন যে এদের জীবন বাইরে থেকে জোর করে বদলে দেবার চেষ্টার পরিবর্তে কী করলে এদের উপকার হবে—সেটার নিরীক্ষা করাই উন্নয়নের সঠিক লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁর গলায় এবার ধ্বনিত হয় সমাজতত্ত্বের শীতল সত্যের মাধ্যমে জীবনের চরম এক দর্শনের তত্ত্ব।

ভরত বলেন শুধু অবস্থার পরিবর্তনে কন্ধদের কোনো উন্নতি সাধন হবে না। কারণ যারা সভ্যতার সিঁড়ির শেষ দিকের ধাপে দাঁড়িয়ে কৃষক হিশেবে যে-শোষণের শিকার হয়ে চলেছে, সভ্যতার আলোকে এসেও সেই বঞ্চনার কোনো অবসান হবে না, কারণ আজ যারা কৃষক তারা হয়ত কাল নতুন গড়ে-ওঠা কলকারখানায় শ্রমিক হয়ে পেটের ভাত জোগাড় করতে যাবে, যেখানে ডম্ব-মহাজনদের মতোই তাদের শোষণ করবে ক্ষমতাশালী মিল কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ শোষণ ও বঞ্চনা থাকবে অব্যাহত—ভিন্ন চেহারায়। তাই ভরত সঠিকভাবেই বলেন যারা শোষণ করে যতদিন না তাদের বিতাড়িত করা যাবে ততদিন অবধি কন্ধদের কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। আবার এও সত্য যে, ওই শোষকরাও এদেশের বৈধ নাগরিক—তাই কোনো আইনি বলে তাদের কোনো অঞ্চল থেকে বিতাড়ন করা যায় না। তিনি আরো গভীরে গিয়ে তুলে ধরেছেন সেই জীবনদর্শনটিকে—শোষণ কেন হয় তার অনুসন্ধানে তিনি দেখেছেন শোষক ও শোষিত উভয়েই এর জন্য দায়ী। একথা ঠিকই যে শোষকরা অত্যাচার করবেই। কিন্তু

শোষিতদের মধ্যেই শোষিত হবার প্রবণতা থাকে যার জন্যে দায়ী মূলত তাদের অশিক্ষা ও অন্ধ কুসংস্কার আঁকড়ে বাঁচার অনমনীয় জীবনবোধ।

ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসরণের রীতির ফলে পুরুষানুক্রমে প্রশ্নাতীত ভাবে কন্ধরা যেভাবে বেড়ে উঠেছে, যে রীতিনীতিকে চূড়ান্ত, অলঙ্ঘ্য বলে মানতে শিখেছে, তারই ফলশ্রুতিতে তারা দেবতাদের তুষ্ট করতে, বা পিতৃপুরুষদের আত্মাকে তুষ্ট করতে পশুবলি দেবে, কষ্টার্জিত অর্থ খরচ করে সারা গ্রামকে ভোজ দেবে, মদ খাওয়াবে। 'মাহাপুরু'র তৈরি করা নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানোর দুঃসাহস তাদের হতে পারে না—তাই আদিকাল থেকে চলে-আসা জীবনধারাতেই তারা মগ্ন হয়ে থাকবে—ফলে শীতের রাতে ফসলক্ষেত পাহারা দেবে; তাই খোলা আকাশের নীচে আদুল গায়ে থাকার জন্যে মদ খেতেই হবে শরীর গরম রাখতে।—কারণ সভ্যদের মতো তারা গা ঢাকা পোশাক পরবে না, তা যে ঐতিহ্যবিরোধী। যেহেতু অর্থসঞ্চয়েরও কোনো শিক্ষা বা সচেতনতা তাদের নেই ফলে দারিদ্র্যও তাদের সঙ্গ ছাড়বে না। এই অনুষঙ্গে নিঃস্বজীবনে ফুর্তির একমাত্র উপকরণ হয়ে দাঁড়ায় মদ—ডম্ব মহাজনদের কৃপায় তা সহজলভ্যও বটে। তাদের সরলতাকে নেশায় আবিষ্ট করে রাখতে পারলেই ওদেরও তো সুবিধে—তাই কন্ধরা খেতে না পাক—মদ পাবেই। আর সংস্কারপালন ও বিনোদন এই দুয়ের প্রয়োজনেই সে সঞ্চয় না-করে পয়সা ওড়াবে এবং প্রয়োজন হলেই অনিবার্যভাবে জীবনে ডেকে আনবে অর্থদাতার রূপে শোষকদের। এ যেন এক বিষম চক্রব্যূহ যা থেকে তাদের মুক্তি নেই—হয়ত বা মুক্তি যে প্রয়োজন সেই বোধটাও তাদের নেই—আসলে 'ভূতকালে'র মানুষগুলি একারণেই তো এত ব্যতিক্রমী এই যুগে। তাই তারা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চায় না এই আশঙ্কায় যে, শিক্ষিত হলে ছেলেপুলেরা ঐতিহ্যভ্রষ্ট হয়ে যাবে, আর পাহাড়ে চাষ করবে না, চলে যেতে চাইবে জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে দূরে—ডংগরিআ হয়ে উঠবে শহুরে—শিকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে তারা।

এ আশঙ্কাও অমূলক নয়। তাই উন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুল খুললেও তারা পড়তে যায় না, সভ্য মানুষদের উপদেশ কানে তোলে না, নিজেদের অদ্ভুতজীবনের বদ্ধ গণ্ডীর ভেতরেই থাকতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। তাই ভরত সঠিকভাবেই বলেছেন সবচেয়ে আগে প্রয়োজন এদের মানসিকতার পরিবর্তন; তা না করে ওপর থেকে বাহ্যিক পরিবর্তন জোর করে চাপিয়ে দিলে তার প্রকোপে তাদের জীবনই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। মনের পরিবর্তনের জন্যে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে ভেতর থেকে, শুধু অক্ষরজ্ঞান হলেই হবে না। যথার্থ শিক্ষা পেলে তবেই তাদের চোখ খুলবে—নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে তারা বিচার করতে শিখবে শিক্ষার শুভদিকটিকে এবং এও শিখবে শিক্ষা যে-সংযম শেখায় তা জীবনটাকে খামখেয়ালে, তাৎক্ষণিক ফুর্তিতে তছনছ করা থেকে বাঁচাবে—সঞ্চয়ের পথে জীবনে আসবে স্থিতি ও ভবিষ্যতের নির্ভরতা।

অধ্যাপকের এই তত্ত্ব-কচায়নে মন ওঠে না সরকারী আধিকারিক পরশুরামের। তিনি বলেন কবে কন্ধরা লেখাপড়া শিখে নিজে থেকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করে নতুন সমাজ গড়বে তা নির্ভর করছে কবে লক্ষ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে, বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়া হবে—এই সম্ভাবনার ওপর—যে সম্ভাবনা তখনো নেহাতই অলীক। তাই সেই সময়ের জন্যে চুপচাপ অপেক্ষা করে বসে থাকলে কন্ধরা অবিরাম শোষণের মাঝে 'না-মানুষ না-জন্তু' হয়েই থাকবে আর সরকারী অফিসার ও গবেষকরা ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জ্ঞান আহরণ করে সেগুলো ফাইলজাত করে রেখে দেবে—তাতে কোনো কাজের কাজ হবে না।

অধীর আগ্রহে তিনি বলেন সবটা না হোক অন্তত দুয়েকটা গ্রামকে পরীক্ষাকেন্দ্র হিশেবে গ্রহণ করে

এক্‌সপেরিমেন্ট চালানো হোক—সরকারী ঋণ দিয়ে, পরামর্শ দেবার জন্য কর্মিকেন্দ্র স্থাপন করে, স্কুল খুলে, নতুন নতুন রোজগারের পথের সন্ধান দিয়ে তাদের সমাজের মুলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। তাঁর বিশ্বাস শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে এলে এরাও ধীরে ধীরে রুচিবান হবে—শিক্ষার আলোকে কুসংস্কার ত্যাগ করে বেরিয়ে আসবে তারা—এইভাবে ধীরে ধীরে প্রসারিত হবে উন্নয়ন; কন্ধদের 'মানুষ' করে তোলার প্রচেষ্টা সফল হবে।

বাধ সাধলেন অধ্যাপক। সমস্যা সমাধানের এই চট্‌জলদি অতি-রোম্যান্টিক পদ্ধতিটি ভ্রান্ত বলে তিনি জানালেন। নতুন রোজগারের পথ চিনলে কন্ধরা হয়ত পয়সা অর্জন করতে পারবে কিন্তু সঞ্চয়ের জ্ঞান ও খরচের সঠিক পদ্ধতি শিখতে শিখতে এক যুগ কেটে যাবে। আর যারা ধূর্ত ব্যবসায়ী বুদ্ধি দিয়ে আজ ওদের ফসল কিনে ঠকাচ্ছে, তারা সেই ফসল হস্তগত করতে না পারলে কন্ধদের মদ্যাসক্তির রন্ধ্রপথ ধরে গভর্মেন্টিকে বেচা তাদের ফসলের সব টাকাই ঠকিয়ে হস্তগত করে নেবে। অর্থাৎ সংস্কারাচ্ছন্নতা ও সঞ্চয়হীনতার যে রাস্তা ধরে টাকা জলের মতো বয়ে যায়, অনিবার্যভাবে দারিদ্র্যের জীবনে মদ আসে একমাত্র বিনোদন হয়ে—সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে অবস্থা থাকবে যে-কে-সেই। উপরন্তু সভ্য জগতের কুটিলতার সংস্পর্শে এসে কন্ধরা কু-অভ্যাস রপ্ত করবে—তাদের ঐতিহ্যানুগ সরলতা ও সততা নষ্ট হয়ে যাবে। 'সভ্যতা'র প্রভাবে তারা খারাপ দোষগুলো শিখে হয়ে উঠবে স্বার্থপর, মিথ্যেবাদী, শিখবে জাগতিক ফন্দিফিকির—সরকারী ঋণ নিয়ে টাকা শোধ করবে না—কাজ করবে না—ঋণের জালে জড়িয়ে নিজের ঘরের জিনিস বাইরে বেচে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে—অর্থাৎ বাহ্যিক শোষণ মুক্ত হতে গিয়ে তারা হারাবে তাদের অকৃত্রিম সত্তা—যা আবার এক নতুনবর্গের বঞ্চনা হয়ে উঠবে তাদের বিড়ম্বিত জীবনে।

প্রশ্ন জাগে তাহলে কি শিক্ষিত সুসভ্য অধ্যাপকটি এদের উন্নয়নের বিরোধী? না তা নয়; তিনি আসলে সমস্যাটিকে বিচার করেছেন একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাই তিনি বলতে পারেন যে এত বঞ্চনা, শোষণ সত্ত্বেও এরা যে আজও সত্যবাদী ও সৎ হয়ে রয়েছে তার কারণ এদের চোখ খোলেনি। যাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হয়ে গেছে তারা সত্যাশ্রয়ী হতে পারে শুধু তখনই যখন সেই লব্ধজ্ঞান দিয়ে অনুভব করে জীবনে সংযমের গুরুত্ব কতটা। ভোগের চেয়ে ত্যাগ বড়ো—বা সহজ করে বললে ব্যয়ের চেয়ে সঞ্চয় জরুরি—এই আত্মজ্ঞান হলে শিক্ষিত হয়েও তারা সত্যের পথে হাঁটতে পারবে। কিন্তু এই উপলব্ধি সত্ত্বেও তো তাদেরও কখনো পদস্খলন হয়। তাই যারা জ্ঞানের স্পর্শই না পেয়েও সত্যের পথে হাঁটতে পারে, আজ জ্ঞানের আলোক পেলেও তার সঙ্গে সংযমের শিক্ষা না পেলে তারা কিন্তু হোঁচট খাবেই। অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকেও তারা যে ভ্রষ্ট হয়নি তা তাদের উন্নতমনের নিদর্শন নয় বরং প্রবঞ্চনা করে কি কি লাভ হতে পারে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয় বলেই সামান্য মদ-মাংসের ফুর্তিতে সন্তুষ্ট থাকে। বুঝতে শিখলেই সেও তাই বিত্তের সন্ধানে হবে শঠ, প্রবঞ্চক।

অর্থাৎ অধ্যাপকের মতে তাদের সৎ-থাকা কোনো বিশেষ গুণ নয় বরং তাদের অজ্ঞানতার মাশুল। তাই অন্নবস্ত্রের দুর্দশার তুলনায় মনের এই অন্ধকারজনিত অবস্থাকেই তিনি এদের দুর্দশার সূচক বলে ভাবছেন।

মনের অন্ধকার দূর না করতে পারলে এদের জীবনের উন্নতি হবেনা—আবার মনের অন্ধকার দূর হলে অবনতি হবে এদের মানসিকতার—এই বিপ্রতীপ জটিলতার জন্যেই এঁরা উন্নয়নের কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না—যা একইসঙ্গে জীবনের উন্নতি করবে অথচ তাদের আদত-সদ্‌গুণ ও নষ্ট হবে না, সেই পথ দূর-অস্ত।

কন্ধদের সভ্যতার সিঁড়িতে ওপরের ধাপে তোলার এই প্রচেষ্টা অসম্ভব-প্রায়—সে কথা সভ্যজগৎ জানে তবু তারা নৃবিজ্ঞানকে পাল্টে দিতে চায়, বদলে দিতে চায় সমাজদর্শনের অনিবার্যতাকে কেননা "আজকালকার যুগে

কতকগুলি মানুষ এমনি অবস্থায় পড়ে থাকাটা সকলের পক্ষেই একটা কলঙ্ক"—হরি পানির এই কথাটির সূত্রেই সভ্যদের মানসিকতা প্রকট হয়ে উঠল—তাহলে কন্ধদের উন্নতিসাধন সমাজসেবার দায়িত্ববোধে নয়—নিজেদের অস্বস্তি কাটাতে—দয়া দেখানোর উন্নাসিক আত্মতৃপ্তির স্বার্থপর প্রয়োজনে।—এইসূত্রেই এবার একটু দেখে নেওয়া যাক গল্পের চরিত্রগুলির নামকরণের রীতিটি। কন্ধ যুবকের নাম টড় পা; আদিবাসী চাপরাশিদের নাম মকর-অ, নজিরু, রামাইয়া। আর বাকিদের নাম—সরকারী আধিকারিক পরশুরাম, অধ্যাপক ভরত, সরকারী কর্মচারী হরি পানি এবং জঙ্গলের গার্ড মধুসূদন। এদের সকলের পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় ব্যঞ্জনাবাহী নামকরণ করে লেখক সচেতনভাবে তাদের আলাদা করে রাখতে চেয়েছেন টড় পাদের থেকে বা ওদের মতো underprevilegded দলিতবর্গীয়দের থেকে—এই শহুরে সভ্যতা "class apart" হয়ে থাকে বলেই সমাজসেবার মোড়কের ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে দয়ার ভাবটি।

এঁরা সভ্য বলেই নিয়মগিরি পর্বতের দুর্গম পথ ধরে স্টেশনে যাবার সময়ে বড়ো বড়ো তত্ত্বকথা ভুলে প্রাণভয় আর দুশ্চিন্তায় গ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন। আসলে এঁরা তো কন্ধ নন, যে নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তাই করবেন না। তাই স্বাভাবিক মানুষিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে পড়া অনিবার্য ছিল এদের কাছে।

আর গল্পেও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল টড় পার উপস্থিতি। বস্তুত আখ্যানের সিংহভাগ জুড়ে শুধু বহিরাগতদের জবানিতে আমরা নিয়মগিরি পর্বত আর তার অধিবাসীদের বর্ণনা শুনেছি—প্রত্যক্ষ কোনো সূত্র উপস্থাপিত হয়নি কাহিনিতে তখনো অবধি। কিন্তু অতিবাস্তব এই 'ভূতকালে'র মানুষরা ও তাদের জগৎ—অর্থাৎ নিয়মগিরির পার্বত্য-মানচিত্র—সরাসরি কাহিনিতে না এলে যেন মন ভরে না।

তাই গবেষণা-টিমের যাত্রাপথে নিবিড় জঙ্গলে দেখা যায় একটি ছায়া—সঞ্চরণশীল—তারপর বেরিয়ে আসে এক যুবক ডংগরিআ কন্ধ—যার নাম টড় পা—পরনে কৌপীন, আদুল গা। সমগ্র কন্ধজাতির প্রতিভূ হয়ে আসে ছেলেটি। আদত—সরলতায় সে বিড়ি চায়, দেশলাই চায়—এঁদের সম্বোধন করে 'মাই বাপ' অর্থাৎ মাবাপের মতো সম্মান জানায়। তারপর জানায় শহুরে বাবুরা অন্ধকারে বনের পথে চলতে অনভ্যস্ত জেনে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের পথ দেখাতে অপেক্ষা করছিল গহন জঙ্গলে। সে সঙ্গে থাকলে পথও হারাবে না টর্চের আলো আর দেশলাইওয়ালা বাবুদের ভয়ও করবে না।

বনের মানুষ সে, তাই বনের পশুরা তার বড়ো আপন, এদের মতো তাই সে ভয় পায় না। তাছাড়া খিদে পায় বলেই-না বাঘ মানুষ মারে—যেমন খিদে পায় বলেই মানুষ যে কোনো প্রয়াসে খাদ্য জোগাড় করে, মোটরচাপা পড়তে পারে জেনেও তারা শহরের রাস্তা দিয়ে চলে—যেমনটা চলে টড় পা তার বনের রাস্তা দিয়ে বাঘে খেতে পারে জেনেও। তার 'রোট' আর ওদের 'রোট' দুটো সমাজ-সভ্যতার চোখে আলাদা হলেও ব্যঞ্জনায় সমগোত্রীয় —প্রতিবন্ধকতা উভয় রাস্তাতেই আছে।

এত বিপদ মাথায় নিয়েও সে কেন রাতের আঁধারে পথে বেরোয় জানতে চাইলে টড় পা বলে সেই পূর্বোক্ত 'মাহাপুরু'র সৃষ্ট নিয়মের কথা। প্রাণপাত করে যে ফসল তারা ফলায়—তা পাহারা দিতে তো বেরোতে তাদের হবেই। যেমনভাবে পাহাড়ে আগত শহুরে অতিথিদের নিরাপত্তাবিধানেও তাকে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পথে এসে দাঁড়াতে হবে—এটাই যে তাদের আজন্মলালিত প্রথা। এই প্রথার অনুসরণে আজও সে পথে বেরিয়েছে—অতিথিদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে সে যাবে আরেক প্রথাপালনে—'ধাংড়ী বেন্ট' করতে অর্থাৎ ভিন্গাঁয়ে 'কনে-শিকারে'। আদিম সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় কোনো সামাজিক বিধিনিষেধ থাকে না। বস্তুত

মেলামেশার মাধ্যমে পরস্পরের মনজানাজানি হলে তবেই তারা ঘর বাঁধার কথা ভাবে। কোর্টশিপের যথার্থতার এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর হয় না! 'বাবু'দের সমাজে এমনটা হয়না জেনে সে প্রশ্ন করে যে দেশে 'ধাংড়ী বেন্ট' নেই সে দেশের লোক মানুষ না জন্তু? না চিনে, না ভালোবেসে, না জেনে অচেনা মানুষের শয্যাসঙ্গী হবার অবমাননা, অরুচিকর পদ্ধতি যাদের—সেই 'তলদেশে'র মানুষদের প্রতি অবজ্ঞায় সে নাক কুঁচকে ফেলে।

সপাটে যেন চপেটাঘাত হয় অধ্যাপকের গালে। তাঁরা অর্থাৎ পাহাড়ের নীচের তলের বাসিন্দারা অরুচিকর ভাবে হৃদয়বর্জিত প্রথায় সঙ্গী বেছে নেয়, জন্তুর মতো বাহ্যিক প্রয়োজনে—অথচ তারাই আবার পাহাড়ের 'উপরিদেশে'র বাসিন্দাদের না-মানুষ, না-জন্তু বলে অবজ্ঞা করতে চায়! কেননা তারা চান করে না, দাঁত মাজে না, ভদ্র পোশাক পরে না, এমন কি, নাকি শৌচকর্মও করে না! 'তলদেশ' শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে লেখক যেন চোখে আঙুল দিয়ে শহুরে সভ্য জীবনের নিম্নমানের ব্যঞ্জনাটি দেখিয়ে দিতে চাইলেন। টড়্‌পারা নারী তথা ধাংড়ীর কোলে বসে জেনে শহুরে বাবুরা হাসাহাসি করলে সে বলে তাদের নিয়ম বাবুদের মতো নয়। বাবুরা শুধু নারী-মায়ের কোলে বসে যখন সে সেই মায়ের সন্তান। কিন্তু টড়্‌পাদের সমাজে নারী মানেই তো মাতৃত্বের প্রতীক। তাই ছোটবয়সে বসে মায়ের কোলে, যৌবনে বসে তার সন্তানের মায়ের কোলে আর বুড়ো হলে লীন হয়ে যায় 'ধরতনী' মায়ের অর্থাৎ পৃথিবীমাতার কোলে। সেই মা-ই তো সর্বময়ী হয়ে বিরাজ করেন সব নারীর মধ্যে—তা সে জন্মদাত্রী মা হোক, কী ধাংড়ী হোক কি কন্যা, ভগ্নী যেই হোক। —প্রকৃতিমায়ের কোলে বেড়ে ওঠা এই প্রকৃতির সন্তানরা যে এইভাবেই ভাববে তাতে আর আশ্চর্য কি? নারী মায়ের কোলে জন্ম নিয়ে, নারী-স্ত্রীর কোলে সন্তান দিয়ে নিজের অস্তিত্বের প্রবহমানতা বজায় রেখে অবশেষে ধরিত্রী নারী-র কোলে মিশে যাবার মধ্যে দিয়ে জীবনচক্রের আবর্তনের যে দর্শন—অশিক্ষিত টড়্‌পা ভারি সহজে তা বুঝিয়ে দেয় শিক্ষিত বাবুদের।

তাকে শহুরে কায়দায় ধন্যবাদ দিতে গেলে সে পয়সা চায়। জঙ্গলের বাইরে এসে এবার বাবুদের 'রোট' আর তার 'রোট' দুদিকে ঘুরে গেছে—আর একসাথে চলা যাবে না—যায়ও না তা বাস্তবে—সে এতক্ষণ এক 'রোটে' চলে বাবুদের সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পেরেছে—বাবুরা ভাবে গরিব ছেলেটা কিছু কিনে খেতে পয়সা চাইছে। পরশুরাম ও ভরত পকেট থেকে মোট তিনটি দশ পয়সা বার করে টড়্‌পাকে দিল। 'বাবার' কাছ থেকে পয়সা পাবার আনন্দে টড়্‌পা গান গাইতে গাইতে মিলিয়ে যায় গহন অরণ্যে—ভিন্‌গাঁয়ের পথে। একটু পরে বাবুরা দেখতে পান রাস্তার ওপর পড়ে আছে চকচকে দশ পয়সাগুলো। প্রথমে মনে হয় হয়ত বা তার হাত ফসকে পড়ে গেছে। তারপর মধুসূদন ব্যাখ্যা করে সে নিজেই পয়সাগুলো ফেলে দিয়েছে। পয়সার লোভ না থাকলেও পয়সার আব্দার কেন করেছিল—জানতে চাইলে মধুসূদন আরো বলে পয়সা চেয়েছে সে 'মা-বাপ' সম্বোধন করে। সন্তান পিতামাতার কাছে আবদার করে কিছু চেয়ে নিলে তাঁদের সম্মান দেখানো হয়—ঠিক সেই সম্মানটিই দেখিয়ে গেছে 'ডংগরিআ' কন্ধটি তার শহুরে অতিথিদের—তার সেই প্রয়োজন ফুরোতেই পয়সাগুলোও মূল্যহীন হয়ে গেছে—তাই সেগুলি ফেলে দিতে তার দ্বিধা হয়নি। পয়সাগুলো এখানে তার কাছে সম্মান জানানোর মাধ্যমমাত্র—তার বেশী নয়।

গল্প শেষ হয়ে আসে। বাবুরা তাকিয়ে দেখেন কুয়াশামোড়া নিয়মগিরিকে—মনে হয় সব যেন স্বপ্ন, সত্যি নয়। আসলে যে জগতে তাঁরা বাস করেন পাহাড়ের 'তলদেশে' সেখানে এমন নিঃস্বার্থ পরোপকার, শত দারিদ্র্যেও প্রলুব্ধ না হওয়া, সম্মান না পেলেও অযাচিতভাবে সম্মান জানানো—সবকিছুই তো স্বপ্নের মতো অলীক। তাঁরা সেটা

জানেনও। কিন্তু তবু সভ্যতার 'কলঙ্ক' মোচনের তাগিদে তাঁরা আবার মেতে ওঠেন 'ডংগরিআ'দের উন্নতির জ্ঞানগর্ভ আলোচনায়। 'ডংগরিআ'-জীবনের শুদ্ধিকরণই যে তাঁদের পরম অভীষ্ট।

শেষ হয় কাহিনি কিন্তু ফুরোয় না প্রশ্ন। যাঁরা ওদের শুদ্ধিকরণে ব্যগ্র তাঁদের নিজেদের আত্মশুদ্ধি হয়েছে কি? যারা অভাবেও সৎ, বিবাহে হৃদয়চালিত প্রতিজ্ঞায় অটল, পরোপকারে নিঃস্বার্থ এবং সম্মান দিতে অকুণ্ঠ— সেই কৌপীন-পরা, 'নোংরার বেহদ্দ' কন্ধরা; আর বিত্তের স্বাচ্ছন্দ্যেও অসৎ, বিবাহে হৃদয়বিবর্জিত, কথার খেলাপে সিদ্ধ, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পরের অনিষ্টকারী, জাত-বর্ণের-কৌলীন্যের তুলনায় অসম্মান প্রদানে অকুণ্ঠ শার্টপ্যান্ট-পরা পরশুরামরা কি ভরতরা—কারা আদিম, অ-সভ্য, জন্তুবৎ? আর কারাই বা আধুনিক, সভ্য ও যথার্থ মানুষ?—এই নির্মম প্রশ্নটির সামনে শহুরে সভ্য পাঠকদের দাঁড় করিয়ে চরম অস্বস্তিকর এক অবস্থায় ফেলে লেখক দাঁড়ি টেনেছেন এ গল্পে। এ প্রশ্নের উত্তর মেলা ভার—হয়ত বা জ্ঞানী, সভ্য পাঠকরা উত্তরটা খুঁজতেও চান না পাছে 'চাঁদে'র গায়ের 'কলঙ্ক'টা দেখা যায়।।

সমাজ-সংস্কারক

(মারাঠী)

অরবিন্দ গোখলে

১.১ □ কাহিনি

পুত্রবধূর বিবর্ণ সাদাটে কপালের উপর নজর পড়তেই বাবাসাহেবের শূন্য মনে এক নতুন চিন্তা ভেসে উঠল।

প্রায় মাসখানেক হোল তাঁর বুক শূন্য হয়ে গেছে। চোখে নিদ্রা নেই। খাবার ওঠে না হাতে। কি করবেন? কারও সঙ্গে দুটি কথা বলবেন এমন ইচ্ছাও হয় না। এই যে এতকাল বেঁচে আছেন তিনি, এই সংসার গড়ে তুলেছেন, সমাজে কিঞ্চিৎ মানমর্যাদা নিয়ে বাঁচার আশা মনের গোপন কোণে পোষণ করছেন। আজ এসবই যেন মিথ্যা প্রমাণিত হোল। মনে হচ্ছে এসব বোকামি মুর্খতা। এ দুনিয়ার যত্রতত্র বিষ, বিষ্ঠা আর অপমান ছড়িয়ে রয়েছে।

তবে তাঁর জীবনে গর্ব করার মত কিছু যদি থেকে থাকে, তা তাঁর বড় ছেলে। আর এই ছেলের মতো ছেলেই আজ অস্তিত্বহীন, মৃত।

অথচ কোন রোগ নেই ব্যাধি নেই । সবে চাকরীতে ঢুকেছিল, সদ্যবিবাহিত। যে বয়সে মানুষ বেঁচে থাকাই সার্থক মনে করে, দুনিয়াটা দেখার মতো হয়, সেই বয়সে নিষ্ঠুর মৃত্যু তাকে আচম্বিতে এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল। তাই নিজের উপর, নিজের দেহের উপর, জীবনের উপর তাঁর বিশ্বাস হারিয়ে গেল।

এই মাসখানেক যাবৎ বাবাসাহেবের কাছে সবকিছুই অর্থহীন হয়ে গেছে। তবু কান্নাকাটি থামে নি। স্মৃতি বেদনাদায়ক। সমস্ত আবেগানুভূতির শুরু ও শেষ বৈচিত্র্যহীন। এ শূন্য জীবন কাটাবেন কী করে? কিসের জন্যে? কার জন্যে?

খাওয়া দাওয়া, প্রিয় বইপত্র পড়াশুনা সবই অসহ্য বোধ হতে লাগল তাঁর। পরিচিতদের মধ্যে নিজের মানসম্মান মিথ্যা বোধ হতে লাগল। বাড়িতে অন্যান্য ছোট ছেলেমেয়েদের, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যেন তাঁর কোন সম্পর্কই রইল না। এমন বৈরাগ্যভাবের জন্যই তিনি সকলের সঙ্গে নিস্পৃহ আচরণ করতে লাগলেন। সব অর্থহীন, সবই মিথ্যে এসব ভেবে তিনি সারাদিন বারান্দায় আরাম চেয়ারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন শূন্য দৃষ্টি নিয়ে।

সবই মনে পড়ে। আবেগ সামলাতে পারেন না। খিন্ন আচরণে তাঁর দিন কাটে এখন। কেউ কাছে এলে নিরাশাব্যঞ্জক উক্তি করেন। সন্ধ্যা নেমে এলেও আলোতে উঠে আসার গরজ হয় না তাঁর। রাত্রেও তাঁর দু-চোখ সম্পূর্ণ খোলা থাকে। এই তাঁর এখনকার নিত্য-করণীয় কাজ। যদিও সবই শান্ত এখন। সব কাজকর্মই মিটে গেছে। তবুও তাঁর রোজকার আচরণ একই রকম রয়ে গেল। স্মৃতি, অনিচ্ছা, নিরাশা, অন্ধকার,আবেগ এসবের মধ্যেই এখন বাবাসাহেবের দিন কাটে। চেয়ারে বসে থেকে থেকে পায়ের গিঁটে ব্যথা হয়ে যায়। খোলা আকাশ এখন অনন্ত, শূন্য মনে হয় তাঁর।

নিত্যদিন বারান্দার চেয়ারে বসে থেকে তাঁর দিন যায়। খেতে ডাকলে বলেন খিদে নেই। বন্ধুবান্ধব এলে পরও সেই একই স্মৃতির রোমন্থন চলতে থাকে। এখন শুধু রাতের অন্ধকারেই যেন উনি স্বস্তি পান।

কিছুদিন পর যেন বাবাসাহেব ক্রমে স্বাভাবিকতার দিকে ফিরে যেতে লাগলেন। বারান্দার চেয়ারে আর বেশিক্ষণ বসে থাকেন না। ভাতের গন্ধ নাকে এলে অস্থির হয়ে উঠেন। এখন আর শূন্য আকাশ পানে না তাকিয়ে থেকে ঘাড় নীচু করে পায়চারি করেন মাঝে মধ্যে। ক্রমশ আশপাশের পরিবেশ পরিস্থিতির দিকে তাঁর নজর পড়তে লাগল। আপন মনে হতে লাগল। পরিচিত বোধ হতে লাগল। শরীরের অন্যান্য অনুভূতিগুলো সজাগ হতে লাগল। আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে সকলে সজাগ রয়েছে, আমার পরিস্থিতি সম্পর্কে, কৃতিত্ব সম্পর্কে ওরা সচেতন—এসব তাঁর লক্ষ্যে আসতে লাগল।

যদিও সব শেষ; তবুও আমি জীবিত আছি, সমাজে আমার এখনো স্থান রয়েছে— এসব বোধ আসতেই ক্রমে বাবাসাহেবের মন শান্ত হতে লাগল। আর তাই এতদিন বিস্মৃত হয়ে-থাকা পুত্রবধূর দিকে তাঁর লক্ষ্য গেল। কালকের গৃহলক্ষ্মী। এই তো সেদিন নববধূর বেশে এ-বাড়িতে প্রবেশ করার কালে সামাজিক প্রথানুযায়ী চৌকাঠে রাখা চালভরা 'পালি'টা পায়ে ছুঁয়ে গড়িয়ে দিয়েছিল। তার ছড়িয়ে-পড়া চালের দু-একটা খুদকনা আজও খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে। আর ওই মেয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করতো যখন, সেই মুহূর্তগুলিতে নিজেকে কত ভাগ্যবান মনে হোত। অথচ আজ!

তার চলাফেরা অতি বড় অপরাধীর মতোই। এতদিন যে বাবাসাহেব সেই পুত্রবধূর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন তাতে তার আশ্চর্য বোধ হোল। এই সদ্যবিধবার করুণ. নীরব কান্না তিনি শুনতে পান নি। নিজেকে নিয়েই বিব্রত ছিলেন তিনি। অথচ সমাজের অবহেলিতদের বন্ধু, সমাজসেবক, সমাজ-সংস্কারক বলে সুনাম এই বাবাসাহেবের।

বাবাসাহেব যারপরনাই বিচলিত হলেন। তাঁর মনে হোল পিছনের দরজায় বসে তাঁর বিধবা ভাগ্যহীনা পুত্রবধূ হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে দিনরাত। আর সামনের খোলা আঙ্গিনায় সমস্ত 'সমাজ' তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। তার মনে পড়ে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ। সমাজ-সংস্কার-বিষয়ক লিখিত নিবন্ধগুলোর কথা। আজ সমাজে যার জন্য তাঁর এই সম্মান ও খ্যাতি। আর তাঁর ওই বিশেষ ভূমিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুঝি তাঁরই বিধবা পুত্রবধূ। সে কারণেই কি ওই পুত্রবধূর জন্যে তাঁর মনে এক নতুন পরিকল্পনা ক্রমে রূপ পেতে চাইছে?

বৌমাকে সান্ত্বনা দিতে সচেষ্ট হন বাবাসাহেব।—মা, তোমার শোক সম্বরণ করো এবার। তুমি এমন করে কান্নাকাটি করলে আমরা কী নিয়ে বেঁচে থাকবো। দুঃখ করো না মা। আমি সর্বদাই তোমার সহায় আছি জেনো। তোমার পিতার মতই তোমাকে সাহায্য করবো।

শোকাকুলা রমণী নিজেকে সামলে নিয়ে বাবাসাহেবের দিকে তাকালো। পুত্রবধূর এই দীন চেহারা আর আশ্রয়-খোঁজা দৃষ্টির মুখোমুখি হতেই বাবাসাহেব নিজেকে ধন্য বোধ করলেন। বাড়িতে এঘরে ওঘরে চলাফেরা করার সময় তাঁর চোখের দৃষ্টিতে বারবার অপার করুণা ফুটে উঠল। বাড়ির বাগানে, হাটে-বাজারে, তাঁর বসার ঘরে বসে কেশহীন মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, আয়নায় নিজেকে রীতিমত গণ্যমান্য নেতা বলে বোধ হতে লাগল।

এখন আবার তাঁর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে। তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক। দলিত, নিপীড়িতদের সেবক বলে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। তাই আবার পুরোদমে লেগে পড়তে হবে ওই কাজে। ওতেই পাবেন তিনি শান্তি সুখ আর জনপ্রিয়তা।

আন্না সাহেবের মনে পড়ে। বাবা বলেছিলেন—"এই মেয়েকে তুমি বিবাহ করবে এই আমার ইচ্ছা।"

সেকালে বাবাসাহেব পিতৃআজ্ঞা পালন করাই কর্তব্য মনে করেছিলেন। সেদিন নিজেকে গর্বিত, উদাত্র মনে হয়েছিল। অধ্যাপকের চাকরী করতে করতে এক সরকারী সংস্থার ডাক এসেছিল। কিন্তু বাবাসাহেব সে সব চাকরীর মোহ ত্যাগ করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। আর সে কাজে পরবর্তীকালে তিনি সফল হয়েছেন ধৈর্যবলে, বুদ্ধিবলে আর নিরন্তর একনিষ্ঠতার ফলে। আজ নিজ পুত্রবধূর 'ভার' তাঁর উপর পড়তেই—। পুত্রবধূর আগামী জীবনের চিন্তা বাবাসাহেবের মনে ভেসে ওঠে।

সকাল বেলার চা-জলখাবারের কাজ মিটিয়ে কাছে এলে পর বাবাসাহেব বললেন— মা, কাগজটা দাও তো। দেখি কী খবরাখবর আছে।

এরপর প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কাগজ পড়া আর তার উপর আলোচনা ও চর্চা চললো। বৌমা তার স্বাভাবিক বুদ্ধির জোরে কিছু কিছু মন্তব্য করলো। বাবাসাহেব এতে কৃতার্থ বোধ করলেন। এ নির্মাল্যকে পুনরায় সাজিয়ে দিতে হবে। ওই অবলাকে কিছু একটা আধার ধরিয়ে দিতে হবে। সমাজের এই পঙ্গু দিকটার সংশোধন করতে হবে। বাবাসাহেব তাঁর ছোট মেয়েকে বললেন— তুই তো বারান্দায় এসে পড়তে বসতে পারিস। তোর বৌদি তবু একটু সঙ্গ পায়। কখনো বা পাশের বাড়ির বিমলাকে ডেকে বলেন— তুমি তো উলের নানান্ কাজ কর। আমাদের বাড়িতে এসো না দুপুরের দিকে। আমাদের বৌমাকেও একটু শেখাও। ওর উপর তো আকাশ ভেঙে পড়েছে। তবু যদি মনটা একটু অন্য দিকে থাকে। এছাড়া নিজের গিন্নীকেও সচেতন করেন বার বার।

আমার বড় ছেলে নেই এই মর্মান্তিক ধাক্কাটা ক্রমে কমে এলো। তার পরিবর্তে বাড়িতে একটি বিধবা বউ রয়েছে এই সূক্ষ্ম বোধটা দিন দিন বাড়তে লাগল।

দিন যায়। পুত্রবধূর শোকের বোঝা বুঝি ক্রমে হালকা হয়ে এলো। শাশুড়ী কাছে ডেকে বলেন— যা হবার হয়ে গেছে। তুমি তো আমাদের আপনজনই। আমার মেয়ের মতই। ননদরা 'বৌদি' বলে উঁচু গলায় ডাকে। হাতে কাজ না থাকলে ওরা বৌদির সঙ্গে নানারকম গল্পগুজবে মেতে ওঠে। তেমনি বাবাসাহেব। এখন আদর্শবান, মমতাময় মানুষ পাওয়া কি ভাগ্যের কথা নয়?

বিধবা পুত্রবধূর মন আশান্বিত হয়ে উঠল। নিজের দৈন্য ভুলে সে ক্রমে ক্রমে হেসে খেলে দিন কাটাতে লাগল। বাবাসাহেব সবই লক্ষ্য করতে লাগলেন। শোকাতুরা বৌমা যেমন তার শোকবিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে লাগল, তিনিও তেমনি করেই অনুভব করতে লাগলেন আমি একজন অসাধারণ মানুষ। সমাজে আমার প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে যেমন আগে ছিল। নিজেকে আগরকর, কার্বে, প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকদের সমতুল্য মানুষ বলে বোধ হতে লাগল তাঁর। আর ছেলের মৃত্যুশোক ক্রমে শুধুই স্মৃতি হয়ে যেতে লাগল। তার মৃত্যুর পর সবচেয়ে শোকাক্রান্ত এই দুটি মানুষ আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। ভাগ্যাহত বিধবা একদা কলেজ গার্লও হয়ে গেল। আর ভগ্নহৃদয় অশান্ত পিতাও ক্রমে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকাতেই আবার উঠে দাঁড়ালেন।

পুত্রবধূর ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠতে লাগল। কাদায় পা বসে-যাওয়া ওই আদরের গরুটিকে যেন তুলে খাড়া করা গেল। বিপন্মুক্ত করা গেল। কিন্তু এসব—

প্রথম দিকে বাবাসাহেবের কেমন কেমন মনে হোত। এই মেয়েকে রীতিমত শতের মধ্যে এক ভেবে পছন্দ

করেছিলেন। খুব ধুমধাম করে এ বাড়িতে গৃহলক্ষ্মী করে এনেছিলেন। আমার বংশবিস্তার করবে ওই মেয়ে এমন গোপন মনোভাবও পোষণ করেছিলেন। অথচ আজ? ওই মেয়ের দুর্দিন মুছে ফেলার জন্যই তাঁকে ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। পাত্র দেখতে হচ্ছে। মনকে শক্ত তো করতেই হবে। নচেৎ কিসের সমাজ-সংস্কারক তিনি? এমনি অবলা, অসহায়, বিধবাদের জীবনে চলার পথ সুগম করে দেওয়াই তো তাঁর কাজ। তবেই না হবে প্রকৃত সমাজ-সংস্কার।

অবশ্য অন্য ব্যবস্থাও করা যায় বই কি। পুনর্বিবাহ হলেই যে মহা সুখশান্তি হবে তার নিশ্চয়তা কই? বিয়ে তো অনেকেই করে আজকাল আকছার। আসলে কিন্তু ওসব মিথ্যে বাঁকা পথ বলতে হয়।

আমাদের মত পরিবারে এমন দুর্দশাগ্রস্ত মেয়েদের উদ্ধার করে উদারতা দেখিয়ে নতুন জীবন প্রদান করা কতজনের পক্ষে সম্ভব? কতজন লোক মেনে নেয়? আমার মত স্পষ্ট চিন্তার মানুষ, কৃতী মানুষ কতজন পাওয়া যাবে এ সংসারে?

এভাবেই কর্তব্যের দায়ে বাবাসাহেব পুত্রবধূর জন্যে উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে থাকেন। পাত্রও তেমনি বিপত্নীক হওয়া চাই। অল্পদিনের পত্নীহীন হওয়া পাত্র। তার উপর সমানে সমানে হওয়া চাই, অবস্থাপন্ন হওয়া চাই। উচ্চ বংশজাত হতে হবে। যেমন ছিল, যেমন বাড়িতে এসেছিল ওই মেয়ের জন্য তেমনি 'ঘর' পেতে হবে। ওই অভাগীর জন্য পরিকল্পনা-অনুযায়ী কাজ করবেন সমাজ-সংস্কারক শ্বশুর স্বয়ং। তাঁর নিজের বিধিলিপিটাই কেমন যেন লিখেছেন ওই বিধাতা পুরুষ।

এমনি দিনে এক সময় বাবাসাহেবের কাছে তাঁর রীতিমত নবরূপা বৌমা এসে দাঁড়ালো। নিজের বাপের কাছে যেমন অখণ্ড বিশ্বাস নিয়ে এসে দাঁড়াতো, তেমনি করে এলো সে। ধীরে কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, আমার মনে হচ্ছে এভাবে থাকা ঠিক হচ্ছে না। আবার বিয়ে করে ঘর-সংসারে ফিরে যাওয়া উচিত আমার। আমার কলেজের একজনের সঙ্গে কিছুটা কথাবার্তা হয়েছে। আশা করি আপনি আমাদের এ বিয়ে মেনে নেবেন। আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

বাবাসাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেন। তাঁর এতদিনের কল্পনার সেই পুত্রবধূর সঙ্গে এ মেয়ের যে পার্থক্য অনেক অনেক। সেই প্রায় অনাথা, অবলা, সব হারানো, ভাগ্যাহতা মেয়ে আজ শ্বশুরের সাহায্য নিয়েই নিজের আগামী দিনের জীবনসাথীর সন্ধানে পা বাড়িয়েছে। এই হাসিখুশি, নির্ভীক মেয়েটি নিজের করণীয় নিজেই ঠিক করে নিতে পারে, নতুন উৎসাহে নতুন করে সংসার সাজাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

বাবাসাহেব কি করবেন না-করবেন কিছুই স্থির করে উঠতে পারেন না। প্রায় বাতিল-হওয়া, আধমরা ওই মেয়েটিকে তিনি টেনে তুলেছিলেন। আজকের এই উজ্জ্বল মেয়েটি তারই ছত্রছায়ায় দিন কাটিয়েছিল। তিনি তো তাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার চেষ্টাতেই ছিলেন। কিন্তু ওদের এই নির্লজ্জ প্রেম এবং তারপর প্রেমের বিয়ে!

বাবাসাহেবের মন-মেজাজ তিক্ত হয়ে গেল। 'প্রেম বিবাহে' তাঁর মত ছিল না। যদিও তাঁর সমাজসেবার গণ্ডির মধ্যে এটাও পড়ে তবুও আতঙ্কিত বুঝি তিনি। ওদের এভাবে বিয়ে করাটাও যে সমাজ-সংস্কারের পর্যায়ে পড়ে তা তিনি এতদিন খুঁটিয়ে দেখেন নি। একদিন যে ধুমধাম করে একটা বিয়ে এ বাড়িতে সম্পন্ন হয়েছিল, ঘর সংসার শুরু হয়েছিল সেসব আজ ধূসর স্মৃতি। আজ আবার শুধুমাত্র নিরুপায় হয়ে বয়সের দিকে তাকিয়ে, সুখী জীবনের পথে এগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমাজ-সংস্কারের নিমিত্তই নিজ পুত্রবধূর নববিবাহ দিতে হবে। আর তাও কিনা যেটুকু না করলে নয়। আড়ম্বরে—অসুখী মনে—কারণ!

বৌমার এমন ধারা আচরণ বাবাসাহেবের বোধগম্য হল না। অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতে লাগলেন তিনি। এদের এই বিয়ে তো নির্মল প্রেমের পরিণতি স্বরূপ 'প্রেমবিবাহ' নয়। অথবা মানুষের মঙ্গলনিমিত্ত সংস্কারবাদী নববিবাহও নয়। এছাড়া ওদের এ বিবাহে আমার উদারতা, সংস্কারকের ভূমিকা কতটুকুই বা অবশিষ্ট থাকবে?

পুত্রবধূর শরমে রঞ্জিত মুখমণ্ডলের দিকে চোখ পড়তেই বাবাসাহেবের মনের সযত্নে পালিত কাল্পনিক চিত্রটিতে যেন কালোকালির ছিটে পড়তে লাগল।

অনুবাদ : জগত দেবনাথ

২.১ ☐ কাহিনি-সংশ্লেষ, নিবিড় পাঠ ও বিশ্লেষণ

বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উতোরচাপানের গল্প 'সমাজ-সংস্কারক।' কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছেন প্রগতিশীল চিন্তক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী বাবাসাহেব এবং তাঁর অল্পবয়সী সদ্যবিধবা পুত্রবধূটি— বাবাসাহেবের বড় ছেলের স্ত্রী।

বাবাসাহেবের বড় ছেলের বয়সও ছিল অল্প, সবে চাকরি পেয়েছিল, বিয়েও হয়েছিল সদ্য-সদ্যই। কোনো অসুস্থতাও ছিল না। তবু সে মারা গেল। তার এই আচম্বিত ও অকল্পিত প্রস্থানে শুধু যে তার নববধূটি বিধবা হলো তা নয়, তার বাবারও জীবনের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে গেল। আসলে সংসারে, সমাজে বাবাসাহেবের মানসম্মানের যেসব উপকরণ রয়েছে, গর্বিত হবার মতো অবকাশ আছে, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধার ছিল তাঁর এই বড়ো ছেলেটি।

তার মৃত্যুজনিত এই আচম্বিত ও অপ্রত্যাশিত আঘাতে মাসখানেক ধরে বাবাসাহেব প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে রয়েছেন। স্মৃতির বেদনায় জীবনের সব অর্থ হারিয়ে গেছে। জাগতিক সব কিছুতে অনীহার কারণে বিগতস্পৃহ এক বৈরাগ্যে তিনি গ্রস্ত হয়েছেন। গল্পের গোড়ায় একটি দীর্ঘ অংশ জুড়ে বাবাসাহেবের নিরাসক্তির দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। এই অবস্থাটি প্রায় যখন উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন একদিন কালের নিয়মেই তাঁর ক্ষতের নিরাময় শুরু হয়। খোলা আকাশের শূন্যতায় মগ্ন হয়ে থাকতে আর ভালো লাগে না তাঁর— চোখ ফেরান মাটির দিকে। স্থানুবৎ হয়ে গেছিল যে অস্তিত্ব— বারান্দার চেয়ারে যেন সমাধি হয়েছিল, তাতে প্রাণের সাড়া মেলে। চেয়ার ছেড়ে বাবাসাহেব পায়চারী করতে শুরু করেন— শূন্যপানে না-চেয়ে ঘাড় নীচু করে মাটির দিকে— তারপর আশেপাশের অতিপরিচিত পরিবেশের দিকে। ক্রমে নাকে-আসা ভাতের গন্ধ লুপ্তপ্রায় ইন্দ্রিয়বোধকে সচকিত করতে শুরু করল, তারপর স্বাভাবিক নিয়মে শরীরের অন্যান্য অনুভূতিগুলিও সজাগ হয়ে উঠল। যেন দীর্ঘ এক 'শীতঘুম' থেকে জেগে উঠলেন বাবাসাহেব। আসলে ছেলেকে হারিয়ে যে মান-গৌরব তাঁর লুপ্ত হয়ে গেছে বলে ভেবেছিলেন, ভেবেছিলেন তাঁর অস্তিত্বই যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে; এখনও তাঁর সেই গৌরব, সেই কৃতিত্ব সবই যে মানুষের চেতনগোচর আছে, সেটা দেখে তিনি ভারি আশ্বস্ত বোধ করেন। নিজের অস্তিত্বের মাপকাঠি হিশেবে তিনি ওই বাহ্যিক সামাজিক মনোযোগ ও স্বীকৃতিকেই ধার্য করে নিয়েছেন— তাই কোনো কারণে এগুলির প্রাপ্তি ব্যাহত হয়েছে মনে হলে তাঁর অস্তিত্বই যেন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে— অন্তত তাঁর বিচারে। সেই মানসিক সংকট ধীরে ধীরে কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় শান্ত হয়ে এল বাবাসাহেবের মন।

অন্তরের শূন্যতার সঙ্গে আপোষ করে বাইরে তাকালেন তিনি এবার— চোখে পড়ল পুত্রবধূর শাদা রঙের শূন্য কপাল— এতদিন নিজের বেদনায় বুঁদ হয়ে থেকে যা তিনি নজর করেননি।

লজ্জায়, কুণ্ঠায় মেয়েটি অপরাধীর মতো চলাফেরা করত— অতি নিঃশব্দে— তার কান্নাও ছিল নীরব— অন্তঃসলিলা হয়ে তারই বেদনার মধ্যে। মাত্র কিছুদিন আগেই নববধূর বেশে সে এ বাড়িতে এসেছিল— সামাজিক নিয়মানুযায়ী চৌকাঠে-রাখা চালভরা পাত্র পা দিয়ে উল্টে সমৃদ্ধির অঙ্গীকার নিয়ে। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে গৃহের মঙ্গলকামনাও সে করতো রোজই। জীবনের এমন পরিপূর্ণতার জন্য ভাগ্যবতী বলে মনে করতো নিজেকে সে। কিন্তু স্বামীর অকালমৃত্যু যেন তার 'অজ্ঞানকৃত' অপরাধের ফলেই— অবচেতনের এই বোধ আর পাঁচটা মেয়ের মতো হয়ত তাকেও পীড়িত করত— তাই অমন অপরাধীভাব তার। আসলে যে সামাজিক প্রথা মেনে সে সমৃদ্ধির অঙ্গীকার করেছিল প্রতীকীভাবে, সেই সামাজিক প্রথাতেই সদ্যবিবাহিত স্বামীর অকালমৃত্যু হলে তার নববধূটির দিকেই আঙুল ওঠার রেওয়াজ আজও রয়েছে এদেশে। আর এই সমাজই হয়ত তাদের জন্ম থেকেই শেখায় এভাবেই ভাবতে— তাই মেয়েটিও অনিবার্যভাবেই নিজেকেই দোষী মনে করেছে।

কিন্তু তার বিয়ে হয়েছিল এমন এক পরিবারে যার কর্তা শুধু সমাজসেবক নন— সমাজ-সংস্কারকও বটে— যিনি অবহেলিতদের সেবা করেন, অসহায় বিধবাদের পুনর্বিবাহ দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই তার এই চরম দুর্দশায় বিচলিত হলেন তার 'সমাজ-সংস্কারক' শ্বশুর। মনে পড়ে গেল সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ ও লিখিত নিবন্ধগুলির কথা, যেগুলির দৌলতে আজ সমাজে তাঁর এত মান ও খ্যাতি। তিনি যেন দেখতে পেলেন তাঁর খোলা আঙিনায় 'সমাজ' এসে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে— পিছনের দরজায় কান্নায় ভেঙে-পড়া হতভাগ্য পুত্রবধূর জন্য তিনি কি 'পুনর্বাসন' নির্দিষ্ট করেন সেটি জানতে। বাবাসাহেবের মনে হলো সমাজ যেন সমাজ-সংস্কারক হিসেবে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকাকে এক পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে; যেখানে তিনি পরীক্ষার্থী আর পুত্রপধূর বকলমে পরীক্ষক হলো সমাজ।

সক্রিয় হয়ে ওঠে বাবাসাহেবের চেতনা— তিনি ব্যথিতা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দিয়ে শোকসংবরণ করতে বলেন, কারণ তিনিই তো পিতার মতো তার সহায় হয়ে আছেন। বিশিষ্ট সমাজসেবীর এই আশ্বাসবাণীতে মেয়েটি শান্ত হলো। আর তার দীনচেহারা ও আশ্রয়প্রত্যাশী দৃষ্টির সামনে ভারি পরিতৃপ্ত বোধ করতে লাগলেন বাবাসাহেব। আসলে এই যে তিনি করুণা দেখাতে পারছেন, দুঃখী মেয়েটি তাঁকে সহায় বলে মান্য করেছে— এতে তাঁর জীবনের অর্থ ও অস্তিত্বের স্মারক যে সমাজ-সংস্কারক সত্তা— সেটি আবারও স্বীকৃত হচ্ছে পুত্রবধূর কাছে, পরিবারের কাছে এবং অবশ্যই সমাজের কাছে। তাই নিজেকে তাঁর নতুন করে আবার গণ্যমান্য নেতা বলে হতে থাকে। নতুন উদ্যমে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে মনস্থ করেন নিপীড়িতদের সেবায়— শান্তি, সুখ এবং জনপ্রিয়তা তবেই না আবার তাঁর করায়ত্ত হবে!

ঠিক এই পর্যায় থেকেই গল্পটির মধ্যে বাবাসাহেবের অতি-সম্মানিত অবস্থান নিয়ে কিছু প্রশ্ন জাগতে শুরু করে পাঠকের মনে। সমাজ-সংস্কারের সূত্রে বঞ্চিত, শোষিত মানুষদের মঙ্গলকামনা করা— নিজের পুত্রবধূর চরম বিপর্যয়ের পর তাকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা— যাবতীয় প্রশংসাসূচক কাজের নেপথ্যে তাহলে জনপ্রিয়তা অর্জনেরও একটি লক্ষ্য থাকে এই জনদরদী নেতার। অর্থাৎ স্বার্থবিহীন নয় এই সমাজসেবা— নিছক মানসিক শান্তি ও পরিপূর্ণতালাভ তাঁর কাছে একমাত্র কাম্য নয়।

কাহিনীতে ফ্ল্যাশব্যাকে বাবাসাহেবের অতীত জীবনের নানান কথা আসে এবার। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অহংপরিতৃপ্তির বিষয়টিই কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে— তা সে পিতৃআজ্ঞা পালন করতে বাবার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করার উদারতাই হোক, কিংবা অধ্যাপনা করার সময় সরকারী চাকরী পেয়েও মোটা মাইনের মোহ ত্যাগ করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করাই হোক। এত উদারতা ও ত্যাগের বিনিময়ে তিনি পেয়েছেন অঢেল সাফল্য ও গর্বিত হবার অবকাশ। তাই কোনো আক্ষেপ নেই তাঁর। তাই আজ যখন পুত্রবধূর 'ভার' তাঁর ওপরে পড়েছে, তখন স্বাভাবিক নিয়মেই সাফল্য ও গর্ব— দুইই তাঁর অভিপ্রেত হবার কথা। লেখক তার শব্দটিকে উদ্ধৃতিচিহ্নের বিচরে রেখে অবশ্য অন্যতর একটি ব্যঞ্জনাও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন— সেটি ক্রমশ আলোচ্য।

যাই হোক বড় ছেলের মৃত্যুর শোককে ছাপিয়ে ধীরে ধীরে বিধবা বউটির প্রতি কর্তব্যবোধ অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বাবাসাহেবের কাছে। এই অবলাকে 'জীবন' দিতে, তাকে নতুন করে 'বাঁচিয়ে' তুলতে পারলে তবেই তো হবে তাঁর অহং-তৃপ্তি। কারণ এভাবেই তিনি পারবেন সমাজের 'পঙ্গু' দিকটির সংশোধন করতে। এই মহৎ প্রয়াসের অন্তরালে সর্বময় হয়ে থেকেছে এই বোধ— "এই নির্মাল্যকে পুনরায় জাগিয়ে দিতে হবে।" — লক্ষ্যণীয় পুত্রবধূর এই পুনর্বিবাহের প্রয়াসের মাধ্যমে তিনি মেয়েটিকে 'নির্মাল্য' হিসেবে গণ্য করছেন— অর্থাৎ পুরুষশাসিত সমাজের নিয়মে পুরুষপতির অর্থাৎ 'ভগবানের' পায়ে দেওয়া পুষ্পার্ঘ্য হিসেবেই গ্রাহ্য হল বিবাহিতা স্ত্রী। উদারচেতা বাবাসাহেবের চিন্তাক্রমও কিছু ব্যতিক্রমী নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গড়পড়তা আর পাঁচটা 'সাধারণ' মানুষের মতো যে তিনি বা তাঁর পরিবার নয়— এইটি প্রশ্রমণের তাগিদ তাঁর এবং তাঁরই আদর্শেগড়া পরিবারের সকলের মধ্যেই কমবেশি রয়েছে। তাই অকালমৃত ছেলের বিধবা স্ত্রীকে রীতিমাফিক বিষকন্যা, ডাইনি সন্দেহে বাড়ি তাড়িয়ে না-দিয়ে তাকে পরম আদরে আপনজনের মতো পালন করা হতে থাকে। বাবাসাহেবের স্ত্রী তাকে মেয়ের মতো বলে মনে করেন। ননদেরাও বৌদিকে আগলেই রাখে। আর শ্বশুরের আদর্শ ও মমতা তো রয়েছেই।

এত সমাদরে ক্রমে মেয়েটিও শোক ভুলে স্বাভাবিক হতে থাকে। তার এই নবজীবনের অভিজ্ঞান হয়ে আসে তার কলেজ-জীবন — নতুন করে লেখাপড়া শুরু করে জীবনের মূলস্রোতে সে ফিরে আসতে প্রয়াসী হয়। বৌমা যত স্বাভাবিক হতে থাকে বাবাসাহেব তত অনুভব করতে থাকেন নিজের অসাধারণত্ব। বস্তুত তাঁরই কৃতিত্ব যে এই 'নবজন্ম' —এই বোধটি এতটাই সর্বময় হয়ে উঠে তাঁকে আপ্লুত করে যে নিজেকে আগরকর, কার্বে প্রমুখ মহান সমাজসেবীদের সমতুল্য হিসেবে ভাবতে থাকেন— ভুলে যেতে থাকেন ছেলের মৃত্যুশোকও। মৃত ছেলের স্মৃতি শুধুই তাঁর গ্লানি ও পরাজয়ের ইঙ্গিতবাহী। তাই সেটিকে যত তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠে পুত্রবধূকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে গর্ব ও জয় অনুভব করা যায় এমন অবচেতন তাগিদই যেন তাঁকে অতিদ্রুত স্বাভাবিক করে তুলল। ভগ্নহৃদয় পিতার অস্তিত্ব নির্মঞ্ছিত করে আবারও সর্বময় হয়ে দাঁড়ালেন সমাজ-সংস্কার-উদারচেতা বাবাসাহেব।

অতঃপর শুধুই পুত্রবধূর ভবিষ্যতের চিন্তা। 'কাদায় পা বসে যাওয়া আদরের গরুটিকে তুলে শুধু খাড়া করা গেলেই' চলবে না, তাকে শক্ত খুঁটির সঙ্গে আবারও বেঁধে দিতে হবে। এমনভাবে আরো অনেক অভাগীকে তিনি আগে উদ্ধার করেছেন— অসহায় বিধবাদের জীবনের পথ সহজ করাই তো তাঁর আরব্ধ কাজ।

কিন্তু বাবাসাহেবের এইবারটিতে যেন 'কেমন কেমন' মনে হোতে লাগল। আসলে প্রচুর ঝাড়াই-বাছাই করে বিয়ের বাজার থেকে সেরা পণ্যটিকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন এ বাড়ির গৃহলক্ষ্মী করতে। ঠিক তাঁর মতেই তাঁর উদারচেতা বড়ো ছেলেও বাবার পছন্দেই বিয়ে করেছিল। সেরা পণ্যটি তাঁর 'মহান' বংশকে বিস্তার করার মাধ্যমও

যে এমন গোপন মনোভাবও তাঁর ছিল। মহাপ্রাণ বাবাসাহেবও আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই বিয়ের বাজারে পাত্রীর গুণমান নিয়ে দরদস্তুর করা কিংবা 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'-র প্রচলিত ঐতিহ্য থেকে বিমুক্ত ছিলেন না যে— তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু তিনি তো আবার সমাজ-সংস্কারকও বটে। তাই নিজের মনকে শক্ত করে নিজের ঘরের মহার্ঘ বস্তুটিকে অন্যত্র পাত্রস্থ করার কথা ভাবতে পারেন তিনি। তবে মনের ভেতরে একটা খচ্‌খচানি তাঁর আছে— পুনর্বিবাহ আজকাল জলভাত হয়ে এলেও তাতেই যে মহাসুখশান্তি আসবে এমন নিশ্চয়তা এমনকি তিনিও দিতে পারবেন না। তাই তাঁর কখনো এমনও মনে হয় যে, পুনর্বিবাহের পদ্ধতি আসলে সুখের খোঁজে এক 'মিথ্যে, বাঁকা পথ' মাত্র। পুত্রবধূর মঙ্গলকামনায় অবশ্য তাই তিনি অন্য ব্যবস্থাও করতে পারেন বইকি। কিন্তু না, তাতে প্রকৃত সমাজ সংস্কারক হওয়া হবে না। বিধবা পুত্রবধূর শ্বশুরবাড়ি থেকে তার পুনর্বিবাহের আয়োজন করলে তবে না আর পাঁচটা গতানুগতিক পরিবার থেকে তাঁরা যে উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে। উদারতা দেখিয়ে বিধবা পুত্রবধূকে নতুনজীবন দান করা কি সাধারণ পরিবারের কাজ? এমন মহৎ অথচ কঠিন সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ই বা কটা লোক ? কিন্তু তিনি নেন, তাঁর পরিবার নেয়— তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই তিনি দাবী করতে পারেন যে তাঁর মতো স্পষ্ট চিন্তার কৃতী মানুষ সংসারে বিরল।

কর্তব্যের তাগিদে বাবাসাহেব পাত্র খুঁজতে শুরু করেন। একদা ছেলে তাঁর মতে বিয়ে করেছিল। আজ এই মেয়েটিও তাঁর কন্যাবৎ। তাই এ ক্ষেত্রেও তাঁরই মত হবে শিরোধার্য— এমনটাই প্রত্যাশিত। বাজার ঘুরে বেছে আনা শ্রেষ্ঠ পাত্রীর জন্য তিনি এবারে খুঁজতে থাকেন অল্পদিন বিবাহের পরে বিপত্নীক পাত্র। 'খুঁতো' পাত্রীর জন্যে 'খুঁতো' পাত্রই তো সবচেয়ে মানানসই— এমনটাই তাঁর বিচার। তবে সে পাত্র হতে হবে কুলে, মানে, অর্থে তাঁর বংশের সমান-সমান। নইলে তাঁর ভারী মানহানি হবে— মেয়েটি তো তাঁরই 'কন্যাসমা'। সমাজের চোখে তাঁর পিতার আসনে অবস্থিত বাবাসাহেবের নইলে মুখরক্ষা হবে না। আঁটোসাঁটো পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা-অনুযায়ী অভাগীর জীবন-সংস্কার করতে প্রস্তুত হন শ্বশুর। মনে ভাবেন বিধাতাপুরুষ যেন নিজের ক্ষমতাটাই বাবাসাহেবকে লিখে দিয়েছেন— বিধাতার নির্দিষ্ট করা বিধিলিপি আর বাবাসাহেবের নির্দিষ্ট করা বিধিলিপি মিলে মিশে গিয়ে তাঁর অস্তিত্বকে যেন ঐশ্বরিক করে তুলেছে— অন্তত তাঁর নিজের কাছে। নিজেকে 'ভগবান' ভেবে-নেওয়া মানুষটির কাছে একদিন সুসজ্জিত, কলেজ-পড়ুয়া বিদুষী বৌমা এসে দাঁড়ায়— যেন নিজের বাবার কাছেই সে এসেছে— এমন আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে। সেই বিশ্বাসে ভর করে সে নিঃসঙ্কোচে শ্বশুরকে জানায় কলেজের এক সহপাঠীর সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনার কথা— ভারী যুক্তিপূর্ণ ভঙ্গীতে সে আরো বলে যে, এভাবে পরনির্ভর হয়ে না-থেকে বিয়ে করে জীবনের স্বাভাবিক পরিক্রমায় ফিরে যাওয়াই সে যথার্থ বলে মনে করে এবং এও আশা করে যে, তার শ্বশুর যিনি উদারচেতা, জনদরদী, সমাজসংস্কারক এক মানুষ — তিনি স্বাভাবিকভাবেই এই বিয়ে মেনে নিয়ে তাদের আশীর্বাদ করবেন।

এক লহমায় বাবাসাহেবের সব পরিকল্পনা যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। চোখের সামনে তাঁর কল্পনায় ভাবা অভাগী পুত্রবধূর ছবির পাশে এক চূড়ান্ত ব্যতিক্রম হিশেবে প্রতিভাত হলো এই হাসিখুশি নির্ভীক মেয়েটি। প্রায় অনাথা, অবলা, সর্বরিক্ত, অসহায় যে মেয়েটির ছবি তিনি পরম করুণায়, মমতায় নিজের অন্তরে ধরে রেখেছিলেন, আজ তাকে তিনি আর খুঁজে পেলেন না এই উজ্জ্বল ও আত্মপ্রত্যয়ী মেয়েটির মধ্যে। এই মেয়েটি আর আগের মতো

শ্বশুরের সাহায্যে জীবনের সন্ধান করে না। সে নিজের করণীয় নিজেই ঠিক করে নিতে পারে— তার উৎসাহ, প্রত্যয়, নির্ভয় মানসিকতা—কোনোটাই শ্বশুরের প্রদত্ত দান নয় — স্ব-অর্জিত।

মেনে নিতে পারেন না তার উদারচেতা শ্বশুর। আধমরা মেয়েটিকে তিনি টেনে তুলেছেন, তার পুনর্বিবাহ দিতে প্রয়াসী হয়েছেন, তাঁরই ছত্রছায়ায় অভাগী মেয়েটি দিন কাটায় — এইসবই তো ছিল একমাত্র বাঞ্ছিত সত্য যা বাবাসাহেবকে প্রতিমুহূর্তে করে গর্বিত, পরিপূর্ণ করে তাঁর সমাজসংস্কারক সত্তাকে — চরিতার্থ করে তাঁর অহংবোধকে। এর কোনো অন্যথা তিনি কীভাবে, কেন মেনে নেবেন — বুঝতে পারেন না। প্রবল তিক্ততায় মেয়েটির অতি সঙ্গত ও স্বাভাবিক হৃদয়বাসনাকে 'নির্লজ্জ প্রেম' বলে ধিকৃত করেন তিনি. 'প্রেমের বিয়েতে' মুক্তমনা বাবাসাহেবের কোনোদিনই মত নেই — সমাজসেবার অঙ্গ হলেও নয়। কারণ কোনো অভাগীর প্রেমজ বিবাহে তাঁর কোনো ভূমিকা, কোনো গুরুত্ব যে থাকে না। তাই বিধবার প্রেমবিবাহ-ও যে সমাজ-সংস্কারের এক সংবেদনশীল এবং উদার পন্থা — সেটিও তিনি বিস্মৃত হয়ে থাকতে চেয়েছেন এতদিন। আর এইবার নিজের জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'ভগবান' হয়ে-ওঠা বাবাসাহেব স্বীকার করেন (যদিও মনে মনে।) শুধুমাত্র নিরুপায় হয়েই তিনি পুত্রবধূর পুনর্বিবাহ দিতে মনস্থ করেছিলেন — সমাজ-সংস্কারকের গৌরবময় তকমাটি অটুট রাখতে। কিন্তু সেটিও অসুখী মনে — তাই বিনা আড়ম্বরে কার্যটি সমাধা করতে চেয়েছিলেন। 'ভার' লাঘব করাও হয়ত অবচেতনে জাগরূক ছিল।

বৌমার এমন 'অসহযোগিতা'য় বাবাসাহেব রুষ্ট ও বিচলিত হয়ে গেলেন। তাঁর কোনো পরিকল্পনাই যে কার্যকর হলো না! এমনকী বজায় রইল না সমাজ-সংস্কারক হিশেবে তাঁর উদার, মহান কর্তব্যনিষ্ঠতার পরিচয়। 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' মেয়েটি সব নষ্ট করে দিল; প্রাপ্য গৌরব, মর্যাদা, জনপ্রিয়তা সবকিছু থেকে বঞ্চিত হলেন তিনি — 'অসাধারণ' ও ভগবানতুল্য হয়ে ওঠা হলো না বাবাসাহেবের।

অবলাদের পুনর্বাসনে জীবনের সার্থকতা খুঁজতে চাওয়া ত্যাগী মানুষটি নিতান্ত ছাপোষা সাধারণ মানবকের মতোই তাই অবরুদ্ধ বিরক্তি ও ক্রোধের সবটুকু মনে মনে বর্ষিত করতে লাগলেন ওই নিরপরাধ মেয়েটির প্রতি। যার প্রতি মমতায় আপ্লুত ছিলেন খানিক আগেও, অবলীলায় তার এই বিবাহেচ্ছাকে কলুষ বলে ভাবতে লাগলেন— তাদের প্রেম যে 'নির্মল' নয়, তাদের বিবাহও যে মানুষের মঙ্গলের জন্য সংস্কারবাদী নববিবাহের মতো মর্যাদা পাবার অধিকারী নয়— অতি অক্লেশে তা তিনি ভাবতে লাগলেন।

আসলে মোদ্দা কারণটি হলো, এই বিবাহে বাবাসাহেবের উদারতা, মহনীয়তা, সংস্কারকের ভূমিকা পালনের গৌরব কিছুই অবশিষ্ট রইল না আর — বলা ভালো 'অর্বাচীন, স্বার্থপর' মেয়েটি রাখতে দিল না।

নবজীবনের সুখকল্পনায় রক্তিম-আননা অল্পবয়সী মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বাবাসাহেবের মনে পড়তে লাগল তাঁর মনের গোপনে সযত্নে লালিত বিধবার পুত্রবধূটির মলিন, দুঃখী চেহারাটি — আজ তাতে তিনি দেখতে পেলেন 'কালো কালির ছিটে।' আসলে তাঁকে 'অধিকার' থেকে, 'প্রাপ্য' থেকে বঞ্চিত করে মেয়েটি যে 'অপরাধ' করেছে বলে তিনি ধার্য করেছেন, তা তো কলঙ্কই — সমাজ-সংস্কারকের চোখে, 'ভগবান' বাবাসাহেবের বিচারে।

মুখোস খসে গেল বাবাসাহেবের — আর সেই সঙ্গে লেখকের অভিপ্রায়ও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল গল্পটির 'সমাজ-সংস্কারক' নামকরণের নেপথ্যে বস্তুত সমাজকে সংস্কার করে পবিত্র করতে গেলে প্রথমে যে আত্মসংস্কার

করাটা জরুরি — সেটাই যেন ওই শ্লেষাত্মক নামকরণটির মাধ্যমে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন তিনি। বাবাসাহেবের কাছে ব্যক্তিগত পরিচয় কি মানবিক অস্তিত্বের তুলনায় সমাজ-সংস্কারক হিসেবে নিজের প্রতিপত্তি, মান ও জনপ্রিয়তাই যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটিও এর মাধ্যমে ব্যঞ্জিত। আগে মানুষ হলে তবে সমাজকে কিছু দেওয়া যায় — নিজেকে নির্মল করে তবেই সমাজকে কলুষমুক্ত করা যায় — এই মহান ও নির্মম সত্যটিই এ গল্পের সারকথা হয়েছে।।

বদমাশ
(গুজরাতী)
ঝবেরচান্দ মেঘানী

১.১ ▢ কাহিনি

ট্রেনের চাকা তখন একপাক ঘুরে গেছে। রামলাল একেবারে শেষ বগিতে যখন তার স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তোলে, ততক্ষণে গাড়ির চাকায় শব্দ উঠতে শুরু করেছে। কোনমতে তিন বাচ্চা আর পোঁটলা-পুঁটলি জানালা দিয়ে গলিয়ে দিল সে। রুক্মিণী সবশেষে তুলে-দেওয়া বাক্স আর কোলের বাচ্চাটিকে সামলে নিতে-না-নিতেই ট্রেন স্টেশন-ইয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

খালি হয়ে-আসা প্লাটফর্মে তখনো যারা এই দৃশ্যের সাক্ষী ছিল তারা সকলেই রামলালকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে শুরু করে—

"সবাই একেবারে সাহেবের বাচ্চা বনে গেছে। একেবারে পাংচুয়াল টাইমে আসবে।"

"কার হাতে যে বৌকে দেখাশোনা করার ভার দিল তা পর্যন্ত খেয়াল করল না!"

কথাগুলো রামলালের কানে যেতে সে একটু ঘাবড়ে যায়। সত্যিই তো কামরায় কারা ছিল? কাকে সে বলল, বাচ্চাদের একটু খেয়াল করবেন। কামরার দৃশ্যটি ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল তার নাকে দেশী বিড়ির উৎকট গন্ধ লেগেছিল। কর্কশ গলায় কিছু অশ্লীল কথাবার্তাও যেন শুনেছিল। স্পষ্টভাবে কোন যাত্রীর চেহারা সে মনে করতে পারে না, কেবল কালো টুপি, কালো দাড়ি, কালো লুঙ্গি ইত্যাদি কিছু কালো ছায়া রামলালের মনকে অন্ধকার মেঘের মত আচ্ছন্ন করে দেয়। গেট থেকে বাইরে বেরুতে এক পরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করল, "বাচ্চাদের কার সঙ্গে পাঠালেন, রামলাল ভাই?"

"সঙ্গে যাবার মত তো কাউকে পেলাম না।"

"তাহলে কাকে আপনি বলছিলেন যে ছেলেমেয়েদের একটু দেখবেন দাদা?"

"বলেছিলাম বটে, কিন্তু কাকে যে বললাম, এখন মনে করতে পারছি না।"

"তাহলে এমন তাড়াহুড়ো করা উচিত হয় নি মোটেই, কালকে না হয় পাঠাতেন ওদের।"

"হ্যাঁ, এখন একটু ভাবনাই হচ্ছে।"

"আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, আমরা রেলগাড়ি দেখলেই কেন জানিনা এখনো বেশ একটু ভড়কে যাই।"

এই 'ভড়কে যাই' কথাটা রামলালের একেবারে মর্মমূলে গিয়ে লাগল। এই শব্দটা সে সময়কার রামলালের আচরণের এক হুবহু চিত্র এঁকে দিল। লাল কাপড় দেখলে ষাঁড় যেমন ভয় পায়, উট দেখলে মোষ যেমন ঘাবড়ে যায়, মিল মালিককে দেখলে আজকাল যেমন শ্রমিক নেতা ক্ষেপে ওঠে ঠিক তেমনি রামলাল গার্ডের কামরায় লণ্ঠন দোলানো দেখে একেবারে মাথা খারাপ করে ফেলেছিল। নিজের জলজ্যান্ত বউকে মানুষ গণ্য না করে একটী নির্জীব পুঁটলি বলে ধরে নিয়েছিল সে। আরে ছিঃ ছিঃ, মানুষ বাক্স-প্যাঁটরাও পরিচিত কোন বিশ্বস্ত লোকের হাতে দিয়েই পাঠায়। একবার রামলাল তার দেশের কাঁচা আমের টুকরি পাঠাবার সময় নিজের আত্মীয়ের ওপরও ভরসা করতে

পারেনি। মনে হয়েছিল পথে আত্মীয়টি নির্ঘাৎ দু-একটা আম সরিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে! আর এখন এটা সে কী করে বসল?

অন্য আর একজন লোক সে সময়ে রামলালের কানে কানে এসে কিছু বলল। কথা বলার সময় সে চারধারে এমনভাবে তাকিয়ে দেখছিল যেন এখনই স্টেশনের দেয়াল ফুঁড়ে কোন গুপ্তঘাতক ছোরা হাতে লাফিয়ে পড়তে পারে।

লোকটি রামলালের কানে বলে গেল, "মশাই, ঐ কামরায় তো আহমেদাবাদের গুণ্ডা সর্দার আল্লারাখা আর তার দশজন নেশাড়ে গাঁজাড়ে চ্যালা চামুণ্ডা বসেছিল। আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। ওদের সঙ্গে একটা বেশ্যা মাগীও ছিল। সবাই মাগীটার সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা করছিল। মাগীটাকে সকলে ঠেলে নিয়ে গিয়ে আল্লারাখার কোলে তুলে দিচ্ছিল। আমি নিজের চোখে এসব দেখেছি। ত্রিশজন লোকের বসবার কামরা ওটা মশাই কিন্তু ওরা ঐ দশ বারোজন ছাড়া কামরায় আর কোন যাত্রী ছিল না। ওদের চেহারা দেখেই সব লোক অন্য কামরায় গিয়ে বসছিল। আপনি জেনেশুনে মশাই আপনার ছেলেমেয়েদের কি করে বাঘ নেকড়েদের মাঝখানে ফেলে দিলেন?"

রামলালের রক্ত হিম হয়ে যায়। লোকটা আবার চারধারে তাকিয়ে হাত দিয়ে যেন নিজেকে আড়াল করে বলে, "মশাই, দশ-পনেরোদিন বাদে-বাদেই আল্লারাখা এদিকে ঘুরে যায়। এবারেও ওর আসার পর পাঁচবার রেলের কামরায় খুন করা লাশ পাওয়া গেছে আর শহরে প্রায় সাতবার লুটপাটের খবর শোনা গেছে। হেন নোংরা কাজ নেই যা ও পারে না। ওকে তো সবাই চেনে। আপনি হয়তো বলবেন, পুলিশ জানে না কেন? আমি তো বলবো, পুলিশ সব জানে মশাই, কিন্তু আল্লারাখা পুলিশকে হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছে। এখন আপনি কি বলেন বলুন? ও তো পুরো গুজরাতটাকে নিজের বাপের সম্পত্তি বলে মনে করে। আরে মশাই সেই কথাই হল আর কি, সরকারী রাজত্বে ভাল মানুষের কাজ নেই। সারা দেশটা নষ্ট হয়ে গেল। গান্ধিজিই সব খারাপ করে ছেড়েছেন। এমনি করে কি আর স্বরাজ আসে মশাই? ইংরেজ রাজত্বে নিয়মের কথা ভাবুন একবার....."

এই ধরনের আরো কিছু তত্ত্বকথা রামলালকে শোনাবার বাসনা ছিল লোকটির, কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হল তার যে রামলাল সে সব কথায় কান না দিয়ে অন্য কি ভাবছে। সে রামলালকে ছেড়ে একটু দূরে অন্য আর একজনকে কিছু বলতে শুরু করে। দু-জনে হাসাহাসি করতে থাকে। তারা রামলালকে হাত দিয়ে দেখিয়ে এমন ভাবভঙ্গি করছিল যে দূর থেকে দেখলেই বুঝতে পারবে যে রামলালের মত মহামূর্খ আর হয় না।

রামলাল একটা টেলিগ্রাম করবে ঠিক করল। টেলিগ্রাফ অফিস সামনেই ছিল। নিয়ন আলোয় 'তারঘর' কথাটা যেভাবে জ্বলজ্বল করছিল কোন অন্ধ লোকেরও নজরে পড়ার কথা কিন্তু রামলালের তখন বুদ্ধিসুদ্ধি এমন লোপ পেয়ে গেছে যে তাকে পাশের লোককে জিজ্ঞেস করতে হল।

টেলিগ্রামের ফর্ম নিয়ে সে খবরটা লিখে ফেলল। একবার জিজ্ঞেসও করে নিল গাড়িটা এ সময় কতদূরে পৌঁছেছে। আগের স্টেশনের স্টেশন-মাস্টারের নামে টেলিগ্রামটা যত কম সম্ভব শব্দে লিখে সে মোটামুটি হিশেব করে দেখল ন-আনাতে হয়ে যাবে—এত কম শব্দে সব কথা গুছিয়ে লিখতে পারার জন্যে নিজেকে নিজেই একবার তারিফ করে নেয়। একটা এক টাকার নোট ও ফর্মটা জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিল সে।

'আরো দু-টাকা লাগবে।" তার-মাস্টার মাথাটা সামান্য তুলে কথাটা বলেই আবার লিখতে শুরু করে।

"কেন?" রামলাল চটে ওঠে, "আমাকে কি বুদ্ধু ভেবেছেন...."

"একটা চার্জ লাগবে।" তার-মাস্টার জবাব দেয়।

"কিসের জন্যে?"

"লেট ফি প্লাস সানডে চার্জ।"

রামলালের মনে হল তাকে যেন কেউ গভীর ঘুম থেকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিল। তিন টাকা? নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে টেলিগ্রাম করার জন্যে তিন টাকা খরচা সে মরে গেলেও করতে রাজি নয়। সে ভাবতে থাকে সত্যিই কি তিন টাকা খরচ করারমত বিপদ দেখা দিয়েছে? আমার বউ কি বুদ্ধি খরচা করে পরের স্টেশনে অন্য কামরায় চলে যেতে পারে না? আমার সঙ্গে এতদিন ঘর করার পর এটুকু বুদ্ধিও কি ওর ঘটে হবে না? কে জানে বাবা। হাজার হলেও মেয়েমানুষ তো! মেয়েদের বুদ্ধি তো আবার গোড়ালিতে হয়। ভুল করে বসবে ঠিক। কোন বিপদে পড়লে কি চেন টানতে পারবে না? চেনটা ও যেখানে বসেছে সেখানেই তো ছিল। কিন্তু চেন ঠিক আছে কিনা কে জানে। এই বর্ষার সময়ে চেন জ্যাম হয়ে গেলেই হয়েছে। রেলওলারা অ্যালার্ম-চেনটা পর্যন্ত চালু রাখার দিকে ঠিকমত খেয়াল দেয় না। কিন্তু আমার স্ত্রী কি চিৎকার করতে পারবে না তেমন বুঝলে? বাচ্চারাও তো চেঁচাতে পারে! কিন্তু ঐ বদমাশ আল্লারাখা যদি তাদের মুখ চেপে ধরে—?

পোস্টমাস্টার টেলিগ্রামের ফর্ম আর টাকাটা বাইরে ঠেলে দিতে রামলালের চিন্তাজাল ছিন্ন হল। "এক কাজ করুন, ভাল করে ভেবে চিন্তে কাল সকালবেলা টেলিগ্রাম করতে আসবেন, ততক্ষণে সোমবারও হয়ে যাবে, চার্জ কম লাগবে।" তারমাস্টার জানায়।

রামলাল মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেয়। সে যেন কল্পনার চোখে দেখতে পায়—জঙ্গলের গভীর অন্ধকারে তার স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, বেচারীর চিৎকার করার উপায় পর্যন্ত নেই, আর তার ছোট ছেলেটা ভয়ে আগেই মারা গেছে।

"হে ভগবান, রক্ষাকর্তা নারায়ণ," আপনা থেকেই তার মুখ থেকে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ঠাকুরের নাম বেরিয়ে আসে। সে টেলিগ্রামের ফর্মটা আবার জানালা দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট ফেলে দেয়।

"রিপ্লাই প্রিপেড?" তার-মাস্টার তার নিজের ভাষায় সংক্ষেপে প্রশ্ন করে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের কাজকর্মের ভাষাটাকেই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং আশা করে সকলেরই তার ভাষা বোঝা উচিত।

"কি বললেন, তা....না....আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে উত্তর আনিয়ে দিন।" রামলাল কোন প্রকারে জবাব দেয়।

রামলালের হৃদয়ে যেন একটা ছাঁকনি রয়েছে—চাতুরী আর নিপুণতার ছাঁকনি। নিজের প্রত্যেক চিন্তা ভাবনাকে সেই চালুনিতে ছেঁকে নেবার পর সে কাজে লাগায়।

পোস্টমাস্টার আট আনা নিজের পকেটে রেখে বাকি পয়সা ফেরত দেয়, তারপর নানা নিয়ম কানুন ও ক্রিয়াকাণ্ডের পর যখন রামলালের নির্দেশটা মেসিনে ফেলে টরে-টক্কা করা হতে লাগল, তখন রামলাল কিছুটা সাহস ফিরে পায়। প্রত্যেক টরে-টক্কা ধ্বনির মধ্যে কল্পনায় সে পুলিশের ভারী বুটের শব্দ শুনতে থাকে, হাতকড়ির ঝন ঝনাৎকার, বদমাশ আল্লারাখার হাতে হাতকড়ি পরানোর আওয়াজ পর্যন্ত যেন শুনতে পায়।

টেলিগ্রামের উত্তরটা একটা খামে পুরে তার মাস্টার এগিয়ে দিতেই রামলাল এক অপার শান্তি অনুভব করে। খামটা ছিঁড়ে দেখে তাতে লেখা রয়েছে ঃ

"গাড়ি পাঁচ মিনিট আগেই এখান থেকে রওনা হয়ে গেছে।"

আবার তার পরের স্টেশনে টেলিগ্রাম করার ক্ষমতা রামলালের ছিল না। সে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। পুরানো কালের মানুষ হলে কুলদেবতার কাছে মানত করত সে আর একেবারে আধুনিক হলে সরাসরি নিজের পুরুষকারের গর্ব করত। কিন্তু সে মাঝামাঝি শ্রেণীতে পড়ে বলে বাড়ি গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নেয়—তার চারপাশে যেন সে ভয়াবহ আকৃতির মূর্তিদের ঘুরতে দেখে।

ভয়ঙ্কর ক্লান্তি লাগছিল তার, কিন্তু তবু ঘুমতে পারে না। সমস্ত স্নায়ু তার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, না ঘুম না জাগরণের মাঝামাঝি এক পরিস্থিতিতে ভয়ে আতঙ্কে ঘেমে নেয়ে ওঠে।

তার মনে হল যে লোকটাকে ও ছেলেমেয়েদের খেয়াল রাখতে বলেছিল তাকে যেন কোথায় সে দেখেছে?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে! একবার ট্রেনে যাবার সময় তাকে দেখেছিল সে। রাত্রিতে লোকটা হঠাৎ তাদের কামরায় উঠেছিল। বীভৎস চেহারার মানুষটা—কিন্তু তার কাছে হাত জোড় করে বলেছিল, "ভাইসাব, আমাকে একটুখানির জন্যে এখানে লুকোতে দিন। দোহাই আপনার, আমি স্বীকার করছি আমার কাছে চোরাই আফিম রয়েছে। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে।"

সেদিন সেই কালো লোকটাকে সাফ বলেছিল, "যা ভাগ্ বদমাশ। এখানে হবে না। এখান থেকে সরে পড়।"

সে তখন স্ত্রী রুক্মিণীর কাছে মিনতি করেছিল, "তুমি আমার মা। আমাকে লুকিয়ে নাও।" স্ত্রী বলেছিল— "পাশে বসে পড়ো।" স্ত্রীকে ধমকে, "পুলিশ পুলিশ" করে চিৎকার করেছিল। পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে নিয়ে যায়। আদালত তাকে বাহবা দিয়েছিল আর লোকটার তিন বছরের জেল হল। সে সময়ে সে দিব্যি দিয়ে বলেছিল, "ঠিক আছে রামলাল, জেল থেকে বেরিয়ে তোকে আমি দেখে নেবো।"

হ্যাঁ, এ তো সেই লোক। এতক্ষণে স্ত্রীর কাছে খোঁজখবর করে নিয়েছে.........এবার সে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে.........স্ত্রীকে খুন করে তার রক্তপান করছে.........হায় ভগবান।

রামলাল তার নিজেরই আর্ত চিৎকরে ঘুম থেকে জেগে ওঠে।

রোজের মতই সে রাত কেটে সকাল হল। দশটা নাগাদ রামলাল তার শালার টেলিগ্রামে সকলের নিরাপদে পৌঁছানোর সংবাদ পেল। তিন দিনের দিন নিজের স্ত্রীর লম্বা চিঠি পেয়ে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। তার স্ত্রী আগে কোনবার এত তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর খবর দেয় নি।

অল্পশিক্ষিত স্ত্রীর নিজস্ব ভাষায় লেখা চিঠি। চিঠির শুরুতে 'প্রিয়' বা 'আমার প্রিয়তম' অথবা 'আমার প্রাণাধিক প্রিয় স্বামী' ইত্যাদি কিছুই ছিল না। পরিষ্কার কাজের কথা দিয়ে চিঠির শুরু। ফলে চিঠিটাকে পুরোনো কালের ইঞ্জিনে টানা রেলগাড়ির বদলে বর্তমানের ইঞ্জিনবিহীন ইলেকট্রিক ট্রেনের মত বেমানান ও খাপছাড়া মনে হয়। হুবহু চিঠিটা এখানে তুলে দেওয়া হল (চিঠির যতি চিহ্ন আমরা লাগিয়ে নিয়েছি)—

"তোমার কী কোন খেয়াল থাকে কিছুতে? কতবার বলেছিলাম একটা জলের কুঁজো দেবার জন্যে, পেতলের না হলেও মাটির দিলেও হবে কিন্তু তুমি তার কোন হুঁশ করলে না। বলে দিলে কি, সব স্টেশনেই তো জল পাওয়া যায়, ঘটি দিয়ে কাজ চলবে না? তা চলল, তোমার কথাই থাকল। রাস্তায় জলের খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। বাচ্চারা ছেলেমানুষ, কান্নাকাটি শুরু করে। সঙ্গে খাবারদাবার যা ছিল দিলাম। ছেলেটা 'জল-জল' করতে এক ভদ্রলোক জল

এনে দেয়। যখনই ছেলেরা জল-জল করে সেই ভদ্রলোক দৌড়াদৌড়ি করে জল এনে দিতে থাকে। আমার সঙ্গে তো কোন কথাবার্তা হয়নি, তবে নিজের সঙ্গী সাথীদের বলছিল, "এর কর্তা আমাকে এদের খেয়াল রাখতে বলেছেন।"

কম করে পঞ্চাশবার সে ঐ এক কথা বলেছে, "এর কর্তা আমাকে বলেছে, এদের একটু খেয়াল রাখবেন।" যতবারই হলে ততই সে যেন খুশী হয়। এবার সব কথা খুলে লিখছি।

গাড়ি চলতে আরম্ভ হতেই সে সেই মেয়েটিকে (বলতে আমার লজ্জা লাগছে) কোল থেকে নামিয়ে অন্য ধারে গিয়ে বসতে বলে। সঙ্গের অন্য সকলকে বলে দিলে, "এবার গলা ফাটিয়ে হাসাহাসি বন্ধ করো, আর বিড়ির ধোঁয়া ওদিকে ফেলবে না, এর কর্তা আমাকে বলেছে ওদের খেয়াল রাখতে।"

"এরপরে সকলেই ধীরে ধীরে কথাবার্তা বলতে শুরু করে এবং খানিক বাদে যে যার মতো শুয়ে পড়ে। কিন্তু সেই ভাইসাব বললে, "আমি শোব না এখন, এর কর্তা আমাদের বলেছে এদের খেয়াল করতে।"

সে বসেই রইল। আমার একটু ভয় ভয় লাগছিল, নিশ্চয়ই তার কোন কুমতলব আছে, কিছু গণ্ডগোল করতে পারে। কে জানে কেন সে জেগে আছে। সে আমাকে বললে, "আম্মা, তুমি শুয়ে পড় এবার।" কিন্তু আমি কি করে ঘুমোই। এমনিই চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর ভান করলাম। ওদিকে তখন বাবলি কান্না জুড়ে দিল। কিছুতেই কান্না থামে না, কেবল কেঁদেই চলে। ছুটকাও সেই সঙ্গে কান্না আরম্ভ করল। সেই ভাইসাব উঠে এসে আমাকে বললে— "আম্মা, একটা কাপড় টাপড় দাও।" আমি ভাবলাম, এবার আমার সব লুটপাট করে নেবে। আমি হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "ভাই এই সব নিয়ে যাও, শুধু আমাকে আর বাচ্চাদের ছেড়ে দাও।" আমি গয়নাগাঁটি খুলতে শুরু করে দিয়েছিলাম। তার দিকে তাকিয়ে দেখি সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। কাপড়ের দোলনাটা পুঁটলির মধ্যে থেকে দেখা যাচ্ছিল, সে সেটা নিজেই বার করে নেয়। দড়ি তার নিজের কাছেই ছিল। ওপরের সিটের সঙ্গে দড়ি দিয়ে দোলনাটা ঝুলিয়ে তাতে বাবলিকে শুইয়ে দেয়, তারপর দূরে বসে দোলনা টানতে টানতে নিজের ভারী গলায় কে জানে কি সব গান গাইছিল। আমি মনে মনে বলি—দেখ দিকি হতভাগী, কেমন সুর মিলিয়ে গাইছে। একদিকে হাসি অন্যদিকে দুঃখ। একগাল দাড়ি-গোঁফভর্তি কদাকার দানবের মত মানুষটা কে জানে কি করে মেয়েদের গলার সুরে গান গাইছে। গাইতে গাইতে সে আবার কাঁদছিল। গাল বেয়ে তার চোখের জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। বেশ খানিকক্ষণ কাঁদবার পর সে আপন মনে বলতে থাকে—"বৌ ছেলেরা সব কে কোথায়। আজ তুই কোথায় আর আমি কোথায়।"

আর বাবলি মুখপুড়ীর কাণ্ড দেখো, আমাকে তো রোজ মারপিট করে ঘুম পাড়াতে হয় আর আজ এককথায় ঘুমিয়ে পড়ল। আর হ্যাঁ, তুমি কোনদিন কি আমার বাবলিকে একবারও দোলনায় দোল দিয়েছো? একদিনও এক কলি ঘুমপাড়ানী গান গেয়েছো? আমি যতই খোশামোদ করি না কেন তুমি জবাব দেবে ও সব আমার কাজ নয় আমি পুরুষমানুষ। না দেখে থাকলে শোন পুরুষমানুষ কাকে বলে।

যাক সে সব কথা। রাত প্রায় তিনটে নাগাদ গাড়ি একটা কোল জংশন স্টেশনে এসে থামে। আমাদের কামরার সামনে প্রায় জনা কুড়ি খাকি পোশাক পরা লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদের সঙ্গে বাক্স প্যাঁটরা বেডিং নিয়ে অনেক মালপত্র। প্রথমে তারা ভাইসাব যেদিকে বসেছিল সেখানে যায় কিন্তু তাড়াতাড়ি আবার আমার কাছে এসে বলে, "তোমাকে এই কামরা খালি করে দিতে হবে।"

আমি বললাম—"কিসের জন্যে?"

ওরা বলে—"সে কি, তুমি জানো না, আজকে লোকসেবকের দল যাচ্ছে।"

আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমি জিজ্ঞেস করলাম—"আপনারা কী সরকারী লোক?"

তারা সবাই হেসে ওঠে। বললে, "হ্যাঁ, তবে আজকের সরকারের নয়, আগামী সরকারের লোক। নাও এবার নেবে এসো, পাশের কামরায় তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছি।"

আমি করুণভাবে মিনতি করলাম—"ভাই, আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তাছাড়া আমার মালপত্র অনেক রয়েছে।"

একথা শুনে তাদের মধ্যে একজন বলে, "তোমার লজ্জা করা উচিত। অন্য বৌয়েরা লোকসেবকের পায়ে হীরে জহরতের গয়না থেকে সব কিছু সঁপে দিচ্ছে আর তুমি এই নগণ্য কামরাটা খালি করে দিতে চাইছো না? লোকসেবক কেবল থার্ড ক্লাস কামরায় চড়ে যাবার ব্রত নিয়েছে, তাও তুমি জানো না দেখছি। সেই 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'র গল্পটা তুমি শোননি?"

আমি তাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় "তোমাদের লোকসেবক চুলোয় যাক, আমার পেছনে পড়েছো কেন?"

কথাটা তো আমার মুখ থেকে বেমক্কা বেরিয়ে গিয়েছিল কিন্তু শুনে তারা ভীষণ রেগে যায়। 'না খালি করে যাবে কোথায়।' বলে তাদের মধ্যে একজন আমাদের কামরায় ঢুকে আমার মালপত্র তুলে বাইরে ফেলে দিতে যায়। আমি 'ভাইসাব ভাইসাব' করে চিৎকার করে উঠতেই ভাইসাব ওধার থেকে উঠে এসে কামরায় যে লোকটা ঢুকেছিল তার ঘাড় ধরে চোখ পাকিয়ে বলে, "এর স্বামী আমাকে এদের দেখাশোনা করতে বলেছেন, বুঝেছো!"

তাকে দেখে বাইরের লোকেরা ভয় পেয়ে যায় আর ভাইসাব যে লোকটার গলা চেপে ধরেছিল সে তো একটা টিকটিকির ছানার মত ছটফট করতে থাকে। এর পরে কি আর আমাদের কামরায় চড়ার কারুর সাহসে কুলোয়? যে লোকটা তখন থেকে কেবল 'লোকসেবক লোকসেবক' করছিল আর আমাকে নেবে আসতে বলছিল সে তাড়াতাড়ি সকলকে বলে, "ভাইসকল, চল আমরা অন্য কামরায় যাই। জনতার ঐক্য ভঙ্গ করা ঠিক হবে না। তাছাড়া পাঠানরা আমাদের সত্যিকারের ভাই।"

এরপরে তারা কার নামে যেন জিন্দাবাদ করে আল্লা-হো-আকবর বলতে বলতে চলে গেল।

ভাইসাব একলা দাঁড়িয়ে থেকে, আপন মনে বলতে থাকে, "আমাকে বলল কিনা এদের খেয়াল রাখতে। এ্যাঁ, আমাকে বলল? আমাকে? চমৎকার। শেষ পর্যন্ত কিনা আমাকেই বলল, একটু খেয়াল করবেন? আশ্চর্য।" এই বলে বিড়বিড় করতে করতে নিজেই বুকে পিঠে চাপড়ে বাহবা দিতে থাকে। এত খুশী যে প্রায় পাগল হবার যোগাড়।

সকাল হতে আমি গাড়ি থেকে নামলাম। ভাইসাব বাবলি, জয়ন্তিয়া আর টপুয়াকে কোলে নিয়ে আদর করলে, তাদের মাথায় হাত রেখে বললে—"সালাম ওআলেকুম।"

আমি বললাম, "ভাইসাব, আপনি আমার কাল খুব মান বাঁচিয়েছিলেন। কখনো বোম্বাই এলে আমাদের ওখানে আসবেন। আমাদের বাড়ি ওমুক জায়গায় আর জয়ন্তিয়ার বাবার নাম 'র' দিয়ে শুরু হয়। স্টেশনে আমার

যে ভাই আমাকে নিতে এসেছিল তাকে বললাম ভগ্নীপতির নাম বলতে। সে বললে, "রামলাল চুন্নীলাল মাহেশ্বরী।" নাম শুনেই কিন্তু ভাইসাব ভীষণ চমকে উঠল। কিছুক্ষণ সে অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে থেকে শেষে হাসতে লাগল।

আমার ভাই একটা কাগজে আমাদের ঠিকানা লিখে তাকে দিতে যেতে সে নিতে আপত্তি করে এবং হেসে অকাশের দিকে হাত দেখিয়ে বিদায় নেয়।"

—ইতি রুক্মিণী

চিঠি পড়ে রামলাল ফেরত ডাকেই নিজের স্ত্রী আর ভাইকে চিঠি লিখে জানতে চাইলে, "আমার বাড়ির ঠিকানা লেখা সেই কাগজটা তাকে দিয়ে দাওনি, এটা ঠিক তো? যদি দিয়ে না থাকো তাহলে সেটা অবশ্যই ছিঁড়ে ফেলে দিও, আর যদি সত্যিই তাকে দিয়ে থাকো তো আমার মাথার দিব্যি, ঠিক মত লিখে জানাও আমাকে, আমি বাড়িতে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করবো এখানে।"

সে চিঠির জবাবে তার শালা সেই ঠিকানা লেখা স্লিপটা পাঠিয়ে দেয়, সেটা তার নোট বইয়ের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল।

তা সত্ত্বেও রামলাল নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে থানায় গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা রিপোর্ট করে। দারোগাবাবুও "ঘটনাটা খুবই সাংঘাতিক" বলে রামলালের নিজের খরচায় তার বাড়িতে একজন চৌকিদারের পাহারার ব্যবস্থা করে।

রুক্মিণী বাপের বাড়ি থেকে ফেরার পরে রামলাল তাকে খুব একচোট ধমক লাগায়—"বলিহারী তোমাকে, সেই বদমাশটাকে বাড়ির ঠিকানা দিতে তোমাকে কে বলেছিল?"

রুক্মিণীর চোখ জলে ভরে ওঠে। সে তার ভাইসাব আল্লারাখার কাল্পনিক ছবিটিকে যেন অশ্রুধারায় স্নান করাতে থাকে।

অনুবাদ : জ্যোতির্ময় দাশ

১.১ □ কাহিনি-সংশ্লেষ

রত্নাকরের ভিতরে বাল্মীকির অবস্থানের অতি-পরিচিত প্রত্নপ্রতিমাই যেন পুনরাবৃত্ত হয়েছে এই গল্পে সম্পূর্ণ এক নতুন আঙ্গিকে। বস্তুত এ গল্পের 'রত্নাকর' আহমেদাবাদের গুণ্ডাসর্দার আল্লারাখার মানসিক রূপান্তরের মর্মস্পর্শী কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে একটি চিঠির মাধ্যমে, যা লিখেছে এক স্বল্পশিক্ষিত গৃহবধূ রুক্মিণী কথার সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদেই আল্লারাখার 'বাল্মীকি' সত্তাটির উন্মোচন হয়েছে।

কাহিনীর সূত্রপাত একটি প্রায় চলন্ত ট্রেনে রুক্মিণীর বালবাচ্চা ও পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে চড়া থেকে। তার স্বামী রামলাল নিজে ব্যস্ত থাকায় স্ত্রীকে বিনা escort-এই পাঠাতে বাধ্য হয় বাপের বাড়ি। প্ল্যাটফর্মে চলন্ত ট্রেনের শেষ কামরায় কোনোমতে সে তার পরিবারকে ঠেলে তুলে দিতে পারে, দেরি করে আসার জন্যে অন্যদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ শুনতে শুনতে। ট্রেন ধরানোর আকুল তাড়ায় সে খেয়ালও করেনি কামরাটিতে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সহযাত্রী কে বা কারা। ট্রেন ছেড়ে দেবার পরে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমান যাত্রীরা যখন তাকে জানালো তার স্ত্রীর সহযাত্রী হয়েছে

গুণ্ডাসর্দার আল্লারাখা, তার আট দশটি নেশাখোর চ্যালা ও একটি গণিকা, তখন রামলালের রক্ত হিম হয়ে গেল।

এতক্ষণে তার মনে পড়লো স্ত্রীকে চলন্ত ট্রেনের কামরায় সন্তান ও মালপত্র সহ ছুঁড়ে দেবার সময় তার নাকে দেশি বিড়ির উৎকট গন্ধ এসেছিল, কানেও লেগেছিল কর্কশ গলার অশ্লীল কথাবার্তা। কোনো যাত্রীর চেহারা মনে করতে না পারলেও যাকে সে স্ত্রী-সন্তানের খেয়াল রাখতে বলেছিল, তার কালো টুপি, কালো দাড়ি, কালো লুঙ্গির আবছা আবছা ছবিও মনে পড়ল। এত কালো রঙের স্মৃতি আর সদ্যপ্রাপ্ত ভয়ানক তথ্যটি তার মনকেও যেন অন্ধকার করে দিল। নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। যতক্ষণ খবরটা পায়নি ততক্ষণ শুধু সে একটু ভড়কেছি, কারণ তার মতো লোকেরা ট্রেন ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রকে খানিকটা ভয়ই পায়। এই ভয় পাওয়ার সূত্রেই লেখক এবার একটু ব্যঙ্গের মাধ্যমে খানিকটা রাজনৈতিক বক্তব্য এনেছেন—বলেছেন রামলালের এই ভয় পাওয়া যেন লালকাপড় দেখে ষাঁড়ের ক্ষেপে-ওঠা কি মিলমালিককে দেখে শ্রমিকনেতার ক্ষেপে ওঠারই সমতুল। আসলে ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে দেখে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সে যে স্ত্রী-সন্তানদের কামরায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল—সেই দায়িত্বজ্ঞানহীতার একটা সাফাই যেন নিজেই সে খুঁজতে চাইছে তাই বলছে যে গার্ডের কামরায় লণ্ঠন দেখেই তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল যেমনটি অন্য পরিস্থিতিতে হয় ষাঁড়ের কিংবা শ্রমিকনেতার। নিজের স্ত্রীকে মানুষ বলে গণ্য না করে নির্জীব পুঁটলির মতো কামরায় তুলে দিয়েছিল এটাও না দেখে সহযাত্রী কারা, সেই লজ্জাই তাকে গ্রাস করেছে। কারণ সে এতোটাই সাবধানী মানুষ যে কিনা কাঁচা আমের টুকরিও ভরসা করে আত্মীয়ের হাত দিয়ে পাঠায় না দেশে পাছে সে খেয়ে ফেলে ভেবে। নিজের স্বভাববিরুদ্ধ অসাবধানী কাজটি করে ফেলার গ্লানিতে সে যেন কাতর হয়ে গেল। তার ওপর আতঙ্ক বাড়িয়ে তোলার জন্যে নানা মুনির নানা মত তো ছিলই। তারা তাকে যথোচিৎ ভর্ৎসনা করল বাঘ-নেকড়েদের মাঝে পরিবারকে ফেলে দেবার জন্যে। আল্লারাখার খুনি পরিচয়কেও তারা সবিস্তারে জানালো—যে নাকি এই রেলের কামরাতেই অনেক খুন করেছে। আর পুলিশকে সে পকেটে পুরেছে— গোটা গুজরাতকে 'বাপের সম্পত্তি' বানিয়ে ফেলেছে। এই স্বনিয়োজিত জ্ঞানীরা এই অনাচারের নেপথ্য কারণ হিশেবে এও ঘোষণা করল যে গান্ধিজির দোষেই সারা দেশটা নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি সহিষ্ণুতা ও অহিংসা দিয়ে স্বরাজ পেতে চাইছেন—যা নাকি সম্ভব নয়। বরং ইংরেজদের নিয়মকানুন অনেক কার্যকর ও কঠিন—মোদ্দা কথা, তাদের মতে আল্লারাখা নামক বদমাশটি এমন পরিবেশের কারণেই এতটা বেড়ে গেছে—গান্ধিজির দোষেই সে অজ এত বেপরোয়া।—খুব পরিচিত একটা সামাজিক মনস্তত্ত্বই যেন উঠে এসেছে এইসব কথার মধ্যে দিয়ে। আসলে সমাজই কঠিন করে দেয় কে বদমাশ আর কে ভালো—কে নির্দোষ আর কে দোষী। আর কে সবকিছুর জন্যে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুকেই যে দায়ী করতে হয় এটাও সমাজেরই বিবেচনা।

তা যাই হোক সেই সবজান্তা সমাজের (মানুষগুলির তো নাম নেই তাই ব্যক্তি নয় সমষ্টি হিসেবেই গণ্য করা যাক) বিচারে রামলাল মহামূর্খ হিসেবে সাব্যস্ত হলো। তাকে এই চরম বিপদে সাহায্য না করে সবাই দূরে সরে গিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল যেমনটি সর্বদাই বোকাদের নিয়ে করা হয়ে থাকে।

রামলালের বুদ্ধি শুদ্ধি তো আগেই লোপ পেয়ে গেছিল। কোনোমতে নিজের স্বাভাবিক সাবধানী মনটিকে একটু উজ্জীবিত করে সে পরবর্তী স্টেশনে একটি টেলিগ্রাম পাঠাতে গেল। অনেকক্ষণ ধরে হিসেব কষে সে দেখল মোট ন-আনাতে তার বক্তব্য গুছিয়ে জানানো যাবে। নিজের প্রতিভায় সে গর্বিত হল যে, এত কম শব্দে সে সব কথা জানাতে পারে—উপরন্তু পয়সাও বাঁচাতে পারে। এত প্রয়াসে সময় কতক্ষণ পেরিয়ে সে খেয়ালই করল না।

টেলিগ্রামের ফর্মটি জমা দিতে গেলে পোস্ট মাস্টার সেদিন রবিবার বলে এক্সট্রা চার্জ লাগবে জানালে সে যেন এতক্ষণের হতভম্ব হয়ে থাকাটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে। 'সামান্য কারণে' তিন তিনটে টাকা খরচ করার কথা সে তো মরে গেলেও ভাবতে পারে না। বরং যথারীতি টাকাটা খরচ না করার অজুহাতও খুঁজে পায়— ভেবে নেয় তার স্ত্রী এতদিন তার সঙ্গে ঘর করে নিশ্চয়ই খানিকটা বুদ্ধি সঞ্চয় করেছে। তাই সে পরের স্টেশনে ঠিকই অন্য কামরায় চলে যাবে।

কিন্তু না, তার দুশ্চিন্তা তার মস্তিষ্ককে হারিয়ে সামাজিক বোধটিকেই সক্রিয় করে তুলল। তার স্ত্রী তো নিছক মেয়েমানুষ; আর কে না জানে মেয়েদের বুদ্ধি 'গোড়ালিতে' হয়! তাই বুদ্ধি খরচ করা তার কর্ম নয়—বর্ষায় জ্যাম হয়ে-যাওয়া ট্রেনের চেনও সে টানতে পারবে না। শুধুমাত্র চিৎকার করে মেয়েলি প্রতিবাদ জানাতে পারলেও বদমাশটা মুখ চেপে ধরলে, মেয়েমানুষ হয়ে গায়ের জোরেও সে পরাস্ত হবে।

এমন স্ত্রীর চিন্তায় তাকে মগ্ন দেখে পোস্টমাস্টার এক টাকা ও ফর্মটা ঠেলে দিয়ে বলে ভালো করে ভাবা শেষ করে সোমবার সকালে এসে টেলিগ্রাম করতে, তাতে চার্জও কম লাগবে।

এতক্ষণে রামলালের মনের অন্য দিকটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি তার কর্তব্য ও অনুভূতি বড়ো হয়ে ওঠে—সে যেন মানসচক্ষে দেখতে পায় অন্ধকার জঙ্গলে তার স্ত্রীকে লাঞ্ছনা করছে বদমাশটা—ছোটো ছেলেটা ভয়ে মরে গেছে।

নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ফর্মের সঙ্গে পাঁচটা টাকা দিয়ে খুপরির ভেতর ঠেলে দেয়, এমনকি প্রিপেড রিপ্লাইও চায়। মেশিনের টরে-টক্কার আওয়াজের তালে তালে সে যেন পুলিশের বুটের শব্দ আর হাতকড়ার ঝনঝন ধ্বনি শুনতে পায়। সাহস ফিরে আসে এই ভেবে যে, টেলিগ্রামটি পরের স্টেশনে পৌঁছোলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। নিজের প্রতি, বলা ভালো নিজের বুদ্ধিবিবেচনার প্রতি, তার অগাধ ভরসা। সে নিজের হৃদয়কে একটা ছাঁকনির মতো দেখে—চাতুরী ও নিপুণতার চালুনি যেন আর নিজের প্রতিটি ভাবনা ও পরিকল্পনা এতেই সে ছেঁকে নিয়ে তার কাজে লাগায়। ফলে ভ্রান্তি হবার সম্ভাবনাই যে নেই তা সে জানে।

এসে যায় টেলিগ্রামের প্রিপেড রিপ্লাই। অপার শান্তি ও আস্থায় খামটা খুলে সে জানতে পারে পাঁচ-মিনিট আগে গাড়িটি স্টেশন ছেড়ে যাওয়ায় কোনো খবর দেওয়া যায়নি।

বস্তুত 'বুদ্ধিমান' রামলাল জ্ঞানগর্ভ চিন্তায় ও সামাজিক বিবেচনায় এত মগ্ন ছিল যে নিজের নিপুণতার ছাঁকনিতে ছেঁকে নিতে ভুলে গেছিল সময়ের গতিটিকে। সেটি তো তার অপেক্ষা করবে না। তাই রামলাল যতক্ষণ টাকা-পয়সার হিশেব করেছে ততক্ষণে 'বদমাশ'-সমভিব্যাহারে তার পরিবার চলে গেছে আরো দূরে।

আরো একটি টেলিগ্রাম করার সঙ্গতি তার ছিল না। ছাপোষা ভীতু মানুষের মতোই সে বিছানা নিল—ভগবানের শরণাপন্ন হল। আর কোনো ক্ষমতাই তো তার নেই। সমস্ত স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে তাকে সারারাত উচাটন করল—ঘুম এলো না—আতঙ্কে ঘেমে স্নান করতে করতে হঠাৎ তার মনে হল যে লোকটাকে (অর্থাৎ কালো লুঙ্গিপরা দাড়িওয়ালা সে আবছা অবয়বটাকে) সে স্ত্রী-পুত্রের খেয়াল রাখতে বলেছিল তাকে যেন আগেও দেখেছে।

স্মৃতি হাতড়ে ফিলে এর অনেকদিন আগের এক রাতে ট্রেনযাত্রার কথা। বীভৎস চেহারার একটি লোক রাতে তাদের কামরায় এসে পুলিশের হাত থেকে লুকোতে চেয়েছিল। স্বীকার করেছিল সে অপরাধী, সঙ্গে আফিম আছে। রামলালের স্ত্রীকে সে "মা" সম্বোধন করে মিনতি করায়, রুক্মিণী তাকে বাঁচাতে উদ্যত হলে, সদা-সাবধনী রামলাল

সামাজিক নিয়ম-অনুসারে পুলিশ ডেকে বদমাশ লোকটিকে ধরিয়ে দিয়েছিল। বিচারে তিন বছরের জেল হয়েছিল তার। আদালতের বাহবায় রামলাল গর্বিত হলেও কাঁটার মতো বিঁধেছিল বদমাশটার হুমকি; বলেছিল জেল থেকে বেরিয়ে রামলালকে সে দেখে নেবে। প্রায় ভুলে যাওয়া হুমকি মনে পড়ায় রামলাল এবারে নিশ্চিত হয় যে এতক্ষণে তার স্ত্রীর পরিচয় জেনে।

সকাল হলে তার শালার দশটার টেলিগ্রামে সে জানতে পারে সকলের নিরাপদে পৌঁছোবার খবর। হিশেব মিলল না দেখে খুবই অবাক হয়। আরো অবাক হয় যখন মাত্র তিন দিনের মাথায় পায় স্ত্রীর লেখা এক লম্বা চিঠি।

কাহিনির মধ্যে লেখক সেই চিঠিটির সম্পূর্ণ বয়ান তুলে দিয়েছেন—তাও আবার স্বল্প-শিক্ষিত মেয়েটির অপটু ভাষায় লেখাটি হুবহু রেখে। এই পরিকল্পনাটির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে যেটি পরে আলোচ্য।

প্রথামাফিক স্বামীকে অনুযোগ করে শুরু -হওয়া চিঠিতে ছত্রে ছত্রে সেই বদমাশের ক্রিয়াকলাপের যে বিবরণ দিয়েছে রামলালের স্ত্রী রুক্মিণী, তাতে এতক্ষণ ধরে বদমাশটি সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছিল, তা যেন কোথায় টাল খেয়ে যেতে লাগল। রামলাল স্ত্রীকে জলের কুঁজো না দেওয়াতে রাস্তায় খুবই অসুবিধা হতে থাকলে সহযাত্রী এক 'ভদ্রলোক' বারবার দৌড়ে দৌড়ে জল এনে দিতে থাকে। লোকটি রুক্মিণীর সঙ্গে সরাসরি কথা না বললেও কম করে অন্তত পঞ্চাশবার নিজের সঙ্গীসাথীদের বলেছে যে এই মহিলার স্বামী তাকে বলে গেছে স্ত্রী-সন্তানদের দেখাশোনা করতে। রুক্মিণী এও জানিয়েছে যে লোকটির বারবার একই কথা বলে আর বারবার খুব খুশি হয় এইটা ঘোষণা করে যে মেয়েটির স্বামী তাকেই দায়িত্ব দিয়ে গেছে। মনে হয় এই দায়িত্বপ্রাপ্তি তার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল—বিস্ময়ে অভিভূত ছিল সে এই ভেবে যে তার মতো গুণ্ডাকেও কেউ পরিবারের খেয়াল রাখতে বলতে পারে।

এরপর মেয়েটি আরো সবিস্তারভাবে সেই লোকটির ভদ্রতা ও সহযোগিতার কথা জানিয়েছে। যে মহিলা লোকটির কোলে বসেছিল (রামলালের শুভানুধ্যায়ী বর্ণিত বেশ্যাটি) তাকে নামিয়ে দিয়ে অন্যদিকে বসতে বলল সে। সঙ্গীদেরকে গলা ফাটিয়ে হাসাহাসি বন্ধ করতে, বিড়ির ধোঁয়া না ছাড়তে সে নির্দেশ দিল। কারণ মেয়েটির সুবিধে অসুবিধের দায়িত্ব তাকেই দিয়ে গেছিল স্বামীটি।

রাত বাড়লে সবাই শুয়ে পড়লে সে জানায়, জেগে পাহারা দেবে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলি আর তাদের মা-কে। কারণ গানের ধুয়ার মতো বারবার সে জানায় "এর কর্তা বলেছে এদের খেয়াল করতে।"

রুক্মিণীকে 'আম্মা' সম্বোধন করে সে বলে ঘুমিয়ে পড়তে। লোকটির কদাকার চেহারা আর সঙ্গীসাথীদের দেখে আশঙ্কিত রুক্মিণী ঘুমোতে পারে না—শুধু ভাণ করে। বেশিক্ষণ এই ভাণ চালানো যায়না। কোলের মেয়ে ছোট্ট বাবলি কেঁদে ওঠে। সেই কান্নায় তার ছোট দাদা ছুটকাও কাঁদতে শুরু করে। মাঝরাতে চলন্ত ট্রেনে দুটি শিশুর কান্নায় মায়ের নাজেহাল অবস্থা দেখে ভাইসাব (মানে সেই লোকটি, যাকে রুক্মিণী এতক্ষণ 'ভাইসাব' বলে চিঠিতে উল্লেখ করতে শুরু করেছে) এসে একটা কাপড় চাইলে সে ভয়ে কেঁপে উঠে ভাবে যে এবারে লোকটি (তখনও রুক্মিণী তাকে 'ভাইসাব' ভাবতে পারেনি সঙ্গত কারণেই) নিশ্চয়ই লুটপাট করবে। সে হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে তার সমস্ত গয়নার বিনিময়ে ছেলেমেয়েদের ও নিজের জীবনের ভিক্ষা চাইল। তার এই অবস্থা দেখে লোকটি হাসতে হাসতে সারা হয়—তারপর পুঁটলি থেকে নিজেই বার করে দেয় কাপড়খানা। দড়ি দিয়ে কাপড়টিকে সিটের সঙ্গে আটকে দোলনা বানিয়ে বাবলিকে শুইয়ে দিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে দোলনাটা টানতে থাকে। তার কর্কশ ভারি

গলার পরিবর্তে মেয়েলি গলা করে গান গায় সে—হয়ত বা পাছে বাচ্চাটি কর্কশ অপরিচিত গলার আওয়াজে ভয় পায় সেই ভেবে। মুখভর্তি দাড়িগোঁফওয়ালা কদাকার লোকটির অমন মেয়েলি গানে রুক্মিণীর হাসি পেলেও সে এও দেখে গাইতে গাইতে লোকটির চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। হাসির সঙ্গে দুঃখের এমন সহাবস্থানে রুক্মিণী অবাকও হয়ে যায়। এক সময় সে শোনে লোকটি আপনমনে বলছে যে সে তার বউ ছেলে সবাইকে হারিয়ে ফেলেছে। আজ তারা কোথায় আর সে নিজে কোথায়—এই অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান যেন সে নতুন করে অনুভব করে পরের মেয়েটিকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে।

এরপর রুক্মিণী স্বামীকে পুরুষমানুষের নতুন সংজ্ঞা জানায়—ক্ষোভের সঙ্গে সে অনুযোগ করে তার স্বামী কোনোদিন মেয়েকে গান গেয়ে দোলনা দুলিয়ে ঘুম পাড়ায়নি—কারণ কাজটা যে পুরুষমানুষের উপযুক্ত বলে গণ্য করে না। অথচ আদ্যন্ত-পুরুষ (চেহারা ও স্বভাবে-চরিত্রে) তার 'ভাইসাব' আপাত-মেয়েলি কাজটা নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে—এর ফলশ্রুতিতে শুধু যে দস্যি বাবলি অন্যদিনের অসহযোগিতার পরিবর্তে একবারে বিনা আয়াসে ঘুমিয়ে পড়েছে তা নয়—বরং শুধু চেহারা, গোঁফদাড়ি কি কর্কশ কণ্ঠের সমাহারে পৌরুষের সংজ্ঞা যে নির্ণয় করা যায়না সেটাও যেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যেটা লেখক ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন —পুরুষ কি নারী নয়—অপরের প্রতি মমতা, সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ববোধ আসলে অন্তরের ব্যাপারে তার কোনো পুরুষ-নারীভেদ নেই—মানুষের মতো বোধ হওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি।

তা এই 'বদমাশ'টির ভেতরে মনুষ্যত্বের সন্ধান এরপরেও করেছেন লেখক। আর সেই প্রক্রিয়ায় আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের সামনে—যার মধ্যে মিশে রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদানও।

পুরুষমানুষের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করা লোকটি বাবলিকে ঘুমপাড়িয়ে সরে যায় কামরার অন্যপ্রান্তে। রাত তিনটে নাগাদ একটি জংশনে ট্রেনটি থামলে খাকি পোশাক পরা একদল লোক অজস্র বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে কামরার সামনে আসে। প্রথমে তারা আল্লারাখা যেদিকে বসেছিল কামরার সেই দিকটিতে যায়; সম্ভবত গুণ্ডাসর্দার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের চেহারা দেখে শক্ত ঠাঁই বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি চলে আসে রুক্মিণীর আসনের দিকে। 'অবলা' মেয়েটি ও নাবালক কয়েকটি শিশুকে দেখে এবারে জোরগলায় হুকুম দেয় কামরার এই অংশটি ছেড়ে দিতে খাঁকি-ওয়ালাদের জন্যে। বিস্মিত রুক্মিণী কারণ জানতে চাইলে তার অজ্ঞতায় বিরক্ত হয়ে লোকগুলি জানায় 'লোকসেবকের' দল এই ট্রেনে করে যাচ্ছে। এটা সরকারী লোক কিনা জিজ্ঞেস করলে 'লোকসেবকেরা' বলে যে তারা 'আগামী' সরকারের লোক। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের লোক হলে যে 'বিশেষ' সুযোগ সুবিধা (!) পাওয়া যায়, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সরকার লোকদেরও সেটাই তো প্রাপ্য হয়—এমনটাই তাদের মনোভাব!

ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে আর অজস্র মালপত্রসহ এই মাঝরাতে কামরা বদল সম্ভব নয় জানিয়ে রুক্মিণী অনুরোধ করলে এরা তাকে তীব্র তিরস্কার করে বলে যে তার লজ্জা হওয়া উচিত। দেশের সেবায় নিয়োজিত এই 'লোকসেবকেরা' ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করতে শুধু থার্ড ক্লাসের কামরায় যাতায়াতের ব্রত নিয়েছে আর এমন মহান দেশসেবীদের সাহায্যের জন্যে সমস্ত বৌ-মেয়েরা তাদের পায়ে এমনকী নিজেদের হীরে জহরতের গয়নাও সঁপে দিয়ে ধন্য হচ্ছে যেখানে, সেখানে সামান্য একটি কামরা খালি করে দিতে রুক্মিণীর এত অনীহা তো অপরাধেরই সামিল বলে গণ্য হওয়া উচিত! স্বল্পশিক্ষিত মেয়েটিকে তারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতাটির উদাহরণ দিয়েও ত্যাগের মহিমা বোঝাতে চায়।

কিন্তু এসব মহতী কথা মেয়েটির কিছুই বোধগম্য হয় না, সে এই অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ করে ফেলে— হয়ত বা ছেলেমেয়েদের অসুবিধার কথা ভেবেই। তার এতবড়ো 'অন্যায়' তো মেনে নিতে পারেনা দেশের ভাবী নেতারা। 'লোকসেবক'-নামধারী জনগণের সেবকরা এবার তাদের ক্ষমতা, পৌরুষ, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির নমুনা দেখতে অসহায় মেয়েটির মাল পত্র বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে উদ্যত হয়। জনগণের প্রতি এ হেন 'সেবা'য় রুক্মিণী অবশেষে নিরুপায় হয়ে চেঁচিয়ে ডাকে তার 'ভাইসাব'-কে। ততক্ষণে বদমাশটিকে ভাই বলে সে ভাবতে পেরেছে। হয়ত বা 'জনসেবী'দের এহেন অমানবিক আচরণের পাশে কদাকার চেহারার ঘুমপাড়ানি গান গাওয়া ও চোখের জল ফেলা গুণ্ডাটিকেই তার বেশি 'লোকসেবক' বলে মনে হয়েছিল। তার চীৎকারে আল্লারাখা উঠে এসে কামরায় ঢোকা 'মস্তান'-টিকে ঘাড় ধরে বার করে দেয় এবং আবারও জানাতে ভোলেনা যে মেয়েটির স্বামী তাকে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গেছে। অতএব তার উপস্থিতিতে কোনো বেয়াদপি করা যাবে না। টনক নড়ে দেশসেবকদের। পত্রপাঠ তারা কামরা থেকে বিদায় হয়। কারণ জনতার ঐক্যভঙ্গ করা অনুচিত। তাছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে পাঠানরাও (পড়ুন মুসলমান) তাদের যথার্থ ভাই। এমন জ্ঞানগর্ভ বিবেচনার পরই 'কার নামে যেন' (সম্ভবত, মহম্মদ আলি জিন্না) জিন্দাবাদ বলে আল্লা -হো-আকবর ধ্বনি দিতে দিতে বিদায় নেওয়া 'হিন্দু' লোকসেবকরা।

বস্তুত গল্পের এই অংশটিতে লেখকের রাজনৈতিক মানসিকতাটি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। কংগ্রেসি কর্মীরা স্বাধীন ভারতের মসনদের অধিকার পাবার লক্ষ্যে যে নানান আপোষ করেছিল এমনকি মুসলিম লীগপন্থীদের সঙ্গেও (দেশভাগের প্রেক্ষিতটি স্মরণীয়) তাই যেন মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছে তাদের গলায় অন্য ধর্মের ও অন্য রাজনীতির শ্লোগানের ব্যবহারে। দেশপূজক, রাষ্ট্রসেবক জনদরদী এই সংঘের কর্মীরা আদতে মৌলিক মানবিকতাও বিরহিত যে সেই নির্মম সত্যটিকেও লেখক তুলে ধরেছেন। জনগণের কল্যাণকামনায় নিয়োজিত বলে দাবী করলেও তাদের লক্ষ্য যে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং গদি ও তার ব্যবহার তাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের আচরণে। আর এই লজ্জাকর ছবিটিকে আরো বেশি কালো দেখাতেই রাষ্ট্রের চোখে অপরাধী, সমাজের বিচারে ঘৃণ্য আল্লারাখার মাধ্যমে লেখক নৈতিকতা, সততা ও মানবিকতার টুকরো টুকরো মর্মস্পর্শী দৃশ্য এ গল্পে সংযোজিত করেছেন। এরই অনুসূত্রে এসেছে আল্লারাখার তিতিক্ষা ও ত্যাগের প্রসঙ্গটি—সকালে গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময়ে রুক্মিণী কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বোম্বাই-তে বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানায়। নিজে স্বামীর নাম উচ্চারণ করবে না বলে ভাইকে দিয়ে বলায়। রামলালের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে 'বদমাশ'। তারপর হাসতে থাকে। ভাগ্যের এমন পরিহাসে হাসি পাওয়াই তো স্বাভাবিক। নতুবা প্রতিহিংসার যে সুবর্ণসুযোগ সে পেয়েছিল তা কি তার কাছে অচরিতার্থ হয়ে থাকত ট্রেন যাত্রার পুরো সময়টাতে? নিজের অজান্তেই সে তার সবচেয়ে বড়ো শত্রুর সবচেয়ে বেশি উপকার তো করেইছে এমনকী এখন সত্য জানার পরেও তার মনের জিঘাংসা আর উদ্‌গীরিত হয়নি। অজ্ঞাতসারে যে কাজ সে করেছে তার মধ্যে দিয়ে সামাজিকভাবে তার 'রত্নাকর' সত্তাটি বিসর্জিত হয়েছিল। এই অজ্ঞাত ত্যাগের পরে সত্য জেনেও নিষ্ক্রিয় থাকার যে আচরণ, তার মাধ্যমে 'বদমাশে'র তিতিক্ষার বোধটাই সর্বময় হয়ে উঠেছে। এই হয়তো 'রত্নাকরে'র মধ্যে 'বাল্মীকি'-সত্তার উদ্‌ভাসন যার নেপথ্যেও ছিল পুরাণ-কাহিনির মতোই করুণা ও হৃদয়ের অনুভূতির বিকাশ।

কাহিনিটি এখানেই শেষ হলে নাটকীয় চমক হয়ত বজায় থাকত। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য সফল হতো না।

তাই আরো খানিকদূর এগোয় গল্প। রুক্মিণীর ভাই বোম্বাইয়ের বাড়ির ঠিকানা কাগজে লিখে তাকে দিতে গেলে সে নিতে অস্বীকার করে এবং আবারও হেসে আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে বিদায় নেয়। আসলে যে সর্বশক্তিমান অদৃশ্য সত্তা তাকেই বেছে দিয়েছিল রামলালের স্ত্রী-সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এবং প্রতিহিংসার পরিবর্তে তাকে করেছিল ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি সেই অদৃশ্য সত্তার অঙ্গুলিহেলনেই রুক্মিণীর সঙ্গে তার দেখা হতে পারে আবারও নচেৎ নয় এমনটাই যেন ওই অনির্দেশ্য সংকেতের মাধ্যমে সে ব্যঞ্জিত করল।

দীর্ঘ এই পত্রটি পড়ে রামলাল আশ্বস্ত হবার পরিবর্তে দ্বিগুণ শঙ্কিত হয়ে পড়ল। তার একমাত্র চিন্তা হল সেই ঠিকানার কাগজটি অবস্থান সম্পর্কে স্ত্রীকে চিঠিতে সে নির্দেশ দেয় কাগজটি না দেওয়া হয়ে থাকলে ছিঁড়ে ফেলতে আর যদি দেওয়া হয়ে থাকে তো তাকে জানাতে, তাহলে সে বাড়িতে পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করবে। তার এই আতঙ্কিত অবস্থার কথা শুনে তার শ্যালক সেই ঠিকানা লেখা স্লিপটাই (যেটি আল্লারাখা নিতে অস্বীকার করেছিল) সরাসরি ডাকে পাঠিয়ে দেয় তার সন্দেহ মোচনের জন্য। কিন্তু মেয়ের দোলনায় দোল দিলে পৌরুষহানি হয়, এমন ভাবনা-পোষণকারী বীরপুরুষের তাতেও শান্তি হয় না। থানায় এই ব্যাপারটি জানিয়ে দেয় সে। দারোগাবাবুও তার মতোই ব্যাপারটিকে 'সাংঘাতিক' বলে অভিহিত করেন। তার মতটি কর্তৃপক্ষও সমর্থন করছে জেনে অবশেষে রামলাল নিশ্চিন্ত হয় এবং বাড়িতে নিজের খরচায় একটি চৌকিদারের ব্যবস্থা করে নিজের সুরক্ষাকেও সুনিশ্চিত করে। তারপর পৌরুষ জাহির করতে স্ত্রীকে তার নির্বুদ্ধিতার জন্য ধমকে চিঠি লেখে—বদমাশটিকে বাড়ির ঠিকানা দেওয়াটা যে কি মাত্রার বোধহীনতা তাই সে সোচ্চারে স্ত্রীকে জানাতে চাইল।

স্বামীর এই তিরস্কারে রুক্মিণীর চোখ ভরে উঠল। তার চোখের অবিরল ধারা যেন 'বদমাশে'র পরিচিত সত্তাটিকে নির্মজ্জিত করে দিয়ে ভেতরে লুকিয়ে থাকা 'ভাইসাব'কে (যাকে শুধু সেই চিনেছে) অভিষিক্ত করে পবিত্রতায়। তার চক্ষুনিসৃত পুণ্যবারি 'রত্নাকর'টিকে মুছে দিয়ে 'বাল্মীকি'কে যেন খুঁজে আনে সমাজ ও রাজনীতির পাঁক থেকে।

২.২ □ কাহিনির অভীপ্সিত সত্য

এবারে সেই মৌলিক প্রশ্নগুলির নিরীক্ষা অনিবার্য হয়ে ওঠে যেগুলির মুখোমুখি লেখক আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ফিরে আসে সেই প্রশ্নটি কেন রুক্মিণীর চিঠিটি হুবহু তুলে দিয়েছেন লেখক। আসলে রুক্মিণীই সম্ভবত একমাত্র মানুষ যে আল্লারাখার ভেতরে লুকিয়ে থাকা বা হারিয়ে যাওয়া মানবিক সত্তাটিকে দেখতে পেয়েছিল। তাই তার নিজস্ব বয়ানটিকেই যথাযথ রাখাটা জরুরি এই গল্পে। তার কথাগুলি অন্য কারুর মাধ্যমে, শুদ্ধ বানানে এবং পরিশীলিত ভাষায় বললে হয়ত সাহিত্যগুণ বজায় থাকত কিন্তু যে বিশ্বাস ও আবেগ থেকে আল্লারাখাকে 'ভাইসাব' বলে ভাবতে পেরেছে রুক্মিণী, সেটি হারিয়ে যেত—যেমন সমাজের মানুষ তো তাকে বদমাশই ভাববে (এমনকি রামলালও) তারই কৃতকর্মের ফলশ্রুতিতে। শুধু রুক্মিণীই তাকে অন্য রকম ভাবতে পারবে তার মানবিক কর্মগুলির একমাত্র সাক্ষী হিসেবে। তাই প্রত্যক্ষদর্শী ও নিন্দুক নয়, এমন মানুষটির নিজস্ব বিবৃতিই পারে আল্লারাখাকে অন্যভাবে উপস্থাপিত করতে।

আর এই বয়ানটিই যেন চোখে আঙুল দিয়ে প্রশ্ন করে আসল 'লোকসেবক' কে? 'বদমাশ'-ই বা কে?

উত্তরটাও লুকিয়ে রয়েছে বয়ানেই—তকমাধারী, উর্দিপরা, রাজনীতির ভাবী নেতা, 'স্বঘোষিত' জনসেবীরা নয়—বরং কাহিনির বিবরণে 'বদমাশ'টিই হয়ে উঠেছে যথার্থ লোক (এ ক্ষেত্রে মানব) সেবক। আর তাই অনিবার্যভাবেই বদমাশের ভূমিকারও অভিনেতা বদল হয়ে গেছে—যাদের বিচারে আল্লারাখা সাব্যস্ত হয়েছিল 'দুষ্ট' বলে আজ তারাই যেন নিজেদের আচরণে (লোকসেবকরা কিংবা রামলাল বা বৃহত্তর অর্থে সমাজের গোটাটাই) পর্যবসিত হয়েছে বদমাশে।

তাই সচেতনভাবেই লেখক হয়তো এই নামকরণ করেছেন তাঁর গল্পের—রাজনৈতিক ও সামাজিক শ্লেষ দিয়ে বিদ্ধ করতে চেয়েছেন প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণাকে, আর কটাক্ষ করেছেন সামাজিক বিচারকেও—সেই সঙ্গে নতুনভাবে যেন সংজ্ঞায়িত করেছেন মানবতাকেও।।

অনুশীলনী

বিস্তৃত প্রশ্ন :

১. 'টোবা টেক সিং' গল্পটিকে 'পলিটিক্যাল স্যাটায়ার' হিসেবে বিশ্লেষণ করে দেখান।

২. সামাজিক অবস্থান, না ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব—কোনটি গল্পের কুশীলবদের জীবনের পরিণতি সূচিত করে? 'কফন' গল্পের বিশ্লেষণ করে সেটি দেখান।

৩. মধ্যবিত্তের জীবনের ত্রিশঙ্কুবৎ অসহায় অবস্থান কি ভাবে 'কনে দেখা' গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে সেটি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. ধর্ম, সমাজ, মানবতা—কিভাবে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে অস্মাচির জীবনের ভবিতব্য নির্দেশ করে দিল—'দিনের বেলার প্যাসেঞ্জার গাড়িতে' অবলম্বনে বিশ্লেষণ করুন।

৫. 'মরীচিকা' গল্পটির নামকরণের প্রকৃত ব্যঞ্জনা কি, সে বিষয়ে ব্যাখ্যাসহ নিজের মতামত জানান।

৬. 'দেয়াল' গল্পটি কি বশীরের আত্মজীবনী—না জীবনের বাস্তবসত্যের নির্মম দলিল? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

৭. একটি মাছ, প্রকৃতি ও একজন মানুষ কিভাবে পরস্পসাপেক্ষে গল্পের প্রধান কুশীলব হয়ে উঠেছে—'মাছ ও মানুষ' অবলম্বনে সেটি বর্ণনা করে দেখান।

৮. নৃতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব—নানান্ উপাদানের সংশ্লেষে গড়ে উঠেছে 'টড় পা' গল্পটি; উপাদানগুলির অনুসন্ধান করে মন্তব্যটির যাথার্থ্য নির্ণয় করুন।

৯. 'সমাজ-সংস্কারক' গল্পটির মধ্যে দিয়ে যে-তীব্র সামাজিক শ্লেষ ব্যপ্তিত হয়েছে—তার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১০. 'বদমাশ' গল্পে যে পৌরাণিক মোটিফটি পরোক্ষে রয়েছে, সেটির উল্লেখ করে 'বদমাশে'র চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

অবিস্তৃত প্রশ্ন :

১. 'টোবা টেক সিং' গল্পে পড়ে-থাকা বিষণের দেহ কিসের প্রতীক, সে বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য রাখুন।

২. 'টোবা টেক সিং' গল্পের আসল পাগল কারা ও কেন, সে বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

৩. 'কফন' গল্পের নামকরণ কি যথাযথ? আপনার মতামত দিন।

৪. প্রচলিত লোকাচার কিভাবে 'কফন' গল্পের ট্র্যাজেডি সূচিত করেছে সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫. 'কনে দেখা' গল্পে সোনার টুকরোগুলো কিসের প্রতীক?

৬. 'কনে দেখা' গল্পে উল্লিখিত চারজন বিশেষ নারী কিসের প্রতিভূ হয়ে এসেছেন?

৭. শিশুকন্যাটির নাম 'পাপ্পাতি' কেন দেওয়া হল, জয়কান্তনের গল্পটির নিরিখে বিচার করুন।

৮. দিনের বেলা, ট্রেন, স্টেশন—এগুলি কিসের প্রতীক হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে জয়কান্তনের গল্পে?

৯. প্রকৃতি কি ভূমিকা পালন করেছে 'মরীচিকা' গল্পে?

১০. 'মরীচিকা' গল্পে প্রতীক ব্যবহারের নিদর্শন কি কি?

১১. 'দেয়াল' গল্পে হাস্যরসের উপাদান কিভাবে সঞ্জাত হয়েছে তার অনুসন্ধান করুন।

১২. গোলাপচারা, জেলখানা ও প্রাচীর কিসের ইঙ্গিত বহন করেছে 'দেয়াল' গল্পে—বিচার করুন।

১৩. অলডাস হাক্সলির 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড' গ্রন্থের দেয়াল-ভেঙে-পড়ার তত্ত্বটি ভি. এম. বশীরের 'দেয়াল' গল্পের আলোচনায় কতখানি প্রযোজ্য, সে বিষয়ে অভিমত দিন।

১৪. হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী' উপন্যাসটির সঙ্গে 'মাছ ও মানুষ' গল্পের তুলনা কতদূর করা যায়—আলোচনা করুন।

১৫. 'মাছ ও মানুষ' গল্পে জীবকান্ত "ভূতগ্রস্ত" মাছটিকে কেন ছেড়ে দিল?

১৬. 'টড় পা' গল্পে সভ্যজগতের প্রতি কিভাবে ব্যঙ্গনিক্ষেপ করা হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

১৭. 'টড় পা' ছোটোগল্প হলেও অনেকাংশেই প্রবন্ধের ধাঁচে লেখা—আলোচনা করুন।

১৮. 'সমাজ-সংস্কারক' গল্পে বাবাসাহেবের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

১৯. 'সমাজ-সংস্কারক' গল্পে বাবাসাহেবের পুত্রবধূর চরিত্রটির মূল্যায়ন করুন।

২০. রুক্মিণী চরিত্রটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কোথায়—'বদমাশ' গল্প অবলম্বনে আলোচনা করুন।

২১. 'বদমাশ' গল্পের নামকরণের তাৎপর্য কি?

২২. বদমাশ রামলাল চরিত্রটির মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. 'No man's land' কি?

২. টোবা টেক সিং কোথায়?

৩. লাহোরের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাগলরা কি নিয়ে শঙ্কিত ছিল?

৪. মাধব কেন আলু ফেলে ঘরে যেতে চায়নি?

৫. মহাভোজের কি রকম বর্ণনা দিয়েছিল ঘিসু?

৬. কোন গান গেয়ে বাপ-ব্যাটা শুঁড়িখানায় নাচছিল?

৭. বাকসা, মিস্টার বাকসি হতে চেয়ে কি কি করেছিল?

৮. বাকসার 'জীবনে-আসা' চারজন বিখ্যাত নারীর পরিচয় দিন? তাঁদের মধ্যে মিল কোথায়?

৯. অম্মাচির 'শ্বশুরবাড়ি' কোথায় ছিল?

১০. কাদের সন্ধানে অম্মাচি নিজের গ্রাম থেকে ট্রেনে রওনা হয়ে ছিল?

১১. অম্মাচির সহযাত্রিণী বিধবা মেয়েটির জীবনের কথা সংক্ষেপে বলুন।

১২. নীলা সারাদিন কি কাজ করত?

১৩. নীলার গল্পে আমগাছ ও শাদাফুলের গাছের প্রসঙ্গ কেন এসেছে?

১৪. নীলার সঙ্গে আলাপ-হওয়া যুবকটির নাম কি? সে দেখতে কেমন?

১৫. রাজবন্দী নেতাদের থেকে বশীর কি কি পেয়েছিলেন?

১৬. বশীরের সহপাঠীকে জেলে কত বার চাবুক মারা হয়েছিল?

১৭. দেখা হলে কি কি চিহ্ন দিয়ে বশীর ও নারায়ণী পরস্পরকে চিনবে বলে ঠিক করেছিল?

১৮. বশীরের 'ডিলাক্স' জীবন কেমন ছিল?

১৯. অ্যাসিস্ট্যান্ট জেলার ও জেল সুপারিনটেণ্ডেটের সঙ্গে কি কি বিষয়ে বশীরের আলোচনা হত?

২০. জেলখানার মধ্যেকার গোলাপবাগিচা কিসের প্রতীক?

২১. মোষখুঁটি বিল কত বড়ো ছিল?

২২. মাঝধরার সময় জেলেরা কি পরে থাকে?

২৩. মোষখুঁটি বিলের সবচেয়ে বড় মাছটিকে "ভূতগ্রস্ত" বলা হতো কেন?

২৪. কোন্ উৎসব উপলক্ষে জীবকান্তরা মাছ ধরতে গেছিল?

২৫. বড়ো মাছ ধরার পদ্ধতি কি?

২৬. কন্ধদের মাছের বর্ণনা দিন।

২৭. "মাহাপুরু" কে?

২৮. "ধাংড়ী বেন্ট" কাকে বলে?

২৯. "ধরতনী মা" কোথায় কোথায় আছে?

৩০. "ডংগরিআ" মানে কি?

৩১. টড়পার "মা-বাপ" কে?

৩২. পুত্রবধূর জন্যে বাবাসাহেব কেমন পাত্র খুঁজতেন?

৩৩. বাবাসাহেব নিজেকে কার সঙ্গে তুলনীয় বলে ভাবতেন?

৩৪. রামলালের ক-টি সন্তান? তাদের নাম কি?

৩৫. "বদমাশের" নাম আসল কি?

৩৬. রুক্মিণীর সহযাত্রী কারা ছিল?

৩৭. রামলাল কেন টেলিগ্রাম পাঠালো? কত খরচ হলো?

৩৮. আল্লারাখার ট্রেনে কুকীর্তির কোন্ গল্প রামলাল শুনলো?

৩৯. "লোকসেবক"-রা রুক্মিণীকে কার, কোন্ কবিতার কথা বলেছিল?

৪০. বদমাশ বাবলিকে কিভাবে ঘুম পাড়াল?

৪১. রামলালের পুরো নাম কি?

৪২. আল্লারাখার ক-বছরের জন্য জেল হয়েছিল?

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata-700 064 and Printed at : Royal Halftone Co., 4, Sarkar Bye Lane, Kolkata-700 007